সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ষোড়শ ভাগ

সম্পাদক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা

২১।৩ নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট্ বাগবাজার

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত

১৩১৬

ষোড়শভাগের সূচী

বিষয়। পৃষ্ঠা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সভাপতির অভিভাষণ*

সভ্যমহোদয়গণ—সাহিত্য-পরিষদের এক দিকে অতীত কাল, অপর দিকে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ। অতীত কাল সীমাশূন্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না, ভবিষ্যৎ অনন্ত। বঙ্গদেশের অতীত কালের ভাষা ও সাহিত্যের অনুসন্ধান করিতে অনেক সময়েই তমসাবৃত গহ্বরে প্রবেশ আবশ্যক; সুতরাং অনুসন্ধিৎসুর পথ বিভীষিকাময়। অনেকেই পথ হারাইবার ভয়ে অন্ধকারে অগ্রসর হইতে পারেন না। প্রায় দুই হাজার বৎসরের সাহিত্যের উদ্ধারও সহজ নহে এবং ইহা সময় সাপেক্ষ। বৌদ্ধ রাজন্যগণের রাজত্বকালের সাহিত্যের নিদর্শন প্রায়ই লুপ্ত হইয়াছে। উত্তরবঙ্গে বিশেষ অনুসন্ধানে কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে, আর কি পাওয়া যাইবে বলা যায় না। বৌদ্ধতন্ত্রের কতকটা নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, নেপাল ও তিব্বতে আরও পাওয়ার সম্ভাবনা। এই একটী আমাদের বিশেষ অনুসন্ধানের ক্ষেত্র, আমরা অচিরে এ ক্ষেত্রে কতটা কাজ করিতে পারিব এখন বলা যায় না। পৌরাণিক তন্ত্রের মতভেদও ছিল, গ্রন্থও অনেক ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানকালে পূর্ণাবয়ব গ্রন্থ বিরল; বিশেষ অনুসন্ধানেও অধিকাংশেরই পূর্ণগ্রন্থ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তি অনেক যত্নে আংশিক ভাবে কতকগুলি তন্ত্র প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু পুরাতনই হউক বা আধুনিকই হউক মহানির্ব্বাণ তন্ত্রও সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় নাই। দিঘাপতিয়ার কুমার শ্রীশরৎকুমার রায় তন্ত্রপ্রকাশে যত্ন প্রকাশ করিতেছেন এবং অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য ফলবান্ হইলে বঙ্গীয় সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই।

পরমা শক্তির প্রভাব ও পূজা সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল; রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান লইয়াও অনেক গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কতকগুলি বরাবরই প্রচলিত আছে। আবার অনেকগুলির পরিষৎ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু বাকীও অনেক। এমন কি কাশীদাসের মহাভারতেরই আমরা এখনও ভাল সংস্কার প্রকাশ করিতে পারি নাই। বঙ্গীয় সাহিত্যের এই শাখারও বিস্তৃতি আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন

---

* সাহিত্যপরিষদের ১৫শ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় যে বক্তৃতা করেন, তাহার সারাংশ।

হয় নাই। অনেক আয়াস, অনেক অর্থব্যয় আবশুক। দিঘাপতিয়ার কুমার শ্রীশরৎকুমার রায় ইহাতেও আমাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন, এখনও তাঁহার যত্ন আছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মূল গ্রন্থের উদ্ধার জন্ত তিনি অর্থব্যয় করিয়াছেন, মূলগ্রন্থ আমাদের হাতে আসিয়াও বেহাত হইয়াছে। পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু মূল গ্রন্থ এখন শঠের করতলস্থ।

ধর্মের পূজা বৌদ্ধধর্মের আধুনিক আভাষ বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস। ধর্মের মন্দির ও পূজা বঙ্গদেশের অনেক গ্রামেই এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্মদেবতা সম্বন্ধীয় গ্রন্থও অনেক আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কতকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, অপরগুলি অন্ধকারাবৃত গুহায় নিহিত আছে। অধুনা 'বল্লীপুরের শ্যামরায়' নামক ধর্মঠাকুরের পূজারিদের নিকট এক খানি পুঁথি পাইয়াছি। অনবকাশবশতঃ তাহা প্রকাশের কোন ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। কিন্তু ইহাতে সেই শূন্য মত, ইহাও শূন্যপুরাণের আভাসে গঠিত।

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পুঁথি বৈষ্ণব ও চৈতন্য সম্প্রদায়ের। বটতলায় অনেকগুলি মুদ্রিত হইয়াছিল, অনেকগুলিই বটতলায় মলিন বেশেই রক্ষা হইয়াছে। ইদানীং অনেকগুলি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও অনেক বাকী। অনেকই এখনও অপ্রকাশিত। সাহিত্য-পরিষৎ কতকগুলির উদ্ধার করিয়াছে। লালগোলার রাজাবাহাদুরের ব্যয়ে এখনও এক খানি মুদ্রিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সম্প্রদায়ের গ্রন্থসমূহ প্রকাশ করিতে অনেক সময় যাইবে। তাহাতে কাব্য ও দর্শন-রত্নও অনেক আছে। চণ্ডীদাসের পদাবলী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ আদৃত। তাঁহার পদাবলীও কাব্যরস-পরিপূরিত, তাহাও প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। চণ্ডীদাসের অনেক নূতন পদের আবিষ্কার হইয়াছে। বিদ্যাপতির বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব এবং বিবিধ পদাবলী সমস্তই মুদ্রিত হইয়াছে; কেবল সূচিপত্র মুদ্রিত হইলেই প্রকাশিত হইবে।

সংস্কৃত ও পালী ভাষারও উপর সাহিত্য-পরিষদের দৃষ্টি আছে। শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহায্যে অধুনা "মিলিন্দপ্রশ্ন" প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক অপ্রকাশিত ভাল ভাল সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থের প্রকাশ আবশুক। কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকও বিশুদ্ধ আকারে প্রকাশিত হয় নাই। বোম্বাই প্রদেশে অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। মান্দ্রাজে বাণীবিলাস ছাপাখানা বিজয়নগরের অসীম ভাণ্ডারে হস্তক্ষেপ করিয়া অনেক ভাল ভাল কাব্য ও দর্শনগ্রন্থ প্রকাশ করিতেছে। আমাদের এখানে তত কাজ হইতেছে না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বঙ্গভাষার ও বঙ্গীয় সাহিত্যের উপর বিশেষ লক্ষ্য, কিন্তু বঙ্গীয় সংস্কৃত বা পালী সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-সীমার অন্তর্ভুক্ত।

সাহিত্য-পরিষদের অতীতকালের সাহিত্য সম্বন্ধীয় কাজই গুরুতর; কিন্তু বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে আমাদিগকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। সেকালে কেবল কাব্য, নাটক, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি ছিল, একালে সাহিত্যের সীমা বৃদ্ধি হইয়াছে, বিজ্ঞানক্ষেত্র একালে

সুবিস্তীর্ণ হইয়াছে। আরও বেশী বিস্তৃত হওয়া সম্ভব। বিজ্ঞানে বিশেষ মনোযোগ দিতে আমরা পারিতেছি না; সময় কম, অর্থ কম। ভাষার উন্নতি, কাব্যাদির উন্নতির জন্য যতটা মনোযোগ আবশ্যক ততটাও ঘটিয়া উঠিতেছে না। প্যারিসের Academy of Literature যেরূপ কাজ করিয়া আসিতেছে, আমরা তাহার শতাংশও করিতে সময় পাই না। অথচ এ সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ নিতান্ত আবশ্যক। Napoleon তাঁহার রাজত্বকালে Academy of Literature সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া ফরাসী ভাষার অসীম উপকার করেন। সেই সভার ছায়ায় সাহিত্য-পরিষৎ গঠিত; কিন্তু আমরা রাজার সাহায্য পাই নাই। যাহাতে বঙ্গভাষার শুদ্ধি ও প্রসার হয়, যাহাতে লেখার প্রণালী উন্নত হয়, যাহাতে কুরুচির উচ্ছেদ ও সুরুচির সম্যক্ বিস্তার হয়, যাহাতে সত্বর বঙ্গীয় সাহিত্য সংস্কৃত, গ্রিক্, লাটিন, ইংরাজি, ফরাসী, জর্ম্মাণ প্রভৃতি সাহিত্যের ন্যায় উন্নত পদবী প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য আমাদের খুব চেষ্টা ও উদ্যোগ আবশ্যক। ছাই পাঁশ পুস্তকের আদর না হয়, প্রকৃত রসাত্মক কাব্যের আদর হয়, দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় ইহার জন্য আমাদের সমধিক যত্ন প্রদর্শন করা উচিত। ইহাই পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য। বঙ্গদেশের এসিয়াটিক সোসাইটির ছায়া অবলম্বন করিয়া কেবল পুরাতনের উদ্ধার করার চেষ্টা পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। অনেক সময়ে পরিষদ্‌কে রুক্ষ হইতে হইবে, অনেক সময় বিরাগভাজন হইতে হইবে। সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যং অপ্রিয়ম্, এ কথা সাহিত্যের বিচারকার্য্যে প্রয়োজ্য নহে। সুরুচি ও কুরুচির ভেদ করিতেই হইবে এবং ভেদ দেখাইয়া প্রকাশ্য আদর বা অনাদর করিতে হইবে। মহিমা ও সৌন্দর্য্যের আদর অপরিহার্য্য। বঙ্গীয় সমাজের সাহিত্যবিষয়ক রুচির সম্মার্জ্জনা করার জন্য আমাদের ব্যক্তিগত প্রীতি বা অপ্রীতির উপর লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না। ত্যাজ্য সাহিত্যগ্রন্থ বর্জ্জন করিতেই হইবে। এই গুরুতর কিন্তু ভবিষ্যতে শুভ ফলপ্রদ অনুষ্ঠানে আমরা অচিরে বিশেষ মনোযোগী হইব।

যাহাতে সমস্ত ভারতবর্ষে এমন কি সমগ্র ভূমণ্ডলে বঙ্গীয় সাহিত্যের আদর হয়; যাহাতে বঙ্গভাষার লালিত্য ও গৌরব জগদ্‌বিখ্যাত হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা পরিষদের কার্য্যের পরিচালনা করিতেছি। বঙ্গের জ্যোতির্ম্ময় কাব্যরচয়িতার অভাব নাই। কিন্তু খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিগণ যে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়াছেন, তাহাও এখনও ভারতব্যাপী হয় নাই। বাইরণ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যেরূপ আদর আছে, আমাদের অদ্বিতীয় কবিদিগের সেরূপ আদর নাই। কি উপায়ে এই সকল মহাত্মাদিগের গ্রন্থ সমগ্র ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে প্রবেশ করিবে তাহা চিন্তার বিষয়। দেখা যাউক আর এক বৎসরে কি করা যাইতে পারিবে।

আদ্যের গম্ভীরা *

উপক্রমণিকা

মালদহের গম্ভীরা উৎসবের ইতিহাস কি? ঐতিহাসিক সত্য অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেরই জ্ঞাত হইবার ইচ্ছা স্বতঃই মন মধ্যে উদয় হইতে পারে। গম্ভীরা যে শিবোৎসব তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। মালদহের এই শিবোৎসব আধুনিক নহে অথবা ইহা অনার্য্য সেবিত (কোঁচ, পলীহা, নাগর, ধানুক, চাঁই) উৎসব নহে। মালদহ জেলা গঠিত হইবার বহু পূর্ব্বে গম্ভীরা গৌড় জনগণের মহোৎসব ছিল; গৌড় প্রকৃত প্রকারে বিখ্যাত হইবার পূর্ব্বে এই শিবোৎসব পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-দেশবাসিগণেরও প্রধান উৎসবরূপে বিদ্যমান ছিল, এ কথা অস্বীকার করিবার হেতু নাই, অধিকন্তু ইহার প্রমাণস্বরূপ শত শত ঐতিহাসিক প্রাচীন সত্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

বঙ্গের ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হইলে, বঙ্গের ইতিহাসের মূল কেন্দ্রস্বরূপ গৌড় বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ইতিবৃত্ত ত্যাগ করিলে যদ্রূপ বঙ্গের ইতিহাসই প্রণীত হইতে পারে না, তদ্রূপ বঙ্গের প্রাচীন ধর্ম্মবিষয়ক ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হইলে এই গম্ভীরা পরিত্যাগ করিলে বঙ্গের ধর্ম্মেতিহাস প্রণয়নই হইতে পারে না। গম্ভীরা উৎসবের সহিত পরম্পরা সম্বন্ধে বঙ্গের ধর্ম্মেতিহাস সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। ঐতিহাসিক ব্যক্তি মাত্রেই এই সত্য-বাক্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। আমার এই বাক্য কিদৃশ সত্যমূলক তাহা গম্ভীরার ইতিহাসেই পরিচয় প্রদান করিব। গম্ভীরা নগণ্য নহে, ইহার মূলে ঐতিহাসিক সত্য কিদৃশ সুন্দর ভাবে নিহিত রহিয়াছে, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ প্রাপ্ত হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা গম্ভীরার ইতিহাস হইলেও ইহা বঙ্গের প্রাচীন ধর্ম্মেতিহাস বলিতে পারা যায়। গম্ভীরার ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হইলে, বাধ্য হইয়া গৌড় ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিতেই হইবে, নচেৎ গম্ভীরার পুরাতত্ত্ব ব্যক্ত করিবার সম্ভাবনা নাই। ধারাবাহিকক্রমে সৌর, জৈন, বৌদ্ধ এবং শৈবেতিহাসের অভ্যুদয়, বিকাশ ও পতনের ক্রম দেখাইতে হইবে, নচেৎ মাল-দহের গম্ভীরার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়াই যাইবে। একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে এক প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায় ও ধর্ম্মভাবের প্রকাশ হইয়া ক্রমে ক্রমে সেই প্রাচীন ধর্ম্মের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া নূতন ধর্ম্ম-শিশুর আবির্ভাব হইয়া আসিতেছে। এই প্রকারে আমাদের ভারতেই বিবিধ ধর্ম্মের অভ্যুদয় ও পতন হইয়াছে। যৎকালে নূতন ধর্ম্ম-ভাব লইয়া এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়, তৎকালে সেই নবধর্ম্ম ও সেই নবধর্ম্মাচারি-সম্প্রদায়

---

* প্রবন্ধ-লেখক এই প্রবন্ধ লিখিয়া মালদহ-জাতীয়-শিক্ষাসমিতি হইতে পুরস্কার পাইয়াছেন এবং উক্ত শিক্ষা-সমিতিই এই প্রবন্ধটি পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছেন। সা-প-প-সম্পাদক।

যে পূর্ব্ব ধর্ম্মের বহু ভাব আচার, ব্যবহার এবং ক্রিয়াপদ্ধতির আচরণ স্বতঃই গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহা মানব জাতির স্বাভাবিক ধর্ম্মই বলিতে হইবে, তাহার আদৌ সংশয় নাই। জগতে এমন কোন ধর্ম্মই নাই, যাহার মূল পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য একটী ধর্ম্মবৃক্ষের শাখাবলম্বী নহে।

উক্ত প্রকারে মূল ধর্ম্ম-বৃক্ষের বহু শাখা প্রশাখা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। মহাত্মা মক্ষমূলর প্রভৃতি কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত, বিশেষ গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে প্রাচীন ভারতীয় 'ঋগ্‌বেদই' আদি মানব ধর্ম্মশাস্ত্র। ঋগ্‌বেদই ধর্ম্ম-বৃক্ষের মূলস্বরূপ স্বীকার করিলে ভ্রম হইবে না।

উইলিয়ম্ জোন্‌স, কোলব্রুক, বার্ণফ, লাসেন এবং মক্ষমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভারত ও পারস্যদেশের প্রধান প্রধান পুঁথির অনুবাদ করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে পণ্ডিতেরা আরও অধিক বিস্মিত হইয়াছেন। কেন না তুলনাসিদ্ধ শব্দতত্ত্ব এবং বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে ভারতীয় আর্য্যগণ, পারসিক জাতি, গ্রীকজাতি, লাটিনজাতি, স্কাণ্ডিনেভীয় জাতি, সেলট জাতি—ইহারা সকলেই একই কাণ্ডের বিভিন্ন শাখা। পিক্‌টেট (Pictet) তাঁহার "ইন্দ্‌য়ুরোপীয় জাতির উৎপত্তি" গ্রন্থে ইহার প্রমাণ করিয়াছেন। যে সময়ে মুসা (Moses) মিসর হইতে বহির্গত হয়েন (Exodus) সেই সময়ে ভারতের যে সভ্যতা ছিল তাহার তুলনা নাই [illegible]হারও অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভারতে যে সব অসংখ্য পুঁথি আছে, সেই সকল পুঁথির দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, দর্শন ও ধর্ম্মের প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলি, ভারতের বড় বড় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দ্বারাই প্রথম আলোচিত হইয়াছিল। ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে পিথাগোরাস্, প্লেটো প্রভৃতি গ্রীসের বড় বড় দার্শনিকেরা, ভারতের ঐ সকল মূল-উৎস হইতেই তাঁহাদের চিন্তা-ঘট পূর্ণ করিয়াছেন। প্রাচ্য ভূখণ্ডের আবরণ এখন উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে ; ঐখান হইতেই আমরা আলোক প্রাপ্ত হইয়াছি। কি ইতিহাস, কি কাব্য কি ধর্ম্মতত্ত্ব কি দার্শনিকতত্ত্ব সকল বিষয়েই প্রাচ্যখণ্ড পাশ্চাত্যখণ্ডের পূর্ব্ববর্ত্তী।"

ভারতের জ্ঞান-ধর্ম্ম-কুসুম কিদৃশভাবে দূর দেশান্তরে আপন সৌরভ বিস্তার করিয়াছিল, তাহার সামান্য উদাহরণ দ্বারাই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে

লাবুলে ও লিএব্‌রেখ্‌ট নামে দুইটী ফরাসী ও জর্ম্মন্ পণ্ডিতের অনুসন্ধানক্রমে একটী বড় অপূর্ব্ব গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। রোমন কেথলিক নামক খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ীরা একটী সাধুজনকে স্বসম্প্রদায়ী সিদ্ধপুরুষ (নরদেবতা) জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছেন। অবশেষে নিরূপিত হইল, তিনি বৌদ্ধদিগের বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ স্বয়ং বুদ্ধদেব বই আর কেহই নয়। এই খৃষ্টানেরা তাঁহাকে স্বসম্প্রদায়ী স্বর্গভোগী সিদ্ধগণের মধ্যে পরিগণিত করিয়া লইয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের মতে, ঐ সিদ্ধপুরুষের নাম জোসফট্। প্রথমে ফরাসী লাবুলে পরে জর্ম্মন্ লিএব্‌রেখ্‌ট তদনন্তর ইংলণ্ডবাসী বীল নিজ নিজ ভাষায় এ বিষয়টী প্রতিপাদন করেন। মক্ষমূলর ইহার সবিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রচার

করিয়াছেন। এই কৌতুকাবহ বিষয়টী পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার উদ্দেশে, এ স্থলে ইহার তাৎপর্য্য সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইতেছে। দমস্‌ক্ নিবাসী জোঅন্নস নামে গ্রীক গ্রন্থকার বাল'াম ও জোঅসফ্ নামক দুই ব্যক্তির বিষয়ক একখানি উপাখ্যান-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সে উপাখ্যানটী বুদ্ধচরিতের অনুরূপ।

বুদ্ধ একটী রাজপুত্র। তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে পর, অসিত নামে এক জ্যোতির্ব্বিদ্ গণনা করিয়া বলেন, রাজপুত্র মহামহিমান্বিত হইবেন। হয়, ভূমণ্ডলের চক্রবর্ত্তী রাজা, নয় সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক লোক-শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ হইবেন। রাজা শ্রবণ করিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন এবং রাজকুমারের কিছু বয়োবৃদ্ধি হইলে, তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণ নিবারণ উদ্দেশে, নানাবিধ সুখ-সম্ভোগ সামগ্রীতে পরিপূর্ণ একটী প্রাসাদ মধ্যে তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কিছুদিন পরে রাজকুমার বহির্গমনের অনুমতি পান এবং বারম্বার রথারোহণে এক দিন একটী পীড়িত, অপর এক দিন একটী জরাগ্রস্ত এবং তৃতীয় দিন শোকার্ত্ত বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত একটী মৃত ব্যক্তিকে দর্শন করেন ও তদ্দ্বারা সংসারে রোগ-শোক-জরা-মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব এবং পশ্চাৎ ভিক্ষুগণের শান্ত ও স্বচ্ছন্দভাব অবলোকন করিয়া ভিক্ষুমার্গাশ্রম অবলম্বনে অনুরক্ত হন।

জোসফটের বৃত্তান্তও অবিকল এইরূপ। বুদ্ধের ন্যায় তিনিও রাজপুত্র। তাঁহার জন্মগ্রহণ হইলে, একটী জ্যোতির্ব্বিদ্ গণনা করিয়া বলেন জোসফট্ মহত্তর মহিমা লাভ করিবেন। সে মহিমা নিজ রাজ্যে নহে, তাহা উচ্চতর ও উৎকৃষ্টতর সাম্রাজ্যে পরিব্যাপ্ত হইবে। বস্তুতঃ তিনি খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের অভিনব নিগৃহীত ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। এই বিষয়ের প্রতিবিধানার্থ অশেষরূপ উপায়াবলম্বন করা হয়। তাঁহাকে সকল প্রকার সুখদসামগ্রী পরিপূর্ণ একটি প্রাসাদ মধ্যে রক্ষা করা হইল এবং তিনি যাহাতে রোগ শোক জরা মৃত্যুর বিষয় কিছুমাত্র অবগত হইতে না পারেন তদর্থে যথোচিত যত্ন করা হইল। কিছুকাল পরে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে গৃহবহির্ভূত হইতে আদেশ দেন। তিনি রথারোহণ পূর্ব্বক একদিবস একটি অন্ধ ও অপর দিবস একটি খঞ্জকে দর্শন করেন। অপর এক দিবস ঐরূপে বহির্গত হইয়া একটী জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিতে পান, তাঁহার অঙ্গ গলিত, কেশ পলিত, দন্ত স্খলিত এবং পদযুগল কম্পিত। তিনি এই সমস্ত দর্শনপূর্ব্বক বিষণ্নমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে একটী সন্ন্যাসী তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া ঈশু প্রচারিত উচ্চতম সুখ-সম্পত্তির আশার বিষয় উপদেশ দেন।

এই সমস্ত ব্যতিরেকেও, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, বুদ্ধ ও জোস্‌ফটের অন্য অন্য বিষয়েরও সুন্দর সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। উভয়েই পরিশেষে নিজ নিজ পিতাকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন এবং উভয়েই মৃত্যুর পূর্ব্বে বুদ্ধ বা সেণ্ট বলিয়া পরিগণিত হন।

উল্লিখিত গ্রীক গ্রন্থকার জোঅন্নস্ আরবসম্রাট্ অল-মন-সুরের একটি প্রধান অমাত্য ছিলেন, আর ন্যূনাধিক ৭২৬ খৃষ্টাব্দে লিও ইস্‌রিকস্ নামক রুম (Constantinople)

সম্রাটের স্থিরপ্রতিজ্ঞ প্রতিপক্ষ বলিয়া বিখ্যাত হন। 'ললিতবিস্তর' নামক গ্রন্থ জোঅস্নসের গ্রন্থ অপেক্ষা বিস্তর প্রাচীন। অতএব তিনিই যে ভারতবর্ষীয় বুদ্ধচরিতের অনুকরণ বা অনুবাদ করিয়া উক্ত উপাখ্যান রচনা করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, আমি ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত লোকদিগের মুখে এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছি। বুদ্ধ ও জোসফট্ যে প্রাচীন ব্যক্তিকে দর্শন করেন, গ্রীক ও সংস্কৃত উভয় গ্রন্থে তাহাকে কতকগুলি সাদৃশ্য বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে।

মস্‌ঔদি সেবিয়ন্ ধর্ম্ম (কেলডিয়া প্রভৃতি পূর্ব্বদেশ চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, জ্যোতিষ্ক উপাসনা ধর্ম্ম, পশ্চাৎ মিশর ও গ্রীসেও এই ধর্ম্ম প্রচলিত হয়), প্রবর্ত্তকের নাম যূদস্ফ এবং কিতাব ফিহ্‌রিস্ত নামক আরবীয় গ্রন্থের রচয়িতা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের নাম যুঅসফ্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রিণো নামক সুবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত প্রদর্শন করিয়াছেন, ঐ দুইটি নাম পার্সী বুদ্‌সংফ অর্থাৎ সংস্কৃত বোধিসত্ত্ব শব্দেরই অপভ্রংশ। ঐ ফরাসী পণ্ডিতের এই সুকৌশলসম্পন্ন অভিপ্রায়ই উপস্থিত বিষয় অর্থাৎ জোসফট্ বা বোধিসত্ত্ব দেবের অভেদ প্রতিপাদনেরই মূল সূত্র।

রোমন কেথলিক সম্প্রদায়ীরা ঐ জোসফট্‌কে অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় বোধিসত্ত্ব (বুদ্ধ) দেবকে আপনাদের একটি সেণ্ট বলিয়া পরিগণিত করিয়া লন। তাঁহার এই উপাখ্যান এক সময়ে ইয়ুরোপ, আসিয়া এবং আফ্রিকারও মধ্যে মহাসমাদরে পরিগৃহীত হয়। ইহা আরবী, আর্ম্মানী, হিব্রু, ইথিয়োপিক, লাটিন, ফরাসী, ইটালীয় জর্ম্মন, ইংরেজী, স্পেনিশ, পোলিশ, ও আইস্‌লণ্ডিক ভাষায় এবং ফিলিপাইন নামক দ্বীপসমূহের প্রাচীন ভাষায় অনুবাদিত হয়। অতএব অবনিমণ্ডলে বুদ্ধের মহিমা যেমন ব্যক্তভাবে, সেইরূপ অব্যক্তভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়।

উপরোক্ত উপাখ্যানাংশ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে একদেশোৎপন্ন উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মজ্ঞানবিষয়াত্মক ব্যাপার বিভিন্ন দেশে নীত হইয়া তদ্দেশস্থিত ধর্ম্মভাবের পুষ্টি সাধিত করিয়া থাকে। শৈবোৎসবও এই প্রকারে ভূমণ্ডলের সমুদায় অংশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাচীনকালে দেশদেশান্তরে ধর্ম্মবিজ্ঞানাদি যে এই প্রকারে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহার কতিপয় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ক্রমশঃ লিখিত হইল।

বহু প্রাচীনকালে আমাদের ভারতবর্ষে, আরব, পারস্য, মিশর, গ্রীস, রোম, ইতালি প্রভৃতি দেশবাসিগণ বিবিধ কারণে আসিতেন, তাঁহারাই ভারতে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া এবং পুঁথির অনুবাদ করিয়া লইয়া গিয়া নিজ নিজ দেশভাষায় প্রচার করিয়া আপনাদের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া দাবি করিয়া গিয়াছেন। ভারত হইতে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মভাব লইয়া যান নাই, এমন একটি মহাদেশ নাই বলিয়াও আমরা গর্ব্ব করিবার অধিকারী। হয়ত ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যেদিন শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্ম্মের ভাবাংশ লইয়া খৃষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে প্রমাণিত হইবে।

"উয়ুন অল্অম্বা ফিতল্ কাতুল্ অতবা" নামক একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা আরবের অন্তর্গত বোগ্দাদের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া জ্যোতিষ ও বৈদ্যক শাস্ত্রাদি শিক্ষা দিতেন। ইহার মধ্যে কাহারও নাম মঙ্ক, কাহারও নাম কঙ্ক, কাহারও নাম বাখর ইত্যাদি লিখিত আছে। মঙ্ক মাণিক্য এবং বাখর ভাস্কর (ভাস্করাচার্য্য) বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। তুরুষ্করাজ্যেশ্বর হরুণ অল্ রসীদের উৎকট পীড়া হয়। কোন রূপেই তাহার প্রতীকার না হওয়াতে তিনি ভারতবর্ষ হইতে ঐ মঙ্ককে চিকিৎসার্থ লইয়া যান ও তদীয় চিকিৎসার গুণে সে রোগ হইতে মুক্ত হন। তদ্ভিন্ন ঐ আরবী পুস্তকে দাহব, জবহর, রাহঃ, অঙ্কর, অন্দি, সকঃ জঙ্গল, জারি, জত্তদর, যাসাফ, সনজহল এই সমস্ত জ্যোতিষজ্ঞ ও চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের প্রণীত অনেক গ্রন্থ আরবী ও পারসী ভাষায় অনুবাদিত হয়। উহাতে আরবদেশে নীত সিরক, সসর্দ ও যেদান নামক তিনখানি ভারতবর্ষীয় বৈদ্যক গ্রন্থের বৃত্তান্ত আছে ; তাহা সংস্কৃত চরক, সুশ্রুত ও নিদান বই আর কিছুই নয়।

বীজগণিতবিদ্যা প্রথমে ভারতবর্ষেই প্রবর্ত্তিত হয়। ডিয়োফেণ্টস্ নামে একজন গ্রীক গণিতবেত্তা গ্রীস দেশে ঐ বিদ্যা প্রথম প্রচার করেন; তিনি নিজ পুস্তকে ভারতবর্ষীয় বীজগণিত শাস্ত্রের প্রমাণ বারম্বার উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আলবীরুনী নামক আরবীয় পণ্ডিত ৯৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ উদ্দেশে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রবিষয়ক একখানি গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।

সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র, গ্রীক লাটিন, আরবী,পারসিক প্রভৃতি বহু ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। আরব্য উপন্যাসের অনেক গল্প ভারতবর্ষীয় পুঁথি হইতে অর্থাৎ কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি পুঁথি হইতে গৃহীত দেখিতে পাই।

ইহাতে সহজেই অনুমান হইতে পারে যে এই প্রকারে দেশদেশান্তরের ধর্ম্মভাব ও জ্ঞান দেশদেশান্তরে আদান প্রদান জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হইয়াছে তাহা সুনিশ্চয়। কাছাছোল হাম্বিয়া নামক পুস্তকে দেখিতে পাই, ইবসিছ সয়তান হিন্দুস্থান ভারত হইতে তিনটি বোত (মূর্ত্তি) লইয়া গিয়া আরবদেশে মূর্ত্তিপূজার প্রচলন করিয়াছিল। তথায় প্রাচীনকালে শিবোৎসবের ন্যায় তাহার পূজা ও নৃত্যগীতাদি সহকারে শোভাযাত্রা সাধিত হইত। ইহা ইদ্পর্ব্ব বলিয়া লিখিত আছে। সয়তান দোজখ (নরক) হইতে চড়ক গাছ লইয়া গিয়াছিল। যাহাই হউক ভারত হইতে মূর্ত্তিপূজা ও উৎসবাদি তথায় নীত হইয়াছিল। শৈব প্রভাব পর্ব্বে দেখিতে পাইবেন, মিশরের শিব ভারত হইতে এপিস নামক বৃষও লইয়া গিয়াছিলেন। মিশর, গ্রীস্ রোম ও ভারতে ধর্ম্মোৎসবের আদান প্রদান হইয়াছিল তাহা সুনিশ্চয়।

ভারতের বৌদ্ধধর্ম্ম চীন, জাপান, সিংহলে প্রভৃতি নানাদেশে প্রচারিত হয়। চীনদেশীয় বহুসংখ্যক তীর্থযাত্রা ভারতে আসিয়া ধর্ম্মপুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। আমেরিকা খণ্ডের অন্তঃপাতী পিরুবিয়া দেশে প্রচলিত 'রামসিতোয়া' নামক মহোৎসব ও ঐ দেশীয় নৃপতিগণের সূর্য্যবংশ হইতে উৎপত্তি প্রবাদ ; ঐ খণ্ডের মধ্যস্থলবাসী কতকগুলি জাতীয় ভাষায় ঈশ্বরের নাম 'সিবু', আসিয়ার অন্তর্গত ফ্রিজিয়া দেশীয়দের একটী উপাস্য দেবতার নাম 'সেবা' বা 'সেবাজিরস্', ঐ দেবোপাসকদের দীক্ষাকালে স্বর্ণঘটিত ব্যাপারবিশেষের অনুষ্ঠান প্রথা, মিশর দেশীয়দের একটী দেবতার নাম 'সেব্' বা সেব্রা বা সোবক এই সমস্ত কথা এই প্রস্তাব সম্বন্ধে লিখিয়া রাখা অসঙ্গত নয়।

ভারত-ভূমি ভূমণ্ডলে কেবল জ্ঞান-ধর্ম্ম ও আরোগ্য বিস্তার করিয়াই নিরস্ত হয় নাই, বিদেশীয়দিগকে দোষশূন্য আমোদ-প্রমোদের উপায়ও শিক্ষা দিয়াছেন। 'তারীখুল্ হোক্মা' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, আরবীয়েরা এখান হইতে সঙ্গীতশাস্ত্রবিশেষ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রচার করেন। ইহার সহিত কি আমাদের দেশের নৃত্যগীতাদি উৎসবামোদের অনুষ্ঠান আরবাদি দেশে নীত হয় নাই ? ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি !

প্রাচীনকালে ভারতেও বৈদেশিক জ্ঞান আনীত হইয়াছিল, তাহাও দেখিতে পাই। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ গর্গ যবনদিগকে জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একদিকে গর্গমুনি যেমন যবনদের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন, অপরদিকে সেইরূপ পুরাণ বিশেষে (বিষ্ণুপুরাণ) গর্গের সহিত যবন জাতীয় নৃপতিবিশেষের সমধিক ঘনিষ্ঠতার বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে।

যাঁহারা ভূমণ্ডলের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অবগত আছেন, তাঁহারা অক্লেশেই বুঝিতে পারিবেন, গ্রীকেরাই এইরূপ জ্যোতিষজ্ঞ যবনজাতি হওয়া সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। সংস্কৃত শাস্ত্রে এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বরাহমিহিরকৃত বৃহৎসংহিতাদি গ্রন্থে 'পুলিশসিদ্ধান্ত' রোমকসিদ্ধান্ত ও মনিথ নামে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম লিখিত আছে। 'পুলিশ' সংস্কৃত শব্দ নয়। একটি গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদের নাম মনীথো ছিল। পূর্ব্বোক্ত মনিথ সেই মনীথো বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। দিন গণনাবস্তু প্রসঙ্গে যবনপুর নামে একটি নগরের নাম লিখিত আছে। কেহ কেহ উক্ত যবনপুরকে আলেকজেণ্ড্রিয়া বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। সমধিক প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে রাশিচক্রের কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই, সম্ভবতঃ গ্রীকদিগের নিকট এই বিষয়ের শিক্ষা হইয়াছিল। বরাহমিহির কৃত 'হোরাশাস্ত্র' গ্রন্থের নামের অর্দ্ধাংশ গ্রীক শব্দ। ইত্যাদি প্রকারে আমাদের ভারতের সহিত গ্রীকগণের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা দৃষ্ট হয়। বাহ্লীক-রাজ্য সংস্থাপনের পূর্ব্বেও গ্রীকদিগের ভারতবর্ষে গমনাগমন ছিল। গ্রীক রাজারা চন্দ্রগুপ্তের সভায় বারংবার দূত প্রেরণ করেন। গ্রীক নৃপতি সিলিউকস খৃষ্টাব্দ প্রবর্ত্তনের প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে পাটলিপুত্রের সভায় মিগেস্থিনিজকে প্রেরণ করেন। সিলিউকস চন্দ্রগুপ্তকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করেন। ঐ কন্যার

সহচরী বা পরিচারিকা স্বরূপ অপরাপর গ্রীক-স্ত্রীলোক মগধরাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রে আগমন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের কোন কোন খোদিত লিপিতে যবনীগণকে অর্থাৎ গ্রীক-যুবতীদিগকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিবার বিষয় বর্ণিত আছে। ভারতবর্ষীয় সৈন্যগণ মধ্যে গ্রীকসৈন্য সন্নিবেশ দেখা যায়। আরও দেখিতে পাই, দরায়ুষ নামে সুপ্রসিদ্ধ পারসীক নরপতি খৃঃ পূঃ ৫২১ হইতে ৪৮৫ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার সেনাদল মধ্যে ভারতবর্ষীয় সৈন্য সন্নিবেশিত ছিল। ইহা দ্বারা আমরা দেখিতে পাইতেছি দূরদেশস্থিত রাজন্যগণের সহিত ও তত্রস্থ দেশবাসিগণের সহিত আমাদের ভারতবাসীর কীদৃশ কুটুম্বিতা, আত্মীয়তা ও ঘনিষ্টতা বর্ত্তমান ছিল। ইত্যাদি কারণে আমাদের বিবিধ বিষয়ের অনুকরণ যেরূপ তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরাও তদ্রূপ তাঁহাদের বিবিধ বিষয়ের অনুকরণ বা গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা সুনিশ্চয়। এই সূত্রে ধর্ম্ম ও উৎসবাদির যে একটী আদান-প্রদান হইয়াছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যথাস্থানে তাহা অবগত হইবেন। গ্রীকদেশাদি জনপদের মানবগণ হইতে তৎ তৎ দেশের ধর্ম্ম ও উৎসবাদির প্রচারও যে আমাদের প্রাচীন ভারতে বিশেষ পাটলীপুত্র নগরাদিতে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখি না। সিলিউকস্ কন্যার (মৌর্য্যরাজমহিষী) সহিত গ্রীকমহিলা ও গ্রীকগণ এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ দেশে অবস্থান কালে স্বদেশীয় উৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পাটলীপুত্রের জনগণ গ্রীকদেশে গমন করিয়া পাটলীপুত্রাদি জনপদের কথা, উৎসব ও দেবপূজাদির কথা যে তথায় গল্পচ্ছলে বলেন নাই বা উৎসবাদির অনুষ্ঠান করেন নাই, তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? পুনশ্চ গ্রীকগণ বহুদিবস পাটলীপুত্রে বাস করিয়া যখন নিজ দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, তৎকালে ভারতের কথা, পাটলীপুত্রের কথা, দেবতা ও দেবোৎসবাদির কথা যে তথায় ব্যক্ত করেন নাই, তাহাই বা কি করিয়া বলিতে পারি।

আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই, গ্রীকগণ "গম্ভীরা" উৎসবের ন্যায় উৎসবামোদে লিপ্ত ছিলেন। সেই উৎসবকে গ্রীকগণ "কেলিকোরিয়া" বলিতেন। 'বেকস্' দেবের পূজা ঐ উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। ঐ সময়ে এক ব্যক্তি একটি সুদীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে মসীলেপন করিয়া নৃত্য করিতেন। [পরে শৈবপ্রভাব দেখুন] বেকস্ আমাদের শিবস্থানীয়। মিশরের সহিতও ভারতের ঘনিষ্ঠতা বিলক্ষণ বর্ত্তমান ছিল। মিশরের শিবঠাকুরের নাম আসীরিস, তাঁহার বাহন বৃষ, তাহাও ভারত হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। আসীরিস্ দেবের শিরোভূষণ সর্প। তাঁহারও উৎসব হইত। তাহা আমাদের কথায় বলিতে হইলে বলিব "গ্রীসের গম্ভীরা" "মিসরের গম্ভীরা"। দেখিতে পাই, আরব, মিশর, গ্রীস প্রভৃতি স্থানে ভারতের বিশেষ সমাদর ও পরিচয় ছিল। ভারতের ঔষধ উক্ত দেশাদিতে খৃষ্টজন্মের ৩৬১ বৎসর পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল।

হিপক্রেটিস নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক চিকিৎসক খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। তাহার গ্রন্থে কৃষ্ণতিল, শোভাঞ্জন, এলাচী, দারুচিনি, জটামাংসী, লোবান, বিবজ্রা

হিঙ্গু, চিরতা এই সকল দ্রব্য রোগবিশেষে ঔষধস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। আরব ও মিশরেও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়।

রোমান কেথলিকদের জোসফট্ এবং আমাদের ভারতের বোধিসত্ত্ব যদ্রূপ অভিন্ন, খুব সম্ভব 'বেকস্' আসীরিস্ দেবগণও আমাদের শিবঠাকুরের সহিত অভিন্ন। এই অনুকরণ মানব প্রাণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এমনও হইতে পারে গ্রীস বা মিশরাদি দেশে আমাদের শিব নামান্তর প্রাপ্ত হইয়া আদৃত হইয়াছেন এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হয়ত গ্রীস বা মিশরাদি দেশ হইতে উক্ত দেবতাদির উৎসবের কোন কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছেন বা উক্ত দেশাদির জনগণ ভারতীয় শিবোৎসব পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। এক্ষণে মিশর, গ্রীসাদি দেশ যেরূপ আমাদের পর হইয়াছে এবং দূর স্থানে রহিয়াছে বোধ হইতেছে, পূর্ব্বকালে সেরূপ ছিল না। ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা নিবন্ধন সাধারণতঃ একটা স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল।

পাঠকগণের নিকট অনুরোধ, তাঁহারা হয় ত মনে করিবেন 'মালদহের গম্ভীরা' লিখিতে বসিয়া ধানভানিতে শিবের গীতের ন্যায় এত বকিবার আবশ্যক কি? একটু ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক সমুদায় প্রবন্ধ পাঠ করিলেই ইহার কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মালদহ ক্ষুদ্র হইলেও নগণ্য নহে। প্রাচীন স্মৃতি জাগাইবার লুপ্তপ্রায় চিহ্ন মালদহের বক্ষে যত রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। উক্ত চিহ্নের দুএকটি অবলম্বনে মালদহের গম্ভীরা লিখিত হইল।

পাটলীপুত্র নগর ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (গৌড়) নগরের ভাগ্যচক্র একই নিয়মে একটী বৃন্তে দুইটি কুসুমের ন্যায় পূর্ব্বকালে বিরাজ করিত। অধিকাংশ কাল পাটলীপুত্র নগরের অধিপতিগণই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের ভাগ্যবিধাতারূপে বহু শতাব্দী ধরিয়া রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর পাটলীপুত্র নগরের রাজন্যগণের অধীনে বা তাঁহাদের আত্মীয়গণের অধীনে সামন্ত-শাসন দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। পাটলীপুত্র নগরের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মোৎসবাদি পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন প্রদেশে অনুষ্ঠিত হইত, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহুল পরিমাণে প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদের মালদহের 'গম্ভীরার' প্রাচীনত্বের পরিচয় প্রদান করিব।

এক্ষণে আমরা কতিপয় ধর্ম্মপ্রভাব বিস্তার দ্বারা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের বা প্রকারান্তরে সমুদায় বঙ্গদেশের ধারাবাহিক ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মবিষয়ক উৎসবের পরিচয় প্রদান করিতে অগ্রসর হইব। প্রথমে বৌদ্ধপ্রভাব, তৎপরে শৈবপ্রভাব এবং মধ্যে মধ্যে যৎসামান্য জৈন ও সৌরপ্রভাব ব্যক্ত করিয়া গম্ভীরার লৌকিকতা হৃদয়ঙ্গম করাইব, তাহা হইলেই গম্ভীরার পুরাবৃত্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

আধুনিক মালদহবাসিগণের সূর্য্যপূজার আড়ম্বর ও পদ্ধতিদর্শনে তাঁহাদিগকে সৌর মতাবলম্বী বলিয়াই বোধ হয়। মালদহবাসিগণের সূর্য্যপূজা অতি প্রাচীন প্রথাসমন্বিত। সূর্য্যপূজকগণকে "মগাংশ্চ সবিতুঃ" অর্থাৎ সূর্য্যপূজকগণ মগ বলিয়া বরাহপুরাণে উল্লেখ আছে। শাকদ্বীপী সৌর-ব্রাহ্মণগণই সূর্য্যপূজক, শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে 'মগ' নামে পরিচিত করা

হইয়াছে। শাম্ব সূর্য্যমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সূর্য্যদেব যে প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন সেই প্রকারে সূর্য্যদেবের রথযাত্রাদি সম্পন্ন হয়। শাম্ব এই প্রকারে সূর্য্যের বিবিধ উৎসব প্রচলিত করেন। সূর্য্যপূজা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপ্রদেশে বিশেষ প্রকারে প্রচলিত ছিল। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে শাকগণ ভারতে আইসেন। শাকদ্বীপে 'জরথুস্ত্র' অগ্নি পূজার প্রচলন করেন, সেই সময়ে সৌর মগ ও অগ্নিপূজক জরথুস্ত্র সম্প্রদায় ভুক্তগণের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে সৌরগণ ভারতে পলাইয়া আইসেন।* জরথুস্ত্র অভ্যুদয়ের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহামহিম শ্রীকৃষ্ণ দেবের অবতীর্ণ কাল ধরা হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শাম্বের কৌশলে সৌর মগগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পৌণ্ড্ররাজ নিহত হইলে পৌণ্ড্রদেশে সৌর ধর্ম্মের প্রচার হইয়া থাকিবে। সূর্য্যদেবের বিবিধ উৎসব কালক্রমে অন্যধর্ম্মে আত্মত্যাগ করিয়া থাকিবে।

বৌদ্ধ প্রভাব।

বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তারের পূর্ব্বে আমাদের ভারতে সূর্য্যোপাসনায় বিবিধ সৌর উৎসব প্রচলিত ছিল, এবং অগ্নি উপাসনাও বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। মহাভারতে কার্ত্তিকেয় জন্মবিষয়ক বিবরণ মধ্যে আমরা অগ্নি উপাসনার বিবিধ আনন্দপ্রদ উপাখ্যান অবগত হই। উহা পাঠ করিলে সৌরকর হইতে স্ফটিকাধারে অগ্নি উৎপত্তি ও তাহার পূজাদির প্রচলন প্রস্তাবে সৌর ও অগ্নি উপাসকগণের সন্ধিবন্ধনের সূত্রপাত দেখিতে পাই। বিশ্বামিত্র ঋষি প্রতিষ্ঠিত অগ্নির আবির্ভাব ও পূজার মধ্যে এবং তাঁহার শিষ্যগণের প্রচণ্ড ব্যাপারে যাহা দেখিতে পাই, তাহা অতি উচ্চ ও ঐতিহাসিক রহস্যপূর্ণ। ঐ অধ্যায় পাঠ করিতে করিতে পারসিক আবেস্তা গ্রন্থের সৌর ও অগ্নি উপাসকগণের বিবাদও মনে পড়িয়া যায়। যাহাই হউক শাম্বাদি সৌরপূজকগণের উৎসবাদি বৌদ্ধ উৎসবের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস হয়। ভারতে বৌদ্ধপ্রভাববিস্তারের পূর্ব্বে যে শিব বিষ্ণু উপাসনার প্রচলন ছিল না তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় না; কিন্তু আমরা সৌর ও অগ্নি-পূজার প্রভাবের পরই বৌদ্ধপ্রভাবের অবতারণা করিলাম। কপিলবস্তুর শুদ্ধোদনপুত্র সিদ্ধার্থ বুদ্ধের পূর্ব্বেও ভারতে জৈন ধর্ম্মের প্রচার দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ উৎসবাদি দ্বারা আমাদের মালদহের গম্ভীরা কলেবর পুষ্ট হইয়াছে, তাহার সবিশেষ অবতারণা বিস্তৃতভাবেই লিখিত হইল। কারণ বৌদ্ধ উৎসবই প্রকৃত গম্ভীরার জনক স্থানীয় বিবেচিত হইতেছে।

আমরা বৌদ্ধ উৎসবাদির বা পর্ব্ব দিনের একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা পঞ্জিকা মধ্যে দেখিতে পাই, তাহাতে নিম্নলিখিত উৎসব দিন বলিয়া অধুনা ধার্য্য রহিয়াছে।

"বৌদ্ধ পর্ব্বদিন।"

১। মহামুনি মেলা ... ... বিষুবসংক্রান্তি চৈত্র।
২। বুদ্ধদেবের জন্ম মহোৎসব ... ... বৈশাখী পূর্ণিমা।

---

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ৪র্থ অংশ দ্রষ্টব্য।

৩। ভিক্ষুদিগের ত্রৈমাসিক ব্রতারম্ভ বা বর্ষাবাস ... আষাঢ়ী পূর্ণিমা।
৪। ভিক্ষুদিগের ত্রৈমাসিক ব্রত সমাপন ... ... আশ্বিনী পূর্ণিমা।
৫। বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ ... ... কার্ত্তিকী অমাবস্যা।
৬। ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন সূত্রপাঠ ... ... মাঘী পূর্ণিমা।

বৌদ্ধ উৎসব বর্ণনার পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের বাল্য জীবনীর প্রথমাংশ সংক্ষেপে ললিত-বিস্তর ও মহাবস্তু অবদানের দীপঙ্কর বস্তু হইতেই বর্ণনা করিলাম—

শাক্যসিংহ পৌষ মাসের পুষ্যা নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা তিথিতে লুম্বিনীবনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। লুম্বিনীবন রাজা শুদ্ধোদনের উদ্যান, কপিলবস্তুনগরপ্রান্ত সীমায় অবস্থিত ছিল। রাজ্ঞী মায়াদেবী গর্ভের দশম মাস আরম্ভে আপন ইচ্ছায় ঐ উদ্যানে বাস করিয়াছিলেন এবং তিনি এই স্থানেই ভগবান্ শাক্যসিংহকে প্রসব করেন। শাক্যসিংহের জন্মকালে অনেক অলৌকিক কার্য্যের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই বর্ণনা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের স্বভাবসিদ্ধ—বুদ্ধদেবের মহামহিম প্রকাশাত্মক বর্ণনা। পুত্রের জন্ম মাত্র মহারাজের সকল কামনা, সকল অভীষ্ট ও সকল অর্থ সুসিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া তিনি পুত্রের 'সর্ব্বার্থসিদ্ধ' নাম রাখিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের জন্মের সপ্তাহ পরে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়. এরূপ সকল বুদ্ধের সময়েই হইয়াছিল। এই সাতদিন নগরে ও বনে কোথাও অনুৎসব ছিল না। মাতার মৃত্যুর পর সর্ব্বার্থসিদ্ধকে লুম্বিনী-বন হইতে নগরে আনিবার আয়োজন হয়। তাঁহাকে যখন লুম্বিনীবন হইতে আনয়ন করা হইল, তখন কি প্রকার উৎসব ও শোভাযাত্রা হইয়াছিল তাহা নিম্নে পাঠ করুন।

"পঞ্চসহস্র সজ্জিত পুরুষ পূর্ণকুম্ভ লইয়া অগ্রগামী হইবে, তৎপশ্চাৎ পঞ্চসহস্র পুরকন্যা ময়ূরপুচ্ছের ব্যাজন ধরিয়া যাইবে, তৎপরে তালবৃন্তধারিণী কন্যাগণ যাইবে। তৎসঙ্গে অন্যান্য কন্যাগণ গন্ধোদক ভৃঙ্গার হস্তে অবস্থান করিবে, রাজপথ জলসিক্ত করা হইবে, পঞ্চসহস্র বালিকা পতাকা ধারণ করিবে, পঞ্চ সহস্র কন্যাগণ বিচিত্র প্রলম্বন মালায় বিভূষিতা হইয়া সঙ্গে যাইবে; পঞ্চশত ব্রাহ্মণ ঘণ্টাবাদ্য করিতে করিতে সঙ্গে যাইবেন। বিংশতি সহস্র হস্তী, বিংশতি সহস্র অশ্ব, অশীতি সহস্র রথ, তদ্ভিন্ন চত্বারিংশ-সহস্র পদাতি সৈন্য সজ্জীভূত হইয়া কুমারের অনুগমন করিবে, নগরবাসীরা সকলেই স্ব স্ব গৃহের দ্বারদেশ অন্তগৃহ সজ্জিত ও শোভিত করিতে লাগিল।"

ললিত-বিস্তরের এই শোভাযাত্রা কথা যদি সত্য হয়, তবে কপিলবস্তু নগর ঐশ্বর্য্যে শ্রেষ্ঠ ছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইতে পারে। যাহাই হউক, ইহাতে যে তৎকালের উচ্চ শোভাযাত্রার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গেল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সর্ব্বার্থসিদ্ধ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। অসিত মুনি সর্ব্বার্থসিদ্ধের ভবিষ্যৎ জীবন বলিয়া ছিলেন। বিশেষ বিশেষ বৌদ্ধ গ্রন্থে 'কন্‌হ', 'মহাকন্‌হ' অর্থাৎ কংস 'মহাকংস, কেশব প্রভৃতি নাম সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বলিয়াছেন পূর্ব্বজন্মবিশেষে বুদ্ধের নাম কন্‌হ অর্থাৎ কংস ছিল। ললিতবিস্তরের একটি গাথায় "অথ কৃষ্ণ মহোৎসাহ" বলিয়া লিখিত

আছে। ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, "মহোৎসাহ কৃষ্ণ" চরিত্র ও গুণানুবাদ তৎকালে প্রচলিত ছিল।

মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় মেথোরা (Methora) ও ক্লিশেবোরা (Clisobora) মথুরা ও কৃষ্ণপুরের বর্ণনা এবং "হেরাক্লিজ" নামে একটি দেবতার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বহুদার পরিগ্রহপূর্ব্বক বহু পুত্র উৎপাদন করেন। বলবীর্য্য বিষয়ে সকল লোককে অতিক্রমপূর্ব্বক দৈত্যবধ করিয়া পৃথিবীর ভার মোচন করিয়া যান এবং মথুরা প্রদেশীয় লোক কর্ত্তৃক বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হন। 'হেরাক্লিজ' গ্রীসের কৃষ্ণ, আমাদের ভারতের নহে, মেগাস্থিনিস আমাদের কৃষ্ণকে হেরাক্লিজবৎ দেখিয়া নামান্তর প্রদান করিয়া গিয়াছেন। মহোৎসাহ কৃষ্ণই মথুরার রাজা শ্রীকৃষ্ণ, তৎকালে তাঁহার উৎসবাদি প্রচলিত ছিল।

মহারাজ অশোকের সময় হইতে সংক্ষেপে বৌদ্ধোৎসবপদ্ধতি বর্ণনা করিব। অশোক খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। বাল্যকালে বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি 'চণ্ডাশোক' নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় দুষ্ট ছিল। চণ্ডাশোক সর্ব্বপ্রথমে জনৈক পর্ব্বতবাসী ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবগণপ্রিয় প্রিয়দর্শী অশোক অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মাশোকের সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম্মোৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া দেখাইব—মালদহের গম্ভীরা কোন্ দুর্গম নিভৃত মহাকালের গুহা হইতে ধীরে ধীরে পদক্ষেপণ করিয়া আত্মবিকাশ করিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক মগধের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সুভদ্রাঙ্গীপুত্র প্রিয়দর্শী অশোকের বহু খোদিত শিলানুশাসন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পাটলীপুত্র এবং অন্যান্য নগরে তাঁহার ভ্রাতাভগিনী এবং আত্মীয়গণ অবস্থান করিতেন। তিনি ধর্ম্মপ্রচারার্থ বিবুধ এবং ধর্ম্মমহাপাত্র সর্ব্বত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎকালে পাটলীপুত্র নগরের অধীনে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর ছিল, তাহার দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। অশোকের ভ্রাতা, ভগিনী বা কোন আত্মীয় দ্বারা এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজকার্য্য পরিচালিত হইত।

সম্রাট্ অশোকের যত্নে পাটলীপুত্র নগরে বৌদ্ধদিগের দ্বিতীয় সভা হয়। এই বিরাট্ সভায় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনবাসীর নিমন্ত্রণ হওয়াই সম্ভব। পাটলীপুত্রের বৌদ্ধমঠে বৈদিক মঞ্জুশ্রীর প্রাধান্য দর্শন করি। অশোকের সময়ে পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিবসে আত্মপাপ অঙ্গীকার করিতে হইত। ক্রমশঃ গৃহীলোককেও এই নিয়মে বাধ্য হইতে হয়; কিন্তু ক্রমশঃ তাহা রহিত হইয়া গিয়াছিল। অশোক সাধারণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধনার্থ একটী মহোৎসব প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে প্রথমে আত্মদোষ স্বীকার ও দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান উভয়ই প্রচলিত ছিল। এই সার্ব্বজনীন উৎসব পঞ্চম বৎসরান্তে সম্পাদিত হইত। বৌদ্ধ উৎসব এই প্রকারে সার্ব্বজনীন উৎসব বিশিষ্টরূপে প্রচারিত হয়। এই অশোকের নিয়ম প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। আত্মদোষ স্বীকার এবং গুপ্ত পর দোষ ব্যক্ত করার প্রথাটি অদ্যাপি গম্ভীরা উৎসব মধ্যে দৃষ্ট হয়। আত্ম-পর পাপাদি গীতাকারে গম্ভীরা উৎসবে গীতাভি-

নয়ের সহিত প্রকাশ অদ্যাপি আমরা দেখিতে পাইতেছি। এই প্রকারে আত্মপাপ গম্ভীরায় প্রকাশ করিলে মুক্তিনিশ্চয় ইহাই সাধারণের ধারণা।

অশোক কর্ত্তৃক পাটলীপুত্র নগরের বৌদ্ধসভার ও উৎসবাদি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পরেই যদি হিউ-এন-থ-সঙ্গ কর্ত্তৃক প্রয়াগ-ক্ষেত্রের মহাসভার বর্ণনা এই স্থলে লিপিবদ্ধ করি, বৌদ্ধ উৎসবের ক্রমশঃ গম্ভীরাভাব প্রাপ্তির আদি পর্য্যায় উপলব্ধি হইবে। বৌদ্ধ উৎসবে হিন্দু দেবদেবীর আবির্ভাব দৃষ্ট হইত, কিন্তু এস্থলে সময়ের পর পর বর্ণনা বাসনায় তাহা প্রকাশ করিলাম না।

চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে একটি বৌদ্ধ উৎসবের পরিচয় প্রদান করিব। ৪০০ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। ফা-হিয়ান গঙ্গা পার হইয়া পাটলীপুত্র নগরে আগমন করেন। সেই অশোকত্যক্ত রাজ্যে, সেই বৌদ্ধপ্রাধান্য কেন্দ্রস্থলে যখন আসিয়াছিলেন, না জানি তাহার হৃদয় কি মহান্ ভাব ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত মধ্যে উক্ত বৌদ্ধ উৎসব যাহা বর্ণিত আছে, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইল।

"প্রতি নূতন বৎসরের দ্বিতীয় মাসের অষ্টম দিবসে (জ্যৈষ্ঠ মাসের ৮ই) বৌদ্ধপৌত্তলিক শোভা যাত্রা দেখিয়াছিলেন। চারি চক্র বংশ বিনির্ম্মিত রথ (Pagoda) যাহার চতুর্দ্দিকে শ্বেতবর্ণ বস্ত্র দ্বারা মণ্ডিত করা হইত এবং সেই বস্ত্রে বিবিধ বর্ণ দ্বারা চিত্র বিচিত্র করা হইত, এই প্রকার ২০ খানি রথ ধ্বজপতাকা ও মাল্যাদি দ্বারা পরিশোভিত করা হইত এবং সেই রথের বর্ণরঞ্জিত বস্ত্রে বহু দেবদেবী মূর্ত্তি চিত্রিত থাকিত। রথোপরি বুদ্ধ ও সারথির ন্যায় বোধি-সত্ত্ব অবস্থান করিত। রথ সমুদয় ধীরে ধীরে নগরে আনা হইত। বহুদূর দেশ হইতে বুদ্ধ দেবের এই রথযাত্রা দেখিবার জন্য ধনী, দরিদ্র, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ সকলেই এই রথোৎসব পথে সমবেত হইত। গীতবাদ্যাদি সহকারে গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পাদি রথোপরি বুদ্ধকে অর্পিত হইত। মহাসমারোহে বাদ্যভাণ্ড সহ রথ সকল ক্রমে ক্রমে শ্রেণীবদ্ধভাবে ধীরে ধীরে নগরে প্রবেশ করিয়া নির্দ্দিষ্ট উৎসব স্থলে সমবেত করা হইত।

সমুদায় রাত্র আলোকমালাপরিশোভিত মণ্ডপে গীতামোদে ক্রীড়াকৌতুকে এবং ধর্ম্ম বিষয়ক অনুষ্ঠানে সমাগত দূর দূরান্তরাগত ব্যক্তিগণ যোগদান করিত।" এই নৈশ উৎসব মালদহের গম্ভীরা উৎসবের প্রাচীন বীজ। অনেকে অনুমান করেন, জগন্নাথদেবের রথযাত্রা এই বৌদ্ধ উৎসব ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং উপস্থিত ত্রিমূর্ত্তি বৌদ্ধদিগের এক প্রকার যন্ত্র বিশেষ। মালদহে বৈশাখের শেষ সপ্তাহে যে গম্ভীরা উৎসব হয় তাহার পরই জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে 'পুষ্পরথ' বলিয়া এক উৎসবের অনুষ্ঠানও হইয়া থাকে। বৌদ্ধ উৎসব ক্রমশ স্ফুটতর হইতে হইতে একদিন পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনেকের অনুমান বৌদ্ধ উৎসব পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া হিন্দু উৎসব যথা শৈব ও বৈষ্ণবগণের বিবিধ উৎসবের উৎপত্তি করিয়াছে।

ফা হিয়ানের সংক্ষিপ্ত বিবরণের পরই হিয়েন-থ-সঙ্গ-নামক চীন-পরিব্রাজকের ভ্রমণ বিবরণ

হইতে কিঞ্চিং বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া বৌদ্ধ উৎসবের সহিত হিন্দু উংসবাদির পর্য্যায় বিবৃত করিব।

হিয়োন-সঙ্গ ৬২৯ খৃষ্টাব্দে চীন ত্যাগ করেন এবং সমরকন্দ বোখারা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করেন, তিনি ভারতে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর জৈন দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পবিত্র গুরু মহাবীর মূর্ত্তিও দর্শন করিয়াছিলেন। বরাহপুরাণেও "তীর্থকস্ত জিনস্ত শুক্লবসনান্" বলিয়া লিখিত আছে। এই মহাবীর পূজাও মালদহে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথাগত বুদ্ধ জৈনপ্রভাব নিজচক্ষে দর্শন করিয়া গিয়াছেন। জৈন উংসবও হিন্দু উৎসবের মধ্যে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। হিয়েন সঙ্গ ভারতের বহুদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে আমাদের হতভাগ্য পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রদেশে আগমন করিয়াছিলেন।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের শোভা ও সমৃদ্ধি দর্শনে বিমোহিত হইতে হয়, বিপুল জনসঙ্ঘ ও বিংশ বৌদ্ধ সঙ্ঘার এবং তিনশত বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন এবং শতাধিক দেবমন্দির ও বিদ্যালয়াদি ছিল। নগরের শোভা. পুষ্পোদ্যান ইত্যাদি অতি সৌন্দর্য্যময় ছিল। তংকালে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্ম তুল্যরূপে বর্ত্তমান ছিল।

খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে প্রয়াগ-ক্ষেত্রে একবার বৌদ্ধ দানোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। চীন-দেশীয় তীর্থযাত্রী হিউ-এন-সঙ্গ, তাহা দর্শন করিয়া যান। "উক্ত সুবিস্তৃত উৎসব-ক্ষেত্র একটি আনন্দ-ক্ষেত্র ছিল; চারিদিকে সহস্র সহস্র গোলাপ গাছের সুরম্যবৃত্তি তাহাতে অপর্য্যাপ্ত মনোহর পুষ্পশ্রেণী অহরহ প্রস্ফুটিত এবং মধ্যস্থলে স্বর্ণ, রজত পট্টবস্ত্র ও অপরাপর বহুমূল্য দান-দ্রব্যে পরিপূর্ণ সুসজ্জিত গৃহশ্রেণী। তাহার সমীপে একশত এরূপ বিস্তৃত ভোজন-গৃহ ছিল যে তাহার প্রত্যেকটিতে একশত ব্যক্তি ভোজন করিতে পারিত। মহারাজ শিলাদিত্যের আহ্বানক্রমে ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, দরিদ্র, পিতৃহীন, মাতৃহীন, বান্ধবহীন, প্রভৃতি পঞ্চাশ সহস্র লোক তথায় আগমন করে। সার্দ্ধ দুই মাস ব্যাপিয়া দান-ভোজনাদি সহকারে ঐ উৎসব-ব্যাপার সম্পন্ন হয়। উহাতে হিন্দু বৌদ্ধের বিদ্বেষ ভাব দূরে থাকুক, সমধিক সদ্ভাবই দেখা যায়। তথায় বুদ্ধ, বিষ্ণু, শিব তিনেরই প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ সমস্ত সমাগত ব্যক্তি-দিগকে বহুমূল্য সামগ্রী দান এবং চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয় নানাবিধ সুস্বাদ সামগ্রী ভোজন করান• হয়।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

একবার শ্রীহর্ষ রাজার উৎসবের বিষয় কি চিন্তা করিবেন? দাতা শ্রীহর্ষ প্রজারঞ্জক ছিলেন. তাঁহার প্রজাগণের প্রীতির জন্য এই আনন্দ-দানোৎসব-ক্ষেত্রে বুদ্ধ, বিষ্ণু ও শিব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে পূজা করিতেন তাহার মূলে আমরা কি দেখিতে পাই? উৎসবটী বৌদ্ধ উৎসব হইলেও উক্ত উৎসবক্ষেত্রে বিষ্ণু ও শিবপূজা বুদ্ধ উৎসব সহ অনুষ্ঠিত হইতে দেখি। বৌদ্ধরাজার অধীনে বৌদ্ধ ক্রিয়াকাণ্ড প্লাবিত ক্ষেত্রে শিবোৎসব দেখিতে পাইতেছি, ইহা অতি মধুর ও অমিয়ময়। এইপ্রকার শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাদ্বারা উৎসব 'গম্ভীরায়' পরিণত হইয়াছে। শৈব বৈষ্ণব ও বৌদ্ধগণের উৎসবাদি বৌদ্ধগণের মূর্ত্তিপূজার অনুকরণের আবির্ভাব ফল।

২য় শিলাদিত্য ৬১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রভাকর বর্দ্ধনের মৃত্যুর পর কান্যকুব্জ সিংহাসনে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্দ্ধন্ অধিরোহণ করেন, কিন্তু তিনি কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক কৌশলে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীহর্ষবর্দ্ধন রাজা হন এবং তিনি শিলাদিত্য নাম গ্রহণ করেন। তিনি কামরূপেশ্বর ভাস্করবর্ম্মা বা কুমারের সহিত মিত্রতা পাশে আবদ্ধ হয়েন। বর্দ্ধনসম্রাটের সহিত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড়-নগরের সংস্রব দেখিতে পাই। এইস্থানে সংক্ষেপে হর্ষবর্দ্ধন অনুষ্ঠিত একটি উৎসবের বর্ণনা করিব।

মহারাজের নিমন্ত্রণে বহু রাজন্যবর্গ সেই আনন্দোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শত-ফিট উচ্চ উৎসব-গৃহ নির্ম্মিত হইত। তাহাতে মানবপ্রমাণ জাগ্রত শ্রীবুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত হইত। এই উৎসবটি চৈত্রমাসের প্রথম হইতে ২১শে তারিখ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইত। (From the 1st to 21st of the month—the second month of spring) শত শত শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ সেই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। এই অস্থায়ী উৎসবগৃহে সঙ্গীত ও বাদ্যভাণ্ডের বিপুল আয়োজন হইত। শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিতেন এবং দূরদেশা-গত দর্শকবৃন্দও যোগদান করিত। নৃত্য-বাদ্য-সঙ্গীতহীন বৌদ্ধ উৎসবক্ষেত্রে ক্রমশঃ নৃত্য গীতাদির আবির্ভাব দেখিতেছি। ইহাই আমাদের গম্ভীরার শৈশবকাল বলিতে পারি।

প্রতিদিন নৃত্যগীতাদি সহকারে উৎসবের অনুষ্ঠান হইত। মহারাজ একটি ক্ষুদ্র বুদ্ধ-মূর্ত্তি স্কন্ধে করিয়া নদীতে স্নান করাইয়া নদীতীর হইতে উৎসবগৃহে আনয়ন করিতেন। এই প্রকার বৌদ্ধ উৎসব প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে অনুষ্ঠিত হইত। এই প্রকারের শৈবউৎসবও দেখিতে পাই [শৈবপ্রভাব দেখুন]। পুষ্প, ধূপাদিগন্ধদ্রব্য, বিবিধ খাদ্য, নৃত্যগীত ও বাদ্যভাণ্ড দ্বারা চৈত্রমাসে বুদ্ধোৎসব সমাধা হইত। শৈব প্রভাবকালে এই উৎসবই চৈত্রমাসের আদ্যের গাজনে পর্য্যবশিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ গ্রন্থপাঠে অবগত হই, বৌদ্ধগণ তাঁহাদের ধর্ম্ম যে অতি প্রাচীন এবং বহুকাল হইতে পৃথিবীতে বর্ত্তমান রহিয়াছে ইহা দেখাইবার জন্য তাঁহারা একসময়ে অর্থাৎ বৌদ্ধ প্রভাবকালে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে কারণেই তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তকাদিতে এক একটি করিয়া বহু বুদ্ধাবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন এবং ধর্ম্মটি ক্রমশঃ জটিলও বহু দেববাদে পর্য্যবশিত হইয়া পড়িয়াছে। অহিংসা বৌদ্ধধর্ম্মের মূল মন্ত্র হইলেও সর্ব্বপ্রথমে তাহা সর্ব্বার্থসিদ্ধও পালন করেন নাই। যোগভঙ্গের পর এক বৃদ্ধাকর্ত্তৃক প্রদত্ত তিলতণ্ডুলমিশ্রিত শূকরমাংসও তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে দেখি। বৌদ্ধগণের মধ্যে সম্প্রদায় ভেদ বর্ত্তমান আছে। এক সম্প্রদায় আদি বুদ্ধের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছেন, তিনি নিত্য, নিরাকার, জ্ঞানবান্, ন্যায়বান্ ও দয়াবান্। তিনি স্বতঃস্বরূপ স্বেচ্ছানুসারে সমুদায় সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আর একদল বলেন যে ঐ আদিবুদ্ধ আত্মস্বরূপ হইতে অন্য পাঁচটি বা সাতটি বুদ্ধ উৎপাদন করেন, তাঁহাদের নাম ধ্যানীবুদ্ধ। এই সমস্ত ধ্যানীবুদ্ধ হইতে আর পাঁচটি বা

সাতটি উৎপন্ন হয়, তাঁহাদের নাম বোধিসত্ত্ব। ইহাঁরা পর্য্যায়ক্রমে জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এখন অবলোকিতেশ্বর নামক চতুর্থ বোধিসত্ত্বের অধিকার চলিতেছে। তিনি অমিতাভ নামক" বুদ্ধ হইতে উৎপন্ন। আরও দেখিতে পাই বৌদ্ধধর্ম্মে 'বুদ্ধশক্তি' কল্পিত হইয়াছে, আদিবুদ্ধ যাহা পরমব্রহ্মস্বরূপ ;তাঁহা হইতে সমুদায় বুদ্ধ, বুদ্ধশক্তি ও বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে।

এই প্রকারে বুদ্ধশক্তি কল্পিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকবাদের প্রসঙ্গ আনিয়াছে। নিম্নে বুদ্ধ, বুদ্ধশক্তি ও বোধিসত্ত্বের উৎপত্তির তালিকা প্রদান করিলাম—

বুদ্ধ।	বুদ্ধশক্তি।	বোধিসত্ত্ব।
(১) বৈরোচন	বজ্রধাতেশ্বরী	সমন্তভদ্র।
(২) অক্ষোভ্য	লোচনী	বজ্রপাণি।
(৩) রত্নসম্ভব	মামুখী	রত্নপাণি।
(৪) অমিতাভ	পাণ্ডরা	পদ্মপাণি।
(৫) অমোঘসিদ্ধ	তারা	বিশ্বপাণি।

এই প্রকারে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের জটিলতা ও তান্ত্রিকভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। বৌদ্ধগণ বহু দেবদেবীকে বিশ্বাস করেন। বৌদ্ধমতে মনুষ্যগণ সাধনাপ্রভাবে উত্তরোত্তর দেবত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা এরূপ সাধনাদ্বারা বুদ্ধ-পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম মানুষি-বুদ্ধ। সাতজন মানুষি-বুদ্ধ পরিগণিত হইয়াছেন যথা—বিপশ্বী, শিখি, বিশ্বভূ, কুকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ ও শাক্যমুনি। প্রত্যেক বুদ্ধদেব পূজায় স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে। কাশ্যপ বুদ্ধের মন্ত্র যথা—

"নমো বুদ্ধায়, নমো ধর্ম্মায়, নমো সঙ্ঘায়, নমো কাশ্যপায়, ওঁ হর হর হর, হো, হো, হো, নমো কাশ্যপায়। অর্হতে সম্যক্সম্বুদ্ধায় স্বাহা।" এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক তথাগত বুদ্ধও আছেন। এই প্রকারে বিবিধ বৌদ্ধপৌরাণিক ভাব বৌদ্ধধর্ম্মের জটিলতা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং একই প্রকার বৌদ্ধধর্ম্ম বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা ও উপশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল শ্রীধর্ম্ম (বুদ্ধ) পূজার ঐ প্রকার কোন এক প্রকার শাখাবলম্বিগণের ক্ষুদ্র ভাবাপন্ন বুদ্ধপূজাপদ্ধতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যথাস্থানে তাহার বিবরণ দেখুন। ঐ প্রকারের বুদ্ধপূজাই শিবপূজায় পরিণত হইয়াছে, ও কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, এবং তাহাই গম্ভীরা বা আদ্যের গাজনরূপে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বৌদ্ধ-তান্ত্রিক প্রভাবকাল।

প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় মধ্যে যখন তান্ত্রিক-প্রভাব উপস্থিত হয়, তখন সেই প্রকৃত ধর্ম্মের পতন কাল উপস্থিত হইয়া থাকে ; মহারাজ শ্রীহর্ষ দেবের সময় হইতেই এই বৌদ্ধ তান্ত্রিক ভাবের ক্রম-বিকাশের পরিচয় পাইতেছি। শ্রীহর্ষদেব বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তিনি একজন বিক্রমাদিত্যের ন্যায় বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন।

তাঁহার সভায় পণ্ডিত ও বিখ্যাত কবিগণ উপস্থিত থাকিতেন। তৎকালরচিত নাটকাদিতে তাৎকালিক দেশের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মভাবাদির যাদৃশ উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহা দ্বারাই হর্ষবর্দ্ধন নৃপতির সময়ের ও তৎপূর্ব্ব ও তৎপরবর্ত্তী সময়ের শৈব তান্ত্রিক উৎসবাদির সহিত বৌদ্ধ তান্ত্রিক উৎসবাদির ঐক্য প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টাই করিব।

শ্রীহর্ষদেবের আজ্ঞায় নাগানন্দ প্রভৃতি নাটকের উৎপত্তি ও অভিনয় হইয়াছিল। উক্ত নাটকাদিতে তাৎকালিক বৌদ্ধপ্রভাব মধ্যে তান্ত্রিকতা ও শৈবভাবের প্রভাব দেখিতে পাই। শ্রীহর্ষদেবের রাজত্ব কাল ৬০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৫০ খৃঃ পর্য্যন্ত। অতএব এই সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের বিকাশ দেখিতে পাই। 'নাগানন্দ' মধ্যে জীমূতবাহন ও মাল্যবতীর উপাখ্যান সন্নিবেশিত রহিয়াছে। বিদ্যাধরপুত্র জীমূতবাহন বৌদ্ধধর্ম্মের আদর্শ এবং তাঁহার স্ত্রী মাল্যবতী শৈবধর্ম্মের আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। উভয়ের মিলনে মণিকাঞ্চন সংযোগই হইয়াছে। বৌদ্ধ ও শৈব মিশ্রণের সুধাময় ফলও প্রসব করিয়াছে।

বৌদ্ধ তান্ত্রিক ভাবের স্ফুরণচিত্র মালতী-মাধবে দৃষ্ট হয়। মহাত্মা ভবভূতি যাঁহার অন্যনাম শ্রীকান্ত ছিল তাঁহার সিদ্ধহস্তের চিত্রাঙ্কণ হইতেই কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্য কনোজরাজ যশোবর্ম্মাকে পরাজয় করিয়া কবি ভবভূতিকে কাশ্মীরে লইয়া যান। ভবভূতি লিখিয়াছেন—

বসন্তোৎসব বা মদনোৎসবের দিবসে পড়ুয়া মাধব হস্তীকচা মন্ত্রীকন্যা মালতীকে দর্শন করেন। মালতী ও মাধব উভয়ে উভয়ের রূপে আকৃষ্ট হন। মাধব মালতীলাভে হতাশ হইয়া বৌদ্ধ শ্রমণী কামন্দকীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। কামন্দকী তাঁহাদের মিলনের আশাও দিয়াছিল, কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তাহা হইল না। তখন মাধব ভীষণ তন্ত্রসাধনই মালতীলাভের একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় স্থির জানিয়া শ্মশানস্থিত ভীষণ চামুণ্ডা মন্দিরে নৃমুণ্ডমালিনী কপাল-কুণ্ডলা নাম্নী ভৈরবীর নিকটে গমন করেন। এখানে তিনি আম-মাংসাদি লইয়া শ্মশানে চামুণ্ডামন্দিরে তন্ত্র সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। ভৈরব অঘোরঘণ্টা পবিত্র কুমারী বলি দিয়া শবসাধনা করিবেন বলিয়া মালতীকে হরণ করিয়া বধ্যবেশিনীরূপে শ্মশানে আনয়ন করিলে মাধব অঘোরঘণ্টার জীবন বিনাশ করেন। তত্রাচ মালতী লাভ হইল না। মাধব মালতী অনুসন্ধানে বিন্ধ্যাচলে গমন করিয়া সৌদামিনী নাম্নী বৌদ্ধ তান্ত্রিকযোগিনীকে দেখিতে পান। সৌদামিনীর ইন্দ্রজাল বিদ্যা ও যোগবলে মালতীকে প্রাপ্ত হন। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের একদিকে দয়ার আধার অহিংসার পারাবার, অন্যদিকে ভীষণ নরহত্যার ও মদিরাপানাদি পৈশাচিক ব্যাপার দেখিতে পাই। এই সময়ে উদার বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে এক সম্প্রদায় হীনধর্ম্ম অবলম্বন করেন। সম্ভবতঃ তাঁহারাই বৌদ্ধনীচ জাতির দলের নেতা হইয়াছিলেন। ভারতের বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে গৃহীদের নাম উপাসক ও উপাসিকা। এই উপাসক ও উপাসিকাগণ নীচ জাতীয় হইলে তাহাদের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মভাব নীচতা-পূর্ণ কদর্য্য হইয়া থাকে, ক্রমশঃ এই তান্ত্রিক বৌদ্ধভাব হীন ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রচণ্ডদেব নামে এক গৌড়পতির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়; তিনি খৃঃ ষষ্ঠ কি সপ্তম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বারেন্দ্র ভূমির মধ্যে কোন এক স্থলে রাজত্ব করিতেন বোধ হয়। তিনি আপন পুত্র শক্তিদেবের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম আচরণ করেন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্মই বিশেষ প্রবল ছিল।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বৌদ্ধ ও জৈনগণের তীর্থস্থান ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রভাব মহামহিমান্বিত ছিল। বৌদ্ধগণ এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনকে তীর্থস্থান ও পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া মান্য করিতেন।

ইহা হইতেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব ও উৎসবাদি কি প্রকার ছিল তাহা কেবল অনুমানের উপরই নির্ভর করিতেছে। এখানে পাটলা দেবী, আইহোরাণী, জহরাদেবী প্রভৃতি অতি প্রাচীন বৌদ্ধদেবী অদ্যাপি পূজাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

গুপ্তরাজগণ খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদিগকে আমরা শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর আস্থা স্থাপন করিতে দেখি। তাঁহাদের অথচ কেহ কেহ বৌদ্ধ মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারও করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে তান্ত্রিক ধর্ম্মের উৎকর্ষতা পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ মহাযান মত হইতে যে তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের পরিপুষ্টি হয়, হিন্দুদিগের ধর্ম্মেও সেই তান্ত্রিকতা প্রবেশ করিয়াছিল। গুপ্ত নৃপতিগণ এই তান্ত্রিক ধর্ম্মে অনুরাগ প্রকাশ করায় বঙ্গদেশে তান্ত্রিকতাই প্রবল হইয়া উঠে। কালিকা, চামুণ্ডা প্রভৃতি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবপূজা ও শৈব ধর্ম্মের অঙ্গ মধ্যে তান্ত্রিক দেবী ও দেবগণের অধিকার সংস্থাপিত হয়। মনুর সময়ে যে পুণ্ড্রদেশ পতিত দেশ এবং অপবিত্র স্থান বলিয়া প্রচলিত ছিল, এই সময়ে তাহাই তীর্থস্থান রূপে পূজা পাইল। এই সময়েই পীঠস্থানের কল্পনা হইয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ উৎসবে যে স্থলে বুদ্ধ ও শিব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা ও উৎসবাদির অনুষ্ঠান হইত, সেই স্থলে তান্ত্রিক দেবদেবী ও তান্ত্রিক মতের নৃত্য ও উৎসবাদির অনুষ্ঠানের সূত্রপাত এই সময়েই হইয়া থাকিবে।

শূরবংশের অভ্যুদয়ের সমকালে খড়্গোদ্যম নামক এক নৃপতি গৌড়দেশের পূর্ব্বাঞ্চল অধিকার করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার পৌত্র দেবখড়্গের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, রাজ রাজ ভট্ট তত্রত্য বৌদ্ধবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং পুরদাস তাঁহার বৌদ্ধ অমাত্য ছিলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন এবং সমতট প্রদেশে হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটিলেও বাঙ্গালার অন্যস্থান অপেক্ষা সেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিপত্তি অধিক ছিল। *

৭৭০ খৃঃ—৭৯০ খৃষ্ট পর্য্যন্ত গোপাল দেবকে পাটলীপুত্রের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। সংক্ষেপে পাল নরপতিগণের পরিচয় লিখিত হইল—

পালরাজগণ যে গৌড় রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন, তাহার মূল এই—"মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ করগ্রাহিতঃ"।

* বিশ্বকোষ ১৭শ ভাগ ৪১৪-৪১৫ পৃঃ।

এই বর্ণনায় ধর্ম্মপালদেবের রাজ্যলাভের কারণ বিবৃত রহিয়াছে। তাঁহার সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে "মাৎস্যন্যায়" প্রচলিত ছিল অর্থাৎ বলবান্ দুর্ব্বলকে পীড়ন করিত, দেশ অরাজক প্রায় হইয়াছিল। আমরা ইহাতে বুঝিতেছি, হিন্দু ও বৌদ্ধগণের বিবাদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড যুদ্ধ এবং প্রকৃত রাজার অভাব হওয়ায় অনেক ক্ষুদ্র রাজার আবির্ভাব এবং নিরন্ত যুদ্ধবিগ্রহাদিতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী প্রজাগণের যৎপরোনাস্তি কষ্ট এবং ধর্ম্ম, শিল্পবাণিজ্য কৃষ্যাদি কার্য্যের অনিষ্ট হইতেছিল। এই সময়ে সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে প্রকৃতিপুঞ্জ সেই "মাৎস্যন্যায়" দূর করিয়া শান্তি সংস্থাপন কামনায়, পরম সৌগত দয়ালু প্রজারঞ্জক পাটলীপুত্ররাজ শ্রীধর্ম্মপালদেবকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়াছিল। এই ব্যাপারে হিন্দু ও বৌদ্ধ সকলশ্রেণীর প্রকৃতিপুঞ্জেরই তুল্যরূপ অধিকার ছিল। ধর্ম্মপাল উভয় সম্প্রদায়কেই সমান দেখিতেন ইহাই প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার সময় হইতেই হিন্দু বৌদ্ধ সম্প্রদায় মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি হইবার সূত্রপাত হয় এবং পুনরায় বৌদ্ধপ্রভাব পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে বিস্তার লাভ করে। এই সময়ে বৌদ্ধপ্রকৃতিপূর্ণ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের শাসনভার প্রজাগণ একজন বৌদ্ধনরপতির হস্তে তুলিয়া দিয়াছিল কেন? আমরা বিশ্বাস করি হিন্দুনরপতিগণ বৌদ্ধগণের উপর তখন অত্যাচার করিত, কিন্তু বৌদ্ধরাজগণ হিন্দুগণের উপর অত্যাচারী ছিলেন না এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে হিন্দু অপেক্ষা বৌদ্ধ প্রজার সংখ্যা অত্যধিক ছিল।

খালিমপুর হইতে ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনের অনুসন্ধান এবং তাহার কতকাংশের প্রতিলিপি আমি ৺ উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়কে দিয়াছিলাম। আমি বটব্যাল মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া উক্ত গ্রামে গিয়া তাঁহাকে তাম্রশাসনখানি দেখাইয়াছিলাম এবং তিনি উহা ১০৲ টাকা মূল্যে খরিদ করিয়াছিলেন। তাহার পাঠোদ্ধার হইলে যে বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে তাহার ক্ষুদ্রাংশ এইস্থলে সন্নিবিষ্ট করিলাম। উক্ত তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় সমাধা করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় বটব্যাল মহাশয় তাহা স্বীকার করেন নাই।

ধর্ম্মপাল ৭৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।* ধর্ম্মপালদেব পাটলীপুত্র নগরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অধীনে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ছিল। তাঁহার মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্ম্মাই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের মহাসামন্তপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হিন্দুপ্রজার মনোরঞ্জনার্থ নারায়ণবর্ম্মা শুভস্থলীতে "ভগবান্ মুন্ন† নারায়ণ ভট্টারক" নামক নারায়ণ বিগ্রহ† প্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্লাবিত প্রদেশে বহুকাল হিন্দু দেবদেবীর সমাদর অপসৃত হইয়াছিল বিশেষতঃ পৌণ্ড্রদেশে। বৌদ্ধ উৎসবের অনুষ্ঠান হিন্দুরাও তৎকালে করিত এবং বংশপরম্পরাগত সেই অভ্যাস এতাদৃশ বলবৎ হইয়া পড়িয়াছিল যে বহুকাল ধরিয়া হিন্দুদেবদেবীর উৎসবাদিও বৌদ্ধ উৎসবের সময় ও বৌদ্ধ উৎসববৎ অনুষ্ঠিত

* বিশ্বকোষ ১১শ ভাগ ৩১৭ পৃঃ।
† 'বুদ্ধনারায়ণভট্টারক' পাঠ হইবে। সা-প-সম্পাদক।

হইত, কেবল বুদ্ধের স্থলে হিন্দু দেবদেবী অর্থাৎ শিবাদিমূর্ত্তি স্থাপিত হইত মাত্র। তৎকালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন দেশে বৈদিক পূজকব্রাহ্মণ না থাকাতে উক্ত সূর্য্যনারায়ণদেবের পূজার জন্য লাট-দেশীয় দ্বিজ আনাইতে হইয়াছিল। লাটদেশীয় দ্বিজদ্বারা পূজাদি সম্পাদিত হইলেও বৌদ্ধ উৎসবাদির সহিত যে তাঁহার উৎসবাদি আচরিত না হইত তাহা নহে; এদেশে যে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহারা হিন্দু দেবদেবীর পূজাদি অবগত ছিলেন না অথবা বৌদ্ধ ধর্ম্মভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময় আধুনিক মালদহের গম্ভীরার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল বলিয়া বিবেচনা হয়। ধর্ম্মপালের পর দেবপাল তৎপরে বিগ্রহপাল এবং তৎপরে নারায়ণপাল রাজত্ব করেন। নারায়ণপালদেবের সময়ে আমরা বৌদ্ধরাজ কর্ত্তৃক শিবপ্রতিষ্ঠার বিষয় অবগত হই।

নারায়ণ পাল ৯১০—৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। নারায়ণপাল ন্যায়পরায়ণ, দরিদ্রবৎসল, প্রজাপ্রিয়, ধার্ম্মিক ও অমিতপরাক্রমী নরপতি ছিলেন। নারায়ণ পালদেবের একখানি তাম্রশাসনপাঠে অবগত হওয়া যায় যে তিনি হিন্দুপ্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জনার্থ শিব-প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। শ্রীমান্ নারায়ণ পালদেব শ্রীমুদ্গগিরির জয়স্কন্ধাবার হইতে ভূমিদান করিয়াছিলেন, দানের প্রয়োজন ও পাত্রাদিসম্বন্ধীয় কথা ৩৮—৪৪ পংক্তি পর্য্যন্ত খোদিতাংশে রহিয়াছে। শিবভট্টারকের 'যথার্হং পূজাবলিচরুসত্রনবকর্ম্মাদ্যর্থং' তথা পাশুপত আচার্য্য পরি-ষদের 'শয়নাসনগ্লানপ্রত্যয়ভৈষজ্যপরিষ্কারাদ্যর্থম্' এবং স্বাভিমতাবলম্বী অন্য জনগণের 'স্বপরি কল্পিতবিভাগেন অনবদ্য ভোগার্থম্' এই ভূমিদান পত্র প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়াই স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। নারায়ণপাল স্বয়ং 'সহস্রায়তন দেবালয়' সংস্থাপিত করিয়া তথায় সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা এবং শৈব পাশুমত মতের প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুচরবর্গের চেষ্টায় বৌদ্ধমতের বিলোপ হইয়া পাশুমত মত প্রচলিত হওয়ার ফলস্বরূপ নারায়ণপালদেব সর্ব্ব শ্রেণীর জনসাধারণের জন্য দেবালয় করিয়া-ছিলেন; তাহাতে যেমন শিবভট্টারকের পূজার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেইরূপ পাশুপত আচা-র্য্যানুচরবর্গের ও স্বাভিমতাবলম্বী অর্থাৎ বৌদ্ধমতাবলম্বী অপর জনগণেরও শয়নাসনাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহারা পরস্পরের সহিত বিবদ-মান না হইয়া সকলেই যাহাতে রাজদত্ত প্রসাদ উপভোগ করিতে পারে তজ্জন্য "স্বপরিকল্পিতবিভাগেন" ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

ইহাই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে শিবোপাসনার আরম্ভ বলিতে হইবে। বাৎসরিক বৌদ্ধপর্ব্ব উপাসনা উৎসবের সময়ই যে এই শিব ভট্টারকের বৌদ্ধ উৎসবাদির অনুরূপ নৃত্যগীত বাদ্যাদির দ্বারা আলোক মালাশোভিত শিব্ সকাশে নিশা অতিবাহিত না হইত তাহার কোন হেতু দেখিতেছি না। আমরা শিবপূজা বা শিবোৎসব (গম্ভীরা) প্রক্রমে বৌদ্ধ উৎসবের অনুরূপ উৎপত্তি এবং নারায়ণপাল প্রতিষ্ঠিত সহস্রায়তন দেবালয় হইতেই গম্ভীরার ন্যায় সার্ব্বজনীন উৎসব অনুভব করিতেছি। এই পালনরপতিগণের সময় হইতেই বৌদ্ধ উৎসব ও শৈব উৎসবের একই প্রকার আয়োজন ও অভিনয় হইত, ক্রমে নীচজাতীয় বৌদ্ধগণ মধ্যে

বৌদ্ধতান্ত্রিকতার প্রচলন হয় এবং তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাব হ্রাস হইতে থাকে, সেই সময়ে নীচ জাতি মধ্যে অথবা সাধারণ প্রজাগণের মধ্যে তান্ত্রিক ভাবাপন্ন বৌদ্ধ ধর্ম্মবিষয়ক গীতাদি-রচিত ও গীত হইত এবং শ্রীধর্ম্মপূজার অদ্ভুত ফললাভের লোভও প্রদত্ত হইত। মহামহো-পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে রমাইপণ্ডিত ধর্ম্মপালের সমসাময়িক বাইতি জাতীয় ছিলেন, * তিনি শ্রীধর্ম্মপূজা পদ্ধতি ও ধর্ম্মগীত রচনা করেন।

"স্নানআচরিল গীত পণ্ডিত রমাই গান।
একল রমাই দ্বিজ শয়ল অবধান॥"

ধর্ম্মপূজা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রাচীন পুস্তক সমুদায় সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। ময়ূরভট্টের গৌড়কাব্য, খেলারামের পুস্তক, রামচন্দ্রপ্রণীত ধর্ম্মমঙ্গল। [ঘনরাম, রামদাসকৈবর্ত্ত, রূপরাম, মহাদেব চক্রবর্ত্তী ও সীতারাম দাসের ধর্ম্মমঙ্গল দ্রষ্টব্য।] রমাই পণ্ডিত বাইতি, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম পূজক, ইহার পূজাপদ্ধতি ও ধর্ম্মের গান আজিও রাঢ়দেশে গ্রামে গ্রামে নীচ জাতি জনগণদ্বারা ধর্ম্মের গাজন নামে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মের গাজনের উদ্দেশ্য ধর্ম্মপূজার প্রচলন এবং এ জন্মে সুখসমৃদ্ধি সম্ভোগ এবং জীবনান্তে নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি। ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি কঠোর তান্ত্রিকতাপূর্ণ। ধর্ম্মের গাজন ও শিবের গাজন একই প্রকার। শিবের গাজনে বা শিবপূজার উদ্দেশ্য পার্থিব ঐশ্বর্য্যাদিলাভ এবং জীবনান্তে শিবলোকবাস। ধর্ম্ম-সংগীতাদি যেমন ধর্ম্মপূজার গুণকীর্ত্তনপূর্ণ, শিবায়ণ বা শিবগীত নামক পুস্তকে তদ্রূপ শিব-মহিমা ও পূজাপদ্ধতি প্রকাশ পাইতেছে।

শিবের গাজন বা চড়ক অথবা চৈত্রমাসিক শিবোৎসব এবং এই ধর্ম্মের গাজনও তদ্রূপ ধর্ম্মোৎসব। মালদহের গম্ভীরা উৎসব যাহা তাহাই শিবোৎসব, কিন্তু ধর্ম্মোৎসবের সহিত একই মৌলিকতা রক্ষা করিতেছে।

আমরা গম্ভীরার মূলস্বরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের গাজনের বিশদ বিবরণ বিবৃত করিব, তাহা হইলেই শিবের গাজন বা চড়ক অথবা গম্ভীরার বিষয় সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। ধর্ম্মের গাজন বা শ্রীধর্ম্মপূজা বৌদ্ধ তান্ত্রিকধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া বৌদ্ধপ্রভাবের মধ্যে লিখিত হইল। শিবের গাজন বা চড়কপূজা শৈবপ্রভাবের বিবরণমধ্যে প্রদত্ত হইবে। ঘনরাম প্রণীত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল হইতে শ্রীধর্ম্মপূজার বিবরণ প্রদত্ত হইল। শ্রীধর্ম্ম বুদ্ধদেবের একটি নাম। যতগুলি ধর্ম্মগীত আছে, সমুদায়গুলিতেই গৌড়ের প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় এবং গৌড়নরপতিগণের বিবরণ লিখিত আছে। ইহাদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে গৌড় বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনই শ্রীধর্ম্মমঙ্গল বা ধর্ম্মগীতির প্রধান উৎপত্তিস্থল; বৌদ্ধপ্রধান গৌড় হইতেই ধর্ম্মপূজার উদ্ভব ও প্রচলন হই-য়াছে। ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল পাঠে অবগত হওয়া যায় যে গৌড়নগরের অনতিদক্ষিণে রমতীনগরে বৌদ্ধধর্ম্মপূজক রমাইপণ্ডিতের বাস ছিল, তাঁহার কন্যা সামুলাসুন্দরী পিতার

---

* রামাই আপনাকে "দ্বিজ" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। কোন প্রাচীন পুস্তকে তিনি বাইতি জাতীয় বলিয়া বর্ণিত হন নাই। সা-প-প-সম্পাদক।

ভার ধর্ম্মপূজা প্রচলনার্থ নিযুক্ত ছিলেন। আমার বিশ্বাস, বৌদ্ধগৌড় বর্ত্তমান পিছলী (পেশল) গঙ্গারামপুরের কাঠালে ছিল, রমতীনগর সম্ভবতঃ বর্ত্তমান অমরতী বা অমৃতী নামে খ্যাত হইয়াছে।

"কর্পূর কহেন দাদা চল এক দৌড়।
আগে ঐ রমতিনগর ঐ গৌড় ॥" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল)

ঘনরাম বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন বা শ্রীধর্ম্মের কল্যাণে তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন। 'শ্রীমন্' নামটি বুদ্ধদেবের এবং শ্রীধর্ম্ম নামটিও বৌদ্ধজনপ্রিয় বুদ্ধদেবের। ঘনরাম তাঁহার সঙ্গীত পালারম্ভে লিখিয়াছেন—

"হাকন্দ পুরাণ মতে, ময়ূরভট্টের পথে
জ্ঞানগম্য শ্রীধর্ম্ম সভায়। ৮৪।"

ইহাতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, 'ময়ুরভট্টের গৌড় কাব্য' অবলম্বনে কবি ঘনরাম রমাই পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়াছেন। ঘনরাম পুনশ্চ বলিয়াছেন—

"ময়ূরভট্টে বন্দি। সঙ্গীত আদ্য কবি।"
"ময়ূরভট্ট বন্দি দ্বিজ ঘনরাম গায়।"

অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্গীত রচনায় ময়ূরভট্টই প্রথম পথ-প্রদর্শক। পূর্ব্বে রমাইপণ্ডিত ধর্ম্মপূজা পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ময়ূরভট্ট গৌড়কাব্যে তাহা গীতাকারে রচনা করিয়া সাধারণের গোচর করেন। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ"প্রণেতা লিখিয়াছেন, "এই ময়ূরভট্ট উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর সমসাময়িক লোক এবং পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদা বিধানকালে উদয়নাচার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন।" উদয়নাচার্য্যের আদিপুরুষ ক্রতুভাদুড়ি। তিনি বল্লাল সভায় কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন, তাঁহার অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ বৃহস্পতি আচার্য্য, যিনি বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য্য জিষ্ণুনির বিচারে পরাস্ত হইয়া বনগমন করেন, তাঁহার পুত্র সুবিখ্যাত উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী অন্ততঃ ১৫০ দেড়শত বৎসর পরের লোক। বল্লাল ১১১৯—১১৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। তাহা হইলে অনুমান ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উদয়নাচার্য্য জীবিত ছিলেন। ময়ূরভট্টও সেই সময়ে জীবিত থাকা সম্ভব। এই ছয়শত বৎসরের পুরাতন পুস্তকবর্ণিত বিবরণ সম্ভবতঃ বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রচলন বিষয়ে উত্তম প্রমাণ প্রদান করিতে সমর্থ। এই ময়ূর ভট্ট প্রদর্শিত পথের ঘনরাম পথিক।

ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল হইতে শ্রীধর্ম্মপূজার বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল দক্ষিণ ময়নাধিপতি কর্ণসেনপুত্র লাউসেন কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া গৌড়নগরে শ্রীধর্ম্মোৎসব ও পূজাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। লাউসেন ধর্ম্মের অনুগ্রহে অসাধারণ দৈব শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উক্ত দৈব-ক্ষমতা লাভ ইচ্ছায় ধর্ম্মপাল ধর্ম্মপূজা আরম্ভ করেন। লাউসেনের ধর্ম্মগুরু রমাইপণ্ডিত (ধর্ম্মপূজকেরা অদ্যাপি পণ্ডিত নামে খ্যাত); ধর্ম্মপাল গৌড়নগরে ধর্ম্মপূজা প্রথম প্রচলন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তৎপূর্ব্বেও

ধর্ম্মপূজা প্রচলিত ছিল। রমাইপণ্ডিত ধর্ম্মপূজার বিধি প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে লিখিত আছে—

"ধর্ম্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর।"

পাটলিপুত্ররাজ গোপালবংশজাত শ্রীধর্ম্মপালদেব এবং ঘনরাম বর্ণিত গৌড়ের ঠাকুর ধর্ম্মপাল ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, মাণিকচন্দ্রের ভ্রাতা ধর্ম্মপাল যাঁহার রাজধানী রঙ্গপুরের অন্তর্গত ধর্ম্মপুর ছিল, তাঁহার রাজ্যকাল "বঙ্গের পুরাবৃত্ত"-লেখক ৯৯৫—১০২০ খৃষ্টাব্দ বিবেচনা করেন। মাণিকচন্দ্রের মহিষী হাড়িপা বা হাড়িসিদ্ধার নিকট ধর্ম্মের পূজা-পদ্ধতি আচরণ করিয়া পুত্রলাভ করেন এবং উক্ত ধর্ম্মপালের সহিত যুদ্ধ করেন। এই সময়ে প্রাচীন (বিশেষ বঙ্গদেশের) বৌদ্ধক্ষেত্র সমুদায় বিনষ্ট ও অরণ্যসমাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার নিদর্শন শ্রীধর্ম্মমঙ্গলেই দেখিতে পাই। লাউসেনের মাতা রঞ্জাবতী পুত্রকামনায় ধর্ম্মপূজা করিতে মনস্থ করিলেন, রঞ্জাবতী উৎসপুরের সুখদত্তের নিকট ধর্ম্ম-পূজার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"উৎসপুরে সুখদত্ত বারুইনন্দন।
করিছে ধর্ম্মের পূজা মজাইয়া মন॥
গাজন লইয়া এল ময়না নগরে।
শিরে ধর্ম্মপাদুকা সোণার চতুর্দ্দোলে॥
কত পঞ্চ বাদ্যবাজে আদ্যের গাজনে।
আনন্দে অবধি নাই ময়না ভুবনে॥
ঢাক ঢোল সিঙ্গা কাড়া একাকার ময়।
আনন্দ আবেশ সবে বলে ধর্ম্ম জয়॥" (ঘনরাম)

রঞ্জাবতী সুখদত্তের নিকট অবগত হইলেন রমাইপণ্ডিত বিখ্যাত সিদ্ধ ধর্ম্মপূজক। রমাই পণ্ডিতকে ময়নানগরে আহ্বান করা হইল। রমাইপণ্ডিতের কন্যা সামুলা রঞ্জাবতীকে পূজাপদ্ধতি বিবৃত করিয়া বুঝাইলেন।

"সামুলা এতেক যদি বলিল রঞ্জায়।
পুঁথি দেখি পণ্ডিত প্রমাণ দিল তায়॥"

চাঁপাইক্ষেত্রে ধর্ম্মপূজার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, কারণ চাঁপাই প্রাচীন ধর্ম্মপূজক-প্রসিদ্ধ স্থল কিন্তু তৎকালে চাঁপাই ঘোর অরণ্য হইয়া পড়িয়াছিল।

"ইহারে চাঁপাই বলি, এই মহাপুণ্যস্থলী,
সামুলা বলিল ইতিহাস।"

*

"মকরাক্ষ মহামতি, তার জায়া চাঁপাবতী
চাঁপাই খেয়াতি যাহা হতে।৬"

* * * *

কানন কাটিয়া বিধি, বান্ধারে রতন বেদী
পূজ ধর্ম্ম পূর্ণ হবে আশ।"

তৎকালে অধিকাংশ প্রাচীন ধর্ম্মপূজার স্থান অরণ্যগত হইয়াছিল, ইহাই তাহার একমাত্র প্রমাণ নহে, পশ্চিম-উদয়পালাতেও দেখিতে পাই :—

"সামুলা বলেন এই আন্তের দেহারা।
কানন কাটায়ে কর গাজনের ত্বরা ॥"

ধর্ম্মপূজায় কি কি আবশ্যক তাহার বিবরণের কিয়দংশ ধর্ম্মপাল রাজার ধর্ম্মপূজা হইতেই সংগ্রহ করিয়া এইস্থলে প্রকাশ করিলাম। গৌড়পতি ধর্ম্মপাল রমতীর রমাই পণ্ডিতের বিধানমত ধর্ম্মপূজার আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রথমেই—"সুচারু চওর বান্ধে তোলাইয়া মাটী।
তায় তোলে দেয়াস তেত্রিশ বড় পাটী ॥"

এই প্রকারে সুন্দর গৃহ নির্ম্মিত হইলে গৃহের উপরে—

"গঙ্গাজল চামরে ছাইল চারি চাল।
মাঝে মাঝে শিখিপুচ্ছ শোভা করে ভাল ॥
কলধৌত কলসে পতাকা দিল সেজে।
কাঁচঢালা কাঞ্চনবরণ করে মেজে ॥
পাষাণে রচিত পীড়া দ্বার চিত্রময়।
দেখিতে মণির চান্দা চিত্ত বান্ধা রয় ॥

বিবিধ নৈবেদ্যাদি ও উপকরণ সম্ভারে গৌড়পতি ধর্ম্মপূজায় নিযুক্ত হইলেন। পূজার জন্য

"পরিমাণ প্রচুর পুরট পদ্মমালা ॥"

লইয়া শ্রীধর্ম্ম আন্তের গাজনে অর্পণ করিলেন। ধর্ম্মপূজায় প্রচুর পদ্মপুষ্পের প্রয়োজন, অদ্যাপি রাঢ়ে তাহা দৃষ্ট হয়, এবং আন্তের গম্ভীরাতেও পদ্মপুষ্প প্রয়োজন হইয়া থাকে। ধর্ম্মপূজার জন্য ঢাক, ঢোল কাঁসি, সিঙ্গা বাদিত হয় এবং গীতাদিরও যথেষ্ট বন্দোবস্ত করিতে হয়।

"তিন সন্ধ্যা গীত-বাদ্য অনাদ্য সঙ্গীত।
ধর্ম্মপূজে নরপতি মজাইয়া চিত ॥"

তৎপরে অন্যান্য বিধি রঞ্জার চাঁপাইএর আন্তের গাজনের অনুষ্ঠান হইতে সংক্ষেপে লিখিত হইল।

রমাইপণ্ডিত, হরিহর বাইতি, সামুলাসুন্দরী রঞ্জাবতীর সহিত চাঁপাইবন কাটাইয়া ধর্ম্মের পূজার স্থান প্রস্তুত করিলেন। রমাইপণ্ডিত তথায় ধর্ম্মের বেদী বাঁধাইয়াছিলেন, সেই বেদীটি—

"মণ্ডিত করিল সব দিয়ে তায় চুণ।
যতনে জ্বালিবে যায় যজ্ঞের আগুন॥"

তাহার পর বেদীর চতুর্দ্দিকে রামকলা রোপণ করিয়া এবং বনফুলের মালাদ্বারা "তেথন্ধি-বেষ্টিত" করিল, রঞ্জাবতী "আপনি মার্জ্জনা করে ধর্ম্মের দেহারা।" তাহাতে চন্দনের ছড়া দিল এবং

'ধর্ম্মজয় ডাকে সবে ঢাকে পড়ে সাড়া।"

তৎপরে নদীতীরে স্নান উদ্দেশে গমন করিতে আরম্ভ করিল এবং সমবেত জনগণকে

"সায় দিতে সামুলা সকল সংযাতে।
নাচিতে লাগিলা সবে বেত লয়ে হাতে॥
বায়েন বিভোল নাচে বাজায় রগড়ে।"

ক্রমশঃ সকলে চাঁপাইঘাটে 'লোটাইয়া পড়ে।' স্নানান্তে ধৌত ধুতি পরিধান করিয়া

"নাচিতে নাচিতে ঢাকে ধর্ম্মজয় ধ্বনি।
দেহারা নিকটে আসি লোটায়া অবনী॥
ভ্রূকুটি বাজায় ঢাক রাখিল বায়েন।"

তৎপরে সকলে শুদ্ধমনে পূজায় বসিল। ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিল এবং ধূপ ধুনায় সেই স্থান অন্ধকারপ্রায় হইয়া পড়িল।

ঘন ঘন ধর্ম্মজয় শব্দ উত্থিত হইল। সংযাতের সকলেই মস্তকে 'ধুনা পোড়াইতে' আরম্ভ করিল, এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। এই প্রকারে পূজা সেদিন শেষ হইল।

"রঞ্জাবতী সেবেন সামুলা দেন জয়॥"

নবমদিবস পর্য্যন্ত এবম্বিধ পূজা আচরিত হইল। দশমদিবসে গামার কাটিয়া ধর্ম্মজয় ঘোষণা করিল, তৎপরে গণেশাদি দেবতার পূজা করিয়া "জাগাল গামার গাছে।" তৎপরে ধর্ম্মপূজক সংঘাত সকলে ধরাধরি করিয়া বৃক্ষের বরণ করিয়া—

'বান্ধিল সবার করে সুতা॥'

তৎপরে ঘোর বাদ্যোদ্যম সহকারে একপ্রকার অনুষ্ঠানের আরম্ভ করিল।

"সাজায়ে কদলী-মঞ্চে,　　কাটারি পাতিয়ে সঞ্চে
ভর দিয়া এল ধর্ম্ম বাটে॥"

এই অনুষ্ঠানকে 'কাটারি ভর বলে'। নদীতীরে কদলী-মঞ্চে সারি সারি খড়্গ বা তরবারি বা কাটারি (দা) সাজাইয়া দেওয়া হয়, সংঘাতের ধর্ম্মব্রতিগণ স্নানান্তে সিক্তবসনে সেই মঞ্চ-শয্যায় শয়ন করে এবং অন্যান্য ভক্তগণ তথা হইতে ধর্ম্মবেদী বা দেহারা সমীপে আনয়ন করে এবং সপ্তবার বেদী প্রদক্ষিণ করিয়া অবতরণ করে। অদ্যাপি রাঢ়ে এই ভর দেওয়া হইয়া থাকে। তৎপরে "নবরত্ন জ্বালে তপস্বিনী।" এই নবরত্ন জ্বালা শেষ হইলে সকলে 'প্রণাম খাটিতে' আরম্ভ করিল, প্রণাম খাটা পাঠকগণ অবগত আছেন বিশ্বাস করি—

"পুলকে প্রণাম খাটে, পঞ্চ বাদ্য গীত নাটে,
যোগ যজ্ঞে জাগিল যামিনী।"

আমরা আদ্যের গম্ভীরাতে 'সেবাগড়া' (প্রণাম খাটা) দেখিতে পাই এবং সমুদায় রাত্র "পঞ্চ বাদ্য গীত নাটে" অতিবাহিত হইতেও দেখি। পরদিবস স্নানান্তে পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মপূজা শেষ করিয়া একে একে

"সুমঞ্চে সন্ন্যাস কাটী গাড়ে চন্দ্রবান বটী
ঘোরমুখা খুর খরশান।
কসিয়ে কোমর আঁটি মুদিয়ে নয়ন দুটি
ঝুপ করে ঝাঁপ দিল তায়॥
ঘোর বাদ্য জয় রোল সামুলা দিলেন কোল
পুনর্ব্বার উঠিল,নির্ভয়া।
সঙ্গী শুদ্ধ ভক্ত যত পুনঃ পুনঃ এই মত
ঝাঁপ দিল তবু নাই দয়া॥"

এই প্রকার 'বঁটিঝাঁপ' পালা শেষ হইল; পাঠকগণ এই বঁটীঝাঁপ বুঝিলেন কি? যাঁহারা শিবের গাজন বা ধর্ম্মের গাজন দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর বুঝাইতে হইবে না, কিন্তু যাঁহারা দেখেন নাই তাঁহাদের বোধগম্য হেতু সংক্ষেপে লিখিত হইল। মঞ্চোপরি ভক্তগণ দণ্ডায়মান হইলে মঞ্চের নিম্নে ও সম্মুখে কদলিভেলায় সংবদ্ধ অর্দ্ধচন্দ্রাকার শাণিত বঁটী সারি সারি করিয়া বিদ্ধ করা হয়, অন্যান্য সংঘাতের ভক্তগণ সেই চন্দ্রবান বঁটীযুক্ত ভেলাটি কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া ধারণ করে; ঘন ঘন ধর্ম্মজয় বা শিবজয় ঘোষণা করিতে থাকে এবং বাদ্য ভাণ্ড হইতে থাকে। সেই মঞ্চোপরিস্থ ভক্ত নয়ন মুদ্রিত করিয়া বক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক সেই কদলিভেলায় পতিত হয় এবং বস্ত্রাবৃত করিয়া তাহাকে শ্রীধর্ম্মের নিকটে বা শিব সন্নিধানে আনয়ন করে। তৎপরে 'শালেভর' নামক শেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। লৌহনির্ম্মিত শালকাঁটায় (সুক্ষ্মাগ্রপ্রেক) তীক্ষ্ণাগ্রভাগ উর্দ্ধমুখে রাখিয়া একটী কাষ্ঠফলকের (মানব শয়ন করিতে পারে) উপর বিদ্ধ করিতে হয়, ঘনরাম লিখিয়াছেন যথা—"পরিপাটী শর সে উত্তম গেছে আঁটা॥

উপরে সূর্য্যের ছটা করে ঝক্ মক্।
পড়িলে পতঙ্গ কুটা উথলে পাবক॥
সিন্দুর জড়িত জবা শোভা করে ভাল।
মঞ্চের সম্মুখে নিল মূর্ত্তিমান কাল॥"

যখন মঞ্চের সম্মুখে নীত হয়, তখন যে আশা বা কামনায় ধর্ম্মপূজায় ব্রতী হওয়া যায়, যদি সে কামনা পূর্ব্ববর্ত্তী কঠোর সাধনায় সিদ্ধ না হয়, তবে শেষ এই 'শালে ভর' মঞ্চে ধর্ম্মজয় ঘোষণা করিয়া সঙ্কল্পমূলক বিষয়ে একান্ত নিষ্ঠাবান্ হইয়া ধর্ম্মউদ্দেশে জীবন ত্যাগ বাসনায় বক্ষ বিস্তার করিয়া নির্ভয়ে লম্ফ প্রদান করিয়া পতিত হইতে হয়।

"ঝুপ করে ঝাপ দিলে শব্দ উঠে ঝুপ ॥"
"বুকে পিঠে ফুটে শাল পিঠ হয় ফার।"

অতি পূর্ব্বকালে এইপ্রকার শালেভর হইত, এক্ষণে হয় না ; আমি বাল্যকালে বর্দ্ধমান জেলার কুচুট গ্রামে শ্রীধর্ম্মরাজের পূজায় শালেভরের প্রেকবিদ্ধ তক্তাটি দেখিয়াছি, তাহার পূজা হইত, কিন্তু শালেভর দিতে দেখি নাই।

জিহ্বা-বানফোড়া, কপাল-বান-ফোড়া প্রভৃতি কতিপয় বাণবিদ্ধ লোককে শোণিতাপ্লুত হইয়া নৃত্য করিতে দেখিয়াছি। ধর্ম্মের গাজনে চড়ক হয় না,উহা শিবপূজার অঙ্গ। অধুনা ধর্ম্মের পূজক ডোম বা হাড়ী ; তাহাদিগকে পণ্ডিত বলে। কোথাও কোথাও বাইতিও আছে। ধর্ম্মের পূজার সহিত কালুরায়ের পূজা হইয়া থাকে এবং শ্রীধর্ম্মপূজাকালে "শ্রীধর্ম্মকালুরায়" নাম একত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে। রাঢ়দেশে কালুরায়, বাঁকুড়ায়, খেলারাম প্রভৃতিরও পূজা দেখা যায়, উহাও ধর্ম্মপূজা। তাঁহারা ধর্ম্মপূজক ও সিদ্ধ ছিলেন, সেই কারণে তাঁহাদের ধর্ম্মের পূজার সহিত পূজা হইয়া থাকে।

দক্ষিণ ময়নাভুমের রঞ্জাবতীপুত্র ধর্ম্মপূজক সিদ্ধ লাউসেনের প্রধান সেনাপতি ও ধর্ম্মভক্ত কালুডোম ছিল। সেব্যক্তি ভীষণ ক্ষমতাশালী বীর ছিল। সিদ্ধ লাউসেন যখন নির্ব্বান প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহাকে লইতে স্বর্গ হইতে রথ আইসে, কালুডোমকে সেই রথে চড়িয়া স্বর্গে যাইতে অনুরোধ করিলে কালু বলিল—

"সেন বলে কালুবীর চল স্বর্গবাস।
কালু বলে যাই যদি পাই মদ মাস ॥
হেথা সেথা কে জানে অক্ষয় স্বর্গপদ।
যথা পাই সদাই শূকর মাংস মদ ॥
সেন বলে সুধাভোগে রাখিব সতত।
কালু বলে স্বর্গকে আমার দণ্ডবত ॥
বোল শুনি বীরের বলেন বর দাতা।
কৌবির ঝাপরা হও কুলের দেবতা ॥
ডোমগণ সদাই পূজিল মদ মাসে।
কালু বলে নেহাল করিলে নিজ দাসে ॥"

আদ্যের গাজন বা ধর্ম্মের গাজন, শিবের গাজন, গম্ভীরা প্রভৃতি সকল উৎসবেই ভক্তগণ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে নৃত্য গীতাদিসহকারে শোভাযাত্রা করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে ধর্ম্মের গাজনেও তদ্রূপ হইত। উৎসপুরের সুখদত্ত "গাজন লইয়া এল ময়না নগরে" লিখিত আছে দেখিতে পাই এবং 'শিরে ধর্ম্মপাদুকা' অর্থাৎ 'সোনার খড়ম' মাথায় করিয়া আসিবার কথা আছে। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনকেও ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি মস্তকে বহন করিবার কথা অবগত হই। ইতিপূর্ব্বে তাহা লিখিত হইয়াছে এবং শৈবপ্রভাবেও এবম্বিধ অনুষ্ঠান দেখিতে পাইবেন।

গাজন ও গম্ভীরা শেষে ভক্তগণ অদ্যাপি 'ধুলাখেলা' করিয়া থাকে। পূর্ব্বে ধর্ম্মপূজায় এই ধুলোট দেখি যথা—

"সম্প্রতি সম্পূর্ণ পূজা চাঁপায়ের ঘাটে।
পণ্ডিত গোঁসাই দিল বিসর্জ্জন ঘটে॥
হরিহর দিল আসি আম্রের ধুমুল।
গাজনে সন্ন্যাসী সব উড়াইল ধুল॥
পণ্ডিত সবার ভালে দিল যজ্ঞ ফোটা।
দক্ষিণান্ত করি রাণী খোলে যোগপাটা॥"

ধর্ম্মাশোক রাজার সময়ের স্তূপ, সেই সময়ের বৌদ্ধশিষ্য ও প্রধান প্রধান বৌদ্ধরাজারও পূজা এবং বহুসংখ্যক নখ-কেশ-অস্থিবিশিষ্ট স্তূপের পূজা হইয়া থাকে। কালুবীরের পূজাও তদ্রূপ ভাবেই হইয়া থাকে। বৌদ্ধগণের বহু উৎসব আছে, সিংহলে 'বনপাঠ' উৎসব প্রচলিত আছে। সেই বনপাঠকালে মধ্যে মধ্যে বাদ্যোদ্যম হইয়া থাকে, রাত্রিকালে প্রদীপ জ্যোতিতে সেইস্থল জ্যোতিষ্মান্ হইয়া যায়। 'পরিও' উৎসব সপ্তাহকাল বর্ত্তমান থাকে। ভোটদেশে তিনটি উৎসব প্রচলিত আছে, একটি গ্রীষ্মারম্ভে, অপর একটি শরতের প্রারম্ভে এবং তৃতীয়টি শীতান্তে সম্পন্ন হয়। প্রথমটি শাক্যমুনির জন্মগ্রহণের স্মরণসূচক। এই অনুষ্ঠান সমূহ একপক্ষ ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময়ে নৃত্য, গীত, ভোজন, দীপদানাদি নানাবিধ আমোদ আহ্লাদ ব্যাপার চলিতে থাকে। আমরা ক্রমশঃই দেখিতেছি, ত্রিমুর্ত্তি স্বীকার, গুরুসন্নিধানে আত্মপাপ অঙ্গীকার, কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি ম্লেচ্ছ সকত্রকেই ধর্ম্মোপদেশ প্রদান, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও তদীয় ফলভোগ, স্ত্রীপুরুষ উভয়েই সমান অধিকার, সন্ন্যাসিনী ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, ঘণ্টা ও জপমালা ব্যবহার, দেবালয়ে দীপদান, লোবানাদি গন্ধ দ্রব্য প্রদান, ধর্ম্মসঙ্গীত গান ও নৃত্যাদি বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গ। আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের এই ধর্ম্মাচরণ ও উৎসবামোদাদি আচরণ হইতে গম্ভীরার জন্য যৎকিঞ্চিৎ উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। যদ্যপি পারগ হইয়া থাকি তাহা হইলে গম্ভীরার উৎপত্তির আদিস্থানের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি সন্দেহ নাই।

ভোটদেশে শীতান্তে একটি উৎসব হয়, সম্ভবতঃ তাহা চৈত্রোৎসবের অনুরূপ, উক্ত ভোট-বৌদ্ধ উৎসব আমাদের গম্ভীরার ন্যায় বলিতে হইবে। ভোটদেশীয় বৌদ্ধগণ নিজধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্ম মিশ্রিত করিয়া লইয়াছে বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস করেন। তাঁহারা ইন্দ্র, যম, যমান্তক (শিব), বৈশ্রবণাদির মন্ত্রপাঠ ও স্তবপাঠ দ্বারা প্রতিদিন তিনবার অর্চ্চনা করেন। 'যমান্তক' পূজা আমাদের শিবপূজাই বলিতে হইবে।

শৈবপ্রভাব।

খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে (৩২৭ পূঃ খৃঃ) গ্রীকসম্রাট্ আলেক্জাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন; মিগাস্থিনীস সিলিউকস্ নিকেটর নামক গ্রীকনরপতির দূত, মৌর্য্যরাজসভায় দূতস্বরূপ উপস্থিত হন। তিনি এদেশের ধর্ম্মভাব, আচারব্যবহারাদি দেখিয়া যান, গ্রীস দেশীয়

অনেক গ্রন্থে তাহা লিখিত আছে এবং আরও লিখিত আছে যে হিন্দুরা বেকস্ ও হর্কিউলিস নামক দুইটী দেবতার বহুপ্রকার উপাসনা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক এ দুইটি দেবতা আমাদিগের নয়, গ্রীকদের; এদেশে যে দুইটি দেবতাকে তাঁহাদের উক্ত দেবদ্বয়ের ন্যায় বোধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই উক্ত নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন। আমাদের মহাদেব গ্রাসদেশীয় বেকস্‌দেব একই বলিতে হইবে। মহাদেবের লিঙ্গপূজার ন্যায় বেকস্ দেবেরও লিঙ্গপূজা বিস্তৃতরূপে প্রচলিত ছিল। প্রকারান্তরে গ্রীকগণ মহাদেবেরই পূজা করিয়াছিলেন। গ্রীস দেশেও লিঙ্গপূজা অতিমাত্র প্রবল হইয়াছিল। অনেক নগরেই প্রত্যেক পথে বহুতর মন্দিরে লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল ও সময়ে সময়ে নানাবিধ ব্যাপার সহকারে লিঙ্গোৎসব সম্পন্ন হইত। জোস্‌ফট্ ও বুদ্ধদেবের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ বেকস্ ও মহেশ ঐ প্রকারেই গ্রাসে নামান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। "ফেলিফোরিয়া" নামে বেকস্ দেবের একটী মহোৎসব ছিল, তাহাতে প্রবৃত্ত ব্যক্তিরা মেষচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে মসী লেপন করিয়া নৃত্য করিত এবং এক একটি সুদীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ডে (বেত্রদণ্ডের ন্যায়) চর্ম্মলিঙ্গ বন্ধন করিয়া পথে পথে লইয়া যাইত। তাহারা এইরূপ স্তব করিত যে "হে বেকস্! আমরা তোমার গুণকীর্ত্তন করি, হে উল্লাসের আশ্রয়! তোমার গুণকীর্ত্তন সতী স্ত্রীলোকের শ্রবণীয় নয়।" বেকস্‌ভক্তগণ বেকস্ মন্দিরের সম্মুখে যে তাণ্ডব নৃত্য ও গীতাদির আচরণ করিত তাহাও বুঝিতে পারি। এই বেকস্‌দেবের পুত্র প্রায়েপস্ নামক দেবতার বিষয়ে এই প্রকরণ সম্বন্ধীয় যে সমুদায় কুৎসিত বৃত্তান্ত লিখিত আছে, তাহা স্মরণ করিলেও লজ্জা উপস্থিত হয়। তাঁহার প্রধান প্রধান মহোৎসব কেবল স্ত্রীলোক কর্ত্তৃকই সম্পাদিত হইত। তাহারা গর্দ্দভ বলিদান ও মদ্যাদি বিবিধ উপচারে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া নৃত্য গীতবাদ্যাদি দ্বারা তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিত।

এথিনিয়স্ নামক একজন গ্রীক গ্রন্থকার লেখেন, গ্রীকেরা বেকস্ দেবের মহোৎসব-বিশেষে একশত বিংশতি হস্ত দীর্ঘ একটি স্বর্ণময় লিঙ্গমূর্ত্তি বহন করিয়া লইয়া যাইত। আমরা বিবেচনা করি এই বেকস্-দেবের 'ফেলিফোরিয়া' উৎসব আমাদের চড়কপূজা বা শৈবচৈত্রোৎসবের অনুরূপ। এদেশে শিবের গাজনে (শান্তিপুরে শিবের বিবাহে) মালদহের গম্ভীরায় ভক্তগণ এবং সাধারণ জনগণ গাত্রে ধূলি, কর্দ্দম, মসীচূর্ণ প্রভৃতি লেপন করিয়া গ্রামের মধ্যে নানাবিধ কুৎসিৎ ব্যবহার করে। গ্রীকগণ সুদীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড লইয়া যে তাণ্ডব নৃত্য করিত, আমাদের দেশে বেত্রদণ্ড লইয়া তদ্রূপ নৃত্যের ব্যবস্থা দেখা যায়। গীত বাদ্য ও নৃত্যাদির বিবরণ উভয় স্থলেই সমান। শিবের গাজনে বিশেষ বিবরণ অবগত হইবেন।

পূর্ব্বকালে লিঙ্গউপাসনা কেবল ভারতবর্ষ মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। প্রায় অষ্টাদশ শতক্রোশ পশ্চিমে মিশরদেশে "আসীরিস্" নামক প্রধান দেবের লিঙ্গপূজা বাহুল্যরূপে প্রচলিত ছিল। এই আসীরিস্ ও তদীয় ভার্য্যা 'আইসীস্' দেবীর সহিত শিব ও শক্তির বিবিধ বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। ভগবতী যেমন বিশ্বরূপা, আইসীস্ দেবীও সেইরূপ পৃথিবীরূপা। তন্ত্রোক্ত শক্তি যন্ত্র যেমন ত্রিকোণাকৃতি সেইরূপ ত্রিকোণ-যন্ত্র আইসস্ দেবীরও পরিচায়ক ছিল। শিব যেমন

সংহারকর্ত্তা আসীরিস্ সেইরূপ প্রাণসংহারক যমস্বরূপ। শিবের বাহন বৃষ যেমন পূজনীয় আসীরিস্ দেবের 'এপিস্' নামক বৃষও তাঁহার অংশ স্বরূপ বলিয়া পূজিত হইত। এইরূপ একটি উপাখ্যান আছে যে, বেকস্ দেব ভারতবর্ষ হইতে দুইটী বৃষকে মিশর দেশে লইয়া যান, তাহারই একটির নাম 'এপিস'। শিব ও অসীরিস্ উভয় দেবতারই শিরোভূষণ সর্প। শিবের হস্তে যেমন ত্রিশূল, অসীরিস্ দেবের হস্তে সেইরূপ একটি দণ্ড দেখা যায়। মিশরে অসীরিস্ দেবের অনেক পাষাণময় মূর্ত্তির সহিত শিবপরিধেয় ব্যাঘ্রচর্ম্মের প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। উইলকিন্স কৃত প্রাচীন মিশরের ইতিহাস সহকৃত চিত্রগ্রন্থের তেত্রিশ সংখ্যক চিত্রফলকে অসীরিস্ দেবের চর্ম্মপরিধানবিশিষ্ট চিত্রময় প্রতিরূপ বিদ্যমান আছে। তাঁহার একটী প্রিয় বৃক্ষ ছিল, তাহার পত্র শিব-প্রিয় বিল্বপত্রের মত ত্রিভাগে বিভক্ত। কাশীধাম যেমন মহাদেবের প্রধান স্থান 'মেম্ফিস্' নগর সেইরূপ অসীরিস্ দেবের সর্ব্বোপরি মাহাত্ম্যভূমি বলিয়া পরিগণিত ছিল। দুগ্ধ দিয়া যেমন শিবের অভিষেক করা হয়, ফিলিদ্বীপে অসীরিস দেবের পীঠস্থানে সেইরূপ প্রতিদিন ৩৬০ পাত্র দুগ্ধ অর্পণ করা হইত। মহাদেবের সহিত অসীরিস্ দেবের বিভিন্নতা এই যে, শিব শ্বেতবর্ণ, অসীরিস কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু মহাকালও কৃষ্ণবর্ণ—

"মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকম্।
বিভ্রতং দণ্ডখট্টাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুম্॥" (তন্ত্রসার)

অর্থাৎ দেবীর দক্ষিণ ভাগে ধূম্রবর্ণ, বিকট দর্শন, ভীষণবদন, দণ্ড ও খট্টাঙ্গধারী শিশু মহাকালের পূজা করিবে। ভারতবর্ষের শিব লিঙ্গপূজার ন্যায় মিশরদেশে অসীরিস্দেবের লিঙ্গপূজা অত্যন্ত প্রবল ছিল। বান্স কেনেডি এদেশীয় শিব-লিঙ্গ উপাসনার সহিত মিশর দেশীয় লিঙ্গ পূজার দুইটি বিষয়ে বিভিন্নতা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, মিশর দেশের ন্যায় ভারতবর্ষে লিঙ্গ মূর্ত্তির গ্রাম-যাত্রা বা নগরযাত্রা প্রচলিত নাই। তাঁহার একথাটী নিতান্ত অমূলক। বাঙ্গালাদেশে চৈত্র-উৎসবের সময় সন্ন্যাসীরা সমারোহপূর্ব্বক জলাশয় হইতে শিব-লিঙ্গকে পূজার স্থলে আনয়ন করে, পরে মস্তকে করিয়া গ্রামস্থ লোকের গৃহে বা শিবালয়ে লইয়া যায় ও তথায় স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনাদি করিয়া থাকে।* এই প্রকার উৎসব আমরা শ্রীহর্ষদেবের বুদ্ধোৎসবেও দেখিতে পাই এবং শিব-লিঙ্গের গ্রামযাত্রাবিষয়ক বিবরণ 'শিবসংহিতা'র শিবপূজা প্রকরণে বিবৃত দেখি। আমরা বিশ্বাস করি অসীরিস্ উৎসব ভারত হইতে মিশরে গমন করিয়াছে। ভারতের বৃষসহ শিবোৎসবও মিশরে প্রেরিত হইয়াছিল। "কাছাছোলহাম্বিয়া" নামক মুসলমানি কেতাবে দেখিতে পাই, ইব্লিছ সয়তান ভারত (হিন্দুস্থান্) হইতে তিনটী 'বোত' (দেবমূর্ত্তি) লইয়া গিয়া মিশর আরবাদি দেশে তাঁহার পূজার প্রথা প্রবর্ত্তন করে। এক সময়ে ঐ মূর্ত্তিপূজা বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। সেই বোতের বৎসরে দুইবার শোভা-যাত্রা ও পূজা হইত, নগরবাসিগণ প্রান্তরে সুবৃহৎ মণ্ডপে ক্ষুদ্র বৃহৎ বোতের পূজা করিত এবং নৃত্যগীতাদি বাদ্যোদ্যম হইত। এই উৎসব 'ইদ' বলিয়া লিখিত আছে।

* বিশ্বকোষ ১৭শ ভাগ 'লিঙ্গ' শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

সম্ভবতঃ হিন্দুস্থান্ হইতে আনীত শিবমূর্ত্তি তথায় অসীরিসাদি নামান্তর প্রাপ্তি সহকারে পূজিত হইত।

পূর্ব্বতন অসুরা অর্থাৎ এসীরিয়া এবং বাবিরুস্ অর্থাৎ বেবিলন দেশীয় লোক তিন শত হস্ত দীর্ঘ লিঙ্গ-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা করিত। বেবিলন দেশে যে সমস্ত পিত্তল রচিত পুরাতন লিঙ্গ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা ভারতবর্ষীয় শিবলিঙ্গ মূর্ত্তির অবিকল প্রতিরূপ। রোমক জাতীয়দের মধ্যেও এই উৎসব প্রচলিত ছিল।

হিউ-এন্-সঙ্গের বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি কাশীধামে সুন্দর সুন্দর কুড়িটি মন্দির ও একটি সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন শিবমূর্ত্তি দর্শন করেন। ঐ মূর্ত্তিটি পিত্তলময় ও ন্যূনাধিক ছয়ষট্টিহাত দীর্ঘ, ঐ শিবমূর্ত্তি দেখিতে অতীব গাম্ভীর্য্য-শালী এবং দেখিলে জীবিত বোধ হইয়া যুগপৎ ভয় ও ভক্তি উপস্থিত হয়।

আমেরিকা খণ্ডের অন্তঃপাতী পিরুবিয়া দেশে প্রচলিত 'রামসীতোয়া" নামক মহোৎসব ও ঐ দেশীয় নৃপতিগণের সূর্য্যবংশ হইতে উৎপত্তির প্রবাদ; ঐ খণ্ডের মধ্যস্থলবাসী কতকগুলি জাতির ভাষায় ঈশ্বরের নাম সিবু; ফ্রিজিয়াদেশীয়দের একটী উপাস্য দেবতার নাম সেব বা সেবাজিয়স; ঐ দেবোপাসকদের দীক্ষাকালে সর্পঘটিতব্যাপারবিষয়ক প্রথা; মিশর দেশীয়দের একটী দেবতার নাম সেব্, সেবরা বা সোবক; এই সমুদায় প্রস্তাব দ্বারা আমরা কি বুঝিতে পারি? হিন্দুধর্ম্মের প্রচার একদিন ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছিল কি বুঝিতেছি না?

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সেতুবন্ধ, পশ্চিমে হিঙ্গলাজ ও পূর্ব্বদিকে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত বিভূতি ও রুদ্রাক্ষ বিভূষিত বিশাল শৈবধর্ম্ম অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। যদিও ভারতে খৃষ্টজন্মের বহুপূর্ব্বে এবং বুদ্ধজন্মের বহুপূর্ব্বে শিব-ধর্ম্ম ও পূজা উৎসবাদির বিবরণ দেখিতে পাই, তত্রাচ ভগবান্ শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য হইতেই শিবপূজা ও শৈবমতবাদ প্রচারের ইতিহাস সংক্ষেপে প্রদান করিব। খৃষ্টাব্দের অষ্টমশতাব্দীর শেষে অথবা নবমশতাব্দীর প্রথমভাগে মলয়দেশের নম্বরি নামক ব্রাহ্মণকুলে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টমবর্ষে উপনয়ন হইলে পর তিনি বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। যথাকালে তিনি ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে ভারতের নানাদেশ পরিভ্রমণ করেন। বিপক্ষগণের মতবাদ খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত প্রচার করেন এবং বেদান্তশাস্ত্রের প্রচার ও তত্ত্বজ্ঞান প্রচলনের উদ্দেশে এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ধ্বংসবাসনায় শৃঙ্গগিরিতে শৃঙ্গগিরিমঠ, দ্বারকায় সারদামঠ, শ্রীক্ষেত্রে গোবর্দ্ধনমঠ ও বদরিকাশ্রমে জ্যোষিমঠ সংস্থাপন করেন। যেখানে যেখানে বৌদ্ধমতের প্রাদুর্ভাব ছিল, তিনি সেই সেই স্থলেই মঠ স্থাপন করিয়া আপন নবমতের প্রচলন করেন। তিনি আত্মজ্ঞানে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শিবাদির উপাসনা প্রচারে উদ্যত ছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যেরা তদীয় আদেশানুসারে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া ও তত্রস্থ পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিয়া শিবাদি সাকার দেবতার উপাসনা প্রচার করেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের

শিষ্য পরমত কালনিল অশেষরূপে দিগ্বিজয় করিয়া সেই সেই দেশের অনেক লোকক্কে পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের উপদেশ দ্বারা শৈবমতাবলম্বী করিতে থাকেন। ত্রিপুরকুমার দ্বারা শাক্তমত ও বটুকনাথ দ্বারা ভৈরব উপাসনা প্রচারিত হয়। শঙ্করাচার্য্য কাঞ্চী, কর্ণাট, কাশী, কামরূপ প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে কাশ্মীররাজ্যে গমন করেন এবং তথায় প্রতিপক্ষদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া সরস্বতীপীঠে অধিষ্ঠিত হন। তথা হইতে বদরিকাশ্রমে চলিয়া যান ও অবশেষে কেদারনাথে গিয়া বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে প্রাণত্যাগ করেন।

বৌদ্ধগণের সহিত শঙ্করশিষ্যগণের ঘোর যুদ্ধ হইত, তাহাও অবগত হওয়া যায়। শঙ্করশিষ্যগণের বেদান্তানুমত তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলনই ইহাদের আদিধর্ম্ম হইলেও হইতে পারে, কিন্তু পরে ইহাঁরা তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শৈবমতানুবর্ত্তী বহু শাখা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে নাগাসন্ন্যাসীরা বড়ই ভীষণ, তাহারা গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াও প্রকৃত যোদ্ধা। ইহারা বিভূতির উপাসক। বিভূতি রাশিকে একত্র করিয়া জমাইয়া রাখে এবং গিরিমৃত্তিকায় চিত্রিত ও চন্দনাদি দ্বারা বিলেপিত করিয়া থাকে। হরিদ্বারে একবার নাগারা বৈষ্ণবগণের সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তির প্রাণবধ করে।

অঘোরীরা মদ্যমাংস ও তান্ত্রিক সাধনে নরহত্যা পর্য্যন্ত করিত। অঘোরীরা শবকঙ্কাল লইয়া আরাধনা করে। ঊর্দ্ধবাহু, আকাশমুখী দেখি। আকাশমুখীর বিবরণ পাঠকগণের জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কোন কোন সন্ন্যাসী ঊর্দ্ধপদ ও নিম্নমস্তক হইয়া তপস্যা করেন। ইহাঁরা ঊর্দ্ধদিকে বৃক্ষ-শাখাদি কোন বস্তুতে পা দুটি বন্ধনপূর্ব্বক অধোমস্তক হইয়া ঝুলিতে থাকেন এবং মস্তকের নিম্নদেশে অগ্নি স্থাপন করিয়া রাখেন। ধর্ম্মের গাজনে ঘনরামের পুঁথিতে তাহার নিদর্শন পাই, যথা—

"উপরে যুগলপদে অধ লোটে শির।
ধুনা অগ্নিকার করে বদনে রুধির ॥"

ঊর্দ্ধবাহু যথা— "বেতহাতে নাচে গায় ডাকে ধর্ম্মজয়।
ঊর্দ্ধবাহু করে কেহ একপায় রয় ॥"

শিবের গাজনে, ধর্ম্মের পূজায় এবং আদ্যের গম্ভীরা উৎসবেও এই প্রকারের অনুষ্ঠান দেখি। গুদড়, রুখড় ও সুখড় নামক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গণ পাত্রবিশেষে ধূপ জ্বালাইয়া ভিক্ষা করে। গুদড়েরা ধুনুচীতে এবং রুখড় ও সুখড়েরা খর্পরে ধুনা জ্বালায়। শিবের গাজনে, ধর্ম্মের গাজনে ও গম্ভীরায় 'ধুনাপুড়ান' প্রথা ঐ প্রকার। 'ঠিকরনাথ' সম্প্রদায়গণ ললাটে মসী ও সিন্দুর লেপনপূর্ব্বক ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভিক্ষায় যায়। হস্তস্থিত মৃৎপাত্রে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে ঘৃতাদি দাহ্যপদার্থ অর্পণ করে, লৌহশলাকা উত্তপ্ত করিয়া গাত্রে আঘাত করে।

ব্রহ্মচারিসম্প্রদায় মধ্যে বিস্তর কঠোর তপস্যা অবলম্বনের কথা অবগত হওয়া যায়। এই প্রকারের কঠোর আচরণে মনকে দৃঢ় করিয়া শিব ধর্ম্মাদির আরাধনায় তাঁহাদের প্রসাদলাভধারণা যে সম্প্রদায়ের মধ্যে বলবতী, তাহাদিগকে ধর্ম্মের গাজন, শিবের গাজন ইত্যাদির প্রবর্ত্তক বলিয়াই বিবেচনা হয়। ধর্ম্মের গাজনের শালেভরের ন্যায় বহুকণ্টকাকীর্ণ বা কঙ্করময় শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবার প্রথা ব্রহ্মচারী মধ্যেও দৃষ্ট হয়। ভক্তের যন্ত্রণাকর লৌহকণ্টকাকীর্ণ শয্যায় শয়নে ভক্তবৎসলের করুণায় শীঘ্র সঞ্চার হইবার আশায় এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। ধর্ম্মের গাজনে রঞ্জাবতীকে যেমন শালেভর দিতে দেখি, তদ্রূপ আসিয়াটিক রিসার্চ নামক পুস্তকাবলীর পঞ্চম খণ্ডে পরমস্বতন্ত্র-প্রকাশানন্দ ব্রহ্মচারী নামে একটি ব্রহ্মচারীর বৃত্তান্ত ও চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকটিত আছে। তিনি কঙ্করময় ও কণ্টকাকীর্ণ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতেন।

এক্ষণে বঙ্গের কতিপয় রাজন্যগণের সংক্ষিপ্ত রাজ্যকাল ও ধর্ম্মভাবের বিবরণ বিবৃত করিয়া বৌদ্ধপ্রভাবের হীনতা ও শৈবপ্রভাবের ক্রমোৎকর্ষের পরিচয়সহ গম্ভীরার প্রাচীনত্বের ইতিহাস প্রদান করিব।

সেনরাজগণের সময়ে বঙ্গে শৈবধর্ম্ম ও তান্ত্রিকতার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়, কিন্তু তাঁহাদের বহু পূর্ব্বে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার মধ্য দিয়া ধীরপদবিক্ষেপে হিন্দু-তান্ত্রিকতা আত্ম-বিস্তারলাভ করিতেছিল। সেনরাজগণের কিছু পূর্ব্বে বিক্রমশিলার আচার্য্যদীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে দেখিতে পাই, তিনি নয়পালের গুরু ছিলেন। শ্রীজ্ঞান নয়পালকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। নয়পাল খৃঃ ১০৩০ হইতে ১০৫৪ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। শ্রীজ্ঞান একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন, তাঁহার প্রভাবে মগধে এবং গৌড়ে সর্ব্বত্র তান্ত্রিক-মত প্রচলিত হয়, কিন্তু আমরা শ্রীজ্ঞানকে বৌদ্ধতান্ত্রিক বলিয়া অনুমান করিলেও অধিকাংশ হিন্দুতান্ত্রিকতা তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল তাহাও নিশ্চয়। এই সময়ে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার শেষকাল এবং শৈবধর্ম্মানুরাগী হিন্দুতান্ত্রিকতার নব-অনুরাগকাল ধরিলে আমরা বৌদ্ধ ও শৈব মিশ্রধর্ম্মে তান্ত্রিক দেবদেবীর পূজা এবং তান্ত্রিকধর্ম্মান্তর্গত আচার-ব্যবহার নৃত্যগীতাদির যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছিল, তাহা কল্পনা করিতে পারি। চামুণ্ডা, বাসুলী, কালী প্রভৃতির পূজক ও ভক্তগণকেও বৌদ্ধ ও শিবমন্দিরে পূজা ও উৎসবামোদে লিপ্ত দেখিতে পাই। এই সময়েই ত্রিষষ্ঠীগড়াধিপতি কর্ণসেনকে ইছাই ঘোষ যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বিতাড়িত করিয়া দেয়। ইছাই বাসুলীর বরে দিনে দিনে বাড়িয়াছিল।

ধর্ম্মপূজক লাউসেন ভগবতীর বরপুত্র ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী কানাড়া যখন গৌড়পতি ধর্ম্মপালের সহিত যুদ্ধ করেন, তখন বাসুলী-উদ্দেশে বলিয়াছিলেন—

> "মনের হরিষে আজি পূজিব বাসুলি।
> নবলক্ষ বিপক্ষ সম্মুখে দিব বলি॥"

লাউসেন (অনুমান ১০০০—১০৫০খৃঃ,) রাঢ়দেশে রাজ্য করিতেন, দক্ষিণময়নাড়

তাঁহার রাজধানী ছিল, তিনি একজন ঘোর বৌদ্ধতান্ত্রিক ছিলেন, কিন্তু তিনি রঙ্কিণীকালী এবং লোকেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন। গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালকে তিনিই ধর্ম্মপূজায় ব্রতী করেন।

"ধর্ম্মপূজা কর রাজা ধরণীমণ্ডলে।
আদরে আমার বর পাবে করতলে ॥"

লাউসেনের সময়ে রাঢ়দেশে ধর্ম্মের গাজন এবং তদনুরূপ শিবের গাজনেরও অনুষ্ঠান প্রচলিত হয়। ধর্ম্মপালের ভ্রাতৃবধূ মাণিকচন্দ্রের মহিষী হাড়িপা বা হাড়িসিদ্ধার নিকট বৌদ্ধতান্ত্রিকধর্ম্মে দীক্ষিতা হন। তৎকালে ধর্ম্মপূজার বিশেষ প্রচলন হইয়াছিল। যোগীপাল, মহীপাল গীতাদিদ্বারা বৌদ্ধতান্ত্রিকতাবিশিষ্ট ধর্ম্মের পূজাসম্বন্ধীয় বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম্মপালের শিষ্য কালবিরূপ, রামপালের রাজত্বসময়ে ত্রিপুরায় গমন করিয়া ত্রিপুররাজকে তান্ত্রিকবৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। রামপালের সময়ে গৌড়ের সর্ব্বত্র তান্ত্রিকগণের প্রভাব অক্ষুন্ন ছিল। রামপাল ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। তাঁহার পুত্র এক রমণীর প্রতি অত্যাচার করায় তিনি সেই পুত্রকে শূলে দিয়াছিলেন। সেই সময়ে শিবশক্তি এবং বুদ্ধ ও বৌদ্ধ-শক্তির সমান মান্য ও পূজাদি এবং শোভাযাত্রা ও রমাই পণ্ডিতের মতে আদ্যের গাজনও হইত। সেই ধর্ম্মের গাজনের অনুরূপ উৎসবামোদাদি শৈবসম্প্রদায় মধ্যেও অনুষ্ঠিত হইত, গৌড়প্রদেশে শ্রীধর্ম্ম ও শিব একত্র পূজিত হইতেন; উভয় উৎসবই এক সময়ে ও একই প্রথামত অনুষ্ঠিত হইত। লাউসেন-প্রবর্ত্তিত শ্রীধর্ম্ম ও শিবের গাজন যেমন রাঢ়দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তদ্রূপ কালবিরূপ, রমাই পণ্ডিত, গোবিন্দচন্দ্র, রামপাল, যোগীপাল, মহীপাল প্রভৃতি ধর্ম্মপূজকগণ দ্বারা রঙ্গপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী প্রভৃতি গৌড়মণ্ডলে শিব ও শ্রীধর্ম্মপূজা প্রচলিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১১১০ হইতে ১১১২ অব্দের মধ্যে বিজয়সেনকে গৌড়সিংহাসনে দেখিতে পাই। তিনি শৈব ছিলেন, তাঁহার উপাধি 'বৃষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর'। তিনিই বর্ত্তমান রাজসাহীর অন্তর্গত দেপাড়ার প্রদ্যুম্নেশ্বর শিব স্থাপন করেন, সম্ভবতঃ তাঁহার সময়েই, শিবোৎসব প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। এই সময়ে বৌদ্ধ পালনরপতিগণ বহুলাংশে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তান্ত্রিকতা তাঁহাদের ধর্ম্মকে বিপর্য্যয় করিয়া তুলিয়াছিল। আমরা মদনপাল দেবকে ১১১৯-১১৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত দেখিতে পাই, তিনি বটেশ্বর স্বামীর নিকট মহাভারত শ্রবণ করিয়া অতীব সন্তোষ লাভ করিয়া থাকিবেন, এবং তদ্বর্ণিত বাণোপাখ্যান শ্রবণ করিয়া শিব প্রতি ভক্তি ও শিবারাধনায় তান্ত্রিক পদ্ধতিও অবগত হইয়া রমাইপণ্ডিত-প্রতিষ্ঠিত তান্ত্রিকতামূলক শ্রীধর্ম্মোৎসবানুষ্ঠানের অনুরূপ বাণোৎসবের সদৃশ শিবোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকিবেন, ইহাও ধারণা হইতেছে।

রাধানগর হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি হইতে যে 'শিববন্দনা' প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে দেখিতে পাইতেছি 'কাঁউসেন দত্ত পুত্র নয়সেন দত্ত' শিবের ব্রত পৃথিবীতে

প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলেও দেখি কর্ণসেনপুত্র লাউসেন শ্রীধর্ম্মপূজা প্রচলন করেন। ইত্যাদি কারণে অনুমান করা যায়, শ্রীধর্ম্মোৎসব হইতেই শিবোৎসব প্রচলিত হইয়াছে এবং কাউসেনই কর্ণসেন এবং নয়সেনই লাউসেন। অতএব আমরা শ্রীধর্ম্মোৎসবানুরূপ শিবোৎসব গৌড়মণ্ডলে মদনপালাদির সময়েও অনুষ্ঠিত হইত অনুমান করি। তৎপরে শৈব সেনবংশের প্রতাপকালে শ্রীধর্ম্মোৎসবমিশ্রিত তান্ত্রিক শৈবোৎসবের উৎকর্ষ এবং পৌরাণিক ভিত্তিবিশিষ্ট হইতে দেখিতে পাই। ক্রমশঃ তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইবে। এই সেনবংশের রাজত্বকালে শিবের চৈত্রোৎসব এবং মালদহে গম্ভীরার পৌরাণিক ভিত্তি বিশিষ্ট উৎসবামোদের ইতিহাস দেখিতে পাই। এই সময়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিকভাব শৈবতান্ত্রিকতায় পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমান মালদহান্তর্গত কাগচচিরা গ্রামের সন্নিকটে চৌদ্বার, যেখানে প্রাচীনকালে নগরদ্বার বা দুর্গদ্বার ছিল, তাহার অনতি সন্নিকটে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল; এই গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানের উত্তরাংশে 'সম্বরপুর' বলিয়া একটী প্রাচীন স্থান বর্ত্তমান রহিয়াছে, তথায় সম্বরবাসিনী দেবীর স্থান বর্ত্তমান। এই সম্বরপুরে বৌদ্ধ তান্ত্রিক মদনপালদেবের রাজধানী ছিল। ভাগীরথী সম্বরপুর গ্রাস করিয়াছিলেন। বল্লালসেন এই সম্বরপুর ও নগরদ্বার (নাগরাই)-অধিপতিকে পরাজয় করিয়াছিলেন। গৌড় সন্নিকটে যে বৌদ্ধ রাজা ছিলেন, বল্লাল কর্ত্তৃক বিতাড়িত হওয়াতে গৌড়দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। তৎকালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের দক্ষিণাংশে কালিন্দী ও মহানন্দার সঙ্গমস্থলের দক্ষিণে পেশল নগরী ও গঙ্গারামপুর বলিয়া বিখ্যাত যে সমৃদ্ধিশালী নগরদ্বয় বর্ত্তমান ছিল, এক্ষণে তাহা পিছলী ও গঙ্গারামপুর কাঠাল নামে খ্যাত আছে, জঙ্গলাবৃত ভূভাগ বর্ত্তমান রহিয়াছে, এই স্থান আদিশূরের গৌড়নগরী বলিয়া খ্যাত আছে। ঐতিহাসিকেরাও ইহা স্বীকার করেন যে ইহা আদি গৌড় বা বৌদ্ধগৌড় নামেও বিজ্ঞসমাজে খ্যাত ছিল। আমি গৌড় পর্য্যটনকালে উক্ত কাঠালের মধ্যে মানবপ্রমাণ বৌদ্ধমূর্ত্তি পতিত থাকিতে দেখিয়াছি, এবং প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট নগরের জলন্ত দৃষ্টান্ত অদ্যাপি তথায় বর্ত্তমান রহিয়াছে।

'সময়প্রকাশ' নামক পুস্তক পাঠে জানা যায়, যে বল্লালসেন দেব কর্ত্তৃক ১০৯১ শকে অর্থাৎ ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে 'দানসাগর' রচিত হয়। অতএব তাহার পূর্ব্বেও তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। রাজা বল্লালকে আমরা বৌদ্ধতান্ত্রিকতার প্রশ্রয়দাতা বলিয়া বিবেচনা করিবার বিলক্ষণ হেতু দেখিতে পাই। সিংহগিরি তাঁহার বৌদ্ধতান্ত্রিক গুরু। তিনি বৌদ্ধমঠের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য ছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সে বল্লালকে অনিরুদ্ধ ভট্ট নামক বৈদিক ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে দেখিতে পাই। প্রথমে মহারাজ বৌদ্ধমতের পোষকতা করিতেন, শেষে তাঁহাকে শৈব ও অন্তে বিষ্ণুভক্ত হইতেও দেখা যায়। তাঁহার রাজত্বের প্রথমভাগে বৌদ্ধধর্ম্মের ও তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের প্রাদুর্ভাব ও তৎসঙ্গে

সঙ্গেই বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মভাবের অভ্যুদয় হইতে থাকে, এই সময় হইতেই বৌদ্ধউৎসব ও শৈব উৎসবের সম্পূর্ণ পার্থক্য সাধিত হইতে আরম্ভ হয়।

যে কারণে বল্লালকে বাধ্য হইয়া বৌদ্ধগুরু সিংহগিরিকে ত্যাগ করিতে হয় এবং অনিরুদ্ধ ভট্টের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হয়, সেই কারণেই বৌদ্ধ ও শৈব উৎসবাদির বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। শৈব প্রজাগণের বিদ্রোহই এই ধর্ম্মবিপর্য্যয়ের হেতু হইয়াছিল। স্থানান্তরে এ বিষয়ে আমি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। বল্লালের সময়ে গৌড়-নগরে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখনও চামুণ্ডা মন্দির, পাটলাচণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবী দৃষ্ট হয়।

অনিরুদ্ধ ভট্ট তেজস্বী ও শাস্ত্রজ্ঞ সত্যবাদী পুরুষ ছিলেন, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের একান্ত বিরুদ্ধবাদী ও শত্রু ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার সময়েই বৌদ্ধতান্ত্রিকতামূলক পূজাপদ্ধতি অপসারিত করিবার মানসে শিবোৎসবে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ভাবের সমাবেশ সাধিত হয়। এই সময় হইতেই শিবপারিষদ ও তান্ত্রিক শিবশক্তির নৃত্যাদির আরম্ভ হইয়া থাকিবে। শ্রীধর্ম্মপূজার যত প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, সেই সমুদায় ক্রিয়াকলাপ জন-সমাজে বদ্ধমূল থাকাতে, তদনুরূপ ক্রিয়াকাণ্ডবিশিষ্ট শিবপূজায় চৈত্রোৎসবের প্রচলন এবং বাণ উপাখ্যানাদির উপাখ্যানাংশ অবলম্বনে সাধারণের হৃদয়ে শিব-ধর্ম্ম ভাবের বীজ নিহিত করিয়া ছিলেন। এই সময়ে বা কিয়দ্দিবস পরে উক্ত শিবোৎসব "গম্ভীরা" উৎসব নামে প্রচলিত হয়।

শিবপুরাণোক্ত শিব নামের তালিকা দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে—

"নৃত্যপ্রিয়ো নিত্যনিত্তঃ প্রকাশাত্মা প্রকাশকঃ।"

নিত্যপ্রিয় বলিয়াই শিব সকাশে নৃত্য করিবার কারণ অনুমিত হইতেছে এবং

"যুগাদিকৃদ্ যুগাবর্ত্তো গম্ভীরো বৃষবাহনঃ॥"

উক্ত প্রমাণানুসারে বৃষভবাহন গম্ভীর শিবের পূজাই 'গম্ভীর'পূজা অর্থাৎ গম্ভীরোৎসব বলিয়া সাধারণে খ্যাত হইয়া থাকিবে।

বল্লালসেনপুত্র মদনশঙ্কর লক্ষ্মণসেন দেব পরম শৈব ছিলেন, তাঁহার সময়ে শিবপূজা ও শৈবগণের প্রতাপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে শিবপূজা অর্থাৎ চৈত্রোৎসব হইতে বৌদ্ধভাব একেবারে বিতাড়িত হওয়াই সম্ভব। কিন্তু যে প্রথা সাধারণের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার মূলোৎপাটন একেবারে অসাধ্য ব্যাপার। এই কারণে শিবোৎসবের অভিনব নিয়মাবলী সহ পৌরাণিক কথার সামঞ্জস্য বর্ত্তমান রাখিয়া নূতন মত ও প্রথা প্রচলিত হয়। যে উদ্দেশ্যে হলায়ুধ রাজাদেশে 'মৎস্যসূক্ত' রচনা করেন,* সেই উদ্দেশ্যেই বৌদ্ধভাব হইতে পৌরাণিক ভাবে শিবারাধনার প্রচলন হয়। তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন

* বিশ্বকোষ ১৭শ ভাগ ৪২৪ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

করিয়াও যেমন লক্ষ্মণসেন বৈদিক বা পৌরাণিক ধর্ম্মপ্রচার বিস্তীর্ণভাবে করিতে না পারিয়া 'মৎস্যসূক্ত' প্রণয়ন করান, তদ্রূপ বৌদ্ধ তান্ত্রিকাচারপূর্ণ শৈবোৎসবকে পৌরাণিক ভাব ও পদ্ধতিপূর্ণ করিবার জন্যও চেষ্টা করেন।

এই সময়ে উৎকলে বিন্দুসরোবরতীরে এবং শ্রীক্ষেত্রে শিবোপাসনা প্রচার বিস্তীর্ণভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উড়িষ্যার সমুদায় অধিবাসী প্রায় শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন, সহস্র সহস্র শিবমঠ প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। সম্ভবতঃ সেই শিবধর্ম্মপ্রচারক্ষেত্র হইতেই গৌড়নগরে শিবমঠনির্ম্মাণের সূত্রপাত হইয়া থাকিবে। যদিও বহুপূর্ব্ব হইতে শিবমন্দির নির্ম্মিত হইত, কিন্তু তাহা বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিল। এই বৌদ্ধপ্রথামত শিবমন্দির-নির্ম্মাণ-প্রথার উচ্ছেদ সাধন-মানসে উৎকল দেশস্থ শিবমন্দিরের প্রথা মত এতদ্দেশে শিবমন্দির-নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়া থাকিবে। উৎকলে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভিতরগৃহের নাম 'গম্ভীরি' এবং শিবমন্দির মধ্যস্থ দেহারা অর্থাৎ ভিতর গৃহে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে শিবলিঙ্গ অবস্থান করেন বলিয়া শিবালয়ের নাম 'গম্ভীরা'। এদেশেও গম্ভীরা গৃহ ঐ প্রকারের দুইটী গৃহবিশিষ্ট এবং ভিতরগৃহে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। উৎকল ভাষায় পূজাপদ্ধতি পুস্তকে শিবের বন্দনায় গম্ভীরা অর্থে শিবালয় দৃষ্ট হয়। পাঠক মহোদয়গণের দর্শনার্থ উক্ত বন্দনাটি লিখিত হইল—

"মহাদেবঙ্ক বন্দনা"।

"কৈলাসবাসীঙ্ক পাদে করিলি বন্দন।
কৈলাস ত্যজি এঠারে হোএ প্রসন্ন॥
খট্টাঙ্গধর পুরুষ কামদেব রিপু।
ক্ষণমাত্রে সাহাহুঅ ফেড় মো সন্তাপু॥
গৌরীঙ্ক প্রাণনাথ যোগীঙ্ক ঈশ্বর।
গঙ্গাকু বহিছ শিরে নাম গঙ্গাধর॥
ঘোর গম্ভীর তে ঘন ঘন ঘণ্টাবাজে।
ঘটঙ্ক কপোল প্রভু অর্দ্ধচন্দ্র সাজে॥
* * * *
ঠিয়াহৈ কবিকর্ণ করন্তি জনান।
ঠিকে মহাদেব পদে পশিলি শরণ॥"

এই বন্দনা মধ্যে দেখিতে পাই "ঘোর গম্ভীরতে ঘন ঘন ঘণ্টাবাজে।" অতএব ঘোর গম্ভীরই শিবমন্দির। অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ভিতরগৃহে শিবাধিষ্ঠান স্থান এবং উক্ত প্রকার মন্দিরই 'গম্ভীর' অর্থাৎ শিবালয়। লক্ষ্মণসেনের সময় যেমন শৈবধর্ম্ম গৌড়দেশে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সঙ্গে গম্ভীর শিবপূজা গম্ভীর মধ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়া বৌদ্ধভাববর্জ্জিত গম্ভীরা-মণ্ডপ নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে। শিবপূজাদিতে পদ্মপুষ্প বিশেষ প্রকারে

ব্যবহৃত হইত, পদ্মমালা বিভূষিত শিব, পঙ্কজ শোভিত শিবালয়ে শোভিত হইতেন বলিয়া, পঙ্কজম্ অর্থাৎ গম্ভীরম্ একার্থবোধক দৃষ্টে 'গম্ভীর' নাম প্রাপ্তির অন্যতম হেতু।

লক্ষ্মণসেন দেবের সময় রাজঅনুকরণে বৌদ্ধ উৎসব ও নৃত্যগীতাদির সহিত পৃথক্ ভাব দেখাইবার জন্য 'গম্ভীর' সন্নিকটে পঙ্কজমণ্ডিত গম্ভীর মধ্যে চামুণ্ডা, কালী, বাসুলী, মশানকালী, প্রমথগণাদির শিবানন্দপ্রদ তাণ্ডব নৃত্যাদির সমাবেশ করেন, তৎকালীন তান্ত্রিক শিবধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাব দৃষ্টে অনুমান করিতে পারি।

এই প্রকার নৃত্যগীতাদি পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার নিদর্শন শিবসংহিতান্তর্গত ধর্ম্মসংহিতা মধ্যে দৃষ্ট হয়। অধুনা আমরা গম্ভীরা মধ্যে গৌরী, কালী, চামুণ্ডা, চণ্ডী, বাসুলী প্রভৃতি শিবশক্তির রূপধারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে দেখি, ইহা অপৌরাণিক নহে, সম্পূর্ণ পুরাণসম্মত।

শিবঠাকুর নৃত্যপ্রিয় ও কৌতুকপ্রিয়, সুতরাং ভক্তগণ নৃত্যকৌতুকাদি দ্বারা তাঁহাকে সন্তোষলাভের চেষ্টা করিবেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ।

ধর্ম্মসংহিতায় আছে,—একদা চন্দ্রশেখর ক্রীড়া করিতে করিতে হৃষ্টান্তঃকরণে নন্দীকে আদেশ করিলেন, হে বানরানন! তুমি আমার আদেশানুসারে কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিয়া কুক্তমণ্ডলা গৌরীকে আমার নিকট শীঘ্র আনয়ন কর। নন্দী প্রস্থান করিলে, অপ্সরাগণ আদরের সহিত পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিলেন—দাক্ষায়ণী ব্যতিরেকে কোন্ স্ত্রী ইহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে? কুষ্মাণ্ড-দুহিতা চিত্রলেখা অপ্সরাগণের এইরূপ বাক্যশ্রবণে উত্থিত হইলেন ও "আমি গৌরীর রূপ ধারণ করিয়া ভগবান্‌কে স্পর্শ করিতে পারি, যদি তোমাদের মধ্যে কেহ নন্দিকেশরের রূপ ধারণ করিতে পার। দেবীর সখীগণের দেবীরূপ ধারণ করা কঠিন নহে।" উর্ব্বশী বৈষ্ণবযোগ অবলম্বন করিয়া নন্দিকেশ্বরের রূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর অন্যান্য অপ্সরাগণ উর্ব্বশীর রূপ পরিবর্ত্তন সন্দর্শন করিয়া স্ব স্ব রূপ পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রম্লোচা সাবিত্রীরূপ ধারণ করিলেন, মেনকা গায়ত্রী, সহজন্যা জয়ারূপ, কুঞ্জিকস্থলী বিজয়ারূপ এবং ক্রতুস্থলী বিনায়ক রূপ ধারণ করিলেন, তাহাদের এই কৃত্রিম রূপ ধারণ অকৃত্রিমবৎ হইয়াছিল। অনন্তর কুষ্মাণ্ডদুহিতা চিত্রলেখা তাঁহাদিগের রূপরাশি সন্দর্শন করিয়া, বৈষ্ণব-আত্ম-যোগ, শিল্পকৌশল ও অনুকরণ-নৈপুণ্য নিবন্ধন দিব্য ও অত্যদ্ভুত পার্ব্বতীরূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার পার্ব্বতীরূপ ধারণ অতি মনোহর ও আশ্চর্য্যই হইয়াছিল। স্বর্গীয় নূপুরমণির রণৎকারে দিগন্তরাল সকল পূর্ণ হইল।

ছদ্মবেশিনী উর্ব্বশী শিব সকাশে গমন করিয়া বলিলেন, হে দেবেশ! গৌরী ও গণের সহিত মাতৃগণ ও আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি; আপনি কৃপা-কটাক্ষপাতে আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন। শিব তৎকালে যাহা আচরণ করিলেন, তাহা পাঠ করুন।

"এবমুক্তস্তয়া রুদ্রস্তাক্তা শয্যাস্তু হৃষ্টবৎ।
পুরস্তান্নির্গযৌ শৌর্য্যাঃ শনৈঃ সপ্ত পদানি তু॥" ৩৬। (ধর্ম্মসংহিতা)

অনন্তর পিনাকধৃক্ পার্ব্বতীর হস্ত ধারণ করিলেন এবং শয়নাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক শয্যাতে সমারূঢ় হইয়া তাঁহার সহিত নানাবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তৎপরে—

"রুদ্রং গায়ন্তি নৃত্যন্তি সর্ব্বাঃ কপটমাতরঃ।
কশ্চিদ্‌পায়ন্তি নৃত্যন্তি রময়ন্তি হসন্তি চ॥৬৬।" (ধর্ম্মসংহিতা)

কপটরূপা মাতৃগণ রুদ্রদেবের চতুর্দ্দিকে গান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নৃত্য ও সঙ্গীত দ্বারা তাঁহাদিগের উভয়ের অনুরাগ সম্বর্দ্ধিত করিয়া হাস্য-জ্যোৎস্না বিস্তার করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সহস্র সহস্র মাতৃগণ অতি মধুর শব্দ এবং শিবও রুদ্রের সহিত অত্যন্ত অদ্ভুত শব্দ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের এই ব্যবহারে বিন্দুমাত্র ছিদ্র ছিল না। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ—

"কেচিদ্‌গায়ন্তি নৃত্যন্তি হসন্তি চ রুদন্তি চ।" (ধর্ম্মসংহিতা)

শিব একেবারে এই আচরণে বিমোহিত ও আনন্দিত হইলেন। এমন সময়ে নন্দীশ্বর মাতৃগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। অদ্ভুতবেশা গৌরীও অনুচরবর্গ পরিবৃত হইয়া আকাশ হইতে ভর্ত্তার নিকট আগমন করিলেন। এই উভয় সম্প্রদায় যখন একত্র হই-লেন, তৎকালে এক বিস্ময়ভাবের অবতারণা হইল।

"কিমিয়ং পার্ব্বতী দেবী কিমিয়মিত্যচিন্তয়ন্।
তাং দৃষ্ট্বা চকিতাঃ সর্ব্বে কিমিয়ং বা সুশোভনা॥১২।" (ধর্ম্মসংহিতা)

এক্ষণে প্রকৃত পার্ব্বতী কে তাহার নিদর্শন হইল না। কারণ তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎমাত্র ভেদ দৃষ্ট হয় নাই।

সকলেই দুই দুইটি, বড়ই আশ্চর্য্য। অনন্তর মহাদেবের পার্শ্বস্থিতা পার্ব্বতী দিব্য নারী-গণের ক্রীড়িতরূপ ভর্তৃব্যতিক্রম জানিতে পারিয়া তৎকালে হাস্য করিতে লাগিলেন। অপ্সরা-গণও আনন্দে মত্ত হইয়া কিলকিলা রব করিতে লাগিল। ভূত পিশাচ যক্ষগণও আনন্দে মত্ত হইল। শিবেরও যথেষ্ট আনন্দের উদয় হইল। অপ্সরাগণের ক্রিয়া-কলাপ সেইরূপ তাঁহার প্রীতিকর হইয়াছিল। এই বিস্তীর্ণ ভ্রম-অভিনয়ে শিবের অনির্ব্বচনীয় প্রীতিলাভ হইয়াছিল। আমরা বিশ্বাস করি, এই পৌরাণিক শিবসন্তোষব্যাপার হইতে শিবপ্রীতি উৎপাদন মানসে (আদ্যের গম্ভীরাতে) গম্ভীরদেবের সম্মুখে তাঁহার সেবকগণ গীতবাদ্যাদি এবং নৃত্যকালে উক্ত বেশান্তর অবলম্বনে নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে। সেনরাজগণের সময়ে এই প্রকার উৎসব আচরিত হওয়াই সম্ভব বোধ হয়। এই প্রকার ভর্তৃব্যতিক্রম-ক্রীড়াপ্রদর্শন গম্ভীরার অঙ্গস্বরূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ক্রমে ক্রমে তান্ত্রিকগণ দক্ষযজ্ঞে সতীর পিতৃগৃহে গমন করিতে অভিলাষী হইয়া হরকে কয়েকপ্রকার মূর্ত্তি

দেখাইয়া ছিলেন। শুম্ভ নিশুম্ভ যুদ্ধে চণ্ডমুণ্ড বিনাশ কালে যে ভয়ঙ্করী চামুণ্ডাদিরূপের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই সমুদায় প্রতিরূপ মূর্ত্তির নৃত্য দ্বারা গম্ভীরার শোভা যে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

রাঢ়দেশে যে শিবের ও শ্রীধর্ম্মের গাজন অদ্যাপি অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা ময়নানগরাধিপতি লাউসেন প্রচলিত। তদ্দেশে বৌদ্ধতান্ত্রিকপ্রভাব গৌড়নগর অপেক্ষা বহু পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকায় শ্রীধর্ম্মের গাজন ও শিবের গাজনে সেই প্রাচীনতা এককালে লোপ পাইতে পারে নাই। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড় হইতে বৌদ্ধগণ ক্রমশঃ বিতাড়িত এবং শৈব প্রভাবের সঙ্গে বৈদিক ও তান্ত্রিকাচার বৃদ্ধি, কান্যকুব্জ প্রভৃতি দেশ হইতে বেদপারগ ব্রাহ্মণাদির আনয়নব্যাপার এবং ধর্ম্ম ও সমাজশোধনের উপর সেনরাজগণের তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিপতিত হওয়ায় গৌড়নগরাদি হইতে শ্রীধর্ম্মের উৎসবও বিতাড়িত বা লোপ প্রাপ্ত হয় এবং রমাইপণ্ডিতের মতাবলম্বিগণ নীচ জাতি তৎপথাবলম্বন ত্যাগ করিয়া তান্ত্রিকতামূলক পৌরাণিক ভিত্তিবিশিষ্ট আদ্যের গম্ভীরার বিকাশ সাধন করিতে থাকে। বৌদ্ধভাব লুপ্তপ্রায় হইলেও শিবোৎসবের সংস্কারসাধনের সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে থাকিয়া গিয়াছে।

রাজা লক্ষ্মণসেন দেবের সময়ে বৌদ্ধ-প্রভাব গৌড়দেশ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। লক্ষ্মণের বৈদিক মতপ্রচার প্রধান উদ্দেশ্য থাকিলেও তৎকালে তান্ত্রিক (বৌদ্ধতান্ত্রিকমূলক?) মতের প্রাধান্য সমাজে বদ্ধমূল হইয়াছিল। পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা লক্ষ্মণসেন তান্ত্রিক ও বৈদিক মতবাদিগণের মধ্যে কৌশলে একতা সম্পাদন মানসে প্রসিদ্ধ বৈদিকপণ্ডিত হলায়ুধদ্বারা মৎস্য-সূক্ত নামে মহাতন্ত্র প্রচার করেন। জনসাধারণ তৎকালে তান্ত্রিক ধর্ম্মে অতিশয় অনুরক্ত ছিল, সুতরাং তান্ত্রিক ধর্ম্ম উচ্ছেদ করা এবং বেদবিধি মত প্রচার করা বড় সহজ সাধ্য ছিল না। সাধারণ প্রজাপুঞ্জের ধর্ম্মমতের বিরোধী মতবাদ প্রচার করিতে হইলে তাঁহাকে তাঁহার পিতার ন্যায় বিপদে পতিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। তৎকালে তান্ত্রিক মতাচারী প্রজাপুঞ্জের শক্তিও বিলক্ষণ ছিল। আমরা এই সমুদায় কারণেই আদ্যের গম্ভীরায় তান্ত্রিকতার নিদর্শন দেখিতে পাই। বল্লালসেনের সময়ে শিবপূজার যে তান্ত্রিকাংশ অসম্পূর্ণ ছিল, তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের সময়ে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল।

অতঃপর শিবপুরাণোক্ত আদ্যের গম্ভীরাপোষক কতিপয় বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকগণকে দেখাইব যে আদ্যের গাজন বা গম্ভীরা এবং ধর্ম্মের গাজনের সহিত শিবপুরাণোক্ত বিবরণের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। শিবলিঙ্গ উৎপত্তির পৌরাণিক বিবরণ সর্ব্বপ্রথমে লিপিবদ্ধ করিলাম :—

"একদা ভগবতী ত্রৈলোক্যসুন্দরী শবরীবেশে শবরবেশধারী মহাদেবের সহিত ভ্রমণে বাহির হইলেন। ঋষিপত্নীরা সৌন্দর্য্যময় শবরকে দর্শন ও তাঁহার মধুর বাক্যাবলী শ্রবণে মোহিত হইয়া সকলে তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। পতিগণের নিষেধসত্ত্বেও তাঁহারা

ফিরিলেন না। তাহাতে তাপসগণ শবরকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে "আমাদিগের এই মহারণ্যে এমন কোন রাজা নাই যে, পরস্ত্রীরত তোমার লিঙ্গ ছেদন করে। পরদাররত দুরাত্মা ব্যক্তির লিঙ্গচ্ছেদনই কর্ত্তব্য। এই মূর্খ দুরাচার আমাদিগের ক্ষেত্র-দারাপহারী, অতএব আমরা স্বয়ংই ইহাকে দণ্ড করিব। মুনিগণের শাপে লিঙ্গ পতিত হইল।

"মুনীনাং অত্র শাপেন পপাত গহনে বনে।
বৃহদ্যোজনবিস্তীর্ণং লিঙ্গং পরমশোভনম্॥" (ধর্ম্মসংহিতা)

সেই সুদীর্ঘ লিঙ্গের নাম বিজয়। মিশর দেশীয় শিব অসীরিস্ সম্বন্ধেও এতাদৃশ একটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে। টাইফন্ নামক দেবতা মন্ত্রণা করিয়া অসীরিসকে নষ্ট করিয়া তাঁহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করেন। এই অশুভ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভার্য্যা আইসীস্ দেবী সেই সমস্ত দেহখণ্ড সংগ্রহপূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ স্থানে খনন করিয়া রাখেন, কিন্তু লিঙ্গাংশ পাইলেন না। এই নিমিত্ত উহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা ও মহোৎসব প্রচলিত হয়। গ্রীকেরা বেকস্ দেবের মহোৎসব বিশেষে একশত বিংশতি হস্ত দীর্ঘ একটি স্বর্ণময় লিঙ্গমূর্ত্তি বহন করিয়া লইয়া যাইত। বেবিলন দেশে যে সমস্ত পিত্তল-রচিত পুরাতন লিঙ্গমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা ভারতবর্ষীয় শিবলিঙ্গ মূর্ত্তির অবিকল প্রতিরূপ। তথায় তিন শত হস্ত দীর্ঘ লিঙ্গ মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইত। যাহাই হউক ধর্ম্মসংহিতালিখিত "বহুযোজনবিস্তীর্ণং লিঙ্গং" উক্তি হইতে অতি বৃহৎ লিঙ্গেরই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এই প্রকার লিঙ্গউপাসনার ক্রম ও পদ্ধতি নিম্নে সংক্ষেপে লিখিত হইল।

"সাধক শুক্লপক্ষে নিজের চন্দ্রতারানুকূল দিবসে শিবশাস্ত্রোক্ত বিধানে যথোক্ত পরিমাণে লিঙ্গ প্রস্তুত করিবে এবং পবিত্র স্থানে ভূমির পরীক্ষা করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রকারে লক্ষণোদ্ধার করিয়া দশোপচারে পূজা করিবে। প্রথমে গণেশপূজা ও স্থানমার্জ্জনাদি করিয়া লিঙ্গটীকে স্নানগৃহে লইয়া রাখিবে। তখন কুঙ্কুমাদি রসে রঞ্জিত কাঞ্চনশলাকা দ্বারা অঙ্কিত লিঙ্গকে শিল্পশাস্ত্রোক্ত বিধান মতে খোদিত করিবে। অষ্ট পূর্ণকুম্ভের বারি (পঞ্চামৃত জল) ও পঞ্চগব্য দিয়া বেদীর সহিত লিঙ্গটিকে শোধন করিয়া পূজা করিবে। পরে সেই সবেদিক লিঙ্গটীকে দিব্য জলাশয়ে লইয়া গিয়া অধিবাস করিবে। যে পবিত্র মনোহর গৃহে লিঙ্গাধিবাস হইবে, তাহা তোরণাদি দর্ভমাল্যে ও আবরণপটে সম্যক্ শোভমান থাকিবে এবং তথায় অষ্টদিগ্‌গজ ও অষ্টদিক্‌পালের প্রতিমূর্ত্তি ও অষ্টপূর্ণকুম্ভ (অষ্ট মঙ্গল কলস) থাকিবে এবং গৃহের মধ্যস্থলে একটী পদ্মাসনচিহ্নিত ধাতুময় বা দারুময় পীঠবেদী প্রস্তুত থাকিবে। প্রথমে সুভদ্র, বিভদ্র, সুনন্দ ও বিনন্দ এই চারিটি দ্বারপালকে যথাক্রমে পূজা করিয়া সবেদিক লিঙ্গকে স্নান করাইয়া বস্ত্রযুগ দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত করিবে ও শনৈঃ শনৈঃ জল সমীপে লইয়া গিয়া পীঠিকার উপর পূর্ব্বশিরা করিয়া শয়ন করাইবে। উহার পশ্চিমে পিণ্ডিকা রাখিবে; এই স্থানেই সর্ব্বমঙ্গলময় লিঙ্গের পঞ্চরাত্র বা ত্রিরাত্র অথবা একরাত্র অধিবাস করিবে। পরে পূর্ব্বমত পূজিত দেবগণকে তথায় বিসর্জ্জন করিয়া

একমাত্র লিঙ্গটীকে উঠাইয়া পূজা করিয়া উৎসবপথে শয়নগৃহে আনয়ন করিবে। নানা মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি সহকারে লিঙ্গটীকে আনয়ন করিয়া রক্তবস্ত্রযুগ্মে ও পিণ্ডিকা দ্বারা বেষ্টন করিয়া পূর্ব্বের মত শয়ন করাইবে। লিঙ্গের ন্যায় প্রতিমাতেও প্রতিষ্ঠা করিবে। এই লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা ও পূজাদির বিবরণ পাঠ করিলে শ্রীহর্ষদেবের বৌদ্ধ উৎসব মনে পড়ে। বুদ্ধমূর্ত্তি স্কন্ধে লইয়া গিয়া স্নান করান, উৎসব পথে আনয়ন ইত্যাদির সহিত বিস্তর সাদৃশ্য দেখিতে পাই। আদ্যের গাজনে ও শ্রীধর্ম্মের গাজনে ঐ প্রকারের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। প্রধান আচার্য্যই শিবকুণ্ডস্থ অগ্নিতে হোম করিবেন। অপর অপর দ্বিজগণ চতুর্দ্দিকে প্রধান প্রধান দেবতার হোম করিবেন। লিঙ্গপূজায় চারিজন ব্রাহ্মণকে হোম করিতে দেখি। আদ্যের গাজনে চারিজন প্রধান পণ্ডিত ও বেদীর উপর অগ্নিপ্রজ্বলিত করিবার কথা আছে। উক্ত শিব-লিঙ্গ পূজাকালে "নৃত্যং গীতঞ্চ বাদ্যঞ্চ মাঙ্গল্যান্যপরাণিচ।" (বায়বীয়সংহিতা)

অর্থাৎ নৃত্য গীত ও বাদ্যের কথাও দেখিতে পাই, ধর্ম্মের গাজনেও ঐরূপ হইয়া থাকে। ধর্ম্মের দেহারা বা আদ্যের দেহারার কথা অবগত আছেন। পরমাত্মা শিবের শিবশাস্ত্রোক্ত লক্ষণসমন্বিত ও রাজকীয় সৌধসদৃশ মন্দির নির্ম্মাণ, ভূধরসদৃশ পুরদ্বার ও নানাবিধ রত্ন-খচিত সুবর্ণময় দ্বারকপাট, এ ছাড়া শিবের জন্য যুগল রাজহংসাকৃতি সূক্ষ্ম শ্বেতবর্ণ চামরদ্বয়, দিব্যগন্ধময় চতুর্দ্দিকে রত্নখচিত উত্তম মালায় বিভূষিত দর্পণ আবশ্যক। শ্রীধর্ম্মের গাজনেও শ্বেতচামর ও মাল্যাদির আবশ্যক হইয়া থাকে। শিবপূজায় রাত্রিজাগরণ এবং গীতবাদ্য ও নৃত্যগীতাদির সবিস্তার বিবরণ দৃষ্ট হয়। যথা—

"গীতবাদ্যৈস্তথা নৃত্যৈর্ভক্তিভাবসমন্বিতঃ।
পূজনং প্রথমং যামে কৃত্বা মন্ত্রং জপেদ্বুধঃ॥" (জ্ঞানসংহিতা)

নৃত্যগীত বাদ্যযোগে প্রথম প্রহর অতিবাহিত করিবে। সংকল্প করিয়া গীতবাদ্য নৃত্য এবং নানা প্রকার গান করিবে। প্রতি প্রহরেই এই রূপ করিবে।

"সঙ্কল্পঞ্চ তদা কৃত্বা গীতং বাদ্যং তথা পুনঃ।
নৃত্যঞ্চৈব তথা চাত্র গানঞ্চ বিবিধং তথা॥" (জ্ঞানসংহিতা)

আরও অবগত হওয়া যায় যে অষ্টজন সিদ্ধ যাঁহার অগ্রে এই স্থানে নিরন্তর নৃত্য করিতে-ছেন, নিজ ভক্তগণ 'জয় জয়' শব্দে তাঁহার উপাসনা করেন। শ্রীধর্ম্মোৎসবেও সংঘাত সমেত 'ধর্ম্মজয় ধর্ম্মজয়' শব্দ করিবার কথা উক্ত আছে।

বিচক্ষণ মানব, সাত্ত্বিকভাবে নৃত্যগীত ও বাদ্যযোগে প্রহরে প্রহরে পূজা করিবে। নানাপ্রকার স্তবদ্বারা বৃষভধ্বজের প্রীতি সাধন করিবে। ব্রতানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি এই ব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে। চারিপ্রহর রাত্রিতে চারিবার ঐ প্রকারে পূজা করিতে হয়।

"জাগরণং তদা গত্বা মহোৎসবসমন্বিতম্।" (জ্ঞানসংহিতা)

শিবপূজায় গীত, বাদ্য, নৃত্য এবং গীত দ্বারা শিবোৎসব সমাধা হয়।

"গীতং বাদ্যং পুনশ্চৈব যাবৎ স্যাদরুণোদয়ঃ॥"

সমুদায় রাত্রি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃসূর্য্যোদয় হইলে গুরুমন্ত্র জপ এবং গানাদি করিয়া তৎকালে স্নান ও শিবের পূজা করিবে।

"জপং মন্ত্রবরেণৈব গীতং নৃত্যং তথা পুনঃ ॥" (জ্ঞানসংহিতা)

ধান্য ও গোদানাদিরও ব্যবস্থা আছে যথা—

"ধেনুং সদক্ষিণাং দদ্যাৎ সুশীলাঞ্চ পয়স্বিনীম্।"

শ্রীধর্ম্মপূজাতেও দেখি "গোঁসাই বলেন পঞ্চগব্য গাভী গুয়া।" "ধূপ ধুনা, ধৌতধান্য ধবল চামর ॥" আবশ্যক হইয়া থাকে। শিরে শ্রীধর্ম্মপাদুকা লইয়া নৃত্যগীতাদি ও বাদ্যোদ্যম সহকারে ধর্ম্মসন্ন্যাসিগণ বেত্রহস্তে উৎসবপথে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করেন। শিব-শাস্ত্রোক্ত উৎসবেও তদনুরূপ অনুষ্ঠান দেখিতে পাই, "রত্নপদ্মোপশোভিত" বিপুল তৈজস পাত্রে দিব্য পাশুপত অস্ত্র আবাহন করিয়া পূজা করিবে। পরে অলঙ্কৃত যষ্টিধারী দ্বিজের মস্তকে সেই পাত্র স্থাপন করিয়া বাহিরে গিয়া নৃত্যগীতাদি বহুবিধ মঙ্গলকার্য্য করিতে করিতে দীপ ধ্বজাদি লইয়া সত্বরও নহে অথচ বিলম্বেও নহে, এইরূপে মহাপীঠ বেষ্টন করিয়া প্রসাদ করিবার উদ্দেশে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে। অদ্যাপি গাজনে সন্ন্যাসীরা বিবিধ অলঙ্কারে শোভিত হইয়া বেত্রহস্তে নৃত্য করিতে করিতে তাম্রপাত্র মস্তকে বহন করিয়া থাকে।

শ্রীধর্ম্মোৎসবে 'গামার কাটা' অনুষ্ঠান আছে। তাহাতে গাম্ভার বৃক্ষের পূজা করিতে হইত। সংঘাতের সমুদায় সন্ন্যাসিগণ উক্ত বৃক্ষ ধারণ করিয়া বরণাদি করিত। শিব-পুরাণোক্ত বায়বীয় সংহিতায় দেখিতে পাই—

"দ্বারযাগঞ্চ বনিকাং পরিবারবলিক্রিয়াম্।
নিত্যোৎসবঞ্চ কুর্ব্বীত প্রাসাদে যদি পূজয়েৎ ॥"

যদি প্রাসাদে পূজা করা হয়, তাহা হইলে রম্য কোমল তরু-সমূহ সমীপে গমন করিয়া দ্বারযাগ ও পরিবারবলিক্রিয়া করিবে এবং নিয়ত উৎসব করিবে। এবং—

"নির্গম্য সহবাদিত্রৈস্তদাশাভিমুখঃ স্থিতঃ।
পুষ্পং ধূপঞ্চ দীপঞ্চ দদ্যাদন্নং জলৈঃ সহ ॥"

নানাবিধ বাদ্যের সহিত সেই তরুসমূহের দিকে গমন করিয়া জল পুষ্প ধূপ দীপ অন্ন এই সকল নিবেদন করিবে। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে দেখি —

"স্নান পূজা বাদ্য নাটে, দশমে গামার কাটে
নদীতটে জয় জয় দিয়া।
পণ্ডিত পদ্ধতি আছে, জাগাল গামার গাছে
গণেশাদি পূজিয়া দেবতা।
বৃক্ষের বরণ করি, সংঘাত সহিত ধরি,
বান্ধিল সবার করে সূতা ॥" (ঘনরাম)

শিবপূজায় কমলদল দ্বারা পূজা বিশেষ আদরণীয়। শিবপূজায় ঈশান কোণে শ্রীমান্

ত্রিশূলের, পূর্ব্বদিকে বজ্রের, অগ্নিকোণে পরশুর, দক্ষিণে সায়কের, নৈঋতে খড়্গের, পশ্চিমে পাশের, বায়ুকোণে অঙ্কুশের ও উত্তর দিকে পিণাকের পূজা করিবে। এই প্রকার পূজার ব্যবস্থা অন্তাপি শ্রীধর্ম্মপূজায় দৃষ্ট হয়। গম্ভীরা পূজায় ত্রিশূল ও সায়কের পূজা হইয়া থাকে। প্রতি মাসে শিবপূজার ও উৎসবের ব্যবস্থা এবং প্রত্যেক মাসিক পূজার ফল-শ্রুতি লিখিত আছে। যথা—

"যঃ ক্ষিপেদেকভক্তেন চৈত্রমাসং নরোত্তমঃ।
ধনধান্যসমৃদ্ধে চ কুলে জায়তি রূপবান্॥৫।"
বৈশাখং যঃ ক্ষিপেন্মাসমেকভক্তেন মানবঃ।
জাতিসংশ্রেষ্ঠতাং প্রাপ্য পূজিতা ধনবানপি॥৬। (সনৎকুমারসংহিতা)

চৈত্র ও বৈশাখ মাসে উপবাস করিয়া শিবারাধনা করিলে ধনধান্য ও জাতিশ্রেষ্ঠতা লাভ হয়, এ আশা শিবভক্তের পক্ষে অতি আশাপ্রদ। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে শিবারাধনার ইহাই বিশিষ্ট কারণ।

উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত ফাল্গুন মাসে মহোৎসব করিবে এবং চৈত্র মাসে দোল করিবে—

"চৈত্রে চিত্রাপৌর্ণমাস্যাং দোলাং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি॥" (বায়বীয়)
এবং "বৈশাখেঽপিচ বৈশাখ্যাং কুর্য্যাৎ পুষ্পমহালয়ম্।" (বায়বীয়)

বৈশাখে পুষ্পদোল এবং পুষ্পময় মন্দির করিবার ব্যবস্থাও আছে। চৈত্রমাসে বসন্তোৎসব বা মদনোৎসবের কথা প্রাচীন নাটকাদিতে ভূরি ভূরি দৃষ্ট হয়। এই উৎসবে রঙ্গিন বারি লইয়া উৎসবামোদের বিবরণ "মালতী মাধবে" দেখিতে পাই। বৈশাখে মহাদেবের পুষ্পময় মন্দির নির্ম্মাণের কথা লিখিত আছে। ইহা পুষ্পরথের অনুরূপ মাত্র। শ্রীহর্ষদেবের সময়ে হিউ-এন্-সঙ্গ লিখিত এই প্রকার বুদ্ধদেবের রথোৎসবের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তাহাতে বুদ্ধমূর্ত্তি ও বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইত এবং শিবের পুষ্পময় মন্দিরে শিব ও নন্দীর অবস্থানের বিষয় দেখিতে পাই। উভয় স্থলেই ভক্তগণের নৃত্য-গীতাদি উৎসবামোদের বিবরণ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

কাশীখণ্ড পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, "যে নারী বা নর চৈত্রমাসের শুক্লতৃতীয়ায় উপবাসী থাকিয়া নিশীথকালে বস্ত্রালঙ্কারাদি বিবিধ উপচার দ্বারা মঙ্গলাগৌরীর পূজা করে, পরে ঐ রাত্রি গীতবাদ্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক জাগরিত থাকে, তাহারা আশাতীত সুখসম্ভার লাভ করিবে। আরও লিখিত আছে যে, কাশীস্থ ব্যক্তিমাত্রেরই চৈত্র মাসের শুক্লতৃতীয়ায় শিবের বার্ষিকী যাত্রা করা উচিত। চৈত্রমাসের পূর্ণিমাতে কৃত্তিবাসেশ্বরের মহোৎসব করিবে। একদা চৈত্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে কৃত্তিবাসোৎসব হইতেছিল, ঐ উৎসবে দেবগণ নানাবিধ উপচারের সহিত রাশীকৃত অন্নপ্রস্তুত করিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষদেবের বিরাট অন্নদানোৎসব এবং দ্বিতীয় শিলাদিত্যের বুদ্ধোৎসব এই চৈত্রোৎসবের সম্পূর্ণ অনুরূপ। আধুনিক মালদহের গম্ভীরাও সেই চৈত্রোৎসবের ক্ষীণস্মৃতি প্রকাশ করিতেছে।

কৌশলে শৈবপ্রভাব খর্ব্ব করাই হরিবংশের উদ্দেশ্য বোধ হয়। হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণপূজার উদ্দেশ্যই বলবৎ করিবার প্রয়াস বর্ত্তমান। শৈব ও বৈষ্ণব উভয় হস্তের ফলিত বর্ণবিন্যাসে উক্ত গ্রন্থ চিত্রিত হইয়াছে। শোণিতপুরাধিপতি শিবভক্ত মহারাজ বাণের ভীষণ পরাজয়ের কথা উহাতে বর্ণিত। এই উপাখ্যানাংশই শিবের গাজন বা গম্ভীরাউৎসবের শেষ পৌরাণিক কারণ বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। এই বর্ণনায় শৈবগণকে বৈষ্ণবগণ হইতে নিকৃষ্ট এবং শৈবগণের হীনতা প্রতিপাদনের চেষ্টা বর্ত্তমান। শৈব ও বৈষ্ণবে ঘোর বিদ্বেষ ও সমরাভিনয়ের কথা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ভূরি ভূরি বিবৃত রহিয়াছে। যাহাই হউক নিম্নে হরিবংশ এবং শিবপুরাণ উভয় গ্রন্থ হইতেই বাণ-পরাজয় উপাখ্যান উদ্ধৃত করিলাম—

"পরমশৈব বাণকন্যা উষার সহিত দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের গুপ্তপ্রণয় সংঘটিত হয় ; মহামতি বাণ কুপিত হইয়া অনিরুদ্ধকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করেন। ভিন্নাঞ্জনসন্নিভা কালী অনিরুদ্ধের স্তবে তুষ্ট হইয়া, জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর দিবস নিশীথ সময়ে তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। অসম্ভব হইলেও সম্ভবতঃ জ্যৈষ্ঠ অমানিশায় দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাণরাজের ঘোর যুদ্ধ হয়। সেই মহাযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রদ্বারা বাণ-রাজের বাহন সমুদায় ছেদন করিয়া যেমন তাঁহার শিরশ্ছেদনের জন্য প্রস্তুত হইলেন, অমনি শঙ্কর বলিয়া উঠিলেন,—আমার বাণের শিরশ্ছেদ করিও না।

"মা বাণস্য শিরশ্ছিন্ধি সংহরস্ব সুদর্শনম্।" ৭।১৮৬ (ধর্ম্মসংহিতা)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবকে বলিলেন, "আপনার বাণ জীবিত থাকুক, এই আমি চক্র প্রতিসংহার করিলাম।"

নন্দী বাণকে শুভঙ্কর বাক্যে কহিলেন, "বাণ! তুমি এই ক্ষতার্ত্ত শরীরেই দেবদেব মহা-দেবের সন্নিধানে উপস্থিত হও"। বাণ নন্দীর বাক্যে সত্বরগমনে সমুদ্যত হইলে, প্রতাপশালী নন্দী তাহাকে তাদৃশাবস্থায় দেখিয়া রথে আরোপণ করিয়া মহাদেবের সন্নিধানে উপস্থিত করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, বাণ! তুমি মহাদেব সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নৃত্য করিতে থাকিবে, তাহা হইলে তোমার কল্যাণলাভের সম্ভাবনা আছে। জীবনপ্রার্থী ভয়-বিহ্বলচিত্ত বাণ নন্দীবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে ভয়োদ্বিগ্ন মনে মহাদেবের সম্মুখে গিয়া পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিতে লাগিলেন। খিল হরিবংশে এই প্রকার বর্ণনা আছে,, কিন্তু শিবপুরাণের ধর্ম্মসংহিতায় নৃত্যের ভাবান্তর বর্ণনা আছে। যথা—

"বাণরাজ তৎকালে পাদদ্বয় ও একশীর্ষ মাত্র হইলেও নন্দীর আদেশানুসারে ভগবানের সম্মুখে অদ্ভুত নৃত্য করিতে লাগিলেন। আলীঢ়, প্রমুখ, বিবিধাকার, শালী স্থানপঞ্চকও প্রদর্শিত হইল ; সুখবাদ্য নিনাদে দিগন্তর পূরিত হইয়া উঠিল. ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মস্তক ভ্রূক্ষেপ সহকারে ভয়ানক রূপে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল ; নানাবিধ গতি সকল প্রদর্শিত হইয়া দর্শকবৃন্দকে বিস্ময়সাগরে মগ্ন করিতে লাগিল। ভূতলও শোণিত-সিক্ত হইয়া ভয়ঙ্করতা প্রাপ্ত হইল।"

"শিরঃকম্পসহস্রাণি প্রত্যনীকান্ সহস্রশঃ ॥
চারীশ্চ বিবিধাকারা দর্শয়িত্বা শনৈঃ শনৈঃ ।৭।১৯৬ ৯৭ ॥ (ধর্ম্মসংহিতা)

বাণ এই প্রকার নৃত্য করিয়াছিলেন। গম্ভীরামণ্ডপে কালী, চামুণ্ডা, নারসিংহী প্রভৃতি নৃত্যও উক্ত প্রকারে সম্পাদিত হয় এবং অঙ্গভঙ্গি অতিশয় প্রাচীন ভাব-সমন্বিত বলিয়াই বোধ হয়। আধুনিক নৃত্য ও প্রাচীন নৃত্যবিশেষে সামান্য বিভিন্নতা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ভক্তবৎসল মহাদেব বাণরাজকে তাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও হতচৈতন্য প্রায় অবস্থায় বারম্বার নৃত্য করিতে দেখিয়া করুণার বশীভূত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি বাণকে বলিলেন, বৎস বাণ! তোমার দুরবস্থা দর্শনে আমারও হৃদয়ে শোক-সঞ্চার হইতেছে। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

বাণ কহিলেন, প্রভো! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন, আমি যেন চিরদিন অজর ও অমর হইয়া থাকিতে পারি। এই আমার প্রথম প্রার্থনা।

মহাদেব কহিলেন, বৎস! তুমি দেবগণের তুল্যকক্ষ হইয়া চিরদিন জীবিত থাকিবে, তোমার মৃত্যু নাই। তুমি আমার নিতান্ত অনুগ্রহভাজন। এতদ্ভিন্ন অন্য যে কোন বর অভিলাষ, প্রার্থনা কর।

বাণ কহিলেন, দেব! আমি যেমন ব্রণ-পীড়িত ও দুঃখার্ত্ত হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে আপনার সম্মুখে নৃত্য করিলাম, যদি আপনার কোন ভক্ত এইরূপ নৃত্য করে, তবে সে যেন আপনার পুত্রত্ব লাভ করিতে পারে।

মহাদেব কহিলেন, বৎস! সত্যপরায়ণ ও সরলতাসম্পন্ন আমার যে ভক্ত নিরাহার থাকিয়া এইরূপ নৃত্য করিবে, তাহার এইরূপ ফললাভ হইবে। এক্ষণে তোমার মনোমত তৃতীয় বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তাহাও দিব।

বাণ কহিলেন, হে ভব! চক্রাস্ত্র প্রহারে আমার দেহে যে অতি তীব্র যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে, ইহা আপনার তৃতীয় বরে শান্তিলাভ করুক।

তৎপরে মহাদেব চতুর্থ বর দিতে চাহিলেন। বাণ কহিল, হে বিভো! তবে আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন, আমি যেন আপনার প্রমথগণের প্রধান হইয়া চিরকাল মহাকাল নামে খ্যাতি লাভ করিতে পারি। মহাদেব তাহাও প্রদান করিলেন।

আমরা পাঠক মহোদয়গণকে এই বাণ ও শিব-সংবাদ-রহস্য পর্য্যালোচনা করিতে অনুরোধ করি। চৈত্র পর্ব্ব বা চড়ক পূজাদি শৈব উৎসবে যে 'বাণফোড়া' ইত্যাদি ক্লেশকর ব্যাপার ও উপবাস নৃত্য-গীতাদির মহোৎসব দেখি তাহার মূলসূত্র এই স্থলে বিবৃত রহিয়াছে। অধিকন্তু শাস্ত্রকার মহাদেবমুখে বলাইয়া লইয়াছেন, যে সত্যপরায়ণ ও সরলতা

সম্পন্ন আমার যে ভক্ত নিরাহার থাকিয়া ঐরূপ নৃত্য করিবে, তাহার এইরূপ ফল লাভ হইবে। পুত্রলাভ এবং শিবের প্রমথ হইয়া শিব সকাশে অবস্থান অতিশয় প্রয়োজনাপূর্ণ। সাধারণ শিব-ভক্তগণ কখনই এই সুযোগ ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি সম্বরণ করিতে সমর্থ হইবে না। এই কারণে চৈত্রোৎসবে ভক্তেরা বাণবিদ্ধ শোণিতাপ্লুত কলেবরে শিবসকাশে তাণ্ডব-নৃত্য ও পৈশাচিক নৃত্য করিতে থাকে। উপবাস ও নৃত্য-গীত-বাদ্য শিব-সন্তোষ বিধান মানসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই বিশ্বাসে অদ্যাপি আদ্যের গম্ভীরা মণ্ডপে বালকবালিকা-গণকেও নৃত্য করিতে দেখি। ইহাতে পরমায়ু, ধন মান ও জীবনান্তে অমরত্ব লাভ হইবে বলিয়া এদেশবাসীর একান্ত বিশ্বাস।

উক্ত প্রকারেই চৈত্রোৎসবের পৌরাণিক মূল গঠিত হইয়া থাকিবে। যদিও হিন্দুধর্ম্মে অতি পূর্ব্বে পৌত্তলিকতা ছিল না, কিন্তু বৌদ্ধমূর্ত্তি ও মঠাদির আরম্ভে অতিপূর্ব্বপ্রথা পরিহার-পূর্ব্বক শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ও উৎসবাদির অনুষ্ঠান বৌদ্ধ উৎসবামোদপ্রথা-লম্বনে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। ক্রমশঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষবশতঃ পরে বৌদ্ধভাব ত্যাগ করিতে অনেকেই যত্নবান্ হইয়াছিল।

এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মনিন্দা ও বৌদ্ধগণের সহিত সংগ্রামাদির বিবরণ ইতিহাসে দেখিতে পাই। এই সময় হইতে শৈব সম্প্রদায় প্রবল হইয়া শত শত বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস ও বহুসংখ্যক শ্রমণ ভিক্ষু প্রভৃতির জীবন নষ্ট করিয়াছিল। সেই সময়ের বৌদ্ধ-বিদ্বেষ ভাব আমাদের ধর্ম্মপুস্তকাদিতে সুন্দর চিত্রিত রহিয়াছে। ভাগবতে তাহার বহু প্রমাণ বর্ত্তমান। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখি :—

"নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্যদানবমোহিনে।"

পুনশ্চ, ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"দেবদ্বিষাং নিগমবর্ত্মনি নিষ্ঠিতানাং পূর্ভির্ময়েন বিহিতাভিরদৃশ্যতূর্ভিঃ।
লোকান্ ঘ্নতাং মতিবিমোহমতিপ্রলোভং বেশং বিধায় বহু ভাষ্যত ঔপধর্ম্ম্যং॥৩৭॥"

যাহাই হউক এই প্রকার বহু বিদ্বেষভাব প্রকাশেও যেন তৃপ্তি হয় নাই। কেহ কেহ বুদ্ধের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াও একেবারে বৌদ্ধধর্ম্ম মিথ্যা ও অলীক প্রমাণ করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন।

"কাহার কাহার মতে বুদ্ধ নামে কোন এক ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্ম নূতন ধর্ম্ম নহে, উহা কপিলের সাঙ্খ্যদর্শন অবলম্বনে সৃষ্ট হইয়াছে। এই জন্যই তিনি কপিলবস্তু নামক কল্পিত জনপদে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। কপিলবস্তু শব্দের অর্থ কপিলের বসতিস্থান। তাঁহার জননী মায়াদেবী মানব নহেন, বস্তুতঃ দর্শনশাস্ত্রের মায়া বা প্রকৃতি। বুদ্ধ নামটি পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি বিশেষের নহে, উহার অর্থ জ্ঞানী।" অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, ইহাতেই অবগত হইতে পারা যাইবে যে বৌদ্ধধর্ম্ম লোপমানসে কীদৃশ চেষ্টা হইয়াছিল। এতাদৃশ বৌদ্ধবিদ্বেষ ভাব না হইলে এদেশ হইতে

বিশেষতঃ বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম লোপ পাইত না এবং পুরাণাদি রচিত হইত না। হিন্দু পৌরাণিক নবধর্ম্ম দৃঢ়ীকরণমানসে ক্রমে ক্রমে বহু পুরাণাদি রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

চৈত্রমাসের শেষে যে শিবোৎসব ও চড়কপূজা হইয়া থাকে, তাহার চলিত নাম 'শিবের গাজন'। অনেকেই এই বঙ্গদেশের শিবের গাজন দেখিয়া থাকিবেন। সংক্ষেপে শিবের গাজনের বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল, এই শিবের গাজনই নামান্তর প্রাপ্ত হইয়া মালদহে গম্ভীরা নামে খ্যাত হইয়াছে।

শিবের গাজনের সময়ে যথাকালে শিব সকাশে বা 'গাজনতলায়' ঘট-স্থাপনা হইয়া থাকে, তাহাকে চলিত কথায় 'ঘটভরা' বলে। প্রত্যেক শিবালয়ের প্রথামত কোন এক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বংশপরম্পরাগত নিয়মে 'মূল সন্ন্যাসী' পদ গ্রহণ করিয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট দিবসে 'সন্ন্যাসীধরা' কার্য্য হয়। যাহারা সন্ন্যাসী হইতে বাসনা করে বা যাহাদের 'মানসিক' থাকে, তাহারা সন্ন্যাসী হয়। সন্ন্যাসী হইবার পূর্ব্বদিবসে নখকেশাদির ক্ষৌরকার্য্যাদি করিয়া হবিষ্যাহার করিয়া থাকার নাম 'সংযম'। হবিষ্য, ফল, উপবাস, জাগরণ, ধুলট ও চড়ক প্রভৃতি নিয়ম গাজুনে সন্ন্যাসীদের অবশ্যপালনীয় কার্য্য। প্রতিদিন গীতবাদ্য, নৃত্য ও শিববন্দনা এবং শিবগুণাদি কীর্ত্তন অবশ্য কর্ত্তব্য। শোভাযাত্রা এবং গাজনতলা হইতে অন্য গাজনতলায় গমন, চিরন্তন প্রথানুসারে নৃত্যগীতাদি উৎসবামোদাদি সহকারে আচরিত হয়। 'গাজুনে বামুন' বলিয়া একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারাই বহু জাতি-মিশ্রিত শিবসন্ন্যাসিগণের শিবপূজায় পৌরোহিত্য কার্য্যাদি করিয়া থাকেন। প্রত্যেক 'গাজুনে সন্ন্যাসী' আপন আপন 'গাজনতলা' হইতে তৎ তৎ স্থানীয় প্রধান ও প্রাচীন শিবের গাজনতলায় দেশীয় প্রথামত গীতবাদ্য নৃত্যাদি-উৎসব সহকারে শোভা যাত্রা করিয়া গমন করে এবং অন্যান্য 'গাজনতলা' হইতে আগত সন্ন্যাসি-গণের সহিত নৃত্যগীত ও বাদ্যাদি-সহ উৎসবামোদে যোগদান করিয়া শোভাবর্দ্ধন করে। কোথাও কোথাও কবির গানের ন্যায় চাপান, চিতেন, জবাব প্রভৃতি ভাবে গীতাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কলিকাতা, ভবানীপুর, কালীঘাট, চেতলা, সবজীবাগান প্রভৃতি স্থানের গাজনতলা হইতে সন্ন্যাসিগণ টালিগঞ্জের 'বুড়াশিবের তলায়' গিয়া একত্র সমুদায় রাত্রি নৃত্যগীতাদি বাদ্যোদ্যমে অতিবাহিত করে। সেখানেও মালদহের গম্ভীরা উৎসবের ন্যায় উৎসব হইয়া থাকে, কিন্তু এদেশের ন্যায় পৌরাণিক ও তান্ত্রিক নৃত্যাদির অনুষ্ঠান সেই রাত্রে আদৌ অনুষ্ঠিত হয় না। এই প্রকার রাত্রিজাগরণপূর্ব্বক উৎসবকে 'জাগরণ' পালা কহিয়া থাকে। গীতাদির ভাব কতক পরিমাণে মালদহের অনুরূপ, ইহাতে শিবের বন্দনা ও শিবের গুণদোষের কীর্ত্তন ইত্যাদি থাকে। নীলপূজার দিবস অতি প্রত্যূষে বিবিধ গাজনতলার সন্ন্যাসী এবং অন্যান্য জনগণ কালীবাড়ী পূজা দিবার জন্য আগমন করে এবং কালীঘাটের পটুয়াটুলীর পটুয়াগণ মূল্য লইয়া সন্ন্যাসিগণকে তাহাদের ইচ্ছামত হরগৌরী, শিব, কালী, ভূত, প্রেতিনী, ভল্লুক, সন্ন্যাসী, ফকির ইত্যাদি নানারূপ চিত্রিত করিয়া দেয়। তাহারা দলে দলে নৃত্যগীতাদি-সহ

দর্শকবৃন্দের মধ্যদিয়া কালীমন্দিরে গমন করে এবং স্নানান্তে কালীমাতার পূজাদি প্রদান পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করে। কেহ কেহ গমনকালীন সাজসজ্জায় আবার প্রত্যাগমন করিয়া থাকে। এই নীল উৎসবের দিবস প্রাতে হিন্দু মুসলমান উভয়কেই একত্র উৎসবআমোদে লিপ্ত দেখা যায়। এই উৎসব মালদহের গম্ভীরার চামুণ্ডা, কালী, বাসুলী ইত্যাদি নৃত্যের অনুরূপ এবং পূর্ব্বকালে এই প্রকার উৎসব যে সর্ব্বত্র বঙ্গদেশ ব্যাপ্ত ছিল, তাহারই পরিচয় প্রদান করিতেছে।

তৎপরে চড়কপূজার দিবস চড়কগাছকে 'জাগাইতে' হয়। যে জলাশয়ে চড়কগাছ নিমগ্ন থাকে, সন্ন্যাসিগণ 'তারকেশ্বরের শিব' নাম উচ্চারণপূর্ব্বক জলাশয়ে অবগাহন ও 'চড়কগাছ' অন্বেষণ কার্য্যে ব্যস্ত হয়। গল্প প্রচলিত আছে—চড়কগাছ শীঘ্র ধরা দেয় না, সন্ন্যাসীদের জলক্রীড়ার জন্য চড়কগাছও মৎস্যাদির ন্যায় ডুবিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে। যাহাই হউক, এই প্রকার জলক্রীড়াসমাধানান্তে 'চড়কগাছ'কে চড়কতলায় আনয়ন করা হয় এবং পূজাদির পর প্রোথিত ও চড়কে ঘুরিবার উপযুক্ত বংশাদি ও রজ্জু সংবদ্ধ করা হয়। তৎপরে চড়ক হইয়া থাকে। বাণফোড়া, বঁটিঝাপ, কাঁটাঝাপাদি এবং অগ্নিদোলাদি ক্রীড়াও চড়কের পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট দিবসে সমাধা হইয়া থাকে। বহুস্থানে এই শিবগাজনে মশানক্রীড়া হইয়া থাকে, সন্ন্যাসিগণ মৃতদেহ ও মুণ্ড অঙ্গে ধারণ করিয়া বিবিধাকার তাণ্ডবনৃত্য করিয়া থাকে। এই শিবের গাজনে সন্ন্যাসিগণ শিবের বন্দনা, সৃষ্টিবর্ণনা, দেবদেবীর বন্দনা ও প্রণাম এবং শিববিষয়ক বিবিধ গীত, যথা—শিবের চাষ, শিবের শাঁখারি বেশ প্রভৃতির গীত হইয়া থাকে। এই শিবের চাষ বিষয়ক গীত আদ্যের গম্ভীরাতেও গীত হয়, এবং চাষের বিষয় ধান্যের জন্ম ইত্যাদিও উক্ত গীতান্তর্গত। শিবায়ন ও শিবগীতাদি গ্রন্থে তাহার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিবের চাষব্যাপার হাস্যোদ্দীপক বটে। শিব পার্ব্বতীর উপদেশমত চাষ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলে পার্ব্বতী তাঁহাকে ইন্দ্রের নিকট জমিগ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। শিব ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়া ইন্দ্রকে বলিলেন—

"তুমি ভূমি দিলে আমি চষি গিয়া চাষ ॥
পূর্ণ হয় তবে পার্ব্বতীর অভিলাষ ॥" (শিবায়ন)

ইন্দ্র বলিলেন—

"ভৃত্যে কেন ভূমি মাগ ভূমিস্বামী হয়ে।
যত পার জোত কর কাজ নাহি করে ॥"
"শিব বলে শক্র কিছু চক্রবক্র আছে।
থন্দ হলে ক্ষেতে তুমি দণ্ড কর পাছে ॥
বিষয়ীর বচনে বিশ্বাস বিধি নয়।
পাটাখানি পেলে পরিণাম শুদ্ধ হয় ॥"

ইন্দ্র তখন শিবকে বলিলেন, কোথায় কত জমি লইবেন বলুন—

"মাগে হর তৃণান্তর কোচপাশে পড়া।
দেববৃত্তি গোবৃত্তি বিপ্রের বৃত্তি ছাড়া॥"

তখন "কশ্যপের বেটা

"দেবদেবে দিলা লিখে দেবত্তর পাট্টা॥"
"ডম্বুরের ডোরে পাটা বাঁধি দিগম্বর।
ইন্দ্রকে আশীষ করি যান যমঘর॥"

এক্ষণে পাঠক বলিতে পারেন, শিব যমের বাড়ী কেন চলিলেন। যমের মহিষটি লইতে ; মহিষ ও বৃষে চাষ হইবে।

"আজ্ঞামাত্র মহেশে মহিষ দিল ধরে॥"

চাষের সজ্জার জন্য বিশ্বকর্ম্মা শিবের ত্রিশূল লইয়া বলিলেন—

"পাঁচ মোনে পাশী করি আশী মোনে ফাল।
দু মোনের দু জলোই অর্দ্ধেকে কোদাল॥
দশ মোনের দা অষ্ট মোনের উখুন॥"

ইত্যাদি প্রকার চাষের সজ্জার কথা শিবকে শুনাইয়া দিল—

"বন্দ করি বাঘছালে জাঁতা দিল তেয়ে।
পাবকে ফেলিছে প্রেত চিতাঙ্গার বয়ে॥
সব্যহাতে সাঁড়াসিতে শূল নিল ধরে।
হাঁটুপাতি বসে বুড়া আড়ম্বর ক'রে॥
ভীষণ ভৈরব জাঁতা জাঁতে হাতে পায়।
দেতায়্যা দেতায়্যা তাকে হাঁকে উভরায়॥"

বীজ ধান্যের জন্য শিবের চিন্তা হইলে—

"কাত্যায়নী কন কান্ত কিছু নাই কেন।
কুবেরের বাটী বীজ বাড়ি করি আন॥"

কৃষক ও বলদের জন্য পার্ব্বতী বলিলেন—

"ঘরে আছে বুড়া এঁড়ে ধরে মহাবল।
যমের মহিষ আর বলাইর লাঙ্গল॥
ভীম আছে হালুয়া আর অনির্ব্বাহ কি ?"

তৎপরে চাষের বিবিধ কথা বহুবিস্তীর্ণ, যাঁহারা কৌতূহলী হইবেন, তাঁহারা শিবায়ন বা শিবসংকীর্ত্তন পাঠে অবগত হইতে পারেন।

চাষ সমাধা হইলে, ধান্য কর্ত্তন করিতে বৃকোদর চলিলেন—

"প্রণমিয়া বিশ্বনাথে,　　　বৃকোদর নামে ক্ষেতে,
হাতে লয়ে দশ মোনের দাত্র।
নিবড়ি চলিল ধেয়ে,　　　দু দণ্ডে নিলেক দায়ো,
হইল আড়াই হালা মাত্র॥"
"শুনিয়া আড়াই হালা,　　　শিব অনুমতি দিলা,
আগুনে মেটায়ে দিতে তায়॥"

বৃকোদর অগ্নিসংযোগ করিয়া "তাতে দিল ফুক"। অনন্ত কাল ধরিয়া সেই ধান্য দগ্ধ হইয়াছিল এবং ইহা হইতেই বিবিধ বর্ণের ধান্যের উৎপত্তি হইয়াছে। অদ্যাপি গম্ভীরা মধ্যে ধান্যচাষের উৎসব আচরিত হইয়া থাকে। শিব শঙ্খবণিগ্‌বেশে হিমালয়গৃহে শঙ্খ-বিক্রয়ার্থে গমন করিয়া গৌরীকে শঙ্খ পরিধান করান—

"মহামায়া মাধবকে মধ্যখানে করি।
অঙ্গনে অঙ্গনাগণ বসিলেন ঘেরি॥
পূর্ব্বমুখে পার্ব্বতী পশ্চিমমুখ হর।
দিব্যাসনে দোঁহে অভিমুখ পরস্পর॥"
"মেনকা সুন্দরী মনস্তাপ করি কন।
মর্দ্দনে মর্দ্দনে মেয়ে টেঁকে কতক্ষণ।
শাসিয়া কহিল শাঁখা বারি করে ঘস।
এ বয়সে আমিও পরেছি বার দশ॥"
"মাধব বলেন মাতা কি করিব আমি।
ঝিয়ের আঁড়রা হাত জান নাহি তুমি॥
আমাকে দিয়েছে দুঃখ আমি সে তা জানি।
ঠকৃঠকে হাতে ঠেকে কি করিব আমি॥"

পার্ব্বতীর শঙ্খপরিধানগীত সধবাস্ত্রীগণের পক্ষে বড়ই পবিত্র, অনেকেই ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করেন। এই প্রকারের বহু গীত শিবের গাজনে গীত হইয়া থাকে।

আমরা বৌদ্ধপর্ব্ব মধ্যে দেখাইয়াছি, চৈত্রসংক্রান্তিতে মহামুনিমেলা, ও বৈশাখে জন্ম-মহোৎসব হয়। শ্রীহর্ষদেবের সময়ে বুদ্ধদেবের রথ ও শোভাযাত্রা জ্যৈষ্ঠমাসে হইত। শৈবশাস্ত্রে চৈত্রমাসে শিবের দোল ও বৈশাখে পুষ্পময়-গৃহোৎসবের কথা আছে—

"মাধবে মাসি পঞ্চম্যাং সিতপক্ষে গুরোর্দিনে।
চন্দ্রে চোত্তরফল্গুন্যাং ভরণ্যাদৌ স্থিতে রবৌ॥"
"চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে যো নরস্তত্রপূজয়েৎ।
তস্য তৈ বরদৌ দেবৌ প্রযচ্ছেতাং হি বাঞ্ছিতম্॥"

"চৈত্রে মাসি ত্রয়োদশ্যাং দিনে পুণ্যতমে শুভে।
প্রতিষ্ঠিতং স্থাণুলিঙ্গং ব্রহ্মণা লোকধারিণা।"

ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা বৌদ্ধদিগের ন্যায় একই নির্দ্দিষ্ট দিনে পূজাদির ব্যবস্থা দেখিতে পাই।

গম্ভীরা।

গম্ভীরা নামের উৎপত্তির পূর্ণ বিবরণ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সহৃদয় পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা মালদহের গম্ভীরা উৎসব দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথমেই গম্ভীরার নৃত্যমণ্ডপের সাজসজ্জার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। অন্যান্য দেশে যে নিয়মে বারইয়ারির মণ্ডপ শোভিত হয়, তাহার সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই। কাগজের বিবিধ বর্ণের পদ্মপুষ্প দ্বারা গম্ভীরা একেবারেই মণ্ডিত করা হয়, ইহার কারণ কি অগ্রে তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। এই প্রথা পূর্ব্বাপর প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত আছে। প্রাচীনকালে স্বভাবপ্রস্ফুটিত পঙ্কজ বা গম্ভীর দ্বারা মণ্ডিত হইয়া গম্ভীরামণ্ডপের শোভাবৃদ্ধি হইত, এক্ষণে পুষ্পের অভাব পূর্ব্ব হইতে যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে এবং অসুবিধা এই যে, নবপ্রফুটিত পদ্মকুসুম দ্বারা প্রতিদিন সজ্জিত না করিলে গম্ভীরা-মণ্ডপের শোভা অক্ষুণ্ণ থাকে না। কাজেই গম্ভীরোৎসব তিন চারি দিন স্থায়ী থাকে বলিয়া কাগজের পদ্মপুষ্প দ্বারা গম্ভীরা শোভিত হয়। ধর্ম্মের গাজনে আমের দেহারা পদ্মপুষ্পে শোভিত হইত, এক্ষণেও হইয়া থাকে।

গম্ভীরা নামোৎপত্তির অন্যতম কারণ সম্ভবতঃ পঙ্কজম্ বা গম্ভীরম্ শোভিত বলিয়া অনুমিত হয়। গম্ভীরা শিবালয়ের অর্থেও ব্যবহৃত হয়, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। 'গম্ভীরম্' শোভিত 'গম্ভীর' মধ্যে 'গম্ভীর' দেবের পূজাস্থল বলিয়া এই মহোৎসবের নাম গম্ভীরা উৎসব এবং এই উৎসব স্থলের নাম গম্ভীরা হওয়াই সম্ভব।

গম্ভীরা উৎসবে হর-গৌরীর পূজা হইয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলে প্রতিমূর্ত্তির পূজা, আবার শিবলিঙ্গেরও পূজা হয়। যদি চৈত্রমাস ৩০ দিনে অর্থাৎ সংক্রান্তি যদি ত্রিশে তারিখে হয়, তবে ২৬শে তারিখে 'ঘটভরা,' ২৭শে 'ছোটতামাসা, ২৮শে বড়তামাসা, ২৯শে 'আহারা' এবং ৩০শে চড়কপূজা হইয়া থাকে। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ইহার বর্ণনা করিব।

এক্ষণে আর একটী কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যদি চৈত্রমাসে 'গম্ভীরা' হয়, তবে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসেও কোথায় কোথায় গম্ভীরা উৎসব হইতে দেখা যায় কেন? ইহার কারণ কতক গম্ভীরা আদি এবং কতক নূতন ও একান্ত তামসিক। আদি গম্ভীরা সকল চৈত্র মাসেই অনুষ্ঠিত হয়। তাহার বিবরণ পশ্চাতে বিবৃত হইবে। 'এদেশের মাণ্ডলিকপদ্ধতির' বিষয় কিঞ্চিৎ লিখিত হইলে গম্ভীরার বিষয় পূর্ণ হইবে। আমরা 'মাণ্ডলিক পদ্ধতি' হইতে আরও করিয়া ক্রমে ক্রমে গম্ভীরার বিষয় লিপিবদ্ধ করিলাম। গম্ভীরার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং

এককালে সর্ব্বত্র গম্ভীরা হইলে দর্শক, গায়ক, ও নর্ত্তকগণের অভাবনিবন্ধন গম্ভীরা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় না, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গম্ভীরার ব্যবস্থা হইয়াছে।

মাণ্ডলিক পদ্ধতি।

মালদহ জেলার পৌণ্ড্রক (বা পুঁড়া)গণের গম্ভীরা উৎসবে উৎসাহাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। নাগর, ধানুক, চাঁই, রাজবংশী এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যগণের মধ্যে গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক গ্রামে একাধিক মণ্ডল থাকে। মণ্ডল গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, পূর্ব্বে গ্রামের সমুদায় কার্য্যাদি মণ্ডলের আদেশে সম্পাদিত হইত। জমিদার মণ্ডলকে মান্য করিতেন। আদায় তহশীলাদি মণ্ডলের আদেশে সহজে সম্পাদিত হইত। পল্লীতে রাজকর্ম্মচারিগণ কোন কার্য্যোপলক্ষে আগমন করিলে মণ্ডল সেই কার্য্যনির্ব্বাহার্থ সাহায্য করিতে বাধ্য থাকে এবং সহজে কার্য্যোদ্ধার হয়। মধ্যে সরকার হইতে সাহাতনীপদের প্রবর্ত্তন হইয়া-ছিল। এখনও অনেকের 'সাহাতন' উপাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

প্রত্যেক মণ্ডলের অধীনে একটি গম্ভীরা থাকে। প্রাচীন ও নূতন গম্ভীরার মণ্ডল থাকে, মণ্ডল ব্যতীত কোন গম্ভীরাই দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন বা আদি গম্ভীরায় শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান আছে। জমিদার পূর্ব্বকালে মণ্ডলের সম্মানার্থ কিছু নিষ্কর জমি অথবা জমার নিরিখ সাধারণ প্রজাগণ হইতে কিঞ্চিৎ হ্রাস করিয়া দিতেন। গ্রাম্যদেবতাদির জন্য এবং শিবের গম্ভীরা পূজাদির জন্য কিঞ্চিৎ জমি প্রদান করিতেন, এই কারণে প্রাচীন গম্ভীরাসমূহের কিঞ্চিৎ জমি জমা বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখা যায়। উক্ত জমির আয় হইতে শিবপূজার ব্যয় পূর্ব্বে সম্পূর্ণ চলিত এক্ষণে কতকাংশ নির্ব্বাহ হইতেছে।

প্রত্যেক গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডল থাকে। মালদহের যত গম্ভীরা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার মধ্যে এক এক জাতির এক গম্ভীরা থাকিলেও সকল জাতির যে একটী গম্ভীরা আছে তাহাকে "ছত্রিশী গম্ভীরা" বলে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডল বর্ত্ত-মান থাকিলেও ছত্রিশীগম্ভীরার মণ্ডল পদ উক্ত মণ্ডলগণের মধ্যে একজনের থাকে। এইপ্রকার ছত্রিশীগম্ভীরার কোন কার্য্যকালে যে সভা বা বৈঠক বসে তাহাকে "ছত্রিশীবৈঠক" বলে। আদি গম্ভীরায় জমিদার বা রাজদত্ত নিষ্কর ভূসম্পত্তি থাকে, নূতন গম্ভীরায় তাহা থাকে না; তবে কোন কোন নূতন স্থাপিত গম্ভীরায় যে নিষ্কর বা সকর জমি বর্ত্তমান আছে তাহার, ভিন্ন কারণ রহিয়াছে। কেহ সামাজিক অপরাধে অপরাধী হইলে মণ্ডলের বিচারে দণ্ডিত হইয়া গম্ভীরা বা শিবোদ্দেশে কিছু জমি বা অন্য কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি শিবোদ্দেশে দান করিলেই তাহাকে সামাজিক অপরাধ হইতে মুক্তিদান করা হয়। কেহ অপত্যাদি হীন থাকিলে তাহার সম্পত্তি শিবোদ্দেশে গম্ভীরায় দান করিয়া যায়। উক্ত প্রকারে গম্ভীরার সম্পত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যতীত একাধিক বৎসর স্থায়ী হয় বা যাহা কোন মণ্ডলের অন্তর্গত নহে, এরূপ 'সখের গম্ভীরা'ও দেখা যায়।

গ্রামে মণ্ডলবংশের বৃদ্ধিসহ যদি তাহাদের মধ্যে কোনপ্রকার জ্ঞাতিবিবাদ উপস্থিত হয় তাহা হইলে গ্রামে দুইপক্ষ অবলম্বন করে, সুতরাং গ্রামের গম্ভীরাও পৃথক্ করিবার আবশ্যক হয়। এইক্ষেত্রে উক্ত গ্রামে নূতন গম্ভীরা স্থাপিত হয়, কিন্তু সেই নবপ্রতিষ্ঠিত গম্ভীরা পূর্ব্ব গম্ভীরার কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় না। এইপ্রকারে গ্রামে একাধিক গম্ভীরার উৎপত্তি হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে গ্রামে একটী মাত্র ছত্রিশীগম্ভীরা দৃষ্ট হয়।

গম্ভীরার ভাঙ্গন।

গম্ভীরার কিছু পূর্ব্বে গম্ভীরা উৎসবের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ গ্রামবাসিগণের মিলিত একটী বৈঠক বসে, তাহাতে মণ্ডলাদি ভদ্রগণ গম্ভীরার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ আনুমানিক একটা ব্যয়ের তালিকা করেন, তৎপরে চাঁদা নির্দ্দিষ্ট হয়, ইহাকেই 'ভাঙ্গন' বলে। এই বৈঠককে সকলে ভয় করে, ইহাতে সামাজিক সকল অপরাধের বিচার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে এবং গম্ভীরা বা শিবপূজার ব্যয়নির্ব্বাহার্থে সকলকে অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

গম্ভীরা-মণ্ডপের আড়ম্বর বৃদ্ধি অনুসারে বহু ব্যয়ে বিবিধ প্রতিমা নির্ম্মাণ ও সজ্জিত হইয়া থাকে। কখন কখন পুত্তলিকাদির সভা নির্ম্মিত হয়। সকল সভাই শিবলীলা অবলম্বনে গঠিত হইয়া থাকে।

ঘট ভরা।

সচরাচর ছোট তামাসার পূর্ব্বদিবস ঘটস্থাপন হইয়া থাকে। সর্ব্বত্র এ নিয়ম নাই। স্থানীয় পূর্ব্ব প্রথানুসারে কোথাও সপ্তাহ পূর্ব্বে, কোথাও নবমদিবস বা তিনদিবস পূর্ব্বে ঘটস্থাপনা (ঘটভরা) হইয়া থাকে।

প্রধান ভক্ত (সন্ন্যাসী) গম্ভীরা পূজার সমুদায় পূজার নৈবেদ্য প্রভৃতি প্রস্তুত কার্য্যের সাহায্য করে। পুরুষানুক্রমে এই ভক্তপদ কোথায় কোথায় বর্ত্তমান আছে, এক্ষণে অধিকাংশস্থলে বেতন দেওয়া হয়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এই ঘটস্থাপন দিবস হইতে ভক্তগণ প্রথানুসারে নিয়মাদি পালন করিত, এক্ষণে প্রায় তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। এই দিন হইতেই গম্ভীরাগৃহে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়।

প্রাচীন গম্ভীরামণ্ডপ।

পূর্ব্বকালে অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসরের ঊর্দ্ধকালে, যেপ্রকার গম্ভীরামণ্ডপ সজ্জিত হইত, অধুনা তাহার সহিত তুলনা হইতেই পারে না। অধুনা যে প্রকার বিলাসিতার স্রোতঃ বহিয়াছে, কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে মালদহে তাহার একাংশও বর্ত্তমান ছিল না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বকার গম্ভীরা-মণ্ডপের শোভার বিষয় শ্রবণ করিলে বিস্ময় প্রকাশ করিতে হয়। পূর্ব্বের লোকে বিলাসিতায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। গম্ভীরা ও নৃত্যমণ্ডপ প্রস্ফুটিত পঙ্কজে পরিশোভিত হইত। ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিত এবং ধূপ ধূনাদির ধূমে গম্ভীরা পূর্ণ হইত।

গম্ভীরার নৃত্যমণ্ডপে 'সরা জ্বলিত' অর্থাৎ বংশদণ্ডের উপরিভাগে একটী সরাতে

সর্ষপের পুঁটুলি তৈল সিক্ত করিয়া জ্বালান হইত। বাঁশের চোঙ্গায় তৈল থাকিত, তাহাই মধ্যে মধ্যে প্রদত্ত হইত। এ ছাড়া ধূপও জ্বলিত। ছিন্নবস্ত্র তৈলসিক্ত করিয়া মশালপ্রস্তুত হইত। যৎকালে ভক্তগণ নৃত্যগীতাদি করিতে আগমন করিত, তৎকালে তাহাদের সম্মুখে সেই মশাল ধরা হইত এবং তাহারা ঐ প্রজ্বলিত মশালের আলোকে সকলকে নৃত্যাদি দেখাইত। নৃত্য ও গীতকারকগণ উকা প্রজ্বলিত করিয়া গম্ভীরা হইতে গম্ভীরান্তরে গমন করিত। কতকগুলি পাটকাঠি একত্র গোছা-বাধার নাম উকা। সাধারণের উপবেশনের জন্য কোন শয্যার বন্দোবস্ত ছিল না। নিজ নিজ গৃহ হইতে আসন আনয়ন করিতে হইত। মণ্ডলাদি জনগণের জন্য মোটাচটের স্থাজা (বিছানা, শয্যা) বিছান হইত। ধূমপানের ব্যবস্থা ছিল। ক্রমে ক্রমে গম্ভীরা-নৃত্যমণ্ডপের উপর কতিপয় বংশদণ্ড সাহায্যে চট টাঙ্গান হইত, ইহাতে আতপতাপ নিবারিত হইত। দুই চারিটি লৌহ-শৃঙ্খলাবদ্ধ লৌহের চতুর্মুখ প্রদীপ (চোমক) লম্বিত হইত। বড় বড় দীপাধার বা পিলসুজ (গাছা) যাহা আড়াই বা তিন হাত উচ্চ তাহার উপর চতুর্ম্মুখ প্রদীপ প্রজ্বলিত হইত, উক্ত চতুর্ম্মুখ প্রদীপের মধ্যস্থলে একটী স্থূল কর্দ্দমপিণ্ড দেওয়া হইত, কারণ তাহাতে তৈলবর্ত্তিকার নিকটে স্বল্প তৈল থাকিত এবং প্রজ্বলিত বর্ত্তিমুখে অল্পে অল্পে তৈল যাইত। দুই চারি খানি রামকেলীর বস্ত্রোপরি মৃত্তিকলিপ্ত করিয়া যে চিত্র অঙ্কিত হইত, তাহাই গম্ভীরার শোভা বৃদ্ধি করিত।

ক্রমশঃ সুবৃহৎ চন্দ্রাতপ, সুবৃহৎ ঝাড়, দেয়ালগির, লণ্ঠন প্রভৃতি সাজের সঙ্গে মোমবাতী জ্বলিতে আরম্ভ হইল, আর্টষ্টুডিওর ছবি, কালীঘাটের পট গম্ভীরা-মণ্ডপের শোভা সম্বর্দ্ধন করিল। বসিবার জন্য ফরাশ বিছানা, তাকিয়াবালিস, বাঁধা হুকা ইত্যাদির আবির্ভাব হইল। এক্ষণে রবিবর্ম্মার ছবি, উৎকৃষ্ট কেরোসিন ল্যাম্প, বৃহৎ বেলোয়ারি ঝাড়, ধ্বজাপতাকা, বিবিধ মাল্য,ফুলঝাড়,কৃত্রিম পক্ষী,ফলমূলাদির দ্বারা এবং তারের আলো বিবিধ বৈদেশিক সাজসজ্জায় গম্ভীরা শোভিত হইতেছে, কিন্তু সেই প্রাচীন কালের পদ্মশোভিত গম্ভীরা-মণ্ডপ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। চেয়ার, বেঞ্চ, ফরাশ বিছানা, আতরদান, গোলাপ-পাশ যথেষ্ট আমদানী হইয়াছে। ফিচকারি দ্বারা ঘন ঘন গোলাপ জল বৃষ্টি করিয়া দর্শকবৃন্দের মস্তক শীতল করা হইতেছে। এখন নৃত্য কালে বিবিধ মহাতাপের বাতি (রংমশাল) জ্বলিয়াছে।

অদ্যাপি বরেন্দ্রভূমিতে কোঁচ পলিহারা (যাহারা বাঙ্গালু নামে খ্যাত) তাহাদের গম্ভীরায় প্রাচীনত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে।

বরিনের (বরেন্দ্রভূমির) বাঙ্গালদের গম্ভীরা।

বরেন্দ্রভূমির নিম্নশ্রেণীস্থ জনগণের (কোঁচ, পলে) সাধারণ নাম 'বাঙ্গাল'। বাঙ্গালগণ চৈত্র মাসের শেষে শিবপূজা করিয়া থাকে। তাহাদের গম্ভীরায় আদৌ বিলাসিতার চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। গম্ভীরা গৃহটী জীর্ণ, শিবলিঙ্গ প্রায় মৃত্তিকা-মগ্ন, গৃহাভ্যন্তরে চামর, শুষ্ক ফুলমালা, কাষ্ঠের কালী প্রভৃতি দেবদেবীর মুখা, পুরাতন ঘট এবং ধুনাচি বর্ত্তমান। গম্ভীরা-প্রাঙ্গণ বিবিধ উদ্ভিদ্‌দামে পূর্ণ। কেবল পূজার সময়, গোময় দ্বারা গৃহাভ্যন্তর

লিপ্ত করা হয়। প্রাঙ্গণের সামান্যাংশ পরিস্কৃত করিয়া রাখে। গম্ভীরা-উৎসবের সময় বাঙ্গালেরা আন্তরিক ভক্তি ও পবিত্রতাপূর্ণ হইয়া উঠে। তাহাদের পূজক ব্রাহ্মণ নাই। তাহারা নিজেই পূজাদি সম্পাদন করিয়া থাকে। ঢাক বাজাইবার জন্য লোকের আবশ্যক নাই, তাহারা স্বয়ংই এ কাজ করে। প্রধান সন্ন্যাসী বা গুণী পূজা করে। নৃত্যগীতাদি উৎসব সহ 'জাগরণ' এবং মুখার নৃত্য হয়। তাহাদের উপর বহু গ্রাম্য ও গ্রামান্তরের ভূত ভর করিয়া থাকে। বাঙ্গালেরা ভূত বিশ্বাস করে এবং প্রতি গৃহে ভূতের পূজা দেয়। তাহারা মৃত্যুর পর স্বর্গ-বাস বড় পছন্দ করে না, তাহারা বলে "কেষ্ট বিষ্ট হয়ে কি করমু, মশনা মুশনী হমু যে ঘরে রহমু"। অর্থাৎ দেবত্ব প্রাপ্তে সুখ নাই, ভূত প্রেত হইয়া গৃহে থাকিলে অপার সুখানুভব হইবে, এই বিশ্বাসে তাহারা গৃহাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিন্দুরলিপ্ত বেদী প্রস্তুত করিয়া থাকে। তাহারা বলে, তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের ও পিতা মাতার ভৌতিক দেহ বা ভূত আত্মা উক্ত সিন্দুরলিপ্ত বেদীতে অবস্থান করে। গম্ভীরা-পূজার সময়ে প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে উক্ত প্রকার বহু ভূতের পূজা হইয়া থাকে। এক গ্রামের ভূত অন্য গ্রামের ভূতের সহিত বিবাদ করে। গ্রামের ভূত গম্ভীরামণ্ডপে কোন ভক্তের উপর আবির্ভূত হইলে প্রকৃত সত্য কথা বলে না, গ্রামান্তরের ভূত সত্য কথা বলিয়া থাকে, সাধারণেরই এই বিশ্বাস।

গম্ভীরা-পূজায় শিবপূজাপেক্ষা ভূতের পূজারই ঘটা দৃষ্ট হয়। গম্ভীরা-পূজায় ছোট তামাসাও বড় তামাসার ন্যায় অনুষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু তাহা অন্যত্র আচরিত গম্ভীরার ন্যায় নহে। মালদহে মুখার নৃত্য হয়, কিন্তু মেহেদীপুর বা ভোলাহাটীর মত নহে। সন্ন্যাসী বা ভক্তের উপর যখন ভর নামে অর্থাৎ যখন ভূতাবেশ হয়, তৎকালে তাহাদের মস্তকসঞ্চালন, হস্ত-পদাদির বিক্ষেপ ও আকুঞ্চন, মুখভঙ্গি, নৃত্য ও উৎকট চীৎকার প্রভৃতি অতি অদ্ভুত ব্যাপার। প্রধান সন্ন্যাসী এই প্রকার আবেশ দর্শনে কোন ভূত বা মশান চামুণ্ডা কালীর আবির্ভাব নিশ্চয় করিয়া লইয়া সেই সেই দেবের উদ্দেশ্যে, সেই সেই দেবের প্রীতির জন্য শান্তি পাঠ শোনায় এবং পুষ্প ও গঙ্গাজল প্রদান করে। তৎপরে প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নৃত্য করান হয়। প্রত্যেকে আপন আপন নৃত্যবাদ্য শ্রবণে নৃত্য আরম্ভ করে। সেই নৃত্য তাণ্ডব-নৃত্য, উহা বিকট চীৎকার সহকারে সম্পাদিত হয়। ভূতাবিষ্টের বা মূল সন্ন্যাসীর নিকট অনেকে ব্যাধির ঔষধ পায়, স্ত্রীগণ পুতি বশের ঔষধ গ্রহণ করে। 'জাগরণ' দিবস সমুদায় রাত্রি ঐ প্রকার নৃত্য এবং 'মুখার' নৃত্য হইয়া থাকে। গীতবাদ্য এবং শিবের বন্দনাও চলিয়া থাকে। শিবের চাষের পালা হয়। বালক বা যুবক সন্ন্যাসী বৃদ্ধগণের মধ্যে ধান ছিটাইয়া দেয়, কেহ বৃষ হইয়া হাল কর্ষণ ব্যাপারে লিপ্ত হয়, কেহ পক্ষী হইয়া ধান্য ভক্ষণ করে, ইত্যাকার বহুবিধ ব্যাপার হইতে দেখা যায়।

তৃতীয় দিবস সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে "মশান" নৃত্য হইয়া থাকে। এই দিবস প্রত্যূষে 'শবনৃত্য' হয়। পূর্ব্ব দিবস কিম্বা দুই এক দিবস আরও পূর্ব্বে হাড়ি কোন স্থান হইতে মৃতদেহ লইয়া আইসে এবং বিবিধ অনুষ্ঠানসহ মন্ত্রপূত করিয়া 'জাগার' এবং

জলাশয় মধ্যে বা তাহার সন্নিকটে কোন বৃক্ষোপরি শব বন্ধন করিয়া রাখে। 'মশান নাচের' সময় উক্ত 'জাগান শব'কে মাল্য ও সিন্দুরাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া হাড়ি বিবিধ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে শবের কটিদেশে রজ্জু সংবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে লইয়া গম্ভীরা-মণ্ডপে আনয়ন করে। এক্ষণে এই প্রকার উৎসব দেখা যায় না। ভক্তগণের উপর 'পাঁতা-নামে' অর্থাৎ গ্রাম্য দেবতার আবির্ভাব হয়। যাহার উপর 'পাঁতানামে' সেই ব্যক্তি বিকট চীৎকার করিয়া অঙ্গ ভঙ্গি সহকারে দর্শকগণের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করিতে প্রয়াস পায়। চড়ক ও বাণফোড়া পূর্ব্বের মত এক্ষণে আর হয় না।

ছোট তামাসা।

'ছোটতামাসার' দিন বিশেষ কোন প্রকার উৎসবাদির অনুষ্ঠান হয় না। হরপার্ব্বতীর পূজা আরম্ভ হয়। সন্ধ্যার সময় বালকগণ নৃত্য করে। রাত্রিকালে সামান্য সামান্য নৃত্যাদি এবং কোন কোন মুখার নৃত্যও হইয়া থাকে। নিম্নে মুখা ও অন্যান্য প্রকার নৃত্যের বিবরণ লিখিত হইল।

মুখা (মুখোস্)।

কালিকা, চামুণ্ডা, নরসিংহ, বাসুলী, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, বুড়া বুড়ী, শিব ইত্যাদি মুখার ব্যবহার হইয়া থাকে এবং ভূত, প্রেত, কার্ত্তিক, খোঁড়া ও চালী প্রভৃতির নৃত্যও হয়। মুখা বা মুখোশ কাষ্ঠনির্ম্মিত বা মৃত্তিকানির্ম্মিতও হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে কাষ্ঠনির্ম্মিত মুখাই ব্যবহৃত হইত। নিম্বকাষ্ঠের মুখা প্রশস্ত। সকল সূত্রধর মুখা খোদিত করিতে পারে না। শাস্ত্রোক্ত প্রমাণানুসারে মুখা নির্ম্মিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে যে দেবদেবীর যে যে প্রকার মূর্ত্তির বর্ণনা আছে, মুখা তদ্রূপ হইয়া থাকে। পটুয়ারা মুখার উপর বর্ণবিন্যাস করিয়া দেয়। কুম্ভকারেরা কালী প্রভৃতি মুখা গড়িয়া ও তাহাতে বর্ণফলিত করিয়া বিক্রয় করে। মালাকরেরা উক্ত মুখার শিরোভূষণ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। নৃত্য করিবার পূর্ব্বে ভক্ত গম্ভীরা-গৃহে পূজকের নিকট নূতন কাষ্ঠনির্ম্মিত মুখার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া লয়েন। যাহাদের মুখা আছে, তাহারা বিজয়াদশমীর দিবস পূজাদি প্রদান করিয়া থাকে। এক্ষণে এইপ্রকার পূজাপ্রথা প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে। অনেক প্রাচীন মুখা গম্ভীরাগৃহে লম্বিত থাকিতে দেখা যায়। এদেশের সাধারণের বিশ্বাস, কোন কোন মুখা জাগ্রত এবং কোন কোন মুখার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভীষণ-ক্রোধপরায়ণা। অনেকে মুখা লইয়া নৃত্য করিতে গিয়া প্রাণ হারাই-য়াছে। পূর্ব্বে যাহারা দেব-দেবী বিশেষতঃ কালী, চামুণ্ডা, বাসুলী, নরসিংহ প্রভৃতি দেব-দেবীর মুখা লইয়া নৃত্য করিত, তাহারা তৈলাদি বর্জ্জন এবং হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া পবিত্র মনে পবিত্র বসনভূষণে ভূষিত হইয়া নৃত্য করিত। এক্ষণে সর্ব্বত্র এরূপ প্রথা আর দৃষ্ট হয় না।

মুখার উর্দ্ধদিকে ও পশ্চাদংশে একটী এবং দুই কর্ণের পশ্চাতে দুইটী ছিদ্র দৃষ্ট হয়, তাহাতে রজ্জু সংবদ্ধ থাকে, সেই রজ্জু দ্বারা মুখা মুখের উপর বন্ধন করা হয়। মুখার ঘর্ম্মপঙ্ক হইতে মুখ রক্ষা করিবার জন্য চাদর বা বস্ত্রখণ্ড দিয়া কর্ণবেষ্টন করিয়া পাগড়ী বাঁধা হয়।

ঘোড়ানাচের ঘোড়া বংশনির্ম্মিত ও কাগজাদি দ্বারা মণ্ডিত ঘোড়ার পৃষ্ঠদেশে যেখানে 'জিন' দিতে হয়, তথায় ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্রের মধ্যে অশ্বারোহী কটিদেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া অশ্বের উভয় পার্শ্বস্থিত রজ্জু স্কন্ধদেশে রক্ষা করিয়া নৃত্য করিতে থাকে। কার্ত্তিকের ময়ূরাদির নৃত্যও ঐপ্রকার। এতদ্ব্যতীত ভালুকনাচও হইয়া থাকে, এক্ষেত্রে ভল্লুকের মুখা এবং কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত শণ বা পাটের চুল দিয়া সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া মানব ভল্লুকের মুখা পরিধান করিয়া থাকে এবং অপর একজন সেই ভালুককে নাচায়। দুর্গাপ্রতিমার ন্যায় তাঁহার ক্ষুদ্র চালচিত্রখানিও সুন্দররূপে সজ্জিত করা হয়। একব্যক্তি আপন কটিদেশের সম্মুখে চালী বন্ধন করে এবং ছোট ছোট বালক বালিকাকে তদুপরি বসাইয়া দুই হস্তদ্বারা পশ্চাৎ হইতে ধরিয়া নৃত্য করায়। কালীমুখার নৃত্যকালে কখন কখন চারিখানি হস্তবিশিষ্ট দেখা যায়, উহার চারিখানি হস্তই কাষ্ঠের। নৃত্যকারী আপন হস্ত পশ্চাতে বন্ধন করিয়া নৃত্য করে। চামুণ্ডা-মুখা-নৃত্যকালে হস্তে খর্পর ও পারাবতাদি ধারণ করিয়া নাচিতে থাকে। প্রধান ভক্ত হনুমানের মুখা পরিধান করিয়া লঙ্কাদগ্ধ, সাগরপার ইত্যাদির অনুষ্ঠান করে। যথাস্থানে তাহা বিবৃত হইবে। শিব-পার্ব্বতী শান্তভাবে নৃত্য করিয়া থাকে। পার্ব্বতীর কক্ষে পূর্ণঘট ও আম্রশাখা এবং একহস্তে প্রস্ফুটিত কমল থাকে। বুঢ়াবুঢ়ীর (বুড়াবুড়ী) নৃত্য কৌতুকপ্রদ। সকলপ্রকার মুখার নৃত্য সম্বন্ধে কোনপ্রকার অভিমত ব্যক্ত করিবার বিশেষ কারণ নাই, কিন্তু নৃসিংহ মুখার নৃত্য এবং মুখাসম্বন্ধে বিশেষ বলিবার কারণ রহিয়াছে। আমরা দেখিতে পাইতেছি, গম্ভীরামণ্ডপে নৃত্য ব্যাপারে শিব, শক্তি ও শিবপ্রমথগণ লইয়াই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, ইহাই প্রাচীন প্রথা এবং এই প্রথা যে পৌরাণিক শাস্ত্রসঙ্গত তাহাও শৈব-প্রভাব প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি ; কিন্তু 'নরসিং (নরসিংহ) মুখার নৃত্যের কোনই হেতু বর্ত্তমান নাই। 'নারসিংহী' নামে চণ্ডীর একমূর্ত্তির বিষয় বর্ণিত আছে। সম্ভবতঃ গম্ভীরামণ্ডপে শিবসকাশে 'নৃসিংহ' নৃত্যস্থলে পূর্ব্বে 'নারসিংহী'র নৃত্যাদির অনুষ্ঠান হইত ; ভ্রম ক্রমে নারসিংহী স্থলে এক্ষণে নৃসিংহ বলিয়া সাধারণে প্রচলিত রহিয়াছে, এই ভ্রম সংশোধন আবশ্যক। নিম্নে নারসিংহীর ধ্যান ও প্রণাম লিখিত হইল, ইহা হইতে শিব-শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন—

নারসিংহী ধ্যান।

"ওঁ সুরবেশা বলোদ্ভিন্না নানাভরণভূষিতা।
ভিন্দন্তী কশিপোর্ব্বক্ষো নারসিংহীতি বিশ্রুতা॥"

নারসিংহী প্রণাম।

"ওঁ নৃসিংহরূপিণীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাং।
শুভদাং সুপ্রভাং নিত্যাং নারসিংহীং নমাম্যহং॥"

এক্ষণে বিবেচনা হইতেছে, নরসিংহমুখার নাম না বলিয়া নারসিংহী মুখার নৃত্য ইত্যাদি বলাই প্রকৃত।

ভক্তগড়া, শিবগড়া, বন্দনা

ছোট তামাসার ও বড় তামাসার দিন সন্ধ্যার সময় ভক্ত ও বালাভক্তগণ গম্ভীরামণ্ডপে সমবেত হইলে গম্ভীরার মণ্ডল বা প্রধান ভক্ত বেত্রহস্তে দণ্ডায়মান হইয়া অন্য ভক্তবৃন্দকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড় করাইয়া সকলে শিবসম্মুখে শিব-বন্দনা পাঠ করিতে থাকে। প্রধান ভক্ত বন্দনা পাঠ করান। বন্দনাপাঠকালে ভক্তগণকে এক পদে দণ্ডায়মান থাকিতে হয় এবং প্রত্যেক বন্দনার এক এক অংশ উচ্চারিত হইলে, এক পদে দুই পদ অগ্রসর হইয়া পুনশ্চ পূর্ব্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের গম্ভীরার বন্দনা মিলাইয়া পাঠ করিলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও মূল উদ্দেশ্য একই বলিয়া মনে হইবে।

শিবগড়ার বন্দনা

(ধানতলা শ্রীগদাধর দাসের নিকট প্রাপ্ত)

(১)

কোথা হইতে আইলেন গোসাঁই, কোথায় তোমার স্থিতি।
আহার নাই পানি নাই আস নিতি নিতি ॥
জল নাই স্থল নাই সকল শূন্যাকার।
কর্পূরেতে ভর কর পবন আহার ॥ শিবনাথ কি মহেশ।

(২)

না ছিল জলস্থল দেবের মণ্ডল
কোন রূপে ছিল ধর্ম্ম হয়ে শূন্যাকার।
কাঁকড়াকে পাঠালেন মৃত্তিকার তরে
কাঁকড়া আনিল মৃত্তিকা বিন্দু পরিমাণ।
বিন্দু পরিমাণ মধ্যে তিল পরিমাণ।
তিল পরিমাণ মধ্যে বেল পরিমাণ ॥
কূর্ম্মের পৃষ্ঠে পৃথিবী করিল সৃজন।
কহন ত গুরুগোঁসাই সরস্বতীর বরে।
পৃথিবীর জন্ম কথা কহি সভার ভিতরে ॥ শিবনাথ কি মহেশ।

(৩)

লালগিরি পর্ব্বত দর্শন দোয়ার।
তাহাতে জন্ম না হইল আমার ॥
হাত মোর সুদ্ধ পা মোর সুদ্ধ
সুদ্ধ মোর পঞ্চ মুখের বাণি।
না পূজিলাম আদ্যের ভবানী ॥
আগমপূর্ব্ববেদ দেহসুদ্ধ শিবদোয়ারে জানি ॥ শিবনাথ কি মহেশ।

(৪)

উলুকে বলে গুরু এই যে কারণ
গুরুর বচনে সুদ্ধ মন্দিরের চারি কোন।
মন্দিরে বসিল গুরু দেবরাজ মন।
গুরুর বচনে সুদ্ধ মোর ভক্তগণ* ॥ শিবনাথ কি মহেশ।

(৫)

কাল কামাখ্যার আজ্ঞা গড়ে দিলা দা
আগে বসি ব্রহ্মা পাছে বসি বিষ্ণু মধ্যে বসে শিব।
শিব শিব স্মরণে আজ ব্যাতে পলো জীব ॥

ভোলানাথ বা শিবনাথ মহেশ।

(৬)

স্বর্গের কপিলা মর্ত্তে নামিলা।
বিশ্বেশ্বর বোঁত বাঁহনে চড়িলা ॥
নরলোক তার বসে তার গোথনে হয় পৃথিবী সুদ্ধ।
তাতে উজে দধি ঘৃত ঘোল দুগ্ধ ॥
কহন্ ত গুরু গোসাঁই সরস্বতীর বরে।
কপিলার জন্মকথা কহি সভার ভিতরে ॥

ভোলানাথ কি শিবনাথ মহেশ।

(৭)

শুন শুন মহাদেব কি করিছ বসি।
সমুদ্রমন্থন কৈল দেবগণে আসি ॥
ইন্দ্র নিল উচ্চৈঃশ্রবা লক্ষ্মী নিল নারায়ণ।
আর যত ছিল তাহা নিল দেবগণ ॥
শেষে মহাদেব তুমি পৌলে ফাঁকি।
ক্রোধে মহাদেব বলে আমি এখন করি কি ॥

ভোলানাথ কি শিবনাথ মহেশ।

নিম্নলিখিত বন্দনাপাঠান্তে গড়া দিতে হয়।

(৮)

জল বন্দ স্থল বন্দ বুড়াশিবের গম্ভীরা বন্দ
আর বন্দ সরস্বতীর গান।
বাসুয়া বাহনে শিব তার চরণে প্রণাম। দাতানাথ কি শিবনাথ মহেশ।

* পাঠান্তর—"মোর মাথার চুল।"

(৯)

(জলবন্দ ইত্যাদি)—মুষা বাহনে গণেশ এলেন তাঁর চরণে প্রণাম।

দাতানাথ ইত্যাদি।

(১০)

(জলবন্দ ইত্যাদি)—মোর বাহনে কার্ত্তিক তাঁর চরণে প্রণাম। ঐ

(১১)

(জলবন্দ ইত্যাদি)—প্যাঁচা বাহনে লক্ষ্মী তাঁর চরণে প্রণাম। ঐ

(১২)

(জলবন্দ ইত্যাদি)—মকর বাহনে গঙ্গা তাঁর চরণে প্রণাম। ঐ

(১৩)

(জলবন্দ ইত্যাদি)—সিংহবাহনে দুর্গা তাঁর চরণে প্রণাম। ঐ

(১৪)

(জলবন্দ ইত্যাদি)—মোষ বাহনে যম তাঁর চরণে প্রণাম। দাতানাথ ইত্যাদি।

(১৫)

(জলবন্দ ইত্যাদি)—হংস বাহনে ব্রহ্মা তাঁর চরণে প্রণাম। দাতানাথ ইত্যাদি।

(১৬)

(জলবন্দ ইত্যাদি)—উল্লুক বাহনে ত্রিশকোটী দেবতা তাঁর চরণে প্রণাম।

দাতানাথ ইত্যাদি।

(১৭)

(জলবন্দ ইত্যাদি)—কাহার নাম না জানি তাঁদের চরণে প্রণাম।

দাতানাথ ইত্যাদি।

(১৮)

শ্যাতের ঘোঁড়া করে ল্যাতের পালান।
জয় জগন্নাথ আজ্ঞা কোটাল
মোকে মুক্ত কর দক্ষিণ দোয়ার ॥
দক্ষিণ দোয়ারে আছে জয় জগন্নাথ।
তাঁর পুরিতে লোক কিনিয়া খায় ভাত।
কমণ্ডলে জল নাই মস্তকে মুছে হাত ॥ দাতানাথ ইত্যাদি।

(১৯)

শ্যাতের ঘোঁড়া ল্যাতের পালনে
জয় জগন্নাথ আজ্ঞে কোটাল
মোকে মুক্ত কর পশ্চিম দোয়ার

পশ্চিম দোয়ারে আছে ভীম একাদশ
তাঁহার চরণে প্রণাম ॥ ভোলানাথ ইত্যাদি।

(২০)

শ্যাতের ঘোঁড়া ইত্যাদি। * * * *
মোকে মুক্ত কর উত্তর দোয়ার
উত্তর দোয়ারে আছে ভানু ভাস্কর রায়
তাঁহার চরণে প্রণাম ॥ ভোলানাথ ইত্যাদি।

(২১)

শ্যাতের ঘোঁড়া ইত্যাদি * * * *
মোকে মুক্ত কর পূর্ব্ব দোয়ার
পূর্ব্ব দোয়ারে আছে কামরূপ কামিখ্যা হাড়িঝি মা চণ্ডীর আজ্ঞা
তাঁহার চরণে প্রণাম। ভোলানাথ ইত্যাদি।

শিবগড়া সম্বন্ধে একটি অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ বিবরণ রাধানগরনিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন দাসের নিকট হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার লিখিত ভক্তগড়া নিম্নে লিখিত হইল।

নমঃ শিবায়।

(১)

জলময় সংসার চিন্তিত ভগবান।
কি মতে ছিলে হে প্রভু হইয়া শূন্যকার ॥
কাঁকড়া সৃজনি হেমের আকার।
কাঁকড়াকে করিল আজ্ঞা মৃত্তিকা অনিবার ॥
কাঁকড়া আনিল মৃত্তিকা হেম পরিমাণ।
সেই ডিম্ব হইল দুইখান ॥
কি মতে পৃথিবী সৃজন করিল ভগবান। শিবনাথ কি মহেশ।

(২)

মাটি মাটি মাটি সৃজন করিল কে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনি মাটি সৃজন করিল যে ॥
সে কাল কামার ব্যাটা গড়িয়া দিল দা।
আগা পাছা বুঝে তার মাঝে দিল ছ্যা ॥
আগে বসে ব্রহ্মা তার পাছে বসে বিষ্ণু
তার মাঝে বসে শিব।
যেথানে শিবের দ্বাদশ থাকে সেথানে বসুক্ জীব ॥ শিবনাথ কি মহেশ।

(৩)

মাটি মাটি মাটি সৃজন করিল কে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ তিনে মাটি সৃজন করিল যে॥
সে কালকুমার বলে গোঁসাই মনে পড়িল।
কালকুমার ব্যাটা ছিল দুতিন ভাই॥
মাটি কাটিয়া তারা করিল ঠাঁই ঠাঁই॥
মাটি কাটিয়া তারা চড়িয়ে দিল চাকে।
ঘট ধুব্‌চি ডঙ্কের পাতিল গড়ালো আড়াই পাকে॥
রবি শুকাইয়া দিল ব্রহ্মা পোড়াইয়া দিল
ত্রিশকোটী দেবতা দিল বর।
ঘট ধুব্‌চির জন্মকথা বলিলাম সভার ভিতর॥
শিবনাথ কি মহেশ।

(৪)

ধবল খাটে ধবল পাটে ধবল সিংহাসন।
ধবল খাটে বসে আছেন ধর্ম্মনিরঞ্জন॥
ধবল আকার গোঁসাই ধবল নৈরাকার।
ধবল চরণে তাঁরে করিলহে পার॥
শিবনাথ কি মহেশ।

(৫)

উঠ উঠ সদাশিব নিদ্রা কর ভঙ্গ।
তোমাকে দেখিতে আইল আউলের ভক্তগণ॥
খোল চন্দন কাঠের কপাট, দেয় দুধ গঙ্গাজল।
তোমার চরণে দ্বাদশ প্রণাম॥
শিবনাথ কি মহেশ।

(৬)

আমরা আইলাম হরষে দরশে।
দরশন দাও গোঁসাই সুবর্ণের দৃষ্টে॥
আমরা আউলের ভক্ত
তোমার চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
শিবনাথ কি মহেশ।

(৭)

সোনারি তার সোনারি বার সোণারি গা জলে।

শোভে মুক্তা প্রবাল শিবের ভক্ত যে বাণরাজা আছে।
তার চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
শিবনাথ কি মহেশ।

(৮)

পবনের পুত্র বীর হনুমান।
আনিয়া যোগাল পাথর চারি খান॥
চাঁচিয়া ছিলিয়া গড়াল শ্রীকান্ত
তাতে ঢালিল কাঁচ ঢাল।
শ্বেত চামরে ছাহিল চণ্ডীমণ্ডপের চারি চাল॥
শিবনাথ কি মহেশ।

(৯)

তাঁবারি চট্‌পটি সুবর্ণের নাল।
শিবের দোয়ারে দ্বারী নন্দি ভৃঙ্গী মহাকাল॥
ঘুচায় ঘুচায় নন্দি চন্দন কেয়ার।
দ্বারসুদ্ধ বালাভক্ত কত শৈব নাম॥
কাশীশ্বর শিবের দ্বার প্রবেশ করিল যত ভক্তগণ
আমরা আউলের ভক্ত বিষ্ণুবাই গম্ভীরা সুদ্ধ।
শিবনাথ কি মহেশ।

(১০)

ছয়মাসের খরচ দেব অঞ্চলে বাঁধিল।
ঝয় ঝঙ্কার বাটে দেব বনে প্রবেশিল॥
চাকন চিকন গাছ তার তলা হতে পাত।
নয় হয় এই হয় করণীর গাছ।
আগা গোড়া কাটি তার মদ্ধখান নিলে।
চাঁচিয়া ছিলিয়া কাঠি নির্ম্মাণ করিলে॥
বাম কাঠি সরস্বতী দক্ষিণ কাঠি উর্দ্ধ।
শিবদুর্গার বরে এই গম্ভীরার ঢ্যাক্যার কাঠি হাতে সুদ্ধ॥
শিবনাথ কি মহেশ।

(১১)

লঙ্কা গেল হনুমান খায় আম্রফল।
মর্ত্তে ফেলিল আঁঠি তাইতে হইল বৃক্ষ অমরাবতী।
আগে বাহ্রাইয়া অঙ্কুর, তার পাছে বাহ্রায় গাছ।

ছয় ছয় মাসে বাড়ে দ্বাদশ হাত।
আগাল গোড়া কাটি তার মধ্যখান নিলে।
চাঁচিয়া ছিলিয়া ঢাক নির্ম্মাণ করিলে।
কামার গড়িয়া দিলো লোহার ক
মুচিরাম চড়াইয়া দিল কপিলার ছড়ি॥
শিব শিব বলিয়া ঢাকে দিল ঘা।
মড়া চামড়া কড়িলেক বিয়াল্লিশ রা॥

শিবনাথ কি মহেশ।

(১২)

শুদ্ধ সভায় বসে গুরু গুরুর গলায় শতেশ্বরীর হার।
গুরু বাক্যে শুদ্ধ করি আদ্যের ভাণ্ডার॥
কৃপা করি গুরু মোরে শিখালেন বচন।
গুরু বাক্যে শুদ্ধ করি চণ্ডীমণ্ডপের চারি কোণ॥

শিবনাথ কি মহেশ।

(১৩)

শুদ্ধ আমার মাতাপিতা শুদ্ধ বসুমতী।
যা হইতে হইল আমার উৎপত্তি॥
দেবতার বর হইল আমার
আসন শুদ্ধ করি গেল ধর্ম্ম গুরু মহাশয়॥

শিবনাথ কি মহেশ।

(১৪)

জল বন্দ স্থল বন্দ বন্দ শিবের কুঁড়্যা।
আট হাত মৃত্তিকা বন্দ চন্দ্র সূর্য্য জুড়্যা॥
"কাউসেন দত্তের" ব্যাটা "নয়সেন দত্ত"।
যে জন পৃথিবীতে আনিল মহেশ্বর ব্রত॥
তাহার চরণে আমার দণ্ডবৎ।

শিবনাথ কি মহেশ।

(১৫)

বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিল চাষ।
আষাঢ় মাসে শিব ঠাকুর বুনিল কার্পাস॥
কার্পাস বুনিয়া শিব গ্যাল কুচনীপাড়া।
কুচনীপাড়া হইতে দিয়ে এলো সাড়া॥

কার্পাস তুলিয়া দিলে গঙ্গার ঠাঁই।
গঙ্গা কাটিল সুতা মহাদেব বুনিল তাঁত।
হর সমুদ্র [illegible]ল ক্ষীর সমুদ্রের পাণি।
উত্তম ধুইয়া [illegible] নিতাই ধুবিনী ॥
শিবনাথ কি মহেশ।

(১৬)

স্বর্গে গেল জগন্নাথ হরে আনিল পারিজাত।
রাঙ্গা পারিজাত।
ডানঠির শেষ কৌতুকের গোসাঁই হাতে নিলবেত।
স্বর্গের বেত মর্ত্তে নামিল।
শ্রদ্ধা করিয়া লক্ষ্মী ভূমেতে আরম্ভিল ॥
শিবনাথ কি মহেশ।

(১৭)

জল বন্দ স্থল বন্দ আস্তের গম্ভীরা বন্দ।
ডাহিনে ডম্বর বন্দ বামে বীর হনুমান।
সিংহবাহনে ভগবতী আছেন তাঁর চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
শিবনাথ কি মহেশ।

(১৮)

জল বন্দ ইত্যাদি * * .
* * * * *
এখানে যত দেবতা আছে সকলের চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
শিবনাথ কি মহেশ।

(১৯)

জল বন্দ ইত্যাদি * *
আমি বন্দনা গাইলাম সকলের চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
শিবনাথ কি মহেশ।

এই প্রকার বন্দনা শেষে ভক্তগণ গম্ভীরা প্রাঙ্গণে দেহ লুণ্ঠন করিলে এই ব্যাপার শেষ হয়। এই প্রকার বন্দনা গম্ভীরাভেদে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। অনেক বন্দনা মধ্যে দেখিতে পাই—

"জলের উপরে মহী করে টল মল।
কচ্ছপকে দিলেন পৃথিবীর ভার।
কচ্ছপ উপরে মহী করে টল মল।
কচ্ছপ সহিত পৃথিবী যায় রসাতল ॥"

ঘনরাম প্রণীত শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে দেখিতে পাই—

"জালের উপরে মহী করে টল মল।
সৃজিলা পৃথিবী কূর্ম্ম অষ্ট কুলাচল॥"

এই প্রকারে "হস্তী হইতে পৃথিবী যায় রসাতল।" পৃথিবীর ভার কেহই বহন করিতে না পারায় 'ধবল নিরঞ্জন' 'এক গাছী পৈতা ছিঁড়ে দিল' তাহাতে বাসুকী নাগের উৎপত্তি হইল এবং

"বাসুকী নাগেরে দিলা পৃথিবীর ভার।
বাসুকী হইতে পৃথিবী হইলেন স্থির॥"

এই প্রকারের বন্দনার পর বন্দনার রচনা প্রায় একই প্রকার দৃষ্ট হয় এবং কুত্রাপি 'ধবল নিরঞ্জন' স্থলে 'ধর্ম্ম নিরঞ্জন' লিখিত আছে। প্রাচীনগণের মুখে অবগত হওয়া যায় এই শিববন্দনাদ্বারাই পূর্ব্বে গম্ভীরা-পূজা সমাধা হইত, তৎকালে ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা করা হইত না। অধুনা রাঢ়দেশে ধর্ম্মের পূজায় বন্দনা দৃষ্ট হয়। সন্ন্যাসিগণ সেই বন্দনা দ্বারাই পূজা সমাধা করে। নিম্নে ধর্ম্মপূজার মন্ত্রাংশ প্রদত্ত হইল—

(১)

নিলি খিলি নিলি খিলি ভকতি করিয়ে,
পূজ শ্রীধর্ম্মনিরঞ্জন কালুরায়,
বল শ্রীধর্ম্মনিরঞ্জন কালুরায়।
কি ফুল তুলিলে গোঁসাই সেই ফুলে গাঁথি মালা,
ভকতি করিয়ে পূজ শ্রীধর্ম্ম নিরঞ্জন কালুরায়
বলো শ্রীধর্ম্ম নিরঞ্জন কালুরায়॥

গম্ভীরার বন্দনা মধ্যে উলুক বা উলূক শব্দ বর্ত্তমান রহিয়াছে, উলূক দেবতার বাহন যথা—

"উলুক বলে গুরু সেই সে কারণ।"
'উলুক বাহনে ত্রিশ কোটি দেবতা।"

উলুক ধর্ম্মের বাহন এ কথা শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে লিখিত আছে যথা—

"এক দিন কর্ম্ম দক্ষ, ধর্ম্মের বাহন পক্ষ,
বৃক্ষ ডালে বসিয়া উলুক॥৪১" (ধর্ম্মমঙ্গল)

রাধানগর হইতে প্রাপ্ত বন্দনা মধ্যে ৮নং বন্দনাংশ সহিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। যথা

(৮)

পবনের পুত্র বীর হনুমান আনিয়া জোগাল পাথর চারিখান।
চাঁচিয়া ছিলিয়া গড়ান শ্রীকান্ত তাতে চালিল কাঁচ ঢাল।
শ্বেত চামরে ছাহিল চণ্ডীমণ্ডপের চারি কোণ॥ (রাধানগরের বন্দনা)

শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে—"গঙ্গাজল চামরে ছাইল চারি চাল।
মাঝে মাঝে শিখী পুচ্ছ শোভা করে ভাল॥
কলধৌত কলসে পতাকা দিল সেজে।
কাঁচ ঢালা কাঞ্চন বরণ করে মেজে॥
পাষাণে রচিত পীড়া দ্বার চিত্রময়।
দেখিতে মনির চান্দা চিত্ত বান্দা রয়॥"

উভয় বর্ণনার সাদৃশ্য আলোচনা করিলে যে মূল হইতে ধর্ম্মপূজা এবং শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের উদ্ভব সেই মূল হইতে গম্ভীরাপূজা এবং গম্ভীরাবন্দনার উদ্ভব বিবেচনা সম্ভব বলিয়াই অনুমান করা চলে। রাধানগর হইতে প্রাপ্ত বন্দরা মধ্যে ২৪ সংখ্যায় দেখিতে পাই—

"কাউসন দত্তের ব্যাটা নয়সন দত্ত।
যে জন পৃথিবীতে আনিল মহেশ্বর ব্রত॥"

শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মপূজাপ্রচারক কর্ণসেন পুত্র লাউসেনকে দেখিতে পাই, বৌদ্ধ-তান্ত্রিকপ্রভাবে তাঁহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। আমি বিবেচনা করি 'কাউসন' 'কর্ণসেন' এবং 'নয়সন' লাউসেন অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কর্ণসেন বেনিয়া জাতি ছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী রঞ্জাবতী 'বেণিয়ার ঝি' ছিলেন ; রঞ্জাবতীর ভ্রাতা মহামদ দত্তবংশীয় ছিলেন। দত্তবংশীয়গণকেই শ্রীধর্ম্মপূজার প্রচারক দেখিতে পাই।

"উসৎপুরে সুখদত্ত বারুই নন্দন।
করিছে ধর্ম্মের পূজা মজাইয়া মন॥" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল)

যাহাইহউক এইপ্রকারে দত্ত পদবী প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। উক্ত লাউসেন রাজাই পৃথিবীতে ধর্ম্মপূজার প্রচলন করেন। গৌড়রাজ ধর্ম্মপাল তাঁহার 'মেশো' হইতেন, উক্ত ধর্ম্মপালের বৌদ্ধতান্ত্রিক নাম বিরূপ ছিল। সম্ভবতঃ কালবিরূপ ত্রিপুরা ও কামরূপ দেশে বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে গমন করিয়াছিলেন। লাউসেন রঙ্কিণীকালী এবং লোকেশ্বর শিবপ্রতিষ্ঠাও করিয়াছিলেন এবং শিবপূজায় শৈবপ্রজাগণের মনস্তুষ্টিমানসে ধর্ম্মোৎসবের ন্যায় উৎসবেরও অনুষ্ঠান এবং 'মহেশ্বর ব্রত' প্রচারও করিয়া থাকিবেন।

রাধানগরে প্রাপ্ত বন্দনা মধ্যে 'আউলের ভক্ত' উল্লেখ আছে। ৫ সংখ্যক বন্দনায় যথা—

"উঠ উঠ সদাশিব নিদ্রা কর ভঙ্গ।
তোমাকে দেখিতে আইল আউলের ভক্তগণ॥"

এবং ৯ সংখ্যক বন্দনায়—

"আমরা আউলের ভক্ত বিষ্ণুবাই গম্ভীরাসুদ্ধ॥"

এই আউলের ভক্ত কাহারা, তাঁহারা গম্ভীরায় গম্ভীরদেব দর্শনে কেন আসিলেন, তাহার কারণ অনুসন্ধানে দেখি ইহা 'আউলেচাঁদ' হইতে উদ্ভব একপ্রকার নবধর্ম্ম সম্প্রদায়। আউলে চাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"উলাগ্রামে মহাদেব নামে এক বারুই ছিল। সে ব্যক্তি ১৬১৬ শকে ফাল্গুনমাসের প্রথম শুক্রবার স্বকীয় পর্ণক্ষেত্রে একটি অজ্ঞাত-কুলশীল অষ্টমবর্ষীয় বালক প্রাপ্ত হয়। তাহাকে বারুই প্রতিপালন করিয়াছিল এবং তাহার নাম পূর্ণচন্দ্র রাখিয়াছিল। এই বালক ২৭ বৎসরাবধি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া রামশরণ পালকে উপদেশ দিয়া তাঁহাকে নিজ মতে আনিয়াছিলেন। আউলচাঁদের ২২ জন শিষ্য ছিল। লক্ষ্মীকান্ত, কৃষ্ণদাস, বিষ্ণুদাস প্রভৃতি। আউলেচাঁদ ১৬৯১ শকে বোয়ালে গ্রামে পরলোক প্রাপ্ত হন। আউলেচাঁদ এক অভিনব ধর্ম্মপ্রচার করেন। তিনি কৌপীন ধারণপূর্ব্বক খেন্কা ও কান্থা গাত্রে দিয়া পর্য্যটন করিতেন। বাঙ্গালাভাষায় লোকদিগকে উপদেশ দিতেন, হিন্দু মোসলমান সকলকেই সমান জ্ঞান করিতেন। তাঁহার জাত্যভিমান ছিল না। এ সম্প্রদায়ী লোক ঐ উদাসীনকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞান করেন। কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরচন্দ্র ও আউলেচন্দ্র, তিনেই এক, একেই তিন বলিয়া থাকেন। ইহারা বলেন যে মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে গিয়া তিরোহিত হইয়াছিলেন, তিনিই পুনরায় রূপান্তর ধারণপূর্ব্বক আউলে মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হন। তাঁহার বহু নাম— ফকির ঠাকুর, সাঁই গোসাই। মোসলমান ভক্তগণ সম্ভবতঃ আউলে নাম রাখিয়া থাকিবে, পারসীক ভাষায় আউলিয়া শব্দের অর্থ বুজুর্গ অর্থাৎ যাঁহার দৈব-শক্তি আছে। আউলেচাঁদ অনেক অত্যদ্ভুত অলৌকিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যান। কাষ্ঠপাদুকাগ্রহণে গঙ্গাপারের কথা প্রচলিত আছে। এ সম্প্রদায়ের বিজ্ঞলোকেরা কহেন, একমাত্র বিশ্বকর্ত্তাকে ভজনা করাই আমাদের ধর্ম্ম; এই সম্প্রদায় দেব-প্রতিমারও অর্চ্চনা করিয়া থাকে। এ সম্প্রদায়ী গুরুদিগের নাম 'মহাশয়' এবং শিষ্যের নাম বরাতি। শিববন্দনায় "আসন শুদ্ধ করি-লেন ধর্ম্মগুরু মহাশয়" দেখিতে পাই এবং আরও লিখিত আছে

'আমরা আউলের ভক্ত বিষ্ণুবাই গম্ভীরাসুদ্ধ।'

এ ক্ষেত্রে 'বিষ্ণুবাই' অর্থ সুলভলভ্য নহে, সম্ভবতঃ বিষ্ণুদাস আউলেভক্তের সম্প্রদায়ভুক্ত-গণই গুরুর দোহাই দিয়া থাকিবেন এবং যে সম্প্রদায় এই বন্দনা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিষ্ণুদাস গুরুমহাশয় দলভুক্ত সম্প্রদায় হইলেও হইতে পারেন। আউলেসম্প্রদায় নিশীথ কালে আমোদাদিতে সমুদায় রজনী অতিবাহিত করেন ও ভয়ঙ্কর হুঙ্কার, দন্ত কিটিমিটি করিয়া ধর্ম্মভাব প্রচার করেন। যাহা হউক পাঠক! 'আউলের ভক্ত' বলিবার উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন।

আউলে সম্প্রদায়ের একটি গীত নিম্নে লিখিত হইল—

"ধন্য গুরুরে পাগল গোসাঞী
আহা মরি মরি গুণের লইয়া বালাই,
নাহি কিছু গুণের শেষ, চন্দন ছাড়ি আবেশ অঙ্গে মাখেন ছাই।
কি কব ধ্যানের কথা, নেঙ্গুটি আর ছেঁড়া কাঁথা,
গোলামে এলাম দাতা সবে বাদসাই।

চঞ্চল লোচনে চায়, কে বুঝিবে অভিপ্রায়,
কোথা থাকে কোথা যায় কোথা আছে নাই ॥"

যাহা হউক ছোট তামাসার দিবস সন্ধ্যাকালে বন্দনা-পাঠকালে ভক্তগণকে একপদে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখা যায় এবং মনে মনে শিবনাম উচ্চারণ করিতে দেখা যায়।

"উর্দ্ধবাহু করি কেহ এক পায়ে রয়।
সংযাত সহিত ডাকে ধর্ম্ম জয় জয় ॥" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল)

রাত্রিকালে বিবিধ নৃত্যগীতাদি ও মুখার নৃত্য হয়।

বড় তামাসা

এই দিন দিবসে যথাপ্রচলিত হরগৌরী পূজা হইয়া থাকে। দিবা দ্বিপ্রহরের পর ভক্তগণের শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। এই শোভাযাত্রা অতি মনোহর এবং কালীঘাটে নীল-পূজার দিবস গাজুনে সন্ন্যাসিগণের শোভাযাত্রা যে প্রকার হয়, এদেশেও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক গম্ভীরায় ভক্তগণ—কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ—সকলকেই এই উৎসবে যোগ দিতে হয়। প্রত্যেক গম্ভীরা হইতে ঢাকসহ ভক্তগণ নৃত্য করিতে করিতে বহির্গত হয়, ভূত প্রেত প্রেতিনী, বাজিকর ও বাজিকরনী, কেহ রামাত, কেহ তুবড়ীওয়ালা, কেহ সাঁওতাল প্রভৃতি যাহার যাহা ইচ্ছা সে তদ্রূপ বেশ ভূষা করিয়া বহির্গত হয়। এক গম্ভীরা হইতে গম্ভীরান্তরে গমন করে। ভক্ত মধ্যে কেহ কেহ ত্রিশূলাকৃতি ক্ষুদ্রবাণ উভয় বক্ষ পার্শ্বে বিদ্ধ করিয়া ত্রিশূলাগ্রে তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া প্রজ্বলিত করে; অন্য এক ব্যক্তি তাহাতে ধূপচূর্ণ নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং ভক্তনৃত্য করিতে করিতে গমন করে। এই উৎসবে দিবাভাগ অতিবাহিত হইয়া যায়। সন্ধ্যার সময় 'হনুমান মুখার' এক প্রকার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কোন এক ব্যক্তি হনুমান-মুখা দ্বারা সজ্জিত হয় এবং কাঁচা কদলীপত্রের দ্বারা সুদীর্ঘ লেজ প্রস্তুত করিয়া অগ্রভাগে শুষ্ক কদলী পত্রাদি বন্ধন করিয়া দণ্ডায়মান হয় এবং দুই ব্যক্তি এক খণ্ড বস্ত্র ধারণ করে, তৎপরে হনুমানের লেজে অগ্নি প্রদত্ত হয়, হনুমান হুঙ্কার শব্দে সেই বস্ত্র উল্লম্ফন পূর্ব্বক একবার এপার একবার ওপার হইয়া প্রস্থান করে; ইহাই লঙ্কাদগ্ধ ও সমুদ্রপারাভিনয় বলিয়াই বোধ হয়।

ফুল ভাঙ্গা

হনুমান পর্ব্বের পর বালা ভক্তগণ একত্রে 'শিবনাথ কি মহেশ' নাম ডাকিতে ডাকিতে ঢক্কা বাদ্যের সহিত নৃত্য করিতে করিতে জলাশয় সমীপে গমন করে এবং কণ্টকী বৃক্ষের কোমল শাখাগ্র ভগ্ন করিয়া ও সিদ্ধি গাছের সহিত একটী তাড়া বাঁধিয়া উহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণপূর্ব্বক স্নান করে, তৎপরে ঢক্কাবাদ্যের সহিত নৃত্য করিতে করিতে গম্ভীরায় আগমন করিয়া 'নাম ডাকিয়া' প্রণামপূর্ব্বক উক্ত কণ্টকগুচ্ছ মন্দিরে রক্ষা করে এবং পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় 'শিব গড়া বন্দনা' করিয়া শেষে উক্ত কণ্টকের নিকটে আগমন করিলে, ব্রাহ্মণ শান্তি-জল তাহাদের উপর ছিটাইয়া দেন এবং শিবের আশীর্ব্বাদী পুষ্প উক্ত ফুল (কণ্টক গুচ্ছ)

উপরি প্রদান করিলে, ভক্তগণ আপন আপন 'ফুল' লইয়া বক্ষে ধারণ এবং উভয় হস্তে দৃঢ়ভাবে ধারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে থাকে, নৃত্য করিতে করিতে ঢক্কাবাদ্যের সঙ্কেত অনুসারে মৃত্তিকা উপরি লুণ্ঠিত হইতে থাকে এবং তৎপরে প্রণাম করিয়া সেই ফুল শিবগম্ভীরা মধ্যে রক্ষা করে। ইহাকেই ফুলভাঙ্গা বলে। তৎপরে শিবদুর্গার আরত্রিকাদি সমাপনান্তে গম্ভীরামণ্ডপে আলোকমালা শোভিত হয়। রাত্রি নয় ঘটিকার সময় হইতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃত্য আরম্ভ হয়। ভূত, প্রেত, রাম, লক্ষ্মণ, শিবদুর্গা, বুড়াবুড়ী, ঘোড়ানাচা, চালিনাচা, কার্ত্তিকনাচা, পরিনাচা ইত্যাদি আরম্ভ হয়। নৃত্যকালে ঢক্কা ও কাঁশি বাদিত হয়, ঢক্কায় যখন বিদায়বাদ্য বাদিত হয়, তৎকালে নৃত্যকারকেরা নৃত্য হইতে বিরত হয় এবং অন্য গম্ভীরোদ্দেশে প্রস্থান করে। ধনিগণ বাদ্যকারকে কিঞ্চিৎ বক্সিস্ দিয়া থাকেন, কেহ কেহ নূতন বস্ত্রও প্রদান করেন।

ক্রমে ক্রমে বিবিধ শিব-নিন্দা-স্তুতি প্রভৃতি দ্বারা শিবের গীত হয়। দলে দলে ভক্তগণ এই সময়ে গম্ভীরা-মণ্ডপে আগমন করিয়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা দর্শকবৃন্দকে সুখী করে।

সারা বৎসর মধ্যে দেশে বা গ্রামে গুপ্ত বা প্রকাশ্যভাবে যে ব্যক্তি যে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা ন্যায়বিগর্হিত হইলে তাহার গীত রচিত ও গীত হয়। একাধিক গায়কগণ একত্র পৃথক্ পৃথক্, স্ত্রীপুরুষে সজ্জিত হইয়া গীত গাইয়া থাকে। শিবের বন্দনা, ঠুংরি, চারাড়ি ইত্যাদি গান হইয়া থাকে।

প্রভাত হইবার সময় এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে 'মশান নাচা' হইয়া থাকে। সুবৃহৎ আলুলায়িত কেশ, সিন্দুরলিপ্ত সমুদায় ললাটদেশ, কাঁচলী ও উন্নত কুচ, হস্তে শঙ্খ-পরিহিতা সালঙ্কারা বিকটবদনা বেশে সজ্জিত হইয়া, বিবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য করিতে থাকে এবং অপর ব্যক্তিগণ ধুনাচিতে ধুনা প্রদান করিয়া সেই ধূম মশানের মুখের সম্মুখে ধারণ করিয়া সান্ত্বনা করে। এই প্রকারের শান্তিক্রিয়া গম্ভীরা-মণ্ডপে কালী প্রভৃতির নৃত্যকালেও অনুষ্ঠিত হয়। যখন ঢাকি মাতন বাজায়, তখন মুখায় নৃত্য ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে, তৎকালে পূজক একটী মাল্য এবং ধূপের ধূম সম্মুখে প্রদান করিলে কালীমুখা প্রভৃতি মস্তক ঘুরাইয়া ধূম গ্রহণ করিয়া শান্ত হয়। মশান-কালী ধূলায় লুণ্ঠিত হয়। তৎপরে সকলে ৮।৯টা পর্য্যন্ত গম্ভীরা হইতে গম্ভীরান্তরে নৃত্যসমাপনান্তে একত্রে নদীতে স্নান করিয়া গৃহে গমন করে।

আহারা পূজা

বড় তামাসার পর দিবস, মশান নাচার পর হরপার্ব্বতীর পূজাদি এবং হোম ও ব্রাহ্মণ ও কুমারীভোজনাদি কার্য্য সমাধা হয়। এই দিবস একটী কাঁচা বাঁশ বা কঞ্চি গম্ভীরার এক পার্শ্বে প্রোথিত করিয়া তাহাতে কলার মোচা, আম্র প্রভৃতি বন্ধন করিয়া পূজা করিলে আহারা-পূজা সমাধা হয়। আহারা পূজার পর গম্ভীরার মধ্য দিয়া কেহ জুতা পায়ে দিয়া বা ছাতা মাথায় দিয়া গমন করিলে মণ্ডল দণ্ড বিধান করেন। অধুনা এ প্রথা আর দৃষ্ট

হয় না। এই দিবস তৃতীয় প্রহরে পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় শোভাযাত্রা বাহির হয়। এই দিবস দুই তিন ব্যক্তি মিলিয়া যে বৃহৎ গীতাদি হয়, তাহাকে বোলাই বা বোলবাহি বলে, ইহার সুরও স্বতন্ত্র। এই রাত্রিতেও গীতাদি হয়, কিন্তু কোন প্রকার মুখাদির নৃত্য হয় না। গীত ও বাদ্যাদি সহ উৎসব হইয়া থাকে। গম্ভীরা গীতের সুরের নূতনত্ব আছে। যে বিষয় লইয়া গান আরম্ভ বা রচিত হয়, তাঁহাকে উক্ত গীতের 'মুদ্দা' বলে। প্রত্যেক গানের 'মুদ্দা' থাকা চাই, যাহার মুদ্দা ভাল তাহার গীতও ভাল। এ বৎসর ভূমিকম্প হইল, এই ভূমিকম্প অবলম্বনে একটী গীত রচিত হইল। অতএব এই গানের 'মুদ্দা' ভূমিকম্প। কোন খলিফা অর্থাৎ গানাদি রচকের নিকট 'মুদ্দা' বলিয়া দিলে তবে খলিফা গীতরচনা করিয়া দেন। যে গীতের মুদ্দা স্ত্রীপুরুষের বিবাদ বা অন্য কোন প্রকার ব্যবহার লইয়া, তাহার গীত রচিত হইলে স্ত্রীপুরুষাদি বেশে সজ্জিত হইয়া আপন আপন অংশ গীতাকারে অভিনয় করে। আহারার দিবস শিবের চাষের অভিনয় হয়। কেহ ধান ছিটাইয়া দেয়, কেহ হল চালায়, কেহ ধান্য রোপণ করে, কেহ কেহ গোমেষাদি হইয়া ধান্য ভক্ষণ করে, তৎপরে ধান্য কর্ত্তন করা হয়, তৎপরে মণ্ডল বা প্রধান ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন 'কত ধান'। তাহার একটা উত্তর দিলে বৎসরের ধান্যফল স্থির হয়।

"সামশোল ছাড়া"

একটি পাত্রে একটি ক্ষুদ্র সকুল মৎস্য জীবিত রাখা হয়, তাহা লইয়া নিকটবর্ত্তী কোন জলাশয়ে ত্যাগ করিতে হয়, উহাকে সামশোল ছাড়া বলে। তৎপরে গম্ভীরার সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিয়া তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি বংশদণ্ড প্রোথিত করিয়া তাহার উপর একটি বংশদণ্ড বন্ধন করা হয়, তাহার পর 'ফুলভাঙ্গার' বৃক্ষশাখা সমুদয়ে আনয়ন করিয়া গর্ত্তোপরি রক্ষিত হয় এবং তাহাতে অগ্নি প্রয়োগ করিয়া ধূনা নিক্ষেপ করিলে পর ভক্তগণ একে একে উক্ত বংশে আপনার পাদদ্বয় বন্ধন করিয়া নিম্নমস্তকে দুলিতে থাকে এবং নিম্নস্থিত অগ্নিতে ধূনাচূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া সপ্তবার দোল খাইবার পর তাহাকে অবতরণ করাইয়া অন্য ভক্তকে ঐ প্রকার করা হয়। ইহাকে কোথাও কোথাও অগ্নিঝাঁপ বা পাটভাঙ্গা বলিয়া থাকে। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে ঐ প্রকার অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। যথা—

"উর্দ্ধে বান্দি পদযুগ ভূমে লুটে মুণ্ড।
যেখানে উজ্জ্বল হ'য়ে জলে যজ্ঞকুণ্ড॥" ৪৮
"ফেলায়ে প্রচুর তায় দেন ধূনাচূর্ণ।" ৪৯

এই প্রকারে গম্ভীরাপূজা শেষ হয়, পূর্ব্বে চৈত্রসংক্রান্তির দিবস চড়ক হইত, এক্ষণে আর হয় না।

গম্ভীরার গান।

বন্দনা, ঠুংরিগান, চাঁয়িরাড়ি, বোলাই ইত্যাদি বিবিধ প্রকার গম্ভীরার গান প্রচলিত আছে। বন্দনা গীতাকারে রচিত। গায়ক ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডাদি হস্তপদমস্তকাদি স্থানে বন্ধন করিয়া

চুণের ফোঁটা নাকেগালে দিয়া বন্দনা গাইতে আরম্ভ করে এবং কোন কোন গায়ক অন্যান্য গীতাদির পূর্ব্বে শিবের বন্দনা গাইয়া থাকে। এই গানগুলি আধুনিক এবং অশ্লীলতা দোষদুষ্ট বলিয়া প্রকাশ করা হইল না।*

* উক্ত প্রবন্ধের সম্পর্কে মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের পত্র খানি আমার অনুরুদ্ধ হইয়া নিম্নে প্রকাশ করিলাম। সাঃ পঃ পঃ সম্পাদক।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ সম্পাদক মহাশয়   সমীপেষু—

মান্যবরেষু—

বিগত ১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে মালদহ জেলার অধিবাসিবৃন্দের সমবেত চেষ্টায় মালদহ নগরে একটি জাতীয় শিক্ষা-সমিতি স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য ও কার্য্য তালিকার মধ্যে জাতীয় শিক্ষাবিস্তারের নিমিত্ত বিদ্যালয়াদি স্থাপন ব্যতিরেকে নিম্নলিখিত দুইটি উদ্দেশ্য ও সন্নিবিষ্ট হয়ঃ—

১। আমাদের দেশের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদির উদ্ধার ও উন্নতির জন্য বিশেষ বিশেষ ছাত্র নিযুক্ত করিয়া অর্থ দ্বারা স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিকতার উৎসাহ প্রদান করা এবং—

২। জেলার বিশেষ ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া তাহার গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা যথা— গম্ভীরার গান, বিষহরির গান, পদ ও কবিতা প্রভৃতির স্থানীয় সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করা। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সমিতির আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয় যে বিদ্যালয় সংক্রান্ত মাসিক সমস্ত ব্যয় বহনের পর জেলার বিশেষ সাহিত্যের পুষ্টি সাধন উদ্দেশ্যে নিয়মিতরূপে অর্থ ব্যয় করিতে পারেন। ১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে মালদহবাসী শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া "মালদহ-সমাচার" পত্রে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন "মালদহের গম্ভীরার ইতিহাস, তাহার বিবরণ এবং বোলবাই ও অপর বিধ গম্ভীরার গান সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধের জন্য ২৫৲ পঁচিশ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। প্রবন্ধের উপযুক্ত পরীক্ষক নিযুক্ত হইবেন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধই পুরস্কার যোগ্য বিবেচিত হইবে। আগামী সন ১৩১৫ সালের ৩০ শে কার্ত্তিকের মধ্যে প্রবন্ধ আমার নিকট পাঠাইতে হইবে।"

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

পুনরায় ১৩১৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়—

"মালদহবাসী যদি কোন ব্যক্তি গম্ভীরার গান সঙ্কলন এবং গম্ভীরা সম্বন্ধে অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয় সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে ২৫৲ পঁচিশ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। একথা গত অগ্রহায়ণ মাসের "মালদহ সমাচারে" প্রকাশ করিয়াছিলাম; এতৎ সম্বন্ধে পুনরায় প্রকাশ করিতেছি যে এই কার্য্য সাধন করিবার জন্য সেই ব্যক্তিকে গম্ভীরার কেন্দ্রস্থানে ভ্রমণ, গম্ভীরার বিবরণ সম্বন্ধে পুরাতন খাতা সংগ্রহ প্রভৃতি কাজ করিতে হইলে যত অর্থ ব্যয় হইবে তাহাও বহন করা যাইবে; এজন্য যদি কিছু মাসিক বৃত্তি দরকার হয়, তাহাও

উচিত মত দেওয়া যাইবে। মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষের নিকট এ সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য জানিতে পারিবেন, উক্ত সমিতি উপযুক্ত বৃত্তি নির্দ্ধারণ, প্রবন্ধ পরীক্ষা এবং পুরস্কার বিতরণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।"

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

উপরি উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশকালে মালদহ-শিক্ষা-সমিতির নিকট পরীক্ষার্থ মালদহের গম্ভীরার ইতিহাস ও বিবরণ-সম্বলিত একটী প্রবন্ধ উপস্থিত হয়। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত। সমিতির একান্ত ইচ্ছা যে প্রবন্ধটী পুরস্কারযোগ্য কি না পরীক্ষার্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিকট প্রেরিত হউক। কারণ সমিতি এই যে বিশেষ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরই কার্য্য। আশা করি, পরিষদ্ এই পরীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আমাদিগকে মালদহের প্রাচীন ও লোকসাহিত্যের উদ্ধারের চেষ্টায় উৎসাহিত করিবেন। অবশেষে নিবেদন এই যে প্রেরিত প্রবন্ধটী অথবা ইহার অংশবিশেষ প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইলে তাহা প্রকাশের ভারও আমরা সাহিত্য পরিষদের হস্তে সমর্পণ করিতে চাহি।

মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতি
১৩১৫।২২শে চৈত্র

শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ
সম্পাদক।

প্রাকৃত ব্যাকরণ ও অভিধান

মহাত্মা বররুচি প্রভৃতি প্রাকৃতব্যাকরণ প্রণয়ন করিতে যাইয়া সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের কতকগুলি পার্থক্যমাত্র দেখাইয়াছেন। তাঁহারা প্রাকৃত ব্যাকরণ লিখিতে বসিলেন, কিন্তু প্রাকৃতের আবার ব্যাকরণ কি? প্রাকৃত অর্থ কথিত ভাষা, তাহার আবার ব্যাকরণ্ কি? লিখিত বা সাহিত্যের ভাষা স্থির-ভাবাপন্ন, তাহারই ব্যাকরণ হয়, আর কথিত ভাষা যতদূর পারে সেই লিখিত ভাষার নিয়মেই আবদ্ধ থাকে, কখন বা তাহা হইতে ছুটিয়া যায়। ইহারা দুই ভিন্ন ভাষা নয়, ইহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ব্যাকরণ হইবে কেন? কাজেই বররুচি প্রভৃতি যে প্রাকৃতব্যাকরণ লিখিলেন তাহা ব্যাকরণ নয়, তাহা কেবল সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের পার্থক্যপ্রদর্শন মাত্র। তাহাতে সন্ধি নাই, সমাস নাই, কারক নাই, ষত্বণত্ববিধি নাই। সংস্কৃতব্যাকরণ না পড়িয়া কেবল প্রাকৃতব্যাকরণ পড়িয়া প্রাকৃত লিখিতে কিম্বা বুঝিতে পারা যায় না। প্রাকৃতব্যাকরণ কেবল লিখিত এবং কথিত ভাষার পার্থক্যপ্রদর্শক।

তাহার পর কতশত যুগযুগান্তর পরে যখন যুরোপীয় ধর্ম্মযাজকগণ বর্ত্তমান প্রাকৃত, অর্থাৎ "বাঙ্গলা", "হিন্দি" প্রভৃতিকে সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র ভাষা মনে করিয়া, বাঙ্গালীদিগকে "বাঙ্গলার" ব্যাকরণ করিতে অনুরোধ করেন, তখন বাঙ্গালীদের একটা মোহ জন্মিল। তাঁহারা এতকাল জানিতেন সংস্কৃতই তাঁহাদের বিদ্যা, সংস্কৃতব্যাকরণই তাঁহাদের ব্যাকরণ, বাঙ্গলা তাহার প্রাকৃত বা কথিত আকারমাত্র। বাঙ্গলাকে তখন পর্য্যন্ত সকলেই পরাকৃত অর্থাৎ প্রাকৃত বলিতেন। এখন এই মোহ জন্মিল যে তবেত বাঙ্গলা একটা স্বতন্ত্র ভাষা, তাহার ব্যাকরণ চাই বই কি? ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার হাল্‌হেড্ প্রথম একখান বাঙ্গলাব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীরা তাহা পড়িতে লাগিল। তখন হইতে বাঙ্গলা এক স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইল। তাহার নাম হইল বঙ্গভাষা, আর উহার প্রাকৃত বা পরাকৃত নাম রহিল না। তখন বাঙ্গালীরা ভাবিতে লাগিলেন এতকাল আমাদের একটা ভাষা ছিল না, সাহিত্য ছিল না, বিজ্ঞান ছিল না, ধর্ম্মশাস্ত্র ছিল না, তন্ত্রমন্ত্র ছিল না, পুরাণ, ইতিহাস ছিল না, কোথাকার কোন্ একটা পরভাষা লইয়া আমরা নাচিতে ছিলাম, ইষ্টমন্ত্র পর্য্যন্ত পরভাষায় গ্রহণ করিয়াছি, পরভাষায় মন্ত্র পড়িয়া ভূত ছাড়াইয়াছি। এখন আমাদের পাপ ছাড়িল, আমাদের ভাষা হইয়াছে, আমাদের ব্যাকরণ হইয়াছে!

ক্রমে দেখা গেল সেই ব্যাকরণে কোন কাজ হয় না। ক্রমে ৺রাজা রামমোহন রায়কে একখান ব্যাকরণ প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করা হয় এবং তাহা প্রণীত হওয়া মাত্র একদিনে চৌদ্দশত পুস্তক বিক্রীত হইয়া গেল। কারণ যুরোপীয়দের অন্য একখান পূর্ণ ব্যাকরণের

তখন এতই অভাব ছিল যে বঙ্গভাষা-শিক্ষার্থী য়ুরোপীয়গণ ঐ ব্যাকরণের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন এবং উহা পাইয়া কৃতার্থমন্য হইলেন। কিন্তু তাঁহারা এত আশা করিয়া এত আগ্রহের সহিত যে পুস্তক ক্রয় করিলেন উহা পাঠ করিয়া তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। এত বড়লোকে যে ব্যাকরণ লিখিলেন তাহাতেও কাজ হইল না দেখিয়া সকলে ক্ষুব্ধ ও হতাশ হইয়া গেলেন। তাহার পর ঐ পুস্তক আর একখানাও বিক্রীত হইল না। ইহার কারণ কি ?

রাজা রামমোহন রায়ের ব্যাকরণও কার্য্যকরী হইল না কেন ? তাহার কারণানুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখিলাম, তিনিও ঐ ব্যাকরণ কেবল বাঙ্গলায় যাহা আছে অথচ সংস্কৃতে নাই তাহাই দেখাইয়াছেন মাত্র। আর কি লিখিবেন ? সংস্কৃতব্যাকরণকে অনুবাদ করিয়া বাঙ্গলাব্যাকরণ আখ্যা প্রদান করিতে তাঁহার ভাল লাগে নাই, সেইজন্য পরাকৃতের যে সকল বিধিব্যবস্থা সংস্কৃতে নাই তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন, আর সকল নিয়ম ত সংস্কৃত-ব্যাকরণেই আছে, তাহার অনুবাদ করিয়া ফল কি ? সংস্কৃতও আমাদের বাঙ্গলাও আমাদের, ইহাদের একটীওত আমরা ছাড়িতে পারিব না, তবে একের অনুবাদ করিয়া দুইটা ব্যাকরণ করিয়া লওয়া প্রয়োজন কি ? তখন পর্য্যন্ত লক্ষিত বা অলক্ষিত ভাবে এইভাব উক্ত মহাত্মার অন্তরে ক্রিয়া করিতেছিল। তখন পর্য্যন্ত সংস্কৃত এবং প্রাকৃত যে এক ভাষারই সাহিত্যিক এবং কথিতাকার, এইভাব বাঙ্গালীহৃদয় হইতে এককালে উন্মুলিত হইয়া যায় নাই।

রাজা রামমোহনের ব্যাকরণ চলিল না। তাঁহার পর কত লোকে ব্যাকরণ লিখিলেন, কিথ্‌ সাহেব একখান ব্যাকরণ লিখিলেন, আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে তাহা আট পয়সাতে কিনিয়া পড়িয়াছি। তাহার পর বড় বড় ব্যাকরণ বাহির হইতে লাগিল, তাহাদিগকে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুবাদ বলিলেই হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণ "সমানঃসবর্ণে দীর্ঘীভবতি পরশ্চ লোপং" তাহার বাঙ্গালা হইল "সবর্ণের পর সবর্ণ থাকিলে তাহা দীর্ঘ হয় এবং পরবর্ণ লোপ পায়"। যতই যাহা হউক, প্রকৃতপক্ষে "বাঙ্গলার" ব্যাকরণ হইল না, সহস্র চেষ্টাতেও হইতেছে না, ইহার কারণ কি ? কারণ এই যে কথিতভাষার ব্যাকরণ হয় না এবং হইতে পারে না। কথিত ভাষা মধ্যে এত শত শত গুহ্য রীতি ও নিয়মাদি আছে যে তাহা সমগ্র উদ্ধার করিয়া লইতে হইলে ব্যাকরণ এত বৃহদাকার ধারণ করে যে তাহা শিক্ষা করা অসম্ভব হয়, আর কতকগুলি এরূপ নিয়ম আছে যে তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না, কেবল কথিত ভাষা শুনিয়া শুনিয়া শিক্ষা করিতে হয়। যাঁহারা অধুনা ব্যাকরণ লিখিতে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা স্বয়ংই ইহা উপলব্ধি করিবেন। কথিত ভাষা প্রত্যেক যোজনে এক এক প্রকার, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য ও ব্যাকরণ হইতে পারে না। সাহিত্যের সার্ব্বজনিক ভাষা এক প্রকার এবং প্রাদেশিক বা স্থানীয় বা গ্রাম্যভাষা অন্য প্রকার। সেই সকল প্রাদেশিক বা গ্রাম্যভাষাই কথিতভাষা, তাহা অস্থির, তাহার

এক এক স্থানে, এক এক সময়ে, এক এক রূপ হয়। সুতরাং তাহাদের ব্যাকরণ হয় না। সাহিত্যের ভাষা স্থির, তাহার ব্যাকরণ হইতে পারে এবং তাহাই হইয়া থাকে। তাহাতে কথিত ভাষায় সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হয় না এবং অনেক বিষয় উপেক্ষা করিয়া যে কয়টী নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়, পরবর্ত্তী সাহিত্যের ভাষা সেই কয়েকটী নিয়মাবলম্বনে এবং কথিত ভাষার অপ্রকটিত ব্যবহার দ্বারা অলক্ষিত ভাবে অল্প বা অধিক অনুশাসিত হইয়া চলিয়া থাকে। ভাষার আভ্যন্তরিক অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার সাহিত্যের ব্যাকরণে থাকে না এবং সাহিত্যের ভাষাতেও থাকে না।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি ভাষার সকল নিয়ম ব্যাকরণে বিধিবদ্ধ হইতে না পারে তবে ব্যাকরণ প্রণয়নে ফল কি? তাহার উত্তর এই যে ব্যাকরণ না হইলে ভাষার স্থায়িত্ব রক্ষা করা যায় না। কথিত ভাষা চঞ্চল, তাহা কখন এক আকার, কখন অন্য আকার ধারণ করে। আমাদের পিতা পিতামহ পিতামহী যে প্রকার কথা বলিতেন আমরা সেই প্রকার বলি না। কিন্তু সাহিত্যের ভাষা স্থির হওয়া আবশ্যক, তাহা ঐ প্রকার অস্থির থাকিলে এককালের সাহিত্য অন্য কালে এবং এক প্রদেশের সাহিত্য অন্য প্রদেশে অবোধ্য হইয়া পড়ে। এই জন্য ব্যাকরণ ভাষাকে একটা বিশিষ্ট আকার প্রদান করে (It gives a definite shape to the language)। আ+কৃ+ক্তি = আকৃতি, বি অর্থ বিশিষ্টপ্রকার। ভাষাকে বিশিষ্টপ্রকার আকৃতি প্রদান করার নাম ব্যাকরণ; সাহিত্যের ভাষা তাহার নিয়মে চলিয়া স্থায়ী হয়, আর কথিত ভাষাও সেই নিয়মের দিকে চাহিয়া আপন স্বাভাবিক উচ্ছৃঙ্খলতাকে কথঞ্চিৎ প্রশমিত করে। সংস্কৃত আমাদের সাহিত্যের ভাষা, বাঙ্গলা তাহার কথিত আকার, অতএব বাঙ্গলাভাষা সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা প্রশমিত হইতে পারে এবং তাহা হইলেই ইহার কল্যাণ, আর সংস্কৃত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহাকে এক পৃথক্ ভাষা করিয়া তুলিলে উভয় ভাষাই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

রাজা রামমোহন রায় যে প্রাকৃত বা বঙ্গভাষার ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন তাহা প্রাচীন প্রাকৃত ব্যাকরণাবলম্বনে নহে, তিনি স্বাধীনভাবে স্বীয় চিন্তাশক্তিতে প্রাকৃতভাষার ব্যাকরণ যেরূপ হওয়া উচিত মনে করিয়াছিলেন সেই প্রণালীতে উহা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে স্থূলতঃ বররুচি প্রভৃতির সহিত তাঁহার প্রণালী মূলতঃ এক প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বররুচি এবং রাজা রামমোহন এই দুইজন মহাপুরুষ সহস্রাধিক বর্ষ ব্যবধানে জন্মগ্রহণ করিয়া আপন আপন স্বাধীন বুদ্ধিতে যে দুইখান ব্যাকরণ লিখিলেন তাহাদের প্রণালী মূলতঃ এক হইয়া দাঁড়াইল, ইহাতে কি স্বভাবের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে না? ইহার কারণ এই যে বঙ্গভাষা সংস্কৃতের এক প্রকার কথিতাকার, সুতরাং তাহার ব্যাকরণে সংস্কৃতে যাহা নাই তাহা প্রদর্শিত হইবে। তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসঙ্গী হইতে পারে, স্বতন্ত্র ব্যাকরণ হইতে পারে না।

ব্যাকরণের ন্যায় অভিধানও সাহিত্যিক ভাষারই হইয়া থাকে। যে সকল শব্দ

মার্জ্জিত বা সংস্কৃত হইয়া সাহিত্যে ব্যবহারের উপযুক্ত হইয়াছে, সেই সকল শব্দই অভিধানে স্থান প্রাপ্ত হয়, আর যে সকল শব্দ মার্জ্জিত হইয়া সাহিত্যিক আকার প্রাপ্ত হয় নাই তাহারা অভিধানে স্থান প্রাপ্ত হয় না। এই কারণে প্রকৃতির ব্যবহৃত অর্থাৎ কথিতভাষায় প্রচলিত অনেক শব্দ অভিধান হইতে বর্জ্জিত রহিয়াছে। যেমন "চীচীকরা" এই শব্দটী হইতে স্বরবিপর্য্যয়ে "চাচীকার", তাহা হইতে "চীচ্কার", আবার তাহাই আরও একটু মার্জ্জিত বা সংস্কৃত হইয়া "চীৎকার" রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই মার্জ্জিত বা সংস্কৃত রূপটীই সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং এই জন্য অভিধানে উঠিতে পারে, কিন্তু "চীচীকরা", "চীচ্কার" প্রভৃতি শব্দ অমার্জ্জিতাবস্থায় থাকায় তাহারা সাহিত্যে কিংবা অভিধানে স্থান পাওয়ার যোগ্য নহে।

উপরোক্ত প্রকারে সাহিত্যে নিগৃহীত প্রাকৃত শব্দ মধ্যে কোন কোন শব্দ অতি প্রাচীন। তাহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানের সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে কথিত ভাষায় প্রচলিত আছে, যেমন লাদ, টিপ, ইত্যাদি। আমাদের মেয়েরা টিপ পরে with tip of the finger. হিন্দিতে লাদ বলে তাহার অর্থ to load, আর লদ অর্থ "to be loaded, Anglo Saxon 'hladan' = to load, hlad = a load". (Beams' Comp. Grammar Vol 11. p. 61.) এই সকল শব্দ ভারতবর্ষ এবং য়ুরোপ উভয় স্থানের আর্য্যভাষাতে প্রচলিত থাকায়, জানিতে পারা যায় যে, এদেশ এবং সে দেশের আর্য্যগণের একত্রবাসের সময় হইতে ঐ সকল শব্দ কথিত ভাষায় চলিতেছে অথচ সংস্কৃতে তাহাদের ব্যবহার নাই। বাঙ্গলা যে সকল শব্দকে আমরা সংস্কৃতের সহিত মিলাইতে পারি না, তাহার মধ্যে হয়ত অনেক এই শ্রেণীর শব্দ আছে। তাহারা ভাষান্তর হইতে গৃহীত নহে।

আর কতক শব্দ আছে তাহারা আনুকরণিক, যেমন ঢেক্ ঢেক্ শব্দ হইতে ঢেকী, কড় কড় শব্দ হইতে কড়া প্রভৃতি। কথিত ভাষায় ব্যবহৃত অথচ সংস্কৃতে উপেক্ষিত শব্দাদি প্রায় সমস্তই আনুকরণিক, কিন্তু কোন্‌টী কোন্ শব্দের অনুকরণে উৎপন্ন তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন, অথবা অসম্ভব। শব্দানুকরণ দ্বারাই যে ভাষার পুষ্টি হয়, তাহা অন্য প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। সেই আনুকরণিক শব্দগুলিকে চিনিতে না পারিয়া, তাহাদিগকে ভাষান্তর হইতে গৃহীত শব্দ বলিয়া মনে করা সঙ্গত নহে। খাইতে মুড় মুড় শব্দ হয় তাহা হইতে 'মুড়ি", মুড়ি ভাজিতে যে কুঁচি দ্বারা আলোড়ন করিতে হয়, সেই আলোড়নে পিস্ পিস্ শব্দ হয়, তাহা হইতে তাহার নাম পূর্ব্ববঙ্গে পিছি। ক্ষুদ্রার্থে ইকার এবং বৃহদর্থে আকার, এই জন্য বৃহৎপিছি যদ্দ্বারা গৃহসম্মার্জ্জন করা যায়, তাহার নাম পূর্ব্ববঙ্গে পিছা, পিছির ন্যায় গঠিত, হয়ত এই জন্য চামরের নাম "পিছিকা"। দেখিতে চামরের ন্যায় "ময়ুরপিচ্ছ"। অতএব মুড়ি, পিছা, পিছি ইত্যাদি আনুকরণিক শব্দ সকলকে না চিনিয়া ভাষান্তর হইতে গৃহীত বলিয়া মনে করা ভাষার পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টজনক।

বিপদাশঙ্কা হইলে, অথবা দূরস্থ বন্ধুকে আহ্বান করিতে হইলে পাখীগণ চীচী রব করে,

তাহা হইতে চীচীকার চীচ্‌কার—চীৎকার। এই প্রকারে প্রাকৃত চীচী সংস্কৃত হইয়া এই রূপ ধারণ করিয়াছে। আমরা যে চীচী হইতে চীচান বা চেচান বলি, তাহা উক্ত প্রকারে মার্জ্জিত বা সংস্কৃত হয় নাই বলিয়া তাহাকে অনার্য্য ভাষা বা ভাষান্তর মনে করা উচিত নহে। কবি গানে অত্যুচ্চ স্বরকে বলে "চিতান" তাহারও মূল এই চীচী, কারণ ভাষাতত্ত্বে "বর্ণান্তর" শীর্ষক পরিচ্ছেদে দেখান গিয়াছে ত=চ। এই প্রকার, আদিমাবস্থার কথিত ভাষা প্রায় সমস্তই আনুকরণিক, তাহারা কতকগুলি মার্জ্জিত হইয়া সংস্কৃতাকার প্রাপ্ত হইয়াছে, আর কতকগুলি সাহিত্যে নিগৃহীত হইয়া অমার্জ্জিত অবস্থায় এখন পর্য্যন্ত কথিত ভাষায় প্রচলিত আছে, সংস্কৃতে নাই। তাহাদিগকে অভিধানে না পাইয়া লোকে অনার্য্য ভাষার শব্দ মনে করে।

অনেকের মুখেই এখন শুনিতে পাওয়া যায় যে পরভাষা হইতে যত অধিক শব্দ আনিয়া ব্যবহার করা যায় ততই ভাষার উন্নতি। কিন্তু ইহা অন্য ভাষার পক্ষে হইতে পারে, সংস্কৃত বা তাহার প্রাকৃত ভাষার পক্ষে নহে। পর ভাষার শব্দ গ্রহণ করা যদি ভাষার উন্নতি হয়, তবে ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ নিত্যই ভাষার এই প্রকার "উন্নতি" করিতেছে। পূর্ব্বে মুসলমান রাজত্ব সময়ে এই প্রকার বহু "উন্নতি" হইয়াছিল। জিন্দিগি, ভোর, হারামজাদা, বেকসুর, হর্‌দম ইত্যাদি প্রতি দশ শব্দে পাঁচ শব্দই আরবি, পার্শী ছিল। আমরা বাল্যকালে তপ্তজল, তপ্তভাত ইত্যাদি বলিতাম। স্ত্রীলোক, বালক, ইতর সাধারণ লোক সকলেই তাহা বলিত। কিন্তু কর্ত্তারা গরম জল, গরম ভাত বলিতেন। আজ কাল আর তপ্ত জল, তপ্ত ভাত কাহাকেও বলিতে শুনি না, সকলেই গরম বলে। বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, কৈ? তপ্তভাত কে কবে বলিয়া থাকে? অতএব এই শব্দটী দেখিতে দেখিতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। আর কিছু দিন পরে কেহ তপ্ত জল বলিলে লোকে তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিবেক "সংস্কৃত বলিতেছেন!" ইহা যদি উন্নতি হয় তবে দুর্গতি কাহাকে বলিব?

লেখনী, কঠিনী, এই দুইটী সংস্কৃত শব্দ আছে। আমরা বলি কলম, তাহা মুসলমানী শব্দ। এখন জিজ্ঞাসা করি মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বেত আমরা দোয়াত কলম ব্যবহার করিতাম, তখন আমরা তাহাদিগকে কি বলিতাম? সম্ভবতঃ তখন লেখন বা লেখনী এবং কঠিনী বা কাঠী বলিতাম, কিন্তু আমাদের "ভাষোন্নতিতে" সেই সকল শব্দ কথিত ভাষা হইতে তিরোহিত হইয়াছে। এখন যদি কেহ তাহাদের ব্যবহার করিতে চাহে লোকে চক্ষু টানিয়া ইঙ্গিত করিবেক, "সংস্কৃত বলিতেছেন!"

লোকে মনে করে যত অধিক শব্দ অন্য ভাষা হইতে গৃহীত হয়, ততই ভাব প্রকাশের সুবিধা হয়। কিন্তু ভাব তাহার ভাষা লইয়াই স্ফুরিত হয়। যখন মনে একটী ভাব আসে, সে তাহার ভাষা লইয়াই আসে; সুতরাং যে ভাব আপনা হইতে অন্তরে উদয় হয় তাহা প্রকাশ করিবার জন্য ভাষা অন্বেষণ করিতে হয় না। তাহার ভাষা আপনা হইতেই

আসে। আর অন্যের নিকট হইতে কোন একটী ভাব অন্য ভাষাতে শিক্ষা করিয়া তাহা স্বীয় ভাষায় প্রকাশ করিতে চাহিলে তাহাই কঠিন হয়। এই জন্য পুস্তক লেখা অপেক্ষা তাহার অনুবাদ করা কঠিন। নিজের ভাব সহজে প্রকাশ করা যায়, পরের ভাব প্রকাশ করা কঠিন। এই কারণে পর ভাষা হইতে ভাব গ্রহণ করিতে হইলেই পর ভাষার শব্দ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্তি হয়। তখন সেই ভাষার শব্দই আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়, এবং তাহার ছায়াতে স্বীয় ভাষার শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাকে ছাড়াইয়া ভাবটীকে নিজস্ব করিয়া লইলেই নিজ ভাষা আসিয়া উপস্থিত হয়।

অনেক সময় আমরা যে স্বীয় ভাষাকে অপ্রচুর মনে করি তাহার একমাত্র কারণ পর ভাষার অনুবাদ করার কাঠিন্য। ভাব স্বতঃ উদ্ভূতই হউক, আর মার্জ্জিতই হউক সে তাহার ভাষা গঠন করিয়া লইবেক, পরভাষা হইতে কোন শব্দ গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন রাখে না। স্বকীয় হউক বা পরকীয় হউক, অন্তরে যত ভাব সঞ্চয় হয়, ভাষা তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই প্রকারে ভাষায় যে সংবৃদ্ধি হয় তাহাকেই ভাষার উন্নতি বলা যায়।

অন্যের নিকট যাহা শুনি তাহাতে আমার হৃদয়-নিহিত ভাবকে উদ্রিক্ত করিয়া দেয় মাত্র, অন্যের ভাবটী সশরীরে আসিয়া আমার হৃদয়ে বসিতে পারে না। আমার হৃদয়ে যে ভাব নাই তাহা আমাকে কেহ দিতে পারে না, যে ভাব আছে তাহার ভাষাও আছে, তাহার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও উদ্রিক্ত হয়। সকল ভাষাই বর্দ্ধনশীল ভাববৃদ্ধি হইলেই ভাষার সমৃদ্ধি হয়। কোন জাতি উন্নত-ভাব-সম্পন্ন, অথচ তাহার ভাষা অপ্রচুর বা অনুন্নত এরূপ হইতে পারে না। যে জাতি ভাবধনে ধনী তাহার ভাষাও ধনী। অতএব পরভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করা ভাষার উন্নতি নহে। তাহা ভাষার বিকৃতি।

পরের দ্রব্য ব্যবহার করা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। নিজস্ব অর্জ্জন করা আয়াসসাধ্য। উন্নতি অনায়াসে হয় না, ইহা কষ্টসাধ্য, আর অবনতি অনায়াসলব্ধ। উন্নতি অবনতির এই লক্ষণ প্রত্যেক বিষয়ে প্রযুক্ত হয়। অতএব ভাষার উন্নতি যদি অনায়াসে করা যায় দেখি তবে সেই লক্ষণ দ্বারাই জানিতে পারিব উহা উন্নতি নহে, উহা অবনতি।

প্রণিধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কথিত ভাষায় ইতর সাধারণ লোকের মুখে নূতন নূতন শব্দ ও প্রত্যয়াদি নিত্য জন্মিতেছে। জল বিম্ববৎ তাহারা যেমন উদ্ভূত হয় তেমনি লয় প্রাপ্ত হয়। সেই সকল শব্দাদি সাহিত্যের উপযুক্ত নহে, এই জন্য সাহিত্যে গৃহীত হয় না। যেমন আমরা বলি দুপয়সার টিকিট দশ খানা, এক পয়সার টিকিট পাঁচ খানা, ইত্যাদি, কিন্তু কোন স্থানে কোন লোকের মুখে শুনিয়াছি দুপয়সানে টিকিট এক পয়সানে টিকিট। এই শ্রেণীর প্রত্যয় বা শব্দ সাহিত্যে ব্যবহার্য্য নহে। পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি কথিত ভাষায় অভিধান হয় না, কারণ তাহা অস্থায়ী। সাহিত্যের ভাষা স্থায়ী এই জন্য তাহারই ব্যাকরণাদি হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। অতএব কথিত ভাষার

যে সকল শব্দাদি সাহিত্যে ব্যবহারের অযোগ্য, সেই সকল শব্দ সঙ্কলন করিয়া অভিধানের কলেবর বৃদ্ধি করা, অথবা সেই সকল শব্দ সাহিত্যে ব্যবহার করা ভাষার উন্নতিসাধক নহে।

আমরা স্বীকার করি যে উচ্চ সাহিত্যে অর্থাৎ সংস্কৃতে ঐ সকল শব্দাদি গ্রাম্য ভাষা বলিয়া এককালে বর্জ্জিত হইলেও নিম্নসাহিত্যে অর্থাৎ বাঙ্গলাদি প্রাদেশিক বা গ্রাম্যসাহিত্যে দুই চারিটী গ্রাম্য বা প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহৃত হওয়া অস্বাভাবিক বা অমার্জ্জনীয় নহে। কিন্তু মার্জ্জনীয় হইলেও তাহাদের ব্যবহার যত অল্প হয় তাহাই বাঞ্ছনীয়। কথিত ভাষার যে সকল শব্দে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের দ্বারা বিভিন্নরূপে কথিত হয়, তাহারা যে পর্য্যন্ত স্থিররূপ ধারণ না করে, সে পর্য্যন্ত তাহারা সাহিত্যে ব্যবহার্য্য নহে। যাহা মুখে আসে তাহাই সাহিত্যে ব্যবহার করা ভাষার উন্নতিজনক নহে। আমাদের বাঙ্গলাদি নিম্নসাহিত্যের স্বাভাবিক গতি উচ্চ সাহিত্যের দিকে, তাহা না হইয়া যদি উচ্চসাহিত্য অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে আরও সরিয়া যাইতে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহাকেই আমরা বিকৃতি বা অবনতি বলি।

শ্রীশ্রীনাথ সেন।

প্রাচীন-পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ

প্রচলিত পদাবলীর সংগ্রহ-গ্রন্থ সকলের মধ্যে মহাত্মা বৈষ্ণবদাসকর্ত্তৃক সঙ্কলিত পদকল্পতরু গ্রন্থই বৃহত্তম বটে। ইহাতে শতাধিক পদকর্ত্তৃগণের নামাঙ্কিত পদাবলি সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাহাতে ভণিতাহীন বহু সংখ্যক পদও উদ্ধৃত হইয়াছে। অপরাপর গ্রন্থের প্রমাণের সাহায্যে ভণিতাহীন পদের রচয়িতৃগণের মধ্যে কয়েকজনের নাম জানিতে পারা গিয়াছে।

বৈষ্ণবদাসের এই পদ-সংগ্রহ কিরূপ বিস্তৃত ও তাঁহার অসামান্য অনুসন্ধান ও ক্ষমতার পরিচায়ক তাহা সহজেই প্রতীত হইতে পারে। জয়দেব, বিদ্যাপতি, ও চণ্ডীদাস ব্যতীত পদকল্পতরুর কবিগণই মহাপ্রভুর সমসাময়িক অথবা পরবর্ত্তী। মহাপ্রভু ১৪০৭ শকে বা ১৪৮৬ খৃঃ অব্দে আবির্ভূত হন। বৈষ্ণবদাস সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। সুতরাং বৈষ্ণবদাস পদাবলীর সৃষ্টি হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্য্যন্ত যে সকল কবি পদ রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশের পদই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। পদ কল্পতরুর কবিগণের নামের সুদীর্ঘ তালিকা দেখিলে বোধ হয় বৈষ্ণবদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক প্রায় কোন কবির উল্লেখযোগ্য কোন পদই বৈষ্ণবদাসের বিরাট সংগ্রহে পরিত্যক্ত হয় নাই। বলা বাহুল্য যে, যে কালে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল না—পদা-

বলী সকল প্রধানতঃ কেবল মুখে মুখে গীত হইয়া প্রচারিত হইত—কেবল কদাচিৎ কোন সহৃদয় পণ্ডিত ব্যক্তি কিংবা কীর্ত্তনিয়া তাহা লিখিয়া রাখিতেন, সেই সময়ে বৈষ্ণবদাস তাঁহার এই বিরাট সংগ্রহে প্রবৃত্ত না হইলে—এত দিনে উক্ত পদাবলী মধ্যে অধিকাংশই যে বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হইত, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবদাস নিজেও পদকর্ত্তা ছিলেন—কিন্তু তিনি চিরকাল অদ্বিতীয় পদ-সংগ্রহকার বলিয়াই বৈষ্ণবসমাজে সমাদৃত। পদাবলীর সংগ্রহ-গ্রন্থ মধ্যে বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু নানা বিষয়ে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

বৈষ্ণবদাসের পূর্ব্বে শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র শ্রীরাধামোহন ঠাকুর—"পদামৃতসমুদ্র" নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুর অনুবাদ প্রকরণে লিখিয়াছেন—

"আচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন।
কে কহিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন।
*　　*　　*　　*
গ্রন্থ কৈলা পদামৃতসমুদ্র আখ্যান।
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥"

পদকল্পতরুর পদসংগ্রহ সম্বন্ধে বৈষ্ণবদাস লিখিয়াছেন—

"নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া।
তাঁহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়া॥
সেই মূলগ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল।
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল॥"

রাধামোহন ঠাকুরের "পদামৃত-সমুদ্র" পদকল্পতরু অপেক্ষা আকারে অনেক ক্ষুদ্র। পদকল্পতরুর পদ-সংখ্যা ৩১০১।* পদামৃত-সমুদ্রের পদ-সংখ্যা ৭০৬টি মাত্র। তন্মধ্যে রাধামোহন ঠাকুরের স্বকৃত পদ ২২৮টী আছে। পদকল্পতরু গ্রন্থে বৈষ্ণবদাস ২৫টীর অধিক স্বরচিত পদ সন্নিবিষ্ট করেন নাই। পদামৃতসমুদ্রে মোটে ৩৫ জন কবির পদ সংগৃহীত হইয়াছে; পদকল্পতরুতে একই নামের বিভিন্ন উপাধিযুক্ত ব্যক্তিগণকে একই ব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া লইলেও ইহাতে ১১৬ জন বিভিন্ন পদকর্ত্তার পদ সংগৃহীত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত দুই শতের অধিক ভণিতাহীন পদও আছে, সুতরাং পদামৃতসমুদ্র হইতে পদকল্পতরুর সংগ্রহ যে কত প্রকাণ্ড ও মূল্যবান্ তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এই জন্যই

* পদকল্পতরুর মুদ্রিত ও হস্তলিপিগ্রন্থসমূহে ৩১০১ পদের স্থলে ৩০২৩ কিংবা তাহার কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক পদ-সংখ্যা দৃষ্ট হয়। পদকল্পতরুর চতুর্থশাখার ৯ম পল্লবে যে কতকগুলি "বারমাসী" পদ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার প্রত্যেক পদকে ১২টি পদ গণনা করিয়াই বৈষ্ণবদাস ৩১০১ পদ-সংখ্যা নির্দ্দেশ করায় এই আপাত-বৈষম্য দৃষ্ট হইতেছে। আমরা বৈষ্ণবদাসের পদাবলি ও তাঁহার সংগ্রহগ্রন্থ পদকল্পতরুর বিস্তৃত সমালোচনার সময়ে এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করিব।

বৈষ্ণবদাসের পূর্ব্বে ও পরে আরও অনেক ব্যক্তি অনেক সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া থাকিলেও পদকল্পতরু গ্রন্থই এ বিষয়ে সর্ব্বোত্তম স্থান অধিকার করিয়াছে।

হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় নানা পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ করেন যে, জ্ঞানদাসের সহচর বাবা আউল মনোহরদাসই সকলের পূর্ব্বে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে পঞ্চদশ সহস্র পদপূর্ণ পদ-সমুদ্র নামে একটী অতি বৃহৎ পদ-সংগ্রহ করেন। ভক্তিনিধির এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া আজ কাল অনেকেই "পদ-সমুদ্রকে" সকল সংগ্রহগ্রন্থ-মধ্যে প্রাধান্য দিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। কিন্তু নানা কারণে পদসমুদ্রের প্রামাণিকতার উপর আমাদিগের ঘোরতর সন্দেহ জন্মিয়াছে। মনোহরদাস শ্রীনিবাস আচার্য্যের সমকালীন ব্যক্তি। তিনি জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতির সমভিব্যাহারে খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মনোহরদাসকর্ত্তৃক এইরূপ বিরাট সংগ্রহ-গ্রন্থ সংকলিত হইয়া থাকিলেও রাধামোহন ঠাকুর, নরহরি (গীতচন্দ্রোদয়ের প্রণেতা) বা বৈষ্ণবদাস কেহই এই গ্রন্থের বিষয় জানিতেন না। রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

'যেস্থলে প্রাচীন পদকর্ত্তাদিগের গানের পোষকপদ প্রাপ্ত হন নাই সেখানে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পদ রচনা করিয়া দিতে হইয়াছে।' রাধামোহন ঠাকুর সহজে স্বকৃতপদ দ্বারা গ্রন্থ পরিপূর্ণ করেন নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রাধামোহন ঠাকুর ৩৫ জন কবির মাত্র পদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন ও তাঁহার পদ সংখ্যা মাত্র ৭৩৬টী। অথচ ইহার বহুকাল পূর্ব্বে মনোহর দাস ১৫ হাজার পদপূর্ণ (পদকল্পতরু গ্রন্থের প্রায় ৫ গুণ বড়) বিরাটগ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন ইহা সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। মনোহরদাস নিজে বিখ্যাত পদকর্ত্তা ছিলেন না। তাঁহার রচিত ৬টী পদ মাত্র পদকল্পতরুতে গৃহীত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় তাঁহার স্বরচিত পদদ্বারা এইরূপ বিরাটগ্রন্থের কলেবর পূর্ণ করাও বড় সম্ভবপর নহে। বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ পরগুণ-গ্রহণে কখনও কুণ্ঠিত ছিলেন না, তাঁহারা অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রাচীন গ্রন্থকারগণের গ্রন্থাদির নাম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় তাঁহারা যে এইরূপ বিরাটগ্রন্থের বিষয় ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেন নাই, ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সুতরাং আমাদের সন্দেহ হয় যে পঞ্চদশ সহস্র পদাত্মক কোন বিরাটগ্রন্থের অস্তিত্ব থাকিলে তাহা কোন পরবর্ত্তী ব্যক্তির সঙ্কলিত ও অকিঞ্চিৎকর পদাবলীতে পূর্ণ হওয়াই সম্ভব। অতএব অপর বৃহত্তর ও উৎকৃষ্টতর সংগ্রহ-গ্রন্থের অভাবে আমরা পদকল্পতরুতে সংগৃহীত পদাবলী অবলম্বনেই প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণের সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। পদাবলীর অধিকাংশ রচয়িতৃগণের জীবনীসম্বন্ধে অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই। পদকর্ত্তৃগণের মধ্যে যাঁহারা মহাপ্রভুর সমকালীন ও পার্শ্বচর ছিলেন তাঁহাদিগের নাম "চৈতন্যভাগবত" ও "চৈতন্যচরিতামৃত" প্রভৃতি গ্রন্থে প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, বসন্তরায়

প্রভৃতি যে সকল প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তৃগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, প্রসঙ্গক্রমে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ঘনশ্যাম নরহরির "ভক্তিরত্নাকর" ও "নরোত্তমবিলাস" ও নিত্যানন্দ দাসের "প্রেম-বিলাস" ও কৃষ্ণদাসের "ভক্তমালে" তাঁহাদিগের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল বিবরণ এত সামান্য যে তাহা হইতে তাঁহাদিগের জীবনচরিত অতি অল্পই জানা যাইতে পারে। পদকল্পতরুর পদকর্ত্তৃগণ মধ্যে যাঁহার সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহা আকারাদিক্রমে কবিগণের নামের পরে তাঁহাদিগের পদসমষ্টি ও পদ সংখ্যার সহিত প্রদত্ত হইবে।

(১)

অজ্ঞাত পদকর্ত্তৃগণ।

প্রায় সকল পদকর্ত্তাই প্রাচীন রীতির অনুকরণে স্বীয় পদাবলীর শেষভাগে স্বনামাঙ্কিত ভণিতাসংযুক্ত করিয়াছেন। কদাচিৎ এই প্রথার অন্যথাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। পদকল্পতরু গ্রন্থে যে সকল ভণিতাহীন পদ দৃষ্ট হয়, উহাদের রচয়িতৃগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই সেইরূপ পদ রচনা করিয়াছেন অথবা এইসকল পদাবলী পূর্ব্বকালে কেবল মুখে মুখে গীত হইত বলিয়া কাল সহকারে তাহাদের ভণিতা লুপ্ত হইয়াছে, তাহা এক্ষণ স্থির করা একরূপ অসম্ভব। পদাবলীর অন্যান্য অংশ মনোহর রচনা ও কবিত্বের জন্য সজীব থাকা যেরূপ সম্ভবপর, ভণিতাংশ সেইরূপ নহে। ইতিহাস-পরাঙ্মুখ ভাবগ্রাহী সাধারণ শ্রোতৃগণের নিকট ভণিতার মূল্য অতি সামান্য। এইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে অনেক প্রাচীনপদের রচয়িতার সম্বন্ধেও অনেক মতভেদ আছে। প্রাচীন লেখক ও কীর্ত্তনিয়াগণ অনেক সময় সুবিধাসত্ত্বেও প্রকৃত রচয়িতার নাম ধাম জানিবার চেষ্টা না করিয়া "যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং" এই সরলনীতির আশ্রয় লইয়াছেন। যাহা হউক পদকল্পতরুর কতকগুলি পদে ভণিতা না থাকার বিশিষ্ট কারণ আছে। পদকল্পতরু গ্রন্থে গ্রন্থান্তর হইতে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকাবলিকে প্রকৃতপক্ষে পদ বলা যায় না; উহাতে ভণিতা যোগ করা সুবিধাজনক নহে এবং সেইরূপ প্রথাও নাই। দৃষ্টান্তস্থলে জয়দেবকৃত গীতগোবিন্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। জয়দেবই সর্ব্বপ্রথমে সংস্কৃতে গীতের আকারে পদ রচনা করিয়াছেন। গীত-গোবিন্দের সঙ্গীতাত্মক পদগুলি সর্ব্বত্রই ভণিতাযুক্ত—কিন্তু শ্লোকাবলীতে কুত্রাপি ভণিতাসংযুক্ত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাবলী প্রকৃত পদ না হইলেও উহা রাগ রাগিণী সহকারে গীত হইতে পারে। বোধ হয় পূর্ব্বে পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ এমন কি কাব্যাদি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সুর-সংযোগে পঠিত হইত। আমাদিগের দেশে চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থ অদ্যাপি সেইরূপে পঠিত হইয়া থাকে। উড়িস্যাদেশে রঘুবংশাদির মত কাব্যের শ্লোকগুলিও সুরসহকারে পঠিত হয়। পদকল্পতরু গ্রন্থেও কতকগুলি শ্লোক এইজন্য পদরূপে সংগৃহীত হইয়াছে। এইসকল শ্লোকের মধ্যে যে গুলির রচয়িতা আমরা স্থির করিতে পারিয়াছি, তাহা সেই সেই কবির নামে উল্লিখিত হইবে।

অবশিষ্টগুলি অজ্ঞাত কবিগণের পদাবলীর অন্তর্গত করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ঐসকল শ্লোকও কোন না কোন সংস্কৃত বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে, সুতরাং আশা করা যায় অনুসন্ধান দ্বারা সময়ে উহাদেরও রচয়িতা স্থির হইতে পারিবে।

অধিকাংশ ভণিতাহীন বাঙ্গালাপদ সম্বন্ধেই কিন্তু ইহা বলা যায় না। এই সকল পদের অধিকাংশই কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত নহে—সুতরাং তাহাদের রচয়িতার নাম ধাম জানিবার সহজ কোন উপায় নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজের সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্যচরিতামৃত হইতে পদকল্পতরুতে যে কয়েকটী ভণিতাহীন পদ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা আমরা উক্ত কবিরাজের নামাঙ্কিত করিয়াছি।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে পরবর্ত্তী লেখকগণের প্রমাদবশতঃই এইসকল পদাবলীর অধিকাংশের ভণিতা পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু পদসংগ্রহকার বৈষ্ণবদাসের সময়েও যে অনেকগুলি পদের ভণিতা ছিল না তাহা বৈষ্ণবদাস পঞ্চবিংশতি পল্লবের মধ্যভাগে লিখিয়াছেন, যথা—

"অথ শ্রীসংকীর্ত্তনানুসারেণ গীতসংগ্রহঃ।

তত্র সকলেষু পদেষু ভণিতা নাস্তি" ইত্যাদি ৯৯৩ পৃষ্ঠা।

(মৎ সম্পাদিত পদকল্পতরু দ্রষ্টব্য)

সে যাহা হউক এইসকল পদের ভণিতা না থাকায় তাহাদের কবিত্ব আস্বাদনের কোন ব্যাঘাত হইবে না, সহৃদয় পাঠকগণ জানেন যে অনেক সময়ে অনেক অকিঞ্চিৎকর পদাবলি—লেখকমহাশয়দিগের অনুগ্রহে—বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত হইয়া— রসগ্রাহী নিরপেক্ষ সমালোচকগণেরও মতি-বিভ্রম ঘটাইয়াছে; সুতরাং পদাবলির প্রকৃত গুণ-বিচারের জন্য বিংশ শতাব্দীর নিরপেক্ষ সমালোচক বোধ হয় কবিগণের ভণিতাহীন পদাবলি পাঠ করাই বাঞ্ছনীয় মনে করিবেন। এরূপ অবস্থায় একটু স্বচ্ছন্দ-চিত্তে ভণিতাহীন পদগুলির কবিত্ব সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা অসঙ্গত হইবে না। বলা বাহুল্য যে দুই শতের অধিক ভণিতাহীন পদের মধ্যে উত্তম ও অধম নানারূপ কবিতাই দৃষ্ট হয়। উত্তম পদাবলীর মধ্যে কতকগুলি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির উৎকৃষ্ট কবিতা হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

"কি কহিব মাধব বুঝই না পারি।

কিসে ধনী বালা কিয়ে বরনারী॥" (৬২ পৃঃ)

ইত্যাদি বয়ঃসন্ধির পদটি বিদ্যাপতির অনুকরণ বটে, কিন্তু তাঁহার পক্ষেও অনুপযুক্ত নহে। বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত হইলে ইহা নিঃসন্দেহ তাঁহার রচিত বলিয়া চলিয়া যাইত। ৬৯৮ সংখ্যক কবিতাটী সম্বন্ধেও এ কথা খাটে।

"সুবল মিতাহে কি কব সে সব রঙ্গ" (১৯২)

ইত্যাদি রসোদ্গারের পদটী শ্রেষ্ঠ কবিগণের অযোগ্য নহে। ২৭৪।৫১৯।৬০৭।৬৭৪।৭৭৭। ৭৮৩।৭৯০।৭৯৪।৮৪৪,৯৩৩।১১৭১।১২৯১।১৩৫৭।১৯১৭ সংখ্যক পদগুলি সম্বন্ধেও এই কথা বলা

যাইতে পারে। ১৫১৯ ও ২৬৬৪ সংখ্যক পদ দুইটি বিদ্যাপতির সমালোচকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য। পণ্ডিতবর গ্রিয়ারসন সাহেবের সংগৃহীত বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলীর ৩৭ সংখ্যক কবিতাটির সহিত এই পদ দুটির সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। পদকল্পতরুর পদ দুটি একটি পদেরই বিভিন্ন পাঠান্তর। প্রথমাংশ উভয়েরই একরূপ কেবল শেষাংশ বিভিন্ন। ২৬৬৪ সংখ্যক পদে "মাধবকেলি বিলাসে" এই পংক্তি হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত "পদামৃতসমুদ্রের" পাঠ অবিকল গৃহীত হইয়াছে। গীতচিন্তামণিতে এই শেষ অংশ প্রায় গ্রিয়ারসন সাহেবের পাঠের ন্যায় যথা,—

সখি হে কেশবকেলিবিলাসে।
মালতী রমি অলি নাহি আগোরলি,
পুন রতি রঙ্গক আশে।
বদন মিলাই ধয়ল মুখ-মণ্ডল
চান্দ মিলল অরবিন্দ।
চকোর ভ্রমর দুহু দুহু আনন্দিত
পিবি অমিয়া মকরন্দ।

গী-চি ১৩শ ক্ষণদা।

গ্রিয়ারসন সাহেবের পুস্তকে যথা—

সখি হে মাধব কেলি বিলাসে।
মালতি রমি অলি নাহি আগোরলি
পুন রতি রঙ্গক আশে॥
বদন মিলায় ধয়ল মুখ-মণ্ডল
কমল বিমল জনি চন্দা।
ভ্রমর চকোর দুঅ ও অলসাএল
পীবি অমিঅ মকরন্দা॥ ৫৪ পৃঃ

ইহার পরে এইরূপ ভণিতা দেখা যায় যথা—

"ভণহি বিদ্যাপতি, শুনহ মধুর পতি,
রাধা চরিত অপারে।
রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ,
প্রাণবতী কণ্ঠহারে॥"

পদটীর প্রথমাংশ সকল পুস্তকেই এক রূপ। গ্রিয়ারসন সাহেবের প্রকাশিত বিদ্যাপতির যে কয়েকটী পদাবলীর সহিত বঙ্গদেশের প্রচলিত বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত পদাবলীর সাদৃশ্য দেখা যায়, তন্মধ্যে এই পদ একটী। বিদ্যাপতির পদাবলী বৈষ্ণব কবি ও লেখকগণের হস্তে পড়িয়া কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, এই পদটীর তুলনা দ্বারা আমরা তাহার কতকটা

নমুনা পাইতে পারি। সে যাহা হউক, এই পদটী যে বিদ্যাপতিকৃত সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশপ্রচলিত বিদ্যাপতির অনেক পদ সম্বন্ধেই কিন্তু নিঃসন্দেহে এই কথা বলা যায় না।

অবশিষ্ট ভণিতাহীন পদগুলির সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহা সংক্ষেপে বলিয়া শেষ করিব।

পদকল্পতরুর ৩৮০ সংখ্যক পদটী গোবিন্দদাস-রচিত ৬০৯ সংখ্যক পদের আংশিক পুনরুক্তি। ৪৪৫ সংখ্যক পদটী জ্ঞানদাস-রচিত ৫১২ সংখ্যক পদ বলিয়াই প্রতীত হয়। ৪৯৯ সংখ্যক কবিতাটী পদকল্পলতিকায় অবিকল দৃষ্ট হয়। উক্ত দুই গ্রন্থে এই পদে যথাক্রমে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের ভণিতা আছে। উক্ত দুই গ্রন্থের পাঠের কোন বৈষম্য নাই। ৮৬৫ সংখ্যক পদটী ৮৫৭ সংখ্যক পদের আংশিক পুনরুক্তি।

অজ্ঞাত কবিগণের পদসমষ্টি ২১৬।

পদসংখ্যা যথা—৭৯।১১৬।১২৬।১৪২।১৭৮।১৯১।২২৪।২৪১।২৪৫।২৪৭।২৫৮।২৭২।২৭৪।২৮৯।২৯১।২৯৪।২৯৬।৩৩৭।৩৪৩।৪২৭।৪৪৪।৪৬১।৪৯১।৫১৫।৫১৯।৫৪১।৫৪২।৫৪৬।৫৫৪।৫৫৬।৫৫৯।৫৯০।৬০৭।৬১৪।৬৪৬।৬৭৪।৬৯৮।৭৭৭।৭৮৩।৭৯০।৭৯৪।৮২১।৮৩৬।৮৪৩।৮৪৪।৮৫৩।৮৬১।৯০৪।৯০৫।৯১৮।৯২৯।৯৩৩।৯৫৪।৯৬৬।৯৭০।১০৫৪।১০৬৪।১০৮৬।১১৩০।১১৩১।১১৪৫।১১৪৯।১১৫৪।১১৫৬।১১৫৯।১১৬০।১১৬৩।১১৬৯।১১৭১।১১৭২।১১৭৪।১১৮০।১১৮২।১১৮৩।১১৮৬।১১৯০।১১৯৫।১২০৯।১২১৪।১২২৪।১২৩৪।১২৪৪।১২৪৫।১২৪৬।১২৭৩।১২৭৫।১২৮২।১২৯১।১২৯৪।১২৯৫।১৩১১।১৩২০।১৩২১।১৩৪০—১৩৪৩।১৩৫৬—১৩৫৮।১৩৬৪।১৩৬৬।১৩৬৭।১৩৭৪।১৩৭৭।১৩৮০।১৩৮১।১৩৯১—১৩৯৩।১৩৯৮—১৪০০।১৪১১।১৪২০।১৪৫৮।১৫২০।১৫৩৪।১৫৩৮।১৫৪৪।১৫৫১।১৫৮২।১৫৭৮।১৬১০।১৬০৬১।১৭৩০।১৭৩২।১৭৭৭।১৭৯৪।১৮০৬।১৮৬০।১৮৬১।১৮৬৩।১৮৭৬।১৯১৭।১৯২৮।১৯৮৯।২০০৪।২০০৯।২০১৩।২০৩৫।২১১৭।২১৪৭।২১৪৮।২১৫৬।২১৬০।২১৬৬।২১৭৬।২১৯২।২১৯৯।২২০৪।২২২১।২২৩৪।২২৬০।২২৭৪।২২৭৭।২২৮৭।২৩১৬।২৩৬৬।২৩৮০।২৩৯৯।২৪৫৫।২৪৬৫।২৪৯৪।২৫১০।২৫১৩।২৫২৫।২৫৩৪।২৫৬২।২৫৭৯।২৫৮০—২৫৮২।২৫৮৭।২৫৮৮।২৫৯০।২৬৪৬।২৬৮৯।২৭১৯।২৭২৩।২৭-৩৫।২৭৩৮—২৭৪৬।২৭৯২—২৭৯৪।২৮৭৭।২৮৭৮।২৮৮০—২৮৮৩।২৮৮৬—২৮৮৯।২৮৯১।২৮৯৪-২৮৯৬।২৯০২।২৯৪২।২৯৬৫।২৯৭৮।৩০০৭—৩০০৯।৩০১৫।

(২)

অনন্ত।

পদকল্পতরুগ্রন্থে "অনন্তদাস" 'অনন্ত আচার্য্য,' ও 'অনন্তরায়' এই তিন ভণিতায় পদই দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের রচিত পদসংখ্যা যথা—

অনন্ত আচার্য্য=২২১৫ সংখ্যক ১টি পদ।

অনন্তদাসের পদসমষ্টি ৩৮। পদ সংখ্যা যথা—

১২৪।১২৫।১৪৮।২৬৮।২৯৩।২৯৭।২৯৯।৩০৬।৩২৬।৩৪৬।৩৫৪।৪১১।৫৫৩।৬৪৯।৭৭৬।১০২৫।

১০৬৫।১০৬৬।১১৯৮।১১৯৯।১২৬৭।১২৭৬।১৩৩৩।১৪৯৩।১৫০৪।১৭৪৬।১৯১০।১৯৪৯।১৯৫০।১৯৫২।১৯৫৩।২০৯৬।২১৩৮।২২৬৬।২৩৪৯।২৩৫১।২৩৭৮।২৯১৩।

অনন্তরায়ের পদ ২টি। পদসংখ্যা—২২৫৮।২২৬৭। বৈষ্ণব কবিগণ ভণিতায় প্রায়শই দীনতাব্যঞ্জক 'দাস' উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। গোবিন্দচক্রবর্ত্তী, শ্রীনিবাস আচার্য্য, রাধা-মোহন ঠাকুর প্রভৃতি দ্বিজকুলোদ্ভব পদকর্ত্তৃগণের সকলেরই ভণিতায় দাস উপাধি দেখা যায়। স্বীয় কুলোপাধি এইরূপে গুপ্ত রাখায় অনেক সময়েই তাঁহাদিগের প্রকৃত পরিচয়ে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। পদকর্ত্তা অনন্তের সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে। আমাদের বোধ হয়—'অনন্তদাস' ও 'অনন্তরায়' একই ব্যক্তি। ইহাঁরই অন্য উপাধি "আচার্য্য" কিনা তাহা ঠিক বলা যায় না। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে একজন অনন্ত আচার্য্যের উল্লেখ আছে—

"পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময় তনু উদার সর্ব্ব আর্য্য॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করে প্রকাশ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য ইঁহো পণ্ডিত হরিদাস॥

* * * *

তিঁহো বড় কৃপা করি আজ্ঞা দিল মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষ লীলা বর্ণিবার তরে॥" ইত্যাদি চৈতন্যচরিতামৃত
আদি লীলা ৮ম পরিচ্ছেদ—

এস্থলে 'পণ্ডিত গোসাঞি' শব্দের লক্ষ্য মহাপ্রভুর প্রিয় পারিষদ গদাধর পণ্ডিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ "অদ্বৈতশাখা-বর্ণন" নামক আদিলীলার ১২শ পরিচ্ছেদে গদাধর পণ্ডিতের শাখা গণনায় "অনন্ত আচার্য্যের" উল্লেখ করিয়াছেন—

"শ্রীগদাধর পণ্ডিত উপশাখা মহোত্তম।
তার উপশাখা কে করিবে গণন॥

* * * *

অনন্ত আচার্য্য কবিদত্ত মিশ্র ও নয়ন।" ইত্যাদি—

গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর সমকালীন ব্যক্তি। মহাপ্রভুর তিরোভাব কালে অর্থাৎ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে বোধহয় গদাধর পণ্ডিত ও অনন্ত আচার্য্য উভয়েই জীবিত ছিলেন।

কৃষ্ণদাস বাবাজী প্রণীত "ভক্তমাল" গ্রন্থে এক অনন্ত আচার্য্যকে শ্রীরাধার সখী সুদেবীর অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—

"সুদেবী অনন্ত আচার্য্য গৌরাঙ্গ কিঙ্কর॥" (ভঃ মাঃ)

সম্ভবতঃ চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণিত অনন্ত আচার্য্য সম্বন্ধেই ইহা বলা হইয়াছে—কারণ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলিতে একজন ভিন্ন দুইজন "অনন্ত আচার্য্যের" উল্লেখ পাওয়া যায় না।

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে অদ্বৈতাচার্য্য শাখা গণনায় এক অনন্তদাসের উল্লেখ আছে—

"অনন্তদাস কাণুপণ্ডিত দাস নারায়ণ" (চৈ-চ আদি ১২শ)

এই অনন্তদাসই পদকর্ত্তা অনন্তদাস কিনা নিশ্চিত জানা যায় না।

অনন্তদাসের পদ রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্রে' উদ্ধৃত হইয়াছে, সুতরাং অনন্ত যিনিই হউন না কেন তিনি যে রাধামোহন ঠাকুরের অপেক্ষা প্রাচীন—অন্ততঃ সমকালীন ব্যক্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাধামোহন ঠাকুরের "পদামৃত-সমুদ্র" রচনার কাল আনুমানিক খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনীতে ঐ বিষয়ের আলোচনা করিব।

মহাপ্রভুর পারিষদ্‌গণের মধ্যে অনন্তদাসের নাম দেখা যায় না। সম্ভবতঃ ইনি মহাপ্রভুর অব্যবহিত পরবর্ত্তী। সুতরাং আনুমানিক ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের পরে তিনি প্রাদুর্ভূত হন। ইহাঁর রচিত একটি গৌরাঙ্গের ষড়্‌ভুজরূপ-বর্ণনা আছে (২০৯৬ পদ দ্রষ্টব্য)। অনন্ত সুকবি ছিলেন। তিনি একদিকে চণ্ডীদাসের ন্যায় সরল ভাষায় দুই চারিটি কথায় প্রাণের গভীর সরল উচ্ছ্বাসগুলি ব্যক্ত করিতে পারিতেন। অন্যদিকে গোবিন্দদাসের ন্যায় ভাবপূর্ণ সুললিত পদ-বিন্যাসেও সমর্থ ছিলেন। অনন্তের 'কি হেরিনু কদম্বতলাতে' (৯২ পৃঃ) ও 'সজনি ও কে নাগর তরুমূলে' (১০৯ পৃ) পূর্ব্বরাগের এই সুললিত পদ দুটি প্রথমশ্রেণীর কবির অনুপযুক্ত নহে।

"কিশোর বয়স বেশ
আর তাহে রসাবেশ
আর তাহে ভাতিয়া চাহনি।
হাসির হিল্লোলে মোর
পরাণ পুতলী দোলে
দিতে চাই যৌবন নিছনি॥" (৯২ পৃঃ)

এইরূপ সরল ও গভীর মর্ম্ম-স্পর্শী উক্তি দ্বারা কবি নায়িকার মনের ব্যাকুলতা বুঝাইয়া দিতেছেন।

"বিকচ সরোজ ভাল মুখমণ্ডল" (১৭৯১ পৃঃ)

এই পদটী গোবিন্দ দাসের উৎকৃষ্ট রূপ বর্ণনার পদের সহিত তুলনীয়। এতদ্ব্যতীত

"কানুর লাগিয়া জাগি পোহায়লু" ইত্যাদি (২৩৫৩ পৃঃ)

বিপ্রলব্ধাবর্ণনটী অতি মনোহর হইয়াছে। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস কি বসন্তরায়ের তুলনায় অনন্তের ঈদৃশ কবিতার সংখ্যা নিতান্তই অল্প। আর একটী কৌতুকের বিষয় এই অনন্তদাসের পূর্ব্বরাগ, ও রূপবর্ণনার পদে যে সুমধুর কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা তাঁহার অন্যবিষয়ক পদে লক্ষিত হয় না। নিম্নশ্রেণীর কবিগণ দ্বারাও যে কদাচিৎ উচ্চ

শ্রেণীর কবিতা রচিত হইতে পারে, ইহা তাহার একটী দৃষ্টান্ত-স্থল। যাহা হউক, অনন্তের পূর্ব্বোক্ত চারিটী পদের জন্যই যে তিনি চিরকাল বঙ্গ-সাহিত্যে সমাদৃত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৩)

আগবরোয়ালি—২৭৫০ সংখ্যক পদ।

ভণিতা দর্শনে ইহাঁকে (আক্‌বর আলী) মুসলমান বলিয়া জানা যায়। ইহাঁর দেশকাল কিছুই জানিবার উপায় নাই। এই একটী মাত্র পদ পাঠ করিয়া ইহাঁর কবিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা অন্যায়—কিন্তু এই একটীমাত্র কবিতাই ইহাঁর বৈষ্ণবতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার মাধুর্য্য যে এক জন মুসলমান কবির অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিমোহিত ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের ভিখারী করিয়াছিল—এই কবিতাটী তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং ইহাই এই কবিতার বিশেষত্ব।

(৪)

আত্মারাম দাস—পদসমষ্টি ৪।

পদসংখ্যা—৬৩৫।২২২৪।২২৩৫।১৯৫১।

আত্মারাম সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। ইহাঁর রচিত পদাবলী "পদামৃত-সমুদ্রে" উদ্ধৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ ইনি রাধামোহন ঠাকুরের পরবর্ত্তী। ইহাঁর ৪টী পদের মধ্যে ৩টী পদই নিত্যানন্দ-বিষয়ক। ইহাঁর রচনায় বিশেষ কোন ভাব-বৈচিত্র্য দেখা যায় না, তবে পদগুলি রচয়িতার ভক্তির পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

এই ভক্তি-ভাবটী বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণের সাধারণ সম্পত্তি, তাঁহাদিগের পদাবলীতে আর কিছু থাকুক বা না থাকুক এই ভক্তিভাবটী প্রায় সর্ব্বত্রই বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

(৫)

আনন্দ

আনন্দ চাঁদ—২৩৬৩ সংখ্যক পদ।

আনন্দদাস—পদ সমষ্টি ২। পদসংখ্যা—২৭১৩।২৭৯১।

আমাদিগের বিবেচনায় আনন্দচাঁদ ও আনন্দদাস অভিন্ন। আনন্দচাঁদের রচিত শ্রীকৃষ্ণের সুদীর্ঘ রূপ-বর্ণনটী ২৭৯১ সংখ্যক পদের শ্রীরাধার রূপ-বর্ণনার সহিত তুলনা করিলেই ইহা প্রতীত হইবে। আনন্দচাঁদ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। ইনি যে সুমধুর পদ বিন্যাসে পটু ছিলেন—তাঁহার কৃত শ্রীকৃষ্ণের সুদীর্ঘ সর্ব্বাবয়ব রূপ-বর্ণনাই সে বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিবে। ইহাঁর এই পদটী গোবিন্দদাস অথবা বলরাম দাসের এই শ্রেণীর রূপ বর্ণনার সহিত সর্ব্বথা তুলিত হইবার যোগ্য।

(৬)

উদ্ধব দাস

পদসমষ্টি —৯৭। পদ-সংখ্যা—৩২।৩৩।৩৫।৪১৮।৪১৯।৫২৫।৫৬৪।৫৭০।৫৮৬।৫৮৮।৫৮৯।৬৪৪। ৮১৯।৮৫১।১০৭২।১০৮৩।১১০১।১১৩২।১১৩৫।১১৩৬।১১৩৯।১১৪০।১১৪২।১১৯৪।১১৯৭।১২২৬। ১২৩২।১২৫৩।১২৫৪।১২৫৬।১২৮৫।১৩৪৪।১৩৪৬।১৪৮।১৪৩৩।১৪৩৪।১৪৪০।১৪৪৩।১৪৫২।১৪৫৪। ১৪৬৭।১৪৬৮।১৪৬৯।১৪৭৭।১৪৯৯।১৫৫৭।১৫৬১।১৫৯২।১৭০০।১৭০৬।১৭৪৪।১৭৪৮।১৯৬৬।২০০২। ২৩০৫।২৩৮২।২৪২৬।২৫৩৭-২৫৪৬।২৫৪৮।২৫৫৮।২৫৬১।২৫৯১।২৬৭৩।২৬৮৩।২৭৫৭—২৭৬০। ২৭৭৬।২৮২৬—২৮৩১।৩০১৪।

উদ্ধবদাস অনেকগুলি পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় ইহাঁর সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না।* ৩০১৪ সংখ্যক পদে ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব আচার্য্যগণের বর্ণনা করিয়াছেন—তাহাতে লিখিত হইয়াছে—

"শ্রীঠাকুর মহাশয়, তাঁর যত শাখা হয়,
মুখ্য কিছু করিয়ে প্রকাশ।
রামকৃষ্ণ আচার্য্য খ্যাতি, গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী,
ভক্তিমূর্ত্তি গামিলা নিবাস।
রূপ রাধু রায় নাম, গোকুল শ্রীভগবান,
ভক্তিমান শ্রীউদ্ধব দাস ॥"

সর্ব্বশেষে এইরূপ ভণিতা আছে—

"শ্রীরাধামোহন পদ, যার ধন সম্পদ,
নাম পায় এ উদ্ধবদাস ॥"

ইহা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে উদ্ধব দাস সুবিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্য নরোত্তম ঠাকুরের শাখাভুক্ত এবং এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। কিন্তু এইরূপ হইলে রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত-সমুদ্রে যে ইহাঁর বহু-সংখ্যক পদাবলী হইতে ২।৪টী পদও উদ্ধৃত হন নাই, ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই বিরোধ পরিহার জন্য দ্বিতীয় উদ্ধব দাসের অস্তিত্ব অথবা উদ্ধব দাসের পদ রচনার পূর্ব্বেই "পদামৃত-সমুদ্রের" সংগ্রহ ও সমাপ্তির কল্পনা করা যাইতে পারে। আমাদিগের কিন্তু সন্দেহ হয় যে পদ বর্ণিত "ভক্তিমান উদ্ধবদাস" ও এই পদকর্ত্তা উদ্ধব এক ব্যক্তি নহেন।

---

* শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে লিখিত আছে, উদ্ধবদাস—অপর নাম কৃষ্ণকান্ত; ইনি পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসের বন্ধু ছিলেন। বাড়ী টেঞা (বৈদ্যপুর), দুঃখের বিষয় দীনেশ বাবু তাঁহার এই উক্তির পোষক কোন প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই।

বিনয়ের আদর্শ প্রাচীন বৈষ্ণব কবির পক্ষে নিজকে "ভক্তিমান" বলিয়া পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর বোধ হয় না। ভণিতার অর্থ দ্বারাও এরূপ নিশ্চিত বুঝায় না যে পদকর্ত্তা রাধামোহনের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। পরবর্ত্তী কবির পক্ষেও ভক্তিবশতঃ এইরূপ উক্তি অসম্ভব নহে। সুতরাং আমাদিগের বিবেচনায় পদামৃত-সমুদ্রকার রাধামোহন ঠাকুরের পরবর্ত্তী সময়ে উদ্ধবদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় নরোত্তম ঠাকুরের শাখাভুক্ত ভক্তিমান উদ্ধবদাস কোন পদ রচনা করিয়া থাকিলে তাহা অপর উদ্ধবদাসের পদ হইতে পৃথক্ করা একরূপ অসম্ভব। এই পদ দর্শনে বোধ হয় যে "ভক্তিমান্" উদ্ধব নরোত্তম ঠাকুর ও সম-সাময়িক শ্রীনিবাস আচার্য্যের সমকালীন অথবা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী ছিলেন। এরূপ অবস্থায় তিনি পদ রচনা করিয়া থাকিলে রাধামোহন ঠাকুরের সংগ্রহে অবশ্যই তাহা স্থান পাইত। সুতরাং বিবেচনা হয় যে এই উদ্ধব তাঁহার ভক্তিময় জীবনের জন্য যেরূপ বিখ্যাত ছিলেন পদকর্ত্তা বলিয়া সেইরূপ ছিলেন না। পক্ষান্তরে পদকর্ত্তা উদ্ধব দাস যে সুকবি ছিলেন সে সম্বন্ধে মতভেদ নাই। উদ্ধবদাসের পদাবলীর কবিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা বলার পূর্ব্বে ইহাও বলা উচিত যে তাঁহার নামীয় পদগুলি প্রণিধান সহকারে পাঠ করিলে তাহা একব্যক্তির রচনা বলিয়াই প্রতীতি হয়।

উদ্ধবদাস—পূর্ব্বরাগ, মান, আক্ষেপানুরাগ, বাল্যলীলা, গোষ্ঠ, রাসলীলা, দানলীলা, হোরি, ঝুলন, মাথুর, বিরহ, রূপবর্ণন প্রভৃতি নানাবিষয়ের পদ রচনা করিয়াছেন। কবিত্ব বিষয়ে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পালা ছাড়িয়া দিয়া গোবিন্দদাস, বলরামদাস, রায়শেখর, বসন্তরায় প্রভৃতি কবিগণের পরেই ইহাঁর স্থান নির্দ্দেশ করিতে হয়। উদ্ধবদাস, বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি মিশ্রিত দুইরকম পদই রচনা করিয়াছেন। ইহাঁর রচিত প্রাঞ্জল ও সুললিত লঘুত্রিপদী ছন্দের "কদম্বের বনে থাকে কোন জনে" (২৯ পৃঃ) ইত্যাদি পদগুলি ইহাঁর ভাষার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণ যে অনেক সময়ে প্রচলিত ভাষা পরিত্যাগ করিয়া ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়াছেন—উদ্ধবের ব্রজবুলির পদ পাঠে তাহাও প্রতীত হইবে। পাঠকগণ ৩২—৩৫ প্রভৃতি পদে উদ্ধবের সুললিত অবিমিশ্র রচনা, ৪১৮।৪১৯ প্রভৃতি পদে উত্তম ব্রজবুলি—"দেখ সখি ঝুলত রাধাশ্যাম" (১৫-৫৭ পদ) ও "নব গোরোচন জিনিয়া বরণ" (১৭৪০ পৃঃ) ইত্যাদি পদে তাঁহার রচনা ও কবিত্বশক্তির পরিচয় লইবেন। নানাবিষয়ক রচনায় অতি অল্পসংখ্যক কবিই দক্ষতা দেখাইতে পারেন; এরূপ অবস্থায় উদ্ধবের নানা বিষয়িণী পদাবলী পাঠ করিয়া তাঁহার কবিত্বের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। প্রাচীন মহাজনদিগের বর্ণনা সম্বলিত উদ্ধবের ২৩০৩—২৩০৫ ও ৩০১৪ সংখ্যক পদগুলি ঐতিহাসিকের নিকট অনাদৃত হইবে না। আমাদের এই ইতিহাসহীন দেশে অনেকস্থলেই এইরূপ বিক্ষিপ্ত বিবরণসমূহের সংগ্রহ ব্যতীত প্রাচীন মহাজনগণের সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য ধারাবাহিক বৃত্তান্ত জানিবার সম্ভাবনা অল্পই আছে।

(৭)

কবিরঞ্জন।

পদসমষ্টি—৭। পদসংখ্যা—২১২।২৫৬।৬৭৯।৯৬১।১০৭৫।১১০০।১৭৫৭।

কবিরঞ্জন যে কোন ব্যক্তির উপাধি নাম নহে, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। পদকল্পতরু গ্রন্থের অষ্টাবিংশ পল্লবে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের যে মিলন বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি দৃষ্ট হয়, যথা—

"চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলল
বটতলে সুরধুনী তীর॥"
"পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে
শুনতহি রূপনারায়ণ॥
কহ বিদ্যাপতি ইহ রস কারণ
লছিমা পদ করি ধ্যান॥"

ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে এই পদের রচয়িতা বিদ্যাপতি ও কবিরঞ্জনকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া জানিতেন।

কবিরঞ্জনের ভণিতাযুক্ত পদগুলি বিদ্যাপতির পদের সহিত তুলনা করিলে তাহা এক ব্যক্তির রচিত বলিয়াই বোধ হয়।

"কি পুছসি রে সখি কানুক লেহ।" (৬৭৯ পদ)

এই সুবিখ্যাত পদটি পদকল্পতরু ও পদামৃতসমুদ্রে কবিরঞ্জনের নামে এবং পদকল্পলতিকায় কবিশেখরের নামে উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিরঞ্জনের অন্যান্য পদগুলিও বিদ্যাপতির উৎকৃষ্ট পদের সহিত তুলিত হইবার অযোগ্য নহে।

(৮)

কানুরাম।

পদসমষ্টি—১২। পদসংখ্যা, ৩১১।৩৩২।৩৩৪।৬৬১।১৯৬৫।১৯৭৭।১৯৭৮।২০৪৬।২১৭৩।২১৯৪। ২২৫১।২২৫৭। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে নিত্যানন্দের শাখা গণনায় কানুঠাকুরের উল্লেখ আছে যথা,—

"শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাঁহার তনয়॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণসনে॥
তার পুত্র মহাশয় শ্রীকানুঠাকুর।
যার দেহে রহে কৃষ্ণ প্রেমামৃত পূর॥" (চৈ-চ আদি ১১শ)

সম্ভবতঃ এই কানুঠাকুরই পদকর্ত্তা কানুরাম হইবেন। ইনি নিত্যানন্দের সহচর পুরুষোত্তমদাসের পুত্র। উক্ত গ্রন্থে অদ্বৈতাচার্য্যের শাখা গণনায় আর এক কানুপণ্ডিতের উল্লেখ আছে যথা,—

'অনন্তদাস কানুপণ্ডিত দাস নারায়ণ।" (চৈ·চ-আদি ১২শ)

উক্ত কানুঠাকুর ও পণ্ডিত কানু একই ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়।

কানুরাম বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি দুইরকম পদই রচনা করিয়াছেন। ৩১১।৩৩৪।১৯৭৭। ১৯৭৮ প্রভৃতি পদে ইহার বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল রচনা এবং ৩৩২।৬৬১। প্রভৃতি পদে ইহাঁর ব্রজ-বুলি রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাঁর রচিত বাঙ্গালা পদগুলি কবিত্বাংশে মন্দ নহে। ইনি সরল ভাষায় কথা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

(৯)

কৃষ্ণকান্ত।

পদসমষ্টি ২৯। পদসংখ্যা ২৭৯৫—২৮২৩। কৃষ্ণকান্তের জীবনী সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। তাঁহার রচিত পদগুলি দ্বাত্রিংশৎ পল্লবের শেষভাগে একত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইনি সুললিত ব্রজবুলির পদ রচনায় পটু ছিলেন,—ইহাঁর অধিকাংশ পদই ব্রজবুলি মিশ্রিত। বহিঃপ্রকৃতির মনোহারিত্ব ইহাঁর রচনায় স্থানে স্থানে বেশ ফুটিয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে "সহজেই ভূধর পরম মনোহর" (২৮১০) প্রভৃতি পদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভাবের গভীরতা ইহাঁর রচনায় বিরল।

(১০)

কৃষ্ণদাস।

কৃষ্ণদাস—পদসমষ্টি ২৩। পদসংখ্যা ১০৮২।১১১২।১১১৩।১২৩৭।১২৩৮।১৪৬০।১৫৬৬। ১৫৭২।১৭৪০।১৯৪৮।২০১৯।২২৭৩।২২৮৮—২২৯০।২৭৬৬।২৭৭৮—২৭৮০।২৯০৯।২৯১০।২৯২৪। ৩০০৬।

কৃষ্ণদাস (কবিরাজ)— পদসমষ্টি ৫। পদসংখ্যা ১১১৮।১৫৪১।১৬৩০।১৬৪৯।২৯৫৯।

কৃষ্ণভক্তদিগের নিকট কৃষ্ণদাস নামটি বড়ই প্রিয়; তাই চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে অনেকগুলি কৃষ্ণদাসের উল্লেখ পাওয়া যায় যথা ;—

১ম—দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে মহাপ্রভুর সহচর কুলীন ব্রাহ্মণ "কৃষ্ণদাস"

"কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যারে সঙ্গে লৈয়া কৈল্ দক্ষিণগমন।" (চৈ·চ আদি ১০ পরিচ্ছেদ)

ইনি অতি সরল-স্বভাব ছিলেন। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সময়ে ভট্টমারীগণ ইহাঁকে প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া যায় (চৈ-চ-মধ্য ৯ম)। ভট্টমারীগণের নিকট হইতে ইহাঁকে উদ্ধার করিয়া নানাদেশ পর্য্যটনান্তে মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইহাঁকে যথা ইচ্ছা যাইবার আদেশ করেন। কিন্তু যখন কৃষ্ণদাস প্রভুর সঙ্গ ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া রোদন

করিতে লাগিলেন, তখন অগত্যা মহাপ্রভু নিত্যানন্দ জগদানন্দ প্রভৃতির অনুরোধে ইহাঁর দ্বারা গৌড়ে অদ্বৈতাচার্য্যাদির নিকট সম্বাদ দিয়া পাঠান (চৈ-চ-মধ্য ১০ম)। ইহার পরে এই কৃষ্ণদাসের আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ স্বদেশে গৌরাঙ্গভক্তিতে ইহাঁর অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হইয়া থাকিবে।

২য়—নিত্যানন্দের শ্বশুর সূর্য্যদাস সরখেলের ভ্রাতা কৃষ্ণদাস।

"সূর্য্যদাস সরখেল তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস প্রেমের নিবাস॥" (চৈ-চ-আদি ১১শ)

ইহাঁর সম্বন্ধে অধিক কিছু জানা যায় না।

৩য়—অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস।

"অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস নাম।" (চৈ-চ আদি ১০ম)
"অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস চলিলা শ্রীধর।" (চৈ-ভা শেষ ৭ম)

৪র্থ—কৃষ্ণদাস (বৈদ্য)

"কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর।" (চৈ-চ ঐ)

৫ম—রাঢ়দেশবাসী কালিয়া কৃষ্ণদাস ;—

"রাঢ়দেশে জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
শ্রীনিত্যানন্দের তিহোঁ পরম কিঙ্কর॥
কালা কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব প্রধান।
নিত্যানন্দ চন্দ্র বিনা কিছু নাহি জান॥" (চৈ-চ আদি ১১শ)
"রাঢ়ে জন্ম মহাশয় দ্বিজ কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দ পারিষদ যাঁহার বিলাস॥
প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণ নাম ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাহার স্মরণে॥" (চৈ-ভা শেষ ৫ম)

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নীলাচল হইতে নিত্যানন্দের ভক্তি প্রচারার্থ গৌড়দেশে গমনপ্রসঙ্গে চৈতন্য-ভাগবতে যে কৃষ্ণদাস পণ্ডিতের কথা লেখা আছে বোধ হয় সেই কৃষ্ণদাস পণ্ডিত ও কালিয়া কৃষ্ণদাস অভিন্ন ব্যক্তি। এই কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দের ভক্তগণ মধ্যে অতি প্রধান ছিলেন, সময়ে সময়ে ইহাঁর ব্রজগোপালের ভাবাবেশ হইত—

"কৃষ্ণদাস পরমেশ্বর দাস দুইজন।
গোপাল ভাবে হৈ হৈ করে অনুক্ষণ॥" (চৈ-ভা শেষ ৫ম)

৬ষ্ঠ। নারায়ণ, মনোহর ও দেবানন্দের ভ্রাতা কৃষ্ণদাস। এই নারায়ণ সম্বন্ধেই সম্ভবতঃ বলা হইয়াছে—

"নারায়ণ পণ্ডিতশাখা এ বড় উদার।" (চ-চ আদি ১০ম)

এই কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে অধিক কিছু জানা যায় না; নিত্যানন্দপ্রভুর পারিষদগণের নাম

প্রসঙ্গে এই চারিভ্রাতার উল্লেখ পাওয়া যায়। চৈতন্যভাগবতেও একত্র কৃষ্ণদাস ও দেবানন্দের উল্লেখ আছে—

"কৃষ্ণদাস দেবানন্দ দুই শুদ্ধমতি।" (চৈ-ভা শেষ ৫ম)

৭ম। বড়গাছী নিবাসী কৃষ্ণদাস।

"বড়গাছী নিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস।
যাহার গ্রামেতে নিত্যানন্দের বিলাস॥" (ঐ)

৮ম। কৃষ্ণদাস—অদ্বৈত আচার্য্যের শাখাভুক্ত ছিলেন। (চৈ-চ আদি ১২শ)

৯ম। উড়িষ্যাদেশীয় জগন্নাথদেবের সুবর্ণ বেত্রবাহক কৃষ্ণদাস।

"কৃষ্ণদাস নাম এই সুবর্ণবেত্রধারী।" (চৈ-চ মধ্য ১১শ)

১০ম। দুখী ওরফে শ্যামানন্দ ওরফে কৃষ্ণদাস। ঘনশ্যাম ওরফে নরহরি চক্রবর্ত্তীর রচিত ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থে এই কৃষ্ণদাসের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। এই কৃষ্ণদাস দণ্ডেশ্বর গ্রামবাসী এক সদ্গোপের পুত্র। বাল্যকালে সকলে ইহাকে দুখী বলিয়া ডাকিত। ইহাঁর দীক্ষাগুরুর নাম হৃদয়চৈতন্য। বৃন্দাবনবাসকালে দুখী কৃষ্ণদাস শ্যামানন্দ নামে পরিচিত হন। ইহাঁর শেষজীবন উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে অতিবাহিত হয়। ইনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন।

১১শ। চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের প্রণেতা সুবিখ্যাত কৃষ্ণদাস কবিরাজ। ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্যবংশে ইহাঁর জন্ম হয়। কৃষ্ণদাস দারপরিগ্রহ করেন নাই। নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে ইনি বৃন্দাবনে প্রস্থান করেন এবং তথায় রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট ও গোপালভট্ট এই সুপ্রসিদ্ধ ষট্‌গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য-খ্যাতি লাভ করেন। ইনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা বিষয়ক "গোবিন্দলীলামৃত" গ্রন্থ ও বিল্বমঙ্গল ঠাকুর কৃত "কৃষ্ণকর্ণামৃতের" টীকা রচনা করিয়া ৭৬ বৎসর বয়সে "চৈতন্যচরিতামৃত" রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই গ্রন্থ-রচনা বিষয়ে মুরারিগুপ্ত ও স্বরূপদামোদরের কড়চা, রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাশয়ের নিকট শ্রুত ও তাঁহার সাক্ষাৎ দৃষ্ট মহাপ্রভুর বিবরণ এবং বৃন্দাবনদাসের "চৈতন্যভাগবত"ই তাঁহার মূল অবলম্বন ছিল। এতদ্ভিন্ন মহাপ্রভুর ভক্ত শিবানন্দসেনের পুত্র কবিকর্ণপূরের রচিত "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" নামক সংস্কৃত নাটক ও রূপগোস্বামীর কড়চা হইতেও তিনি সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের রচনা নয়বৎসরে সমাপ্ত হইয়াছিল।

উপরে যে ১১ জন কৃষ্ণদাসের নাম লিখিত হইল এতদ্ব্যতীত তাঁহাদিগেরই প্রায় সমসাময়িক আরও ২।৪ জন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাসের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। তাঁহারা সকলেই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোক। কৃষ্ণদাস বাবাজির রচিত "ভক্তমাল" গ্রন্থে ইহাঁদিগের ২।১ জনের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে বিখ্যাত বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের আদি গুরু মহাপ্রভুর সমসাময়িক বল্লভাচার্য্যের শিষ্য কৃষ্ণদাস পয়োহারীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইনি ব্রজভাষার

কৃষ্ণলীলাবিষয়ক বহুসংখ্যক পদ রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে কৃষ্ণলীলাত্মক পদ রচনাবিষয়ে তিনি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অদ্বিতীয় কবি সুরদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আগর-দাস ইহাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন। আগরদাসের শিষ্য নাভাজি ব্রজভাষায় দোহা ছন্দে "ভক্তমাল" গ্রন্থ রচনা করেন *। এই কৃষ্ণদাস বা তন্নামধারী অপর মহাত্মগণ যে বাঙ্গালাভাষায় অথবা তথাকথিত ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করিয়াছেন ইহা সম্ভবপর নহে। সুতরাং ইহাদিগের কথা ছাড়িয়া দিলে আমরা বৈষ্ণবগ্রন্থে প্রধানতঃ ১১ জন কৃষ্ণদাসের উল্লেখ পাই। এরূপ অবস্থায় "কৃষ্ণদাসের" ভণিতাযুক্ত পদগুলি যে কোন্‌টি কাহার রচিত তাহার মীমাংসা করা একরূপ অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

ভণিতায় কেবল "কৃষ্ণদাস" নাম পাওয়া গেলেও আমরা এই পদাবলির মধ্যে ৫টি পদ। কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামে চিহ্নিত করিয়াছি। এইরূপ করার কারণ এই যে এই পদগুলি "চৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে অবিকল দৃষ্ট হয়। রচনা বা বিষয় দৃষ্টে এই পদগুলি যে উক্ত গ্রন্থে গ্রন্থান্তর হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে না। এমন কি দুই তিনটি পদের পূর্ব্বে "পদকল্পতরু" গ্রন্থে "তথাহি চৈতন্যচরিতামৃতে" এইরূপ পদকর্ত্তার নির্দ্দেশ আছে। অবশিষ্ট পদাবলীর মধ্যে কয়েকটির ভণিতায় "কৃষ্ণদাস" নামের পূর্ব্বে 'দুঃখী' এই বিশেষণটি সংযুক্ত দেখা যায় (১১১২, ১১১৩ ও ১৯৪৮ পদ), এইরূপ বিশেষণ দর্শনেই কেহ কেহ এই পদগুলিকে নিঃসন্দেহে দুঃখী কৃষ্ণদাস ওরফে শ্যামানন্দের রচিত বলিয়া স্থির করিতে চাহেন, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। প্রথমতঃ—বৈষ্ণব কবিগণ ভণিতায় নিজ নিজ নামের পূর্ব্বে যে অনেক স্থলেই দীনতাব্যঞ্জক অনেক বিশেষণ সংযুক্ত করিয়াছেন তাহার শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কৃষ্ণদাসের ভণিতাযুক্ত পদেও অনেক স্থলে "দীন" (১০৮২, ১৪৬০, ২০১৯ ও ২২৮৮ পদ দ্রষ্টব্য) ও কোন কোন স্থলে "দীন হীন" (২২৮৯, ২২৯০ পদ দ্রষ্টব্য) বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। আমাদিগের বোধ হয়, "দুঃখী" শব্দটিও ঐরূপ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। নতুবা কষ্টকল্পনায় "দীন" ও "দীনহীন" শব্দের "দুঃখী" অর্থ ধরিয়া ঐ পদগুলি সমস্তই দুঃখী কৃষ্ণদাসেরই রচিত বলিয়া স্থির করা যায় না কি ? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দীক্ষান্তে দুঃখী কৃষ্ণদাস "শ্যামানন্দ" নামে বৈষ্ণব-জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। শ্যামানন্দের ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদও পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা একাধিক পদকর্ত্তা শ্যামানন্দের বিষয় অবগত নহি। এক ব্যক্তির দুই নামে পদ রচনা করাও সম্ভব বোধ হয় না।

আমাদিগের বর্ণিত কৃষ্ণদাসগণের মধ্যে এক উড়িষ্যাবাসী কৃষ্ণদাসকে ছাড়িয়া দিলে অবশিষ্ট সকলেরই পদরচনার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় বিশেষ প্রমাণের অভাবে আমরা কাহারও সম্বন্ধে পক্ষপাত করিতে প্রস্তুত নহি। এই পদগুলির অধি-

* গ্রিয়ার্স'ন সাহেব কৃত The Modern Vernacular Literature of Hindusthan নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের ২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

কাংশই গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের বর্ণনা এবং গৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। তন্মধ্যে ১৫৭২ সংখ্যক পদে অম্বিকানগরবাসী গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের অভিষেক বর্ণিত হইয়াছে। তদ্রূপ ২২৮৮-২২৯০ পদে উক্ত গৌরীদাসের স্বপ্ন ও তাঁহার গৃহে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের অধিষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে। এই পদগুলির ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য নহে। এই সকল পদের রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ হইলে তাহা অন্ততঃ সূত্ররূপেও তাঁহার গ্রন্থে স্থান না পাওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। পরিশেষে সত্যের অনুরোধে ইহাও ব্যক্তব্য যে অবশিষ্ট পদাবলীর মধ্যে কয়েকটীর রচনা-প্রণালীর সহিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের পদাবলীর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ২২৭৩ সংখ্যক পদটি কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিঃসন্দিগ্ধ পদগুলির সহিত তুলনা করিলেই ইহা প্রতীত হইবে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। গৌরাঙ্গ-ভক্ত বৈষ্ণব-জগতে ভক্তিশাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্যের জন্য যে সকল মহাত্মা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। এ বিষয়ে তাঁহাকে রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামী ও রামানন্দ রায়ের সমকক্ষ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার "চৈতন্য-চরিতামৃত" বঙ্গীয় বৈষ্ণব-জগতে দ্বিতীয় ভাগবতরূপে পূজিত হইতেছে। বস্তুতঃ তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য, উদারতা, অপূর্ব্ব সত্যনিষ্ঠা, সহৃদয়তা, ও ভগবদ্ভক্তির প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না; এই সকল গুণে তাঁহার "চৈতন্য-চরিতামৃত" চৈতন্য-ভাগবতাদির পরবর্ত্তী হইলেও মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম ও তাঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন ও ইতিহাসের স্থান অধিকার করিয়াছে। কবিরাজ গোস্বামীর পদাবলীই আমাদের আলোচ্য বিষয়। তাঁহার দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি ও পাণ্ডিত্য যেরূপ প্রশংসাযোগ্য কবিত্ব সেইরূপ নহে। পদাবলীর কবিত্ব উপলক্ষ করিয়াই এই কথা বলিতেছি—নতুবা ঘটনাবলীর বর্ণনায় তিনি যে অপূর্ব্ব ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, বৈষ্ণব সাহিত্যে তাহার তুলনা-স্থল অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। তাঁহার বর্ণিত মহাপ্রভুর অমৃতায়মান চরিত্রের আস্বাদনে অতি পাষণ্ডের হৃদয়ও বিগলিত না হইয়া পারে না। গোস্বামীর রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর পদাবলী কালে বিলুপ্ত হইতে পারে—কিন্তু তাঁহার "চৈতন্য-চরিতামৃত" তাঁহাকে চিরকালের জন্য অমর করিয়া রাখিবে।

(১১)

কৃষ্ণদাস।

পদসমষ্টি ২। পদসংখ্যা ২৬৩।৯৪১। পদামৃত-সমুদ্রকার রাধামোহন ঠাকুরের গ্রন্থের প্রারম্ভে নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি দৃষ্ট হয়, যথা—

"বন্দে তং জগদানন্দং গুরুং চৈতন্যদায়কং।
শ্রীভবেদার্থবিস্তারে প্রবৃত্তো যৎ কৃপাশয়া॥

গুরোঃ প্রকাশকং শ্রীলকৃষ্ণাখ্যং সর্ব্বসিদ্ধিদং।
প্রসাদপদসংযুক্তং বন্দেহহং করুণার্ণবম্ ॥"

এই শ্লোক ও রাধামোহন ঠাকুরের স্বকৃত টীকা পাঠে জানা যায়, কৃষ্ণপ্রসাদ রাধামোহনের গুরু জগদানন্দ ঠাকুরের পিতা ছিলেন। এই জগদানন্দ মহাপ্রভুর অসামান্য প্রেম পাত্র ও সহচর জগদানন্দ পণ্ডিতের অনেক পরবর্ত্তী। রাধামোহন ঠাকুরের পিতামহ শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী ছিলেন—এরূপ অবস্থায় রাধামোহন ঠাকুরের সমসাময়িক জগদানন্দ যে মহাপ্রভুর অনেক পরবর্ত্তী হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

রাধামোহন ঠাকুরের জন্মকালের আনুমানিক অন্যূন বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে অথবা শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্মের বিংশতি বৎসর পরে এই কৃষ্ণপ্রসাদের কাল স্থির করা যাইতে পারে। পদামৃত-সমুদ্রের এই একটি উক্তি ব্যতীত ইহাঁর জীবন-বৃত্তান্ত কিছুই জানা যায় না।

কৃষ্ণপ্রসাদের দুইটি মাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু এই দুইটি মাত্র পদেই তাঁহার কবিত্বের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের আদর্শে পদ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পদ দুটি সরল ও স্বাভাবিক বর্ণনা কৌশলে উক্ত সুপ্রসিদ্ধ কবিগণের শিষ্যের অনুপযুক্ত হয় নাই।

(১২)

গতিগোবিন্দ

২২৪৮ সংখ্যক পদ।

উক্ত পদের ভণিতা এইরূপ যথা,—

"মনের আনন্দে,　　　　শ্রীনিবাসসুত,
গতিগোবিন্দ চিত ভোররে ॥"

রাধামোহন ঠাকুরের কৃত পদামৃত-সমুদ্রের টীকায় লিখিত হইয়াছে—

"শ্রীমদাচার্য্যপ্রভোঃ পুত্রং শ্রীগোবিন্দগতিসংজ্ঞকং।"

ইহা দ্বারা জানা যায় যে শ্রীনিবাস আচার্য্যের এক পুত্রের নাম গতিগোবিন্দ ছিল। এই নাম অপর কোন ব্যক্তির ছিল বলিয়া জানা যায় নাই; সুতরাং ইনিই যে পদকর্ত্তা গতিগোবিন্দ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীনিবাস আচার্য্য ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন; তখন তাঁহার প্রৌঢ় বয়স। সুতরাং গতিগোবিন্দ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। সম্ভবতঃ তিনি পদকর্ত্তা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। পদামৃতসমুদ্রে ইহার রচিত কোন পদ দৃষ্ট হয় না। তবে তিনি গোবিন্দদাস নামে পরিচয় দিয়া কোন পদ রচনা করিয়া থাকিলে তাহা সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দদাস কবিরাজের সহিত মিশিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে।

কিন্তু তিনি যে "গতিগোবিন্দ" ও "গোবিন্দদাস" এই উভয় নামেই পদ রচনা করিয়াছেন তাহার কোন প্রমাণ নাই।

(১৩)

গুপ্তদাস

পদ সমষ্টি ১। পদ-সংখ্যা ১৬৯৭।২২৪৯।

"গুপ্তদাস" শব্দটি যে উপাধিসূচক তাহা সহজেই প্রতীত হয়। 'গুপ্ত' উপাধিধারী পদ-কর্ত্তৃগণ মধ্যে মুরারিগুপ্ত সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। 'মুরারিগুপ্ত' ভণিতার দুইটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই মুরারিগুপ্ত নিজকে "গুপ্তদাস" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন কি না বলা যায় না। বৈদ্যবংশীয় ব্যক্তিগণ সকলেই "দাসগুপ্ত" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায়, অপর কোন বৈদ্যকুলোদ্ভব ব্যক্তির পক্ষেও এইরূপ পরিচয় দান অসম্ভব নহে। শিবানন্দ, বল্লভ প্রভৃতি বৈদ্যবংশীয় অনেক পদকর্ত্তার পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। গুপ্তদাসের পদ দুইটিতে কোন বিশেষত্ব নাই।

(১৪)

গোকুল।

পদসংখ্যা—২৮৯৩। গোকুলানন্দ। পদসংখ্যা—২২৮১।

গোকুলদাস ও গোকুলানন্দের নামে দুইটি মাত্র পদ আছে ; গোকুল গোকুলানন্দেরই সংক্ষেপ কি না নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে নিত্যানন্দের শাখা-বর্ণনায় এক গোকুলদাসের নাম উল্লিখিত হইয়াছে—

"শ্রীমন্ত গোকুলদাস হরিহরানন্দ।" (চৈ-চ আদি ১১শ)

ইঁহার সম্বন্ধে আর অধিক কিছু জানা যায় না। ইনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং নিত্যানন্দপ্রভুর একজন পারিষদ ছিলেন।

এতদ্ভিন্ন নরহরি চক্রবর্ত্তীর "ভক্তিরত্নাকরে" একজন কীর্ত্তনিয়া গোকুলদাসের উল্লেখ আছে। নিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী খেতুরীর মহোৎসবে ইঁহার মুখে গোবিন্দ-দাসের পদাবলীর গান শ্রবণে মোহিত হইয়া—

"শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের দুটি কর ধরি।

কহে তুয়া কাব্যের বালাই লৈয়া মরি॥" (ভ-র)

গোকুলদাসের রচিত কৃষ্ণের স্তোত্রে (২৮৯৩ পদ) অনুপ্রাসের আধিক্য দৃষ্ট হয়, বোধ হয় এইরূপ পদই পরবর্ত্তী সময়ে গোবিন্দ কবিরাজের অপূর্ব্ব অনুপ্রাসময় পদগুলির আদর্শ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে নলোদয়কার কালিদাসের নিকট ঘটকর্পরের ন্যায়, কবিরাজ গোবিন্দদাসের নিকট অনুপ্রাসপথের পথিক পদকর্ত্তৃগণ সকলেই সম্পূর্ণ পরাভূত হইয়াছেন।

(১৫)

গোপাল।

পদসংখ্যা ১৮০। গোপালদাস—পদসমষ্টি ৪। পদসংখ্যা ৩৯৪।১২৫৫।২৮৮৪।২৯৭২।
গোপালভট্ট—পদসংখ্যা ২৭৫২।

চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে বৃন্দাবনবাসী সুপ্রসিদ্ধ গোস্বামী গোপালভট্ট ও তদ্ভিন্ন আরও কয়েকজন গোপালের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ। গোপালভট্ট। ইনি সুপ্রসিদ্ধ ছয় জন আদি গোস্বামীর মধ্যে একজন। ইনি চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের অন্যতম শিক্ষাগুরু ছিলেন যথা—

"শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
তাঁ সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার॥" (চৈ-চ-আদি ১ম পরিচ্ছেদ)

কথিত আছে যে "চৈতন্যচরিতামৃত" রচনাকালে গোস্বামী গোপালভট্ট কৃষ্ণদাস কবিরাজকে তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে নিষেধ করেন। ভট্ট গোস্বামীর একান্ত যশোনিঃস্পৃহাই যে ইহার একমাত্র কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক কৃষ্ণদাসরচিত "ভক্তমাল" গ্রন্থে (২য় মালায়) এই রঘুনাথ ভট্টের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে; তাহা হইতে কতিপয় ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

"মহাপ্রভু যবে তীর্থ ভ্রমিবারে গেলা।
ভট্টমারী গ্রামে চাতুর্ম্মাস্য স্থিতি হৈলা॥
শ্রীমান্ বেঙ্কট নামে ভট্ট মহাশয়।
তাঁহার গৃহেতে রহে হইয়া সদয়॥
তাঁহার নন্দন শ্রীগোপাল ভট্ট নাম।
সদাই করয়ে সে প্রভুর সেবাকাম॥
প্রভু তারে কৃপা করি শক্তি সঞ্চারিল।
হরিনাম মহামন্ত্র কর্ণেতে অর্পিল॥
*　*　*　*
বিষয় ছাড়িয়া বৃন্দাবনে আকর্ষিল।
শ্রীরাধারমণ রূপে বড় কৃপা কৈল॥"

শেষ পংক্তির ব্যাখ্যায় উক্ত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, গোপালভট্ট একটি শালগ্রামচক্রের উপাসক ছিলেন। একদা কোন ধনিভক্ত তাঁহার বিগ্রহের জন্য অলঙ্কার বস্ত্রাদি আনিয়া দেন। গোপালভট্ট শালগ্রামকে শ্রীমূর্ত্তির যোগ্য বস্ত্রালঙ্কার পরাইতে না পারিয়া অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া রাত্রিযাপন করেন। কথিত আছে যে প্রভাতে দেখা গেল শালগ্রামচক্র

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম মুরলীবদন কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়াছেন। গোপালভট্ট সম্বন্ধে অপর কোন বৃত্তান্ত জানা যায় না। ইনি দাক্ষিণাত্যবাসী হইয়াও যে বঙ্গীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণ মধ্যে অতি প্রধান স্থান লাভ করিয়াছিলেন, এতদ্দ্বারাই তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও ভক্তির বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ে ব্রজধামে বল্লভাচার্য্য, বিঠ্‌ঠলনাথ, কৃষ্ণদাস পয়আহারী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জীবিত থাকিলেও বঙ্গীয় বৈষ্ণবসমাজে গোপালভট্টই সমধিক পূজিত ছিলেন। ইহাঁর অসাধারণ গৌরাঙ্গভক্তিই তাহার প্রধান কারণ।

২য়—গোপাল দাস। মহাপ্রভুর শাখাগণনায় ইহাঁর উল্লেখ দেখা যায়—

"রামচন্দ্র কবিচন্দ্র শ্রীগোপালদাস।" (চৈ-চ আদি ১০ম)

৩য়—গোপাল আচার্য্য। মহাপ্রভুর শাখাগণনায় ইহাঁর নাম লিখিত হইয়াছে।

"গোপাল আচার্য্য আর বিপ্র বাণীনাথ। (চৈ-চ আদি ১০ম)

৪র্থ—কাশীর গোপাল ভট্টাচার্য্য। ইনি মায়াবাদী বৈদান্তিকপণ্ডিত গোপালাচার্য্যের ছাত্র, নীলাচলে মহাপ্রভুর সহচর ভগবান্ ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা ছিলেন। গোপালের মুখে মায়াবাদ শ্রবণে ধর্ম্মনষ্ট হইবে বলিয়া ভগবান্ ভট্টাচার্য্য ইহাঁকে নীলাচল হইতে দেশে পাঠাইয়া দেন। (চৈ-চ অন্ত্য ২য় পরিচ্ছেদ)

৫ম—নিত্যানন্দের সহচর গোপাল—

"নর্ত্তক গোপাল রামভদ্র গৌরদাস।" (চৈ-চ-আদি ১১শ)

এই সকল গোপালের মধ্যে গোপালভট্টের পদের সহিত কাহারও পদ মিশিবার সম্ভাবনা নাই। গোপালভট্ট খাঁটি ব্রজভাষায় (তথাকথিত ব্রজবুলি নহে) পদরচনা করিয়াছেন। যদিও কালক্রমে লেখকগণের হস্তে বিদ্যাপতির মৈথিলপদাবলীর ন্যায় ব্রজভাষার পদগুলিও বঙ্গদেশে প্রচারিত হইয়া কিয়ৎপরিমাণ বিকৃত হইয়াছে, তথাপি তাহা বাঙ্গালা ও তথাকথিত ব্রজবুলি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ। গোপাল ভট্টের ভণিতাযুক্ত পদটি বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি পদের সহিত তুলনা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। এই ব্রজভাষা ও তথাকথিত ব্রজবুলি সম্বন্ধে স্থানান্তরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা আছে। ভাষাগত প্রমাণ দর্শনে "গোপালদাস" ভণিতার ২৮৮৪ সংখ্যক পদটিও গোপালভট্টের রচিত বলিয়া প্রতীতি হয়। ভাষার বিশেষত্ব ভিন্ন গোপালভট্টের পদে আর কিছু বিশেষত্ব নাই। "গোপাল" ও "গোপালদাস" ভণিতাযুক্ত অবশিষ্ট পদগুলি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে এক মায়াবাদী গোপালের কথা ছাড়িয়া দিলে অবশিষ্ট 'গোপাল'গণ সকলেই তুল্যভাবে এই সকল পদের কৃতিত্বের দাবি করিতে পারেন। বিশেষ-প্রমাণের অভাবে এই সকল পদের রচয়িতা সম্বন্ধে কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না। গোপালদাসের পদ "পদামৃতসমুদ্রে" উদ্ধৃত হইয়াছে, সুতরাং পদকর্ত্তা গোপালদাস যে রাধামোহন ঠাকুরের পূর্ব্ববর্ত্তী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রচনাদর্শনে ১৮০।৩৯৪।১২৫৫ সংখ্যক পদগুলি একজনের রচিত হওয়াই সম্ভব বোধ হয়। পদগুলি কবিত্বাংশে মন্দ নহে।

(১৬)

গোপী।

২৪৯৩ সংখ্যক পদ। গোপীকান্ত—পদসমষ্টি ৪। পদসংখ্যা—৫৯৫।৫২৬।২৩১০।২৯৪৯।

গোপীরমণ—১৬০৫ সংখ্যক পদ।

"চৈতন্যচরিতামৃতে" নবদ্বীপবাসী গৌরাঙ্গভক্তগণের মধ্যে গোপীকান্তের উল্লেখ দেখা যায়—

"শ্রীনিধি মিশ্র গোপীকান্ত মিশ্র ভগবান্।" (চৈ·চ-আদি ১০ম)

গোপীকান্তের ভণিতাযুক্ত পদগুলির আলোচনা দ্বারা "গোপীকান্ত" নামধারী দুইজন গোপীকান্তের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণিত গোপীকান্ত যে মহাপ্রভুর সমসাময়িক উক্ত গ্রন্থপাঠে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। পক্ষান্তরে ২৩১০ সংখ্যক পদের রচয়িতা গোপীকান্ত প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীনিবাস আচার্য্যের ভগবদ্ভক্তি ও ভক্তিগ্রন্থ প্রচারের গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাপ্রভুর অনেক পরবর্ত্তী। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পদের রচয়িতা গোপীকান্ত চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণিত গোপীকান্ত হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি। গোপীকান্তের ভণিতাযুক্ত সমস্ত পদই এই গোপীকান্তের রচিত কি না—তৎসম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে—৫৯৫।৫২৬ সংখ্যক পদের রচনা হইতে অবশিষ্ট পদ দুটির রচনা বিভিন্ন প্রকৃতির। বিষয়ভেদে ভাষা ও ভাবের এইরূপ বৈষম্য হওয়াও বিচিত্র নহে, সুতরাং এ সম্বন্ধে নিশ্চয় কোন কথা বলা যায় না। শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরে ও বৈষ্ণবদাসের পূর্ব্বে ইঁহার কাল নির্ণীত হইতেছে, সুতরাং ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর লোক।

গোপীরমণ সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না। ইঁহার পদটি কবিত্বাংশে উত্তম।

গোপী—এই নামটি গোপীকান্ত, গোপীরমণ বা গোপীনাথ ইত্যাদি কোন্ নামের সংক্ষেপ তাহা ঠিক বলা যায় না। চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার ১০ম পরিচ্ছেদে দুইজন গোপীনাথের উল্লেখ আছে। গোপী নামাঙ্কিত পদটি এই সকলের মধ্যে কোন ব্যক্তি বা অন্য কাহারও রচিত কি না তাহা বলিবার উপায় নাই।

(১৭)

গোবর্দ্ধন।

পদসমষ্টি—১৬।

পদসংখ্যা—১২৩৫।১৪৩৯।১৪৫০।১৪৫১।১৪৫৩।১৪৫৫-১৪৫৭।১৪৭০-১৪৭৬।১৫৬৯।

গোবর্দ্ধন দাস সুকবি ছিলেন; দুঃখের বিষয় তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। "পদামৃতসমুদ্রে" ইঁহার কোন পদ উদ্ধৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ ইনি রাধামোহন ঠাকুরের পরবর্ত্তী ছিলেন। ইনি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি এই উভয়বিধ পদই রচনা করিয়াছেন—১২৩৫।১৪৫০।১৪৭৪।১৫৬৯ সংখ্যক পদগুলি বাঙ্গালা রচনার ও অবশিষ্ট পদগুলি তাঁহার ব্রজবুলি রচনার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহার উভয়বিধ পদই সুললিত—

"গৌর বরণ, হিরণ কিরণ,
অরুণ বসন তায়।
রাতা উৎপল, নয়ন যুগল,
প্রেম ধারা বহি যায়"

এবং "কিশোরে শ্যাম, নবীন কাম,
নবীন বৃন্দা-বিপিন ধাম
সঙ্গে নবীন, নাগরীগণ,
নব ঋতুপতি রাতিয়া"

ইত্যাদি পদগুলি রচনা ও বর্ণনার মাধুর্য্যে বৈষ্ণব কবিগণের উৎকৃষ্ট পদ মধ্যে গণনীয়। যে সকল বৈষ্ণব কবি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি এই উভয়বিধ পদ-রচনায় সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম বলিয়া গোবর্দ্ধনের নাম উল্লেখযোগ্য।

(১৮)

গোবিন্দ ঘোষ।

পদ সমষ্টি ৬।

পদসংখ্যা—১০২৬।১৫৯৪।১৬০৩।১৬১৯।২০৫৭।২০৭৫।

গোবিন্দ ঘোষ মাধব ও বাসুদেব নামক ভ্রাতৃদ্বয় সহ মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং তাঁহার একান্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন। ইহাঁর বাসস্থান কোথায় ছিল তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু কোন কোন ব্যক্তি ইহাঁদিগের জন্ম-স্থান কুলীনগ্রাম ও কেহ নবদ্বীপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—কিন্তু চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে কুত্রাপি ইহাঁদিগের নাম কুলীনগ্রামবাসিগণের গণনায় উল্লিখিত হয় নাই। ইহাঁদিগের নিবাস যে নবদ্বীপে ছিল এরূপ স্পষ্ট উল্লেখও আমরা কোন স্থলে প্রাপ্ত হই নাই। যাহা হউক মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পর দাক্ষিণাত্যভ্রমণ হইতে নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার দেশভ্রমণের সহচর কৃষ্ণদাস দ্বারা নবদ্বীপের ভক্তমণ্ডলীর নিকট সংবাদ পাঠাইলে সেই বৎসর তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন উপলক্ষে যে সকল ভক্ত নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন—তন্মধ্যে আমরা এই তিন ভ্রাতার উল্লেখ পাই। গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য ইহাঁদিগকে দেখাইয়া রাজা প্রতাপরুদ্রকে বলিয়াছিলেন,—

"গোবিন্দ মাধব ঘোষ এই বাসু ঘোষ।
তিন ভাইর কীর্ত্তনে প্রভু পায়েন সন্তোষ॥"

ইহা দ্বারা বোধ হয় যে, ইহাঁরা নবদ্বীপে আদি-লীলার সময়েও মহাপ্রভুর সহচর ছিলেন। পূর্ব্ব-বর্ণিত ভক্তমণ্ডলী লইয়া মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবের রথের সম্মুখে যে উদ্দাম নৃত্য করেন তৎসময়ে এই গোবিন্দ ঘোষ—চারিটি প্রধান কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটীর দলপতি হইয়াছিলেন,—তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ও ঐ সম্প্রদায়ে গান করেন।

(১২) ...... ভূ (?) কটক বন্তেভ্য (?) ছান্দশ ব্রাহ্মণ বরাহস্বামিনে দত্তং তদ্ব......

(১৩) ...... ভূম্যাদানক্ষপ (?) চ শুণু (?) গুণমনুচিন্ত্য শরীরকল্যা (?) নকস্য চো......

(১৪) শ উক্তঞ্চ ভগবতাদ্বৈপায়নেন। স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা.........

(১৫) ... তৃভিঃ সহ পচ্যতি যস্টি[ং] বর্ষসহস্রাণি স্বগর্গে মোদতি ভূমিদ[ঃ] ......

(১৬) ... পূর্ব্বদত্তাং দ্বিজাতিভ্য যত্নাদ্রক্ষ যুধিষ্ঠিরমহী[ং].........

(১৭) ...... [ও] যং শ্রীভদ্রেণ উৎকীর্ণ্ণং স্বপ্নেশ্বর দাসে[ন]......

ইহার অনুবাদ সম্ভবপর নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে ক্ষুদ্রক গ্রামবাসী শিবশর্ম্মা ও নাগশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণদ্বয়কে মহাখুষাপার বিষয়ান্তর্গত কোন গ্রাম বা ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বিষ্যদেবশর্ম্মন্ (বিশ্বদেবশর্ম্মন্) ও বিষ্য (বিশ্ব) ভদ্র নামক ব্যক্তিদ্বয় ও আটটী গ্রামের অধ্যক্ষের (গ্রামাষ্টকুলাধিকরণ) নাম উল্লেখ আছে। নীবীধর্ম্ম-ক্ষযমালভ্য ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্ট বুঝা যায় যে প্রদত্ত ভূমি বা গ্রাম পূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইয়াছিল বা কোন ব্রাহ্মণের অধিকারে ছিল এবং তাহার মালিকান স্বত্ব রহিত করাইয়া উপরোক্ত ব্রাহ্মণদ্বয়কে দান করিতে হইয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্ত প্রাচীন খোদিতলিপিসমূহে অতীব বিরল। নীবীধর্ম্মের কথা পূর্ব্বে মহারাজ শিবরাজের তাম্রশাসনে প্রকাশ করিয়াছি। খোদিতলিপির শেষভাগে বরাহস্বামী নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নাম পাওয়া যায়। "বরাহ-স্বামিনে দত্তং" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা অনুমান হয় ইহা পূর্ব্বে বরাহস্বামীকেই দেওয়া হইয়াছিল। বরাহস্বামী ছান্দস (সামবেদীয়) ব্রাহ্মণ ছিলেন। খোদিতলিপির শেষ পংক্তিতে বলা আছে যে ইহা স্বপ্নেশ্বর দাসকর্ত্তৃক খোদিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই খোদিতলিপি হইতে আর কিছু বলিবার যোগ্য কথা নাই।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩১৫ সালের বঙ্গ-সাহিত্যের বিবরণ

বৎসরের মধ্যে যত বাঙ্গালা-পুস্তক প্রকাশিত হয়, বৎসরের শেষে 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্', ১৩০৯ সাল হইতে তাহার একটা বিবরণ প্রস্তুত করিয়া আসিতেছেন। ১৩১১ সাল পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের উপর এই কার্য্যের ভার ছিল। ১৩১২ বঙ্গাব্দ হইতে এই বিবরণ প্রস্তুতের ভার, আমার উপর অর্পিত হয়। তদনুসারে আমি অদ্য ১৩১৫ সালে প্রকাশিত বঙ্গ-সাহিত্যের বিবরণ লইয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এই বিবরণে অসম্পূর্ণতা-ত্রুটি যথেষ্টই পরিলক্ষিত হইবার সম্ভাবনা। তজ্জন্য পূর্ব্বেই একটা কৈফিয়ৎ দিয়া রাখিতেছি। বাঙ্গালাদেশে কোথায় কখন্ কি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, তাহা জানিবার আপাততঃ কোন উপায় নাই। অলিতে গলিতে মুদ্রাযন্ত্র। কত বই ছাপা হইতেছে, তাহার সংবাদ কে রাখে? অবশ্য সরকারী আফিসে সাধারণতঃ, প্রত্যেক মুদ্রিত গ্রন্থের একখণ্ড মুদ্রাকর-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া থাকে। বেঙ্গল লাইব্রেরিতে যে সমস্ত মুদ্রিত পুস্তকাদি প্রেরিত হয়, তিন মাস অন্তর তাহাদের একটী সরকারী তালিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে; কিন্তু দুঃখের বিষয়—এই তালিকাটী অত্যন্ত অসম্পূর্ণভাবে নিতান্ত অ-সময়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বিগত ৮ই মে পর্য্যন্ত মোটে ছয় মাসের তালিকা সম্পূর্ণ হইয়াছে। বাকী ছয় মাসের তালিকা পাইবার উপায় নাই। এ অবস্থায় মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক পত্রের সমালোচনা ও বিজ্ঞাপন হইতে, পুস্তকালয়ের গ্রন্থ-তালিকা হইতে গত বৎসরে প্রকাশিত গ্রন্থের তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে হইবে। পত্র লিখিয়া ফল হয় না—কাজেই মফঃস্বলের না হউক, অন্ততঃ কলিকাতার ছাপাখানাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নূতন পুস্তকের সন্ধান লইতে হইবে। এইরূপে ও নানাপ্রকারে পুস্তক ও তালিকাদি সংগ্রহ করিতে যাওয়ায় সংগ্রহকার্য্যে ত্রুটি হওয়ারই সম্ভাবনা। তজ্জন্য সকলের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিতেছি।

'পরিষদ্', সাহিত্যের পঞ্জী-রক্ষার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিতেছেন—বৎসরের মধ্যে যত বাঙ্গালা গ্রন্থ, প্রকাশিত হয়—তাহার শ্রেণীবিভাগসহ তালিকা প্রস্তুত করিয়া বৎসরান্তে সাহিত্যের গতি ও পরিপুষ্টির আলোচনা করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু, বঙ্গভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের প্রত্যেক মুদ্রাকর, প্রকাশক বা গ্রন্থকারের সাহায্য ব্যতীত এই কার্য্য, সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। এজন্য পরিষদ্, প্রতিবৎসরই তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও সানুনয় প্রার্থনা জানাইয়া আসিতেছেন। এরূপ স্থলে তাঁহারা যদি তাঁহাদের এক এক খণ্ড বই সাহিত্য-পরিষদে অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে সাহিত্য-পরিষদের পাঠাগারে সেগুলি সযত্নে রক্ষিত হইবে এবং বৎসরান্তে আলোচনার সময়ে বহু সাহিত্য-সেবীদের নিকট সেগুলির নাম ও পরিচয় দেওয়া যাইবে।

বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ দিবার পূর্ব্বে একটী কথা বলিয়া রাখা উচিত, মনে করিতেছি।

পরিষদের নিয়মানুসারে, আপাততঃ সুসঙ্গত কারণে, পরিষদ্, কোন গ্রন্থের সমালোচনার ব্যবস্থা রাখেন নাই। কাজেই আমাদের এই বিবরণীতে কোন পুস্তকের সমালোচনা থাকিবে না। তবে এই সাহিত্য-বিবরণের মধ্যে সাহিত্যের বিভিন্ন-বিভাগ-সম্বন্ধে গতি লক্ষ্য করিয়া যা'দুই চারি কথা বলা হয়, তাহারও একটা পরোক্ষ ফল, সাহিত্যের উপর ফলে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার একটু আভাস দেখাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু সে চেষ্টায় কেহ যদি ক্রটি দেখেন, তাহা আমার ক্রটি বলিয়া বুঝিবেন—পরিষদের নয়।

আলোচ্যবর্ষে বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত অনূন ৬৪৩ খানি নূতন বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু গতবর্ষের মুদ্রিত বাঙ্গালা-পুস্তকের সংখ্যা ৮৭৪। তন্মধ্যে যে সকল পুস্তকের নূতনসংস্করণ হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ২৩১। এগুলির সংখ্যা, তালিকা-ভুক্ত হয় নাই। ইহার মধ্যে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে প্রকাশিত ৬১৬ খানি পুস্তকের বিষয়ভেদে শ্রেণীবিভাগ করিলে, দেখা যায়—

আলোচ্য বর্ষে,—

কলাবিদ্যায়	১৬
জীবনীতে	২৯
নাটকাদিতে	৪৬
উপন্যাসে	৮৪
ইতিহাস-ভূগোলে	১৮
সাহিত্যে	৩৯
আইনে	৩
চিকিৎসায়	৪৫
দর্শনে	৪
কাব্য ও কবিতায়	৪২
ধর্ম্ম-বিষয়ে	১৯০
ভ্রমণ-বিবরণে	১
বিজ্ঞানে	১৭
বিবিধ বিষয়ে	৮২

মোট ৬১৬ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩০৯ সাল হইতে ১৩১৫ পর্য্যন্ত মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা তুলনা করিলে, দেখা যায়—

শ্রেণী	১৩০৯	১৩১০	১৩১১	১৩১২	১৩১৩	১৩১৪	১৩১৫
১। কলাবিদ্যায়	৯	৬	৫	৪	৫	৭	১৬
২। জীবনীতে	১৫	১৭	২১	১৮	১৪	১৬	২৯
৩। নাটকাদিতে	৩৭	৪৩	৩৬	৫২	৪২	৩৮	৪৬
৪। উপন্যাসে	৫১	৪৮	৭৫	৬৪	৫৩	৫০	৮৪
৫। ইতিহাস-ভূগোলে	১৫	১৬	২১	২০	১৭	২০	১৮
৬। সাহিত্যে	৯৮	১০৬	১১১	১২৫	১২২	১৪৩	৩৯
৭। আইনে	৪	৬	৫	৫	৪	২	৩
৮। চিকিৎসায়	৩৭	২৮	৩৩	৪০	২৭	৩০	৪৫
৯। দর্শনে	৫	৭	৭	৪	৭	৮	৪
১০। কাব্যে ও কবিতায়	৭৩	৯৯	১০২	৮২	৮৭	১১০	৪২
১১। ধর্ম্মবিষয়ে	৬০	৫২	৮২	৮৪	৭৫	৭০	১৯২
১২। বিজ্ঞানে	৩০	৪৫	৪৮	৫৩	৩৫	২৫	১৭
১৩। বিবিধবিষয়ে	১২৫	১১৩	১০৫	১৫০	১৬৩	২৭০	১০৭
১৪। ভ্রমণ-বৃত্তান্তে	৫	৬	৮	৪	৫	৩	১
মোট	৫৫৯	৫৯২	৬৫৭	৭০৫	৬১৬	৭৯৫	৬৪৩

১৩১৫ সালে প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা।

বিষয়	নূতন গ্রন্থ প্রথম সংস্করণ পুস্তক	নূতন গ্রন্থ প্রথম সংস্করণ সাময়িকপত্র	নূতন সংস্করণ পুস্তক	পুনর্মুদ্রণ	অনুবাদ	মোট পুস্তক	মোট সাময়িকপত্র	স্কুলপাঠ্য	সাধারণপাঠ্য	মোট
১। কলাবিদ্যায়	১৬	১১	৩			১৯	১১	১৫	১৫	৪০
২। জীবনীতে	১৯		১০			২৯			৩৯	৩৯
৩। নাটকাদিতে	৪৬		৪			৫০			৫০	৫৯
৪। উপন্যাসে	৮৪		৩৫			১১৯			১১৯	১১৯
৫। ইতিহাস-ভূগোলে	১৮	৮	১২			৩০	৮	১৫	২৩	৩৮
৬। সাহিত্যে	৩৯		৫১			১০		৮১	৯	৯০
৭। আইনে	৩		১			৪			৪	৪
৮। চিকিৎসায়	৪৫	৩৫	১৮			৬৩	৩৪		৯৮	৯৮
৯। বিবিধ বিষয়ে	১০১	৪৪৬	৪৯			১৫০	৪৪৬	১২	৫৮৪	৯৯৬
১০। দর্শনে	৪					৪			৪	৪
১১। কাব্য ও কবিতায়	৪২		৬			৪৮		৫	৪৩	৪৮
১২। ধর্ম্মবিষয়ে	১৯২	৪৬	১৫	২৮		২০৭	৪৬	৩	২৫০	১৫৩
১৩। বিজ্ঞানে	১৭		২৬			৪৩		৩৬	৭	৪৩
১৪। ভ্রমণে	১					১		০	১	১
১৫। রাজনীতিবিষয়ে	৬					৭			৭	৭
মোট	৬৪৩					৮৭৪	৫৪৬	১৬৭	১২৪৩	১৪২০

খৃষ্টানদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মপুস্তিকগুলি, এবারও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় তালিকা মধ্যে ধরা হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত বিভাগের মধ্যে—

ইতিহাস ও ভূগোলের	১৮ খানির মধ্যে	—১৫ খানি
সাহিত্যের	৩৯ ,, ,,	—৩০ ,,
কাব্য ও কবিতার	৪২ ,, ,,	— ৫ ,,
বিজ্ঞানবিষয়ক	১৭ ,, ,,	— ৭ ,,
বিবিধ বিষয়ক	৮২ ,, ,,	—১২ ,,

মোট ৬৯ খানি পুস্তক স্কুলপাঠ্য

(ক) কলাবিদ্যা—এ বিভাগের ১৬ খানি পুস্তকের মধ্যে ৪ খানি পুস্তক উল্লেখযোগ্য।

১। ব্রহ্ম-সঙ্গীত স্বরলিপি—কাঙ্গালীচরণ সেন।

২। চিত্রবিদ্যা-শিক্ষা (১ম ভাগ) }
৩। চিত্রবিদ্যা-শিক্ষা (২য় ভাগ) } ব্রজেন্দ্রকুমার গুহ

৪। শিল্প রত্নাবলী (১ম খণ্ড)—মনোমোহন দাস ও অমূল্যরতন পাল।

কলাবিদ্যাবিভাগে এবারেও আমরা আশানুরূপ ফল পাই নাই। কোন একটা কলা, রীতিমত শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে তাহার বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া, উপর স্তর পর্য্যন্ত শিক্ষা দিবার জন্য ক্রমবিন্যস্ত পাঠ্যপুস্তক লিখিতে, কাহারও চেষ্টা দেখি না। ফটোগ্রাফি, চিত্রবিদ্যা, বর্ণবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে কতকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে দুই এক খানি ভাল বই যে না আছে, তাহা নয়; কিন্তু রীতি-বিশুদ্ধ প্রণালীতে এ সকল বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতে, কেহ আজিও প্রবৃত্ত হন নাই। সঙ্গীত-কলাসম্বন্ধে নানাবিধ বাজনার বোল্, নানারূপ রাগ-রাগিণীর গৎ, নানাবিধ ওস্তাদী আলাপ এবং বহুবিধ গান-সংগ্রহের বহু প্রকার পুস্তক বাহির হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গীত-শাস্ত্রে পারদর্শী অধ্যাপকগণ, সঙ্গীত-বিজ্ঞানের সম্বন্ধে গ্রন্থ-লিখিতে প্রলুব্ধ হন না! এ সম্বন্ধে দুই এক খানা বই যে না আছে, এমনও নয়; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কেহ লাগিয়া পড়িয়া উঠেন নাই। এই কলিকাতা সহরেই ভারতসঙ্গীতসমাজ আছে, তাঁহাদের 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' আছে; অথচ আমাদিগকে বৎসর বৎসর এইরূপ আক্ষেপ করিতে হয়। "সঙ্গীত-প্রকাশিকায়" প্রতি মাসে নূতন পুরাতন গানের স্বরলিপি ভিন্ন আর কিছু থাকে না। সঙ্গীত-সমাজ, নাট্যকলার অনুরাগী; কিন্তু সঙ্গীত-প্রকাশিকায় ভারতের নাট্যশাস্ত্রের একটা ধারাবাহিক অনুবাদও যদি প্রকাশিত হইত, তাহা হইলেও, আমাদের একটা খেদ মিটিত।

"শিল্পরত্নাবলীতে" সাবান, তেল, গন্ধ-দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার প্রণালীগুলি, সাধারণ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। অন্যান্য শিল্প-সম্পর্কে এ-বারে ভাল বই প্রকাশিত না হইলেও,

বাঙ্গালা মাসিক পত্রগুলি শিল্পগ্রন্থের অভাব কতক পরিমাণে দূর করিয়াছে। এ গুলির আলোচনা করিলে, বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়, ভারতের মৃত শিল্পের পুনঃ-সঞ্জীবন করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালীর প্রাণ কাঁদিয়াছে। বাঙ্গালী যথা-সময়ে সুযোগ ছাড়ে নাই। এ সময় শিল্পগ্রন্থের যাহাতে বহুল প্রচার হয় এবং সে সকল গ্রন্থ, যাহাতে সহজ-বোধ্য হয়, তদ্বিষয়ে সকলেরই চেষ্টাবান্ হওয়া উচিত। দুই খানি সঙ্গীত-গ্রন্থ বা পাঁচ খানি পাকপ্রণালী, প্রকাশিত হইলেই, কলাবিস্তার আলোচনা হইতেছে বলিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে, চলিবে না। শিল্পকলা-বিষয়ক য়ুরোপীয় গ্রন্থাদি, সরল বাঙ্গালায় সার-সঙ্কলন করিলেও, চলিতে পারে। যাহা হউক, গত বর্ষে এ বিষয়ে যে একটু আধটু চেষ্টা হইয়াছে—তাহাই যথেষ্ট।

(খ) জীবনী—এই বিভাগের ২৯ খানি পুস্তকের মধ্যে নিম্নলিখিত ১২ খানি পুস্তক উল্লেখ-যোগ্য। যথা—

১। দয়ানন্দের স্বরচিত জীবনবৃত্ত—শিশিরকুমার ঘোষাল।

২। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—যোগেন্দ্রনাথ সরকার।

৩। সিদ্ধ-জীবনী—ব্রহ্মানন্দ ভারতী।

৪। কৃষ্ণচন্দ্রপাল—মথুরানাথ নাথ।

৫। আর্য্য-নারী (১ম ভাগ)—কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত ও দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার।

৬। বালগঙ্গাধর তিলক—নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

৭। বুদ্ধদেব-চরিত—কালীপ্রসন্ন বিস্তারত্ন।

৮। বিদ্যাসাগর—যোগীন্দ্রনাথ সরকার।

৯। হজরৎ মহম্মদের জীবনী (মাসলেম পত্রিকা)—ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন।

১০। সাহিত্য-সেবক—শিবরতন মিত্র।

১১। নবীনবাবু—

১২। রাজনারায়ণ বসু—

এতদ্ভিন্ন নানা মাসিক পত্রে আলোচ্য বর্ষে অনেকগুলি কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীরের জীবনী, প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা একটী সুলক্ষণ—সন্দেহ নাই। গত বৎসরে "বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকে" শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়, স্বকীয় পরিশ্রমের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মথুরনাথ নাথ, বাঙ্গালাদেশের আদি খৃষ্টান কৃষ্ণচন্দ্র পালের জীবন-বৃত্তান্তে অনেক প্রয়োজনীয় কথার আভাস দিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষের অসামান্য জ্ঞানী দয়ানন্দ সরস্বতীর জীবনী, বাঙ্গালায় প্রকাশ—আনন্দের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। বালগঙ্গাধর তিলকের জীবনীখানি, এরূপ ক্ষীণ-কলেবর না হইলেই, যেন ভাল হইত। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে, আলোচ্য বর্ষে জীবনী-পুস্তকগুলি, মোটের উপর মন্দ হয় নাই। আমার মনে হয়, প্রতি বর্ষে অনেকগুলি করিয়া জীবনচরিত প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। পূর্ব্বে যেমন পুরাণপাঠ, কথকতা ইত্যাদির বহুল প্রচার ও আদর ছিল—তাহার উদ্দেশ্য ও

পরিণাম, জীবনীপাঠেরই তুল্য। আমাদের বর্ত্তমান সমাজে যাহাতে জীবনীগ্রন্থ, সেইরূপ হয়, তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আমরা মহতের আদর করিতে যতই শিখিব, আমাদের দেশে জীবনীগ্রন্থের সংখ্যা, ততই বৃদ্ধি পাইবে।

(গ) নাটকাদি—এই শ্রেণীর ৪৬ খানি পুস্তকের মধ্যে ২১ খানি উল্লেখ-যোগ্য ;—

১। অশোক—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।
২। বরুণা— „
৩। বাসন্তী— „
৪। শারদোৎসব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৫। হিন্দাহাফেজ—অতুলকৃষ্ণ মিত্র।
৬। দেলেরা—ননীলাল সুর।
৭। মাতৃপূজা বা স্বর্গোদ্ধার—কুঞ্জবিহারী গাঙ্গুলি।
৮। উষা—মহেন্দ্রনাথ তালুকদার।
৯। স্বপ্ন-মিলন গীতি-নাট্য—কামাখ্যাপ্রসাদ সেন।
১০। দলিতা-ফণিনী—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।
১১। প্রহসন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১২। প্রতাপসিংহ—শশিভূষণ মজুমদার।
১৩। অদৃষ্ট—হরিচরণ সেনগুপ্ত।
১৪। শ্রীমতীর বন্দে মাতরম্ বা মহিলা-মিলন—শ্যামাপদ নাগ।
১৫। মেবার-পতন—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
১৬। শাস্তি-কি-শান্তি—গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
১৭। সোরাব-রুস্তাম—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
১৮। বীর-পূজা—হরনাথ বসু।
১৯। কংস-বধ—অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
২০। রণজিতের জীবন-যজ্ঞ
২১। জয়দ্রথ-বধ গীতাভিনয়—কালীকিঙ্কর সেন।

গত ও গত পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এ বৎসরও নাটক-শ্রেণীতে কয়েক খানি,উত্তম পুস্তক বাহির হইয়াছে। তাহার মধ্যে ঐতিহাসিক নাটকগুলিই, প্রধান ও সংখ্যায় অধিক। দেখা যাইতেছে, নাট্যকারেরা গত দুই বৎসর বাঙ্গালার প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন। ইহার কারণ যাহাই হউক, ফলে আমরা কয়েকখানি পাঠোপযোগী নাটক পাইয়াছি। গীত-নাট্যে কল্পনাপ্রসূত কয়েকখানি নাটকও প্রকাশিত হইয়াছে। গত বৎসর সামাজিক নাটক ৫ খানি বই প্রকাশিত হয় নাই। ঐতিহাসিক নাটক যাঁহারা লেখেন, তাঁহাদের অনেকে ইতিহাসের সম্মানটা মলাটে মাত্র বজায় রাখেন। কেহ এক-

খানি মাত্র ইতিহাস, কেহ পাঁচখানা ইতিহাসের পাঁচ জায়গা দেখিয়া, ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়া থাকেন। ফলে, ঐ সকল নাটকে ইতিহাসের "ম্ভাজা মুড়ো" খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই সকল ঐতিহাসিক নাট্য কবি, পিতার বিবরণ পুত্রের ঘাড়ে, বধুর ব্যাপার শাশুড়ীর স্কন্ধে, রাজার মুখে রাধার ভাষা, বাদশাহের সভায় "গেঁয়ো" সভ্য-পদ চাপাইয়া দিতে, ক্রটি করেন না। কবিরা নিরঙ্কুশ আমরা মানি; কিন্তু সাহিত্যের গম্ভীর ভিতরে ইতিহাস, ছন্দঃ, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, অভিধান মানিয়া না চলিলে, তাঁহারা কবিত্বের দাবী করিবেন কিসে? ভগবানের সৃষ্ট হাতী ঘোড়া ক্ষেপিলে, গুলি করিয়া মারিবার একটা প্রথা আছে। সাহিত্যের আদালতে এই সকল মদ-মত্ত নিরঙ্কুশ কবিরা, কিরূপ দণ্ড পছন্দ করেন, জানিতে পারিলে, আমরা সুখী হইব। যাত্রায় অভিনীত পুস্তকগুলির মধ্যে পুষ্কর-বিজয় বা সহস্র-স্কন্ধ রাবণ-বধ, "বিজয়বসন্ত গীতাভিনয়" প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রহসন, এবার অনেকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'তুফানি', সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের "যৎকিঞ্চিৎ" এবং বিহারিলাল দত্তের 'মজা কি সাজা'-ই উল্লেখযোগ্য। 'তুফানি' Molere এর L' Efroldi অবলম্বনে লিখিত। "যৎকিঞ্চিৎ" বালিকাদিগের উচ্চ শিক্ষার চূড়ান্ত নমুনা।

(ঘ) উপন্যাস—এই বিভাগের ৮৪ খানি পুস্তকের মধ্যে ১৬ খানি উল্লেখযোগ্য ;—

১। হেমেন্দ্রলাল—ভবানীচরণ ঘোষ।

২। জড়-ভরত—দীনেশচন্দ্র সেন।

৩। রত্ন-হাস—দুর্গাদাস লাহিড়ী।

৪। লক্ষ টাকা উপন্যাস } পাঁচকড়ি দে।

৫। সুহাসিনী ও ঠিকে ভুল } পাঁচকড়ি দে।

৬। নীরদা—সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৭। ভৈরবী } সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

৮। স্বপ্নসুন্দরী } সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

৯। সরলা—ঊষা প্রমোদিনী।

১০। ভবের খেলা—ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১১। অভিশাপ—হরিহর শেঠ।

১২। নাগ-পাশ—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

১৩। অমরাবতী, মুরলা—নবকুমার দত্ত।

১৫। সাবিত্রী—S. P. Sen,

১৬। ইতিকথা—নিখিলনাথ রায়।

(গ) গত বৎসরের ন্যায় এবারেও ভাল উপন্যাসের সংখ্যা বড় অল্প। এবার ছোট গল্পের সংগ্রহ-গ্রন্থ ও ডিটেক্‌টিভ গল্প, বেশী প্রকাশিত হইয়াছে। ভবানীবাবুর "হেমেন্দ্রলাল"

এবার উপন্যাস-বিভাগের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। হেমেন্দ্রবাবুর "নাগপাশ" অনেক পাঠকেরই সুবিজ্ঞাত। এই উপন্যাস-বিভাগেও আমাদের সেই পূর্ব্ব আক্ষেপ বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে একটা কথা। এক বৎসর এইরূপ সাহিত্য-বিবরণে বলিয়াছিলাম যে, ছোট গল্পের প্রভাবে বাঙ্গালায় আর ভাল উপন্যাস বড় জন্মিতেছে না। ছোট গল্পগুলি যদি ভাল হয়, সে অভাবের জন্য আমরা দুঃখ করি না। আমাদের সে কথা, এবৎসর ফলিয়াছে। এ বৎসর কতকগুলি ভাল ছোট গল্পের সংগ্রহ-পুস্তক ছাপা হইয়াছে;—নিখিল বাবুর 'ইতিকথা'-নামক গ্রন্থ এই শ্রেণীতে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মাসিক পত্রেও অনেক-গুলি ছোট গল্প বাহির হইয়াছে। আমরা একবার আক্ষেপ করিয়াছিলাম—বাঙ্গালার উপন্যাস, সংখ্যায় অনেক হয়, কিন্তু গল্পে নূতন হয় না। যদি বাঙ্গালী নূতন গল্প লিখিতে না পারেন, তবে উপন্যাস-লেখা বন্ধ করুন। আমাদের সে নিবেদন এবার সফল হইয়াছে। এ বৎসর আমাদের ফর্দ্দে এতগুলি উপন্যাসের নাম থাকিলেও ডিটেক্‌টিভের গল্প এবং ছোট গল্পগুলি বাদ দিলে, উপন্যাসের সংখ্যা ভীতিজনক হইবে না। ইহাতেই বুঝিতেছি, বাঙ্গালী আর প্রেমিক-প্রেমিকার প্রণয়-লীলার মধ্যে বিপদ্, বিচ্ছেদ মরণ ঘটাইয়া এমনই ভাবের শত সহস্র গল্প লিখিয়া, পরিশ্রম নষ্ট করিতে প্রস্তুত নন। এখন বাঙ্গালার উপন্যাস-লেখকেরা, সংযত হইয়া, বাঙ্গালী-জীবনে উপন্যাসের উপযুক্ত কি উপাদান আছে, তাহাই খুঁজিতেছেন, আর সেই জন্যই বোধ হয়, ছোট গল্পের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে।

ইতিহাস-ভূগোল-গ্রন্থ—এই শ্রেণীর ১৮ খানি পুস্তকের মধ্যে ২ খানি উল্লেখযোগ্য;—

১। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস (১ম খণ্ড)—দুর্গাচরণ সান্ন্যাল।

২। নবীন জাপান—রসিকলাল গুপ্ত।

এ বৎসর "বঙ্গের পুরাবৃত্ত" বা "জালিয়াৎ ক্লাইবের" ন্যায় গ্রন্থ বাহির হয় নাই। 'বাঙ্গালীর সামাজিক ইতিহাস' ও 'নবীন জাপান' এ বিভাগের মুখ রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু এক দিক্ দিয়া দেখিলে, বলিতে হইবে যে, এ বৎসরের মত পূর্ব্বে কখনও এত অধিক ঐতিহাসিক চর্চ্চা হয় নাই। মাসিক পত্রগুলি, ঐতিহাসিক আলোচনা-পূর্ণ। সুখের বিষয়—এবার অন্য দিক্ দিয়া, ইতিহাসের আলোচনা হইয়াছে।

(চ)—এই শ্রেণীর ৪৫ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৬ খানির নাম উল্লেখযোগ্য—

১। স্বাস্থ্য-চিকিৎসা—শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২। পশু-চিকিৎসা—তারাপদ শর্ম্মা।

৩। পশু-চিকিৎসা—কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন।

৪। ভৈষজ্য-লক্ষণ-সংগ্রহ (১ম খণ্ড)—মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কোম্পানি।

৫। 　" 　(২য় খণ্ড)

৬। সংক্ষিপ্ত গার্হস্থ্য-চিকিৎসা—গণনাথ সেন বিদ্যানিধি কবিভূষণ।

এই শ্রেণীতে তৃপ্তি দিতে পারে, এমন কোন পুস্তক, এ বৎসর প্রকাশিত হয় নাই। এই

বিভাগে গ্রন্থসংখ্যা পুষ্টির জন্য আমরা য়ুরোপীয় ভাষায় লিখিত বিবিধ চিকিৎসাবিজ্ঞানের গ্রন্থের আলোচনামূলক গ্রন্থ অথবা কেবল ভাষান্তরিত গ্রন্থের আশা করিয়া থাকি। এ সহরে গলিতে গলিতে ডাক্তার কবিরাজ বর্ত্তমান। অনেকে গ্রন্থও লিখিয়া থাকেন; কিন্তু কেহই আমাদের আশা পূর্ণ করিতে অগ্রসর হন না, ইহা বড়ই ক্ষোভের কথা। মাসিকপত্রের প্রবন্ধের উল্লেখ-স্থানে আমরা দেখাইব—একটীমাত্র কবিরাজ, য়ুরোপীয় শারীরশাস্ত্রের ঐক্য অনৈক্য দেখাইয়া, প্রবন্ধাদি লিখিতে প্রস্তুত হইয়া আছেন। এইরূপ অন্যান্য বিষয় লইয়া অন্যান্য ভিষক্, যদি লিখিতে আরম্ভ করেন, আমাদের কতক ক্ষোভ মেটে। হোমিওপ্যাথী, এলোপ্যাথা, কবিরাজী, হাকিমী, এ দেশের এই চারিবিধ চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে একটা প্রধান বিষয় আমাদের লক্ষ্যভূত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথী মতে দুইটা বিভিন্ন ঔষধের সংযোগে ঔষধের গুণ-ব্যত্যয় বা শক্তিবৃদ্ধির কথা স্বীকৃত হয় না। অপর তিন প্রথায় তদ্ব্যতীত চিকিৎসা করা চলে না। কবিরাজী এবং হাকিমী—যে দুটী ঐ দেশের অস্থি-মজ্জাগত, তাহাতে আবার অনুপান-সংযোগে ঔষধ-সেবনের ব্যবস্থা, আরও ফলদায়িনী বলিয়া বিবেচিত হয়। এই দুই বিভিন্নমতের সামঞ্জস্য, অবশ্যই আছে। নতুবা উভয়প্রথাতেই রোগ প্রশমিত হয় কেন? সে সামঞ্জস্য কোথায়—তাহা প্রচারিত করিতে, বিভিন্নমতের চিকিৎসকেরা চেষ্টা করেন না কেন, তাহা বুঝিতে পারি না। ইহা প্রকাশিত হইলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিভিন্ন পন্থার তর্ক মিটিয়া যায়। তাহাতে ঔষধ-প্রয়োগের মূল সূত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে।

বিবিধ ধর্ম্মসঙ্গীত—প্রসন্নকুমার সেন।

নূতন মাসিক—

১। ছাত্রসখা—মন্মথমোহন বসু।

২। বাল্যসখা—

৩। প্রকৃতি—

৪। সুপ্রভাত—কুমুদিনী মিত্র।

৫। শিবপুর কালেজপত্রিকা—তুলসীদাস কর এম্, এ,

৬। তারা—

৭। পল্লীচিত্র—

৮। কমলা (পুনঃপ্রকাশিত)—

৯। বঙ্গভাষর—

১০। পথিক—

১১। চিন্তা—

১২। গৃহলক্ষ্মী—শান্তিময়ী সেন।

দৈনিক—সোণার বাঙ্গলা। সাপ্তাহিক—মারক।

(ছ) দর্শন—এই বিভাগের ৪ খানি পুস্তকই উল্লেখযোগ্য।

১। উপনিষদের উপদেশ (কঠ ও মণ্ডুক) ২য় খণ্ড—কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন।

২। হারামণির অন্বেষণ—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩। প্রেততত্ত্ব—সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

৪। পরলোকতত্ত্ব—কালীবর বেদান্তবাগীশ।

এ বিভাগে এবার ৪ খানি অতি সুন্দর পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে হীরেন্দ্রবাবুর "গীতায় ঈশ্বরবাদ" বাঙ্গালীর মুখ যেরূপ উজ্জ্বল করিয়াছিল, তাহার প্রভা এখনও মলিন হয় নাই। ইতোমধ্যেই আমরা চারিখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাইয়াছি। সংখ্যায় কম হইলেও, এই গ্রন্থচতুষ্টয় অনেক দার্শনিক তত্ত্বের পরিচয় দিয়াছে।

(জ) সাহিত্য—এই শ্রেণীর ৩৯ খানির মধ্যে নিম্নলিখিত দুই খানি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

১। কাব্যকথা—সুরেশচন্দ্র সেন, এম্ এ।

২। কালিদাস—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

এ শ্রেণীর সমস্তই প্রায় স্কুলপাঠ্য। অবশিষ্ট যে কয়খানি, সাহিত্য-নামধারী—তাহার মধ্যে উল্লিখিত কয়খানি ভিন্ন কোন খানিই উল্লেখযোগ্য নয়। এই বই কয়খানি সাহিত্যের আদর, গৌরব ও সম্মান রক্ষা করিয়াছে। ব্যোমকেশ বাবু ১৩১০ সালের সাহিত্যের বিবরণে বলিয়াছেন, "যে দেশের লেখক পাঠক সকলেই—মহাবিজ্ঞ সমালোচক, সে দেশে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে একখানিও সমালোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় না, ইহা বিস্ময়ের কথা বটে! পূর্ণবাবুর 'কাব্যসুন্দরী', গিরিজাবাবুর তিন খণ্ড "বঙ্কিমচন্দ্র", বীরেশ্বর বাবুর "উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত," যোগীন্দ্র তর্কচূড়ামণির "মেঘনাদবধ প্রবন্ধ" ব্যতীত নাম করিবার মত সমালোচনার গ্রন্থ আর নাই বলিলেই চলে। গিরীশবাবু, রাজকৃষ্ণবাবু প্রভৃতির নাটক-কাব্য, রবীন্দ্রনাথ, ৺হেমচন্দ্র প্রভৃতির কাব্য ও কবিতা, দামোদর বাবু, রমেশবাবু প্রভৃতির উপন্যাসাবলীর সমালোচনা-গ্রন্থ কেন যে প্রকাশিত হয় না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই সমস্ত মনীষী লেখকের রচনার সমালোচনা হইলে, সাহিত্যের পুষ্টি ব্যতীত মার্জ্জনাও হইতে পারে। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের "সাহিত্য-মঙ্গল" মত প্রবন্ধপুস্তকও আর প্রকাশিত হইতেছে না। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয়, আর কি হইতে পারে?"

(ঝ) আইন—এই শ্রেণীর ৩ খানি গ্রন্থের মধ্যে ১ খানি গ্রন্থ উল্লেখ্য।

১। প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়ত গাইড—জ্ঞানদানন্দ চক্রবর্ত্তী।

(ঞ) ধর্ম্ম—এই বিভাগের ১৯০ খানি পুস্তকের মধ্যে নিম্নলিখিত ৩ খানি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য—

১। ঈশ্বরভক্তি—অমরনাথ সিংহ বি, এল,

২। নিবেদন—নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এম্, এ,

৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—(৩য় ভাগ) মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বড়ই ক্ষোভের বিষয়, দিন দিন ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। যে দুই এক

খানি গ্রন্থ বাহির হইতেছে, সেগুলিকেও ঠিক্ ধর্ম্মগ্রন্থ বলা যায় না। আলোচ্যবর্ষে এতদ্ বিভাগীয় গ্রন্থের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(ট) বিজ্ঞান—এই শ্রেণীর ১৭ খানি গ্রন্থের মধ্যে ২ খানি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

১। শঙ্কু-নির্ম্মাণ—যোগেশচন্দ্র রায়।

২। পরিমাপপদ্ধতি—শশিভূষণ বিশ্বাস।

(ঠ) ভ্রমণ—এই বিভাগের ১ খানি পুস্তকের মধ্যে ১ খানিই উল্লেখযোগ্য।

এই বিভাগদ্বয়ে যে ১৮ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুদয় কেবল স্কুলপাঠ্য, তবে মাসিকপত্রাদির মধ্যে এই এই বিষয়ে যে সমস্ত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, স্থানান্তরে তাহার তালিকা দিয়াছি। বড়ই পরিতাপের বিষয়, বর্ত্তমান বর্ষে আমাদের ভ্রমণ ও বিজ্ঞান বিষয়ে এক "শঙ্কু-নির্ম্মাণ" ব্যতীত কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। ভারতীয় বিজ্ঞানের বিদ্যুৎ-চমকে একদিন সমুদয় সভাসমাজের জ্ঞানচক্ষুঃ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। চাষার গান, ঘুমপাড়ান ছড়ায় পর্য্যন্ত তখন বিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইত। সেই ভারতে এখন দুই এক খানা বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই আনন্দিত হইতে হয়! বাঙ্গলাভাষায় বিজ্ঞানগ্রন্থ নাই বলিলেই কোনই হানি হয় না। অথচ তাই বলিয়া বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বড় কম নয়। এখনকার দিনে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধি নিতান্তই প্রার্থনীয়।

(ড) বিবিধ বিষয়ের ৮২ খানি গ্রন্থের মধ্যে ১২ খানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ। বাকী ৭০ খানি গ্রন্থের মধ্যে ১১ খানি উল্লেখযোগ্য—

১। সমাজ ও তাহার আদর্শ—দেবেন্দ্রবিজয় বসু।

২। দেবসমিতি বা সুরলোকে স্বদেশকথা—অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

৩। নারী-ধর্ম্ম—গিরিজাসুন্দর চক্রবর্ত্তী।

৪। এস্লামের জয়—মীর মসররফ হোসেন।

৫। সমাজ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬। সমূহ— " "

৭। স্বদেশ— " "

৮। বঙ্গে ম্যালেরিয়া—রাজকৃষ্ণ মণ্ডল।

৯। উপসর্গ (বর্ত্তমান যুগের)—উমেশচন্দ্র বসু।

১০। রাজা প্রজা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১১। বিপিনবাবুর বক্তৃতা—উমেশচন্দ্র চৌধুরী।

এই শ্রেণীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাবুর "সমাজ," 'সমূহ' 'স্বদেশ,' "রাজা প্রজা," দেবেন্দ্রবিজয় বাবুর "সমাজ ও তাহার আদর্শ," এবং 'বিপিনবাবুর বক্তৃতা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এবার বিবিধবিষয়ে অনেকগুলি আজগুবী বই বাহির হইয়াছে। গ্রন্থে সারবত্তা না

থাকিলেও নাম মাহাত্ম্যের খাতিরে নিম্নোক্ত বহিখানির নাম করা গেল—স্বদেশী কেতাব "কোরমা খাবু" ? ১ম ভাগ (কালীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়)। বর্ত্তমানকালে এমন পুস্তকেরও প্রচার হয়!

আর্য্যনীতিবিজ্ঞান—গিরিশচন্দ্র দত্ত।

(ঢ) কাব্য ও কবিতা—এই শ্রেণীর ৪২ খানির মধ্যে ৪ খানির নাম উল্লেখের উপযুক্ত।

১। অনলপ্রবাহ—
২। উদ্বোধন—
} আবুমহম্মদ ইস্মাইল হোসেন।

৩। কুন্দ—কালিদাস রায়।

৪। কথা ও কাহিনী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাব্যের ভিতর দিয়া প্রতি বৎসরই বাঙ্গলা-সাহিত্যে অনেক আবর্জ্জনার সৃষ্টি হয়, এবারও যে—হয় নাই, তাহা নয়। তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কম। গত বৎসর 'জুলিয়াস্ সিজার' ও "মেঘদূত' এই গ্রন্থদ্বয়ের পদ্যানুবাদ বাহির হইয়াছিল। এবার কোন ভাষান্তরের নাম শোনা যায় না।

আলোচ্যবর্ষে বেশী জাতিতত্ত্বের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। মাত্র দুই খানি উল্লেখযোগ্য।

১। কায়স্থজাতিবিজ্ঞান, ১ম খণ্ড। —বঙ্গীয়ব্রাহ্মণ সভা।

২। কায়স্থকুসুমাঞ্জলি—কালীপ্রসন্ন সরকার।

বঙ্গসাহিত্যের সকল বিভাগেই অল্পবিস্তর কার্য্য হইয়াছে, কিন্তু কোন উল্লেখযোগ্য স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ আলোচ্যবর্ষে প্রকাশিত হয় নাই। স্ত্রী ও পুরুষের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া যাহাতে স্ত্রীজাতির শিক্ষা হয় এবং তদুপযোগী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে কাহারও কাহা-রও দৃষ্টি রাখিলে ভাল হয়।

গতবর্ষে মোট ৫৪৬ খানি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়খানি উল্লেখযোগ্য। (কলাবিদ্যাসম্বন্ধে) সঙ্গীত-প্রকাশিকা (১৩০৮)

চিকিৎসা-সংক্রান্ত :—

ভিষকদর্পণ (১৮৯০), চিকিৎসা-প্রকাশ (১৩১৫), সরল হোমিওপ্যাথি (১৯০০), হোমিওপ্যাথি প্রচার (১৩১৪)।

বিবিধবিষয়ে :—

অবসর (১৩১০), আর্য্যভূমি (১৩১৪), আলোচনা (১৩০৩), ইসলাম-প্রচারক (১৩০৭), উদ্বোধন (১৩০৫), উপাসনা (১৩১০), কমলা (১৯০৫), গৃহলক্ষ্মী (১৩১৪), জন্মভূমি (১২৯৯), জাহ্নবী (১৩১১), নব্যভারত (১২৮৯), পথিক (১৩১৪), পন্থা (১৩০৩), পূর্ণিমা (১২৯৯), প্রকৃতি (১৩১৪), প্রবাসী (১৩১৭), ভারতমহিলা (১৩১১), ভারতী (১২৮৩), মহাজন-বন্ধু (১৩১৫), মহাশক্তি (১৩০৯), মহিলা (১৩০৯), মুকুল (১৩০১), যুবক (১৩০৮), রঙ্গপুর শাখা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (১৩১৪), বসুধা (১৩০৭), সাহিত্য (১২৯৬), সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (১৩০১),

সাহিত্য-সংহিতা (১৩১০), সুপ্রভাত (১৩১৪), সুমতি (১৩১২), স্বদেশী, (১৩১১), হিন্দু-সখা (১৩১৫), খৃষ্টীয়-বান্ধব (১৮৭৮), তত্ত্ববোধিনী (পত্রিকা), ধর্ম্ম ও কর্ম্ম (১৩০৭), নববিধান (১২৯১), বেদান্তদর্পণ (১৩১৪), সত্যপ্রকাশ (১৩১৫), বাল্য-সখা (১৩১৫), ভক্তি (১৩১৪), ভাণ্ডার (১৩১১), জগজ্জ্যোতিঃ (১৩১৫), কৃষক (১৩০৬), শক্তি (১৩১৫), সর্ব্বজন-সুহৃদ্ (১৩১৪), শিবপুর-কালেজ-পত্রিকা (১৩১৪), তাম্বুলী-সমাজ (১৩০৬), তারা (১৩১৪), বঙ্গ-দর্শন (১৩০৭), বসুধা (১৩০৮), বামাবোধিনীপত্রিকা (১২৭৫), আর্য্যধর্ম্ম (১৩১৫)।

মাসিকের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইহা সর্ব্বপ্রথমে প্রচারিত হয়। এক্ষণে ইহা আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র। ১৮০০ শকে তত্ত্বকৌমুদী প্রচারিত হয়। বর্ত্তমান সাময়িক পত্রিকার মধ্যে যেগুলি দশ বৎসরের অধিককাল পরিচালিত হইয়াছে, নিম্নে তাহাদের নাম ও প্রথম প্রকাশের সময় লিখিত হইল :—

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১৭৬৫ শাক।
তত্ত্বকৌমুদী—১৮০০ শাক।
বামাবোধিনী পত্রিকা—১২৭০ সাল, ভাদ্র।
ভারতী—১২৮৩, বৈশাখ।
পরিচারিকা—১২৮৫, জ্যৈষ্ঠ।
নব্যভারত—১২৯০, বৈশাখ।
জন্মভূমি—১২৯৭, পৌষ।
সাহিত্য—১২৯৭, বৈশাখ।
ভিষক্‌দর্পণ—১৮৯০ জানুয়ারি।
পূর্ণিমা—১৩০০, বৈশাখ।
হিন্দুপত্রিকা—১৩০১, বৈশাখ।
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১৩০১, শ্রাবণ।
মহিলা—১৩০২, শ্রাবণ।
প্রদীপ—১৩০৪, পৌষ।
রঙ্গপুর-দিক্‌প্রকাশ—১২৬৬।
ঢাকাপ্রকাশ—১২৬৮
ধর্ম্মতত্ত্ব—১২৭২
হিন্দুরঞ্জিকা—১২৭৪
বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী—১২৮৪
সঞ্জীবনী—১২৮৯
পরিদর্শক—১৮৮৭
বঙ্গবাসী—১২৮৮

সময়—১২৮৯ .

হিতবাদী—১২৯৮

বরিশাল-হিতৈষী—১২৯৯

চারুমিহির—১৩০০

বসুমতী—১৩০৩

১৩১৫ সালের সাহিত্য-বিবরণ, যতটা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা উপস্থাপিত হইল। বার্ষিক সাহিত্য-বিবরণ বলিতে যাহা বুঝি, তাহার কিছুই ইহাতে দিতে পারা গেল না। যে সকল পুস্তক উল্লেখযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, সেগুলি কেন যে উল্লেখযোগ্য, তাহাও প্রকাশ করিতে পারিলাম না। এ বৎসরে যে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও আমাদের বিবেচনায় যে সকল ত্রুটি দৃষ্ট হইয়াছে, তাহারও বিবৃতি করিতে পারিলাম না। তথাপি সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের উল্লেখে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা অতি সংক্ষেপে যতটুকু বলিয়াছি, সাহিত্যিকগণ, সহৃদয়তার সহিত যদি পাঠ করেন এবং তাহার উদ্দেশ্যের প্রতি অবহিত হন, তাহা হইলেও, এই অসম্পূর্ণ ত্রুটি-বিশিষ্ট বার্ষিক সাহিত্য-বিবরণ লেখার সামান্য পরিশ্রমও, সার্থক হইতে পারে। আমাদের বাঙ্গলাসাহিত্যে যে কয়টী বিভাগে আজকা'ল সাহিত্যিকেরা লেখনী ধারণ করিতেছেন, সেই কয়টী ছাড়া আর কোন নূতন বিভাগে কাহাকেও হস্তার্পণ করিতে দেখিতেছি না। তবে এইরূপ যে, কেবল যোগ্য ব্যক্তির অভাববশতঃই হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। বঙ্গভাষার প্রতি অশ্রদ্ধাই ইহার মূলীভূত কারণ। আমার এ বিষয়ে আর বলিবার অধিক কিছু নাই। পরিষদ্ বহুকালাবধি কৃতবিদ্য মহাশয়গণকে আবাহন করিয়া আসিতেছেন; আজিও পুনরায় আবাহন করিতেছেন। বঙ্গের কৃতী সন্তানগণ বঙ্গ-ভাষার সেবার জন্য অগ্রসর হউন। আগামী বর্ষে সাহিত্য-বিবরণী উপস্থিত করিবার সময়ে তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিয়া যেন ধন্য হইতে পারি।

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

রাজা অনঙ্গভীমদেবের সময়ে উৎকীর্ণ চাটেশ্বর-লিপি

(শিলাফলকের ছবিসহ)

কটকজেলার পদ্মপুর পরগণার অন্তর্গত কৃষ্ণাপুর গ্রামে চাটেশ্বর শিবমন্দির অবস্থিত। ঐ মন্দিরগাত্রে প্রবন্ধোল্লিখিত শিলালিপি খানি উৎকীর্ণ ছিল। কটক নগর হইতে ১২ মাইল উত্তরপূর্ব্বে গমন করিলে কটক চাঁদমারী রাস্তার ২ মাইল উত্তরে এই মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরটী তৎপার্শ্বদ্বয়ে স্থাপিত কৃষ্ণরাধিকা ও পার্ব্বতীমন্দির অপেক্ষা কিছু বর্দ্ধিতায়তন এবং অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। উক্ত মন্দিরদ্বয়ের স্থাপত্যনিদর্শনই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। খৃষ্টীয় ১২শ বা ১৩শ শতাব্দীতে উড়িষ্যার বিভিন্নস্থানে যে শ্রেণীর মন্দিরসমূহ স্থাপিত হয়, এই চাটেশ্বর মন্দির স্থাপত্যসৌন্দর্য্যে ও সৌসাদৃশ্যে তাহারই অনুরূপ এবং তৎসমকালে বিনির্ম্মিত বলিয়া পরিগৃহীত।

সমগ্র মন্দিরটী বউলমালা পাথরে গঠিত। ইহাতে শিল্পীর শিল্পবিস্থার পরিচায়ক চিত্রশিল্পের পরাকাষ্ঠাপূর্ণ নিদর্শন নাই; এক কথায় গড়নটী সাদামাটা বলিলেও চলে। তবে ইহাতে পূর্ব্বসৌন্দর্য্যের সমৃদ্ধিজ্ঞাপক যাহা কিছু পরিলক্ষিত হইতেছে, কালে জলবায়ুর প্রকোপে ও জীর্ণসংস্কারে তাহা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে।

এই সুবৃহৎ মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ গাঢ় অন্ধকারপূর্ণ, আলোকপ্রবেশের জন্য একটী সামান্য আওয়াজী মাত্রও নাই। ভক্তগণ এখন আর এই মন্দিরে পূজা দিতে আসে না। তাহাদের ঔদাসীন্যবশতঃই এই নির্জ্জন পরিত্যক্ত মন্দির এক্ষণে বাদুড়কুলের নিরাপদ বাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। মন্দিরের গর্ভগৃহে একটী সুগভীর গর্ত্ত মধ্যে লিঙ্গমূর্ত্তি নিরন্তর জলমগ্ন আছেন; কেবলমাত্র উৎসবের সময় জল ছেঁচিয়া ফেলা হইলে, চাটেশ্বরলিঙ্গ সাধারণের দৃষ্টিপথে পতিত হন।

বর্ত্তমান সময়ে, কৃষ্ণাপুরগ্রামে যে মুষ্টিমেয় লোকের বসতি আছে, তাহারা দেবদেব চাটেশ্বরের ভক্ত ও পূজক, এই কারণে 'ভোপা' নামে পরিচিত। পূর্ব্বে চাটেশ্বর-মন্দিরের ব্যয়ভারবহনোপযোগী অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল। দেবসেবকগণ উহার অধিকাংশ সম্পত্তি বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়ায় বা নষ্ট করায়, মন্দিরের আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং সেই কারণেই আর পূর্ব্ববৎ সমারোহে দেবপূজা ও উৎসবাদি সম্পন্ন হয় না। এক্ষণে দেবমন্দিরের পূজানির্ব্বাহের জন্য বৎসরে ৩০০ 'ভরণ' ধান্য নির্দ্দিষ্ট আছে; এতদতিরিক্ত দেবসম্পত্তির মধ্যে যে একহাজার বিঘা মাত্র ভূমি বিদ্যমান আছে। তাহার রাজস্ব হইতেই বৎসরের সকল ব্যয়াদি নির্ব্বাহিত হয়। শিবরাত্রি পর্ব্বে এবং কার্ত্তিকী চতুর্দ্দশীতে এখানে দুইটী মেলা হয়, ঐ মেলার সময়ে বহু তীর্থযাত্রী এখানে দেবদর্শনে আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের উপহারাদি হইতেও দেবপূজাদির অনেক সাহায্য হইয়া থাকে।

চাটেশ্বর লিঙ্গের উৎপত্তি ও মন্দিরপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, যেখানে এখন দেবমন্দির বিরাজমান, ঐ স্থানে একসময়ে একটী দীর্ঘিকা ছিল, উহারই পার্শ্বদেশে একজন গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের ক্ষুদ্র চাটশালা ছিল, ঐ থানে বসিয়া তিনি পড়ুয়াদিগকে শিক্ষাদান করিতেন। প্রবাদ, স্বয়ং মহাদেব বিদ্যা অধ্যয়নমানসে ঐ চাটশালার চাট (বালক) রূপে আসিয়া সমুপস্থিত হন। তিনি বালকবৃন্দের সহিত একযোগে বিদ্যাভ্যাস করিতেন। ছাত্রগণ সাধারণতঃ দরিদ্র ছিল, গুরুমহাশয় পুনঃ পুনঃ বেতনের জন্য ছাত্রদিগকে পীড়ন করিতেন, কখন কখন তিনি তাহাদের পিতামাতার নিকট বেতনপ্রাপ্তির অনুযোগ করিয়া পাঠাইতেন; কিছুতেই তিনি সময়মত বেতন প্রাপ্ত হইতেন না। কিন্তু চাটরূপী মহাদেব গুরুমহাশয়ের চাহিবার পূর্ব্বেই স্বীয় বেতন পরিশোধ করিয়া দিতেন। তিনি গুরুমহাশয় কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেও কখন স্বীয় পিতামাতার পরিচয় দিতেন না। বালক কেন স্বীয় পিতামাতার পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত এবং কিরূপেই বা সে সকলের পূর্ব্বে স্বীয় বেতন পরিশোধ করিতে সমর্থ, এ বিষয় জানিতে কুতুহলী হইয়া একদিন গুরুমহাশয় সন্ধ্যাকালে পাঠশালা হইতে গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত ঐ বালকের পশ্চাদনুসরণ করেন। গুরুমহাশয় দেখিলেন, বালক ক্রমশঃই ঐ দীর্ঘিকাতটে উপস্থিত হইল এবং অকস্মাৎ লম্ফ প্রদান করিয়া উক্ত তড়াগের গভীর জলে নিমগ্ন হইয়া গেল। তিনি বিস্ময় বিহ্বলনেত্রে বালকের এই অলৌকিক ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া কিছুকালের জন্য তথায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে তিনি এই নৈসর্গিক ব্যাপারের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনচিন্তায় আত্মবিস্মৃত হইয়া ধীরে ধীরে স্বীয় চাটশালায় ফিরিয়া আসিলেন। ঐ রজনীতেই গুরুমহাশয় স্বপ্ন দেখিলেন, স্বয়ং মহাদেব তাঁহার সমক্ষে আসিয়া বলিতেছেন, "আমি আমার মহত্ত্ব প্রকাশার্থ এতদিন তোমার নিকট পড়ুয়া (চাট) ছিলাম, এক্ষণে তুমি জগদ্বাসীর নিকট আমার নাম ঘোষণা কর। অদ্য হইতে আমি জগতে চাটেশ্বর নামে প্রথিত হইব।"

এই অপূর্ব্ব ঘটনার পর হইতে, যে সকল ছাত্র ঐ গুরুমহাশয়ের চাটশালায় বিদ্যাধ্যয়নার্থ সমুপাগত হইয়াছিল, তাহারা দেবদেবের কৃপায় কয়েকজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কালক্রমে ঐ পুণ্যস্থানের খ্যাতি উৎকলরাজের কর্ণগোচর হয়। তিনি দেবদেবের পুণ্যভূমি ও নিকেতনস্বরূপ ঐ পুষ্করিণী মৃত্তিকাপূর্ণ করিয়া তদুপরি দেবদেবের উদ্দেশে একটী সুবৃহৎ ও সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তদভ্যন্তরে বর্ত্তমান চাটেশ্বর লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং মন্দিরের পূজাদি ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বহু সম্পত্তি দিয়া যান।

এই মন্দির মধ্যেই আমরা উৎকলাধিপ ২য় অনঙ্গভীমের সময়ে উৎকীর্ণ উপরিউক্ত শিলালিপি দেখিতে পাই। পূর্ব্বে মন্দিরগাত্রে সংলগ্ন ছিল, এখন খুলিয়া রাখা হইয়াছে। আমার প্রিয়বন্ধু মৌদার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত আর্ত্তত্রাণ মিশ্রের অনুরোধে আমি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ৭ই

নবেম্বর তারিখে চাটেশ্বর মন্দিরে গমন করি। দেবসেবকগণ, আমাদের প্রার্থনানুসারে উক্ত খোদিত শিলাফলকখানি আমাদের সম্মুখে আনিয়া মন্দিরের দ্বারদেশে স্থাপন করেন। তখন সন্ধ্যা হয় হয়, তাহাতে ছায়া, ভাল করিয়া ফলকখানি পাঠ করা অসম্ভব জানিয়া আমি রজনীর গাঢ় অন্ধকারপ্রবেশের পূর্ব্বে তাড়াতাড়ি একখানি কাগজে পেন্‌সিল ঘসিয়া উহার একটা ঘসা-ছাপ উঠাইয়া লইলাম। ইহার পর উক্ত ফলকের আর একখানি ছাপ আমার নিকট আসিলে আমি উহার পাঠোদ্ধারে প্রবৃত্ত হই। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মৎপ্রণীত বিশ্বকোষ অভিধানে 'চাটেশ্বর' শব্দে সর্ব্বপ্রথমে এই ফলকের উল্লেখ মাত্র করিয়াছিলাম। তৎপরে ১৮৯৬ সালের এসিয়াটিক সোসাইটীর ৬৬ ভাগের ৪র্থ সংখ্যার পত্রিকায় ঐ লিপির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করিয়া প্রকাশ করি। কিন্তু বহুদিন চেষ্টা করিয়াও উক্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় শিলাফলকের একখানি উপযুক্ত প্রতিকৃতি (fascimile) প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটে নাই। তৎপরে গত ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মহারাজ ময়ূরভঞ্জাধিপের আগ্রহে প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসন সংগ্রহমানসে আর একবার উক্ত গ্রামে উপস্থিত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। এই সময় আমরা উপযুক্ত ফটো লইবার সুবিধা পাইয়াছিলাম। এখন শিলাফলকখানি যেরূপভাবে রহিয়াছে, উড়িষ্যার বহু শিলালিপির ন্যায় এখানিও পাছে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় ইহার উপযুক্ত আলোকচিত্র সত্বর প্রকাশ করা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি। বিশেষতঃ এই শিলালিপির সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। লিপিখানি আলোচনা করিলেই সকলে জানিতে পারিবেন। সেই জন্যই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ উপযুক্ত প্রতিকৃতি সহ উক্ত লিপির উপযুক্ত পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশ করিতেছেন।

ঐ প্রস্তরফলকখানি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৩২·৫″×২২″ ইঞ্চ। অক্ষরগুলির আকৃতি-পরিমাণ ⅛″×½″। ইহাতে সর্ব্বসমেত ২৫টী পঙ্‌ক্তি আছে। পঙ্‌ক্তিগুলি পাথরের বাম হইতে দক্ষিণ দিক্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, কেবল চারিধারে ১॥০ ইঞ্চ পরিমিত স্থান ফাঁক আছে। অক্ষরগুলি প্রাচীন কুটিলাক্ষর। এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকার প্রকাশিত মেঘেশ্বর[১] ও ব্রহ্মেশ্বর[২] শিলালিপির বাঙ্গালার অক্ষরের সহিত ইহার সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে।

ভাস্কর নামধেয় জনৈক কবি কর্ত্তৃক এই লিপির প্রশস্তি রচিত হইয়াছে। রাজা ২য় অনঙ্গভীমদেবের মন্ত্রী বিষ্ণুকর্ত্তৃক শিবমন্দির (চাটেশ্বর) নির্ম্মাণ-বিবরণ লিপিবদ্ধ করাই ঐ শিলালিপির প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার ভাষা সংস্কৃত, লালিত্যপূর্ণ, উজ্জ্বল ও ভ্রমবিরহিত।

বর্ণমালা—ইহাতে অন্ত্যস্থ স্থানে প্রায়ই বর্গীয় 'ব'র ব্যবহার আছে। প্রায় সকল স্থানেই প, ব, অন্ত্যস্থ ব, রেফ্ যোগে দ্বিত্ব ব্যবহৃত হইয়াছে, ২,৩,৪ প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিতে এরূপ প্রয়োগ

---

(১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, for 1898, Part I. p. 317.

(২) Journal As. Soc. Bengal, Vol, VII, Plate XXIV.

দৃষ্ট হয়। ১৮ পঙ্‌ক্তিতে একটী অদ্ভুত ভ্রম আছে, ঐ স্থলে "যদ্দিগ্‌গজাঃ" স্থলে 'যৎদিগ্‌-গজাঃ' লিখিত হইয়াছে।

"ওঁ নমঃ শিবায়" শিলালিপির আরম্ভ, তৎপরে মহাদেবের চূড়াবিলম্বিত চন্দ্রের এবং বিষ্ণুর বিলাসনিকেতন সমুদ্রের আরাধনা করা হইয়াছে। তদনন্তর চন্দ্রবংশাবতংস চোড়-গঙ্গের বংশকীর্ত্তিবর্ণনপ্রসঙ্গে (১) চোড়গঙ্গ, (২) তৎপুত্র ১ম অনঙ্গভীম, (৩) তৎপুত্র রাজেন্দ্র (রাজরাজ), এবং তৎপুত্র ২য় অনঙ্গভীম পর্য্যন্ত একটী বংশতালিকা এবং বৎস গোত্রীয় ব্রাহ্মণপ্রবর গোবিন্দ ও 'তুম্মান'* নামক গৌড়াধিপবিজেতা বিখ্যাত সেনাপতি বিষ্ণু নামক মন্ত্রিদ্বয়ের নাম বিবৃত হইয়াছে।

আলোচ্য শিলাফলকের ১৪শ শ্লোকে যে "তুম্মাণ পৃথ্বীপতি"র উল্লেখ আছে, ইনি গৌড়েতিহাসপ্রসিদ্ধ তুঘ্রিল্‌-ই-তুঘান্‌ খান্‌। উক্ত গৌড়পতির সঙ্গী ও সমসাময়িক ইতিহাস-লেখক মিন্‌হাজ্‌-ই-সরাজ্‌ লিখিয়াছেন, '৬৪১ হিজরা জীকদের ৬ই তারিখে শনিবার মালিক তুঘ্রিল-ই-তুঘান্‌ খান্‌ যাজনগর অধিপতিকে শাস্তি দিবার জন্য সসৈন্যে কটাসিনে' আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ... কিন্তু হিন্দুর হস্তে মুসলমানসৈন্য পরাভূত হইলে মালিক ভগ্ন-মনোরথ হইয়া লখণাবতীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং সুলতান আলাউদ্দীন্‌ ম'সূদ শাহের নিকট সৈন্যসাহায্য প্রার্থনা করিয়া শরফ্‌-উল্‌ মুল্‌ক্‌কে পাঠাইয়া দিলেন। ... এ দিকে এই বর্ষেই (৬৪২ হিজ্‌রা) যাজনগরপতি কটাসিন্‌ লুণ্ঠনের প্রতিশোধ লইবার জন্য বহু সংখ্যক হস্তী ও পদাতি লইয়া লখণাবতী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অভিযানকালে যাজনগর সীমা ছাড়াইয়াই হিন্দুসৈন্য প্রথমেই লখ্‌নোর অধিকার করিল। এই যুদ্ধে লখ্‌নোরের শাসনকর্ত্তা ফথ্‌রুল্‌ মুল্‌ক্‌ সসৈন্যে প্রাণ উৎসর্গ করেন। তৎপরে হিন্দুসৈ লখণাবতীর প্রবেশদ্বারে আসিয়া পেঁছিল। দ্বিতীয় দিবসে তাহারা সংবাদ পাইল যে (দোয়াব ও অযোধ্যা হইতে) ইস্‌লাম্‌সৈন্য আসিতেছে। এ সংবাদ পাইয়া হিন্দুসৈন্য সরিয়া পড়িল।"[২] উক্ত অভিযানকালে যিনি হিন্দুসৈন্যের পরিচালনভার পাইয়াছিলেন, মিন্‌হাজ্‌ তাঁহাকে রাজজামাতা ও 'সাবন্তর্‌' নামে পরিচিত করিয়াছেন।[৩] সংস্কৃত 'সামন্তরাজ' শব্দ অপভ্রংশে উৎকলে 'সান্‌ত্রা' এবং মুসলমান-ঐতিহাসিকের নিকট 'সাবন্তর্‌' নামে প্রচলিত।

আলোচ্য শিলাফলক হইতে বুঝা যায় যে মন্ত্রিপ্রবর বিষ্ণুশর্ম্মাই তুঘ্রিল্‌-ই-তুঘান্‌ খানের

---

* *Tabakat i Nasiri*, pp 740-763 and সংপ্রকাশিত On the copperplate grant of Nrisimha Deva II, in A, S. B. J, Vol LXV, pt. I, pp 233-34. দ্রষ্টব্য।

(১) কটাসিনের বর্ত্তমান নাম 'রাইবণিয়াগড়', উহা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত।

(২) Raverty's Tabakat-i-Nasiri, p. 739—740.

(৩) ঐ ঐ ঐ p. 763.

রাজা অনঙ্গ-ভীমদেবের চাটেশ্বর-লিপি

Visvakosha Press.

বিরুদ্ধে অভিযানকালে সৈন্যাপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে কখনই আমরা তাঁহাকে যাজনগরপতি (২য় অনঙ্গভীমের) জামাতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। এ দিকে আবার উৎকলাধিপ ২য় নরসিংহদেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে ২য় অনঙ্গভীমের পুত্র ২য় নরসিংহদেব রাঢ় ও বরেন্দ্র জয় করিয়া অশেষ কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।[৪] এরূপ স্থলে মনে হইতেছে যে গৌড়-আক্রমণকালে উৎকলপতি ২য় অনঙ্গভীমের পুত্র, জামাতা ও মন্ত্রী সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন।

মূল

পংক্তি—১ম　　ওঁঃ নমঃ শিবায়।

স যস্মিন্ মৈনাকঃ স্মরতি জনকক্রোড়ললিতং
যদন্তঃ শ্রীকান্তঃ শ্রয়তি গৃহজামাতৃপদবীম্।
সুরেভ্যস্তন্মন্থব্যসনমনুভূয় ব্যথিত য-
স্স্বধাসত্রং সোয়ঞ্জয়তি সরি-

পং—২　　তামেকসুভগঃ ॥

তস্মাদভূদ্বিস্ময়মাদধানঃ
কলানিধির্ব্বিশ্ববিলোচনানাম্।
যমর্প্পয়ামাস গুণানুরাগা-
ন্নেত্রে মুরারির্ম্মুকুটে পুরারিঃ ॥ [২]
ভূপাস্তস্মাদ্বভূবুর্ব্বিস্মরসমরোদঞ্চদাশ্চর্য্যবীর্য্য-
জ্যো-

পং—৩　　তির্জ্জালাবলীঢ়প্রতিভটকরটিস্থানদানপ্রবন্ধাঃ।

যেষাঙ্কীর্ত্তিপ্রবাহৈঃ প্রতিপদমুদয়ৎস্বর্দ্ধনীসঙ্গসৌখ্য-
প্রেঙ্খৎকল্লোলকেলিঃ কলয়তি জলধিস্তানি লীলায়িতানি ॥ [৩]
তেষাম্বংশে বিশদযশসা-

পং—৪　　শ্চোড়গঙ্গক্ষিতীন্দ্র-

ব্যাজব্যক্তং নরহরিতনোর্জ্জ্যোতিরাবির্ব্বভূব।

(৪) বিশ্বকোষ ৫ম ভাগ "গাঙ্গেয়" শব্দ দ্রষ্টব্য।

দর্পোদ্দামদ্বিপমদনদীতীর্থসংন্যাসিনো য-
স্মিন্নিস্ত্রিংশেন প্রতিনৃপতয়ঃ প্রাপিতা মোক্ষলক্ষ্মীম্ ॥ [৪]
ধম্মিল্লং করপল্লবে কলিতবান্ প্রাগেব বৈ-

পং—৫ রিশ্রিয়ঃ

স্মেরামর্দতরঙ্গিতেন মনসা নিস্ত্রিংশবল্লীস্ততঃ।
চক্রে বৈরিবধূজনস্তনতটীর্ব্যো মুক্তমুক্তাঃ পুরঃ
পশ্চাদুদ্ধুরগন্ধসিন্ধুরমদপ্রস্যন্দিগণ্ডস্থলীঃ ॥ [৫]
যৎকল্লোলিতমণ্ডলাগ্রকুটিলাটোপস্ফু-

পং—৬ রৎসাধ্বসৈ-

র্বাণপ্রকরপ্রহারতরলৈঃ প্রত্যর্থিভিঃ পার্থিবৈঃ।
চণ্ডাংশোর্দিবি মণ্ডলাগ্রপটলং নির্ভিদ্য তন্মন্যুনা
মন্যে নির্বৃতিগর্বিতৈরনুসৃতো নির্ব্বাণসীমারসঃ ॥ [৬]
আসীৎ সূনুরনঙ্গভীমনৃপ-

পং—৭ তিঃ পুণ্যাতপত্রং ততো

ন স্পৃষ্টঃ কলিকালকল্মষমসীকল্লোললীলায়িতৈঃ।
কোয়ং মন্ত্রকলাপদুর্মদকরিব্যূহং বিহায়ামুনা
শ্রদ্ধামেকপদে নৃপে কলয়তা সাম্রাজ্যমাসাদিতম্ ॥ [৭]
স্বৈরশ্রুতি-

পং—৮ ত্রয়গবীভিরুপাস্যমানো

গোবিন্দ ইত্যজনি বৎসকুলে দ্বিজেন্দ্রঃ।
রাজ্ঞঃ ক এষ মহিমা যদসাবনেন
সাম্রাজ্যভারবহনে বিদধে ধুরীণঃ ॥ [৮]
সেবানতপ্রতিমহীপতিকেশপাশ-
শৈবালবল্লিশিখ-

পং—৯ রে নখরাজহংসাঃ।

যৎপাদপঙ্কজগৃহাশ্রমিণঃ স্বপন্তি
রাজেন্দ্র ইত্যজনি তেন ততঃ ক্ষিতীন্দ্রঃ ॥ [৯]

জজ্ঞেহসৌ তমনঙ্গভীমনৃপতিং যস্য প্রতাপানলঃ
জ্বালাসংবলিতৈঃ সুবর্ণশিখরীযাতিদ্রবত্বং

পং—১০ যদি।

আদায়ৈনমহর্নিশং যদি ঘনা মুঞ্চন্তি ধারোৎকরা
নাশাঃ পুরয়িতুং তথাপি বিজয়ী যদ্দানকেলিক্রমঃ ॥ [১০]
ত্রৈলোক্যং বিমলীকরোতি যদি তৎকীর্ত্তিম্মুর্ধাস্বর্দ্ধুনী
কণ্ঠে চেৎ বিলুঠন্তি

পং—১১ তদ্‌ভণিতয়ো ধিঙ্‌মৌক্তিকানাং স্রজঃ।

যৎপাদাব্জনখদ্যুতিব্যতিকরৈর্ভূষাবিধির্যদ্যভূৎ
প্রত্যর্থিক্ষিতিপালভালফলকে কঃ পট্টবন্ধগ্রহঃ ॥ [১১]
তস্যাথ ক্ষিতিপালভালবড়ভীনিদ্রালু-

পং—১২ পাদাঙ্গুলে

বিষ্ণুর্বিষ্ণুরিবাপরঃ কলিতবান্ সাচিব্যমব্যাহতং।
শ্বেতচ্ছত্রশতানি যস্য যশসা নির্ম্মায় কিং ক্রমহে
সাম্রাজ্যং ত্রিকলিঙ্গনাথনৃপতেরেকাতপত্রীকৃতম্ ॥ [৩২]
যে যাতাঃ শরণং

পং—১৩ রণাঙ্গনশিরস্‌সুন্যস্তশস্ত্রাঃ পুরো

বৈর্বা দুর্দ্দমদোর্ব্বিলাসরসিকৈরুৎখাতখড়্গৈঃ স্থিতম্।
আশ্চর্য্যং যদমীদ্বয়েপি ন চিরাদাসাদ্য বিষ্ণোঃ পদং
প্রাপ্তা নির্ভরনির্বৃতিপ্রণয়িতাং প্র-

পং—১৪ ত্যর্থিনঃ পার্থিবাঃ ॥ [১৩]

বিন্ধ্যাদ্রেরধিসীমভীমতটিনী কুঞ্জে তটেম্ভোনিধে-
র্ব্বিষ্ণুর্ব্বিষ্ণুরসাবসাবিতি ভয়াচ্চৈতন্দিশঃ পশ্যতঃ।
সাম্রাজ্যং সপরিশ্রমেণ ন তথা বৈখানসানামিদং
বিশ্বং

পং—১৫ বিষ্ণুময়ং যথা পরিণতং ভুম্মাণপৃথ্বীপতেঃ ॥ [১৪]

কণ্ঠোত্তংসিতসায়কস্য সুভটানেকাকিনো নিঘ্নতঃ

কিং ক্রমো যবনাবনীন্দুসমরে তত্তস্য বীরব্রতং
যস্যালোকনকৌতুকব্যসনি-

পং—১৬ নাং ব্যোমাঙ্গনেনাকিনা-
মস্বপ্নৈরনিমেষবৃত্তিভিরভূম্মৈত্রৈর্মহানুৎসবঃ ॥ [১৫]
সাহস্রাঃ পরিতঃ স্ফ রন্তি হরয়ঃ খেলন্তি যৎদিগ্‌গজাঃ
প্রেঙ্খন্তিঃ পথিপুণ্ডরীকপটলৈর্দিকৃচক্রমা-

পং—১৭ ক্রম্যতে।
সম্বাসঃ কটকেষু মৌলিষু পদন্যাসঃ কুলক্ষ্মাভৃতাং
ক্রুদ্ধে(?) যত্র ন কাচিদুৎকলপতেঃ সাম্রাজ্যলক্ষ্মীং কৃতিঃ ॥[১৬]
ক্ষ্মাপীঠং কিয়দম্বরঙ্কিয়দথ স্বঃ সৌধমেতৎ কিয়ৎ
দিকৃচক্রং কিয়-

পং—১৮ দেতদেব কলয় ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডং কিয়ৎ।
আস্তে যত্র তনোতি যত্র চরণং যত্রেদমামোদতে
যত্র সৃজ্যতি যত্র বা নিবসতি স্বচ্ছন্দমেতদ্‌যশঃ ॥ [১৭]
তপনতনয়ামভ্যাদত্তেবতংসয়িতুং শিবঃ
কুবলয়কুল-

পং—১৯ কণ্ঠোত্তংসেন বিভ্রতি সুভ্রুবঃ।
বিচকিলবনোৎসঙ্গে ভৃঙ্গীবিদনালিনং স্বনং
জগতি জনিতশ্বেতাদ্বৈতে তদা যশোভরিঃ ॥ [১৮]
অনেন পুরুষোত্তমপ্রণয়িনীষু বারাম্বিধে-
স্তটীষু ঘটিতাস্তুলাপু-

পং—২০ রুষহেমভূমীভৃতঃ।
বিলাসবসতীশ্‌শতং কলয়তা বলারাতিনা।
শচীবদনবারিজে তরলিতাঃ স্ম লোলং দৃশঃ ॥ [১৯]
পদ্মানং সরসাং শতৈস্তত ইতস্তেনাঙ্কিতা যত্তট-
স্মেরাম্ভোজগভীরগ-

পং—২১ র্ত্তকুহরধ্বস্তাধ্বখেদোর্ম্ময়ঃ।

অন্তঃসৌরভসারশীকরময়ৈঃ পাথেয়ভারৈরমী
মন্দং মন্দমনুব্রজন্তি পথিকানাম্বোধিবেলানিলাঃ ॥ [২০]
আন্বীক্ষিকীকুটিলমৈক্ষত যং কটাক্ষৈ-
র্যস্য ত্রয়ী বদনতাম্র-

পং—২২　　রসং চুচুম্ব।
স্বৈরং যদীয়হৃদয়ে বিজহার বার্ত্তা
যং দণ্ডনীতিরপি নির্ভরমালিলিঙ্গ ॥ [২১]
উদগ্রদোষাদপথপ্রবর্ত্তন-
স্খলদ্‌গতীনি শ্রুতিদৃষ্টিবিভ্রমৈঃ।
চকার তত্র প্রতিপত্তিসম্প-

পং—২৩　　দা-
স্পদং পুরাণানি পুনর্নবানি যঃ ॥ [২২]
কনককলসভারং ভারয়ামাস ভাস্বা-
নজনি রজনিজানিঃ স্ফাটিকঃ পূর্ণকুম্ভঃ।
ধ্বজপটচটুলশ্রীর্যত্র চ ব্যোমগঙ্গা
বিরচিতমমুনেদং ধাম

পং—২৪　　কামান্তকস্য ॥ [২৩]
ত্রিভুবনভয়শান্তিস্কর্ত্তুমেকার্ণবস্ত-
ঞ্জলজয়মিব যাবৎ কুর্ব্বতে পর্ব্বতেন্দ্রাঃ।
সদনমিদমুদঞ্চৎফেনপুঞ্জপ্রতিষ্ঠা-
মিহ কলয়তু তাবদ্দীয়তাঞ্চ প্রশস্তিঃ ॥ [২৪]
লোক-

পং—২৫　　শ্চতুর্দ্দশ ন মাতি যশো যদীয়ং
বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ ন তৃপ্যতি যস্য বুদ্ধিঃ।
মন্বন্তরাণ্যপি চতুর্দ্দশ যস্য সূক্তি-
র্ন ম্লানিমেতি স কবিঃ কিল ভাস্করোঽস্যাঃ ॥ [২৫]

অনুবাদ

গিরিরাজসুত মৈনাক যে স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক পিতার সুকোমল ক্রোড়ের বিষয় চিন্তা করেন, প্রলয়কালে ভগবান্ লক্ষ্মীপতি যেখানে গৃহজামাতৃপদ অবলম্বন করেন, যিনি সুধাসত্র-হেতু সুরগণকর্ত্তৃক মন্থনরূপ বিপদের আশঙ্কায় নিয়ত ব্যথিত, সেই সরিৎপতি ক্ষীরসমুদ্র জয়যুক্ত হউন। ১

যাঁহার গুণে একান্ত আসক্ত হইয়া মুরারি ও পুরারি যথাক্রমে তাঁহাকে মুকুটে ও নেত্রে বিন্যস্ত করিয়াছেন, সেই বিশ্বজনগণের লোচনবিস্ময়কর কলানিধি চন্দ্র উক্ত ক্ষীরসমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ২

যে সকল রাজগণের বহুদূরব্যাপী অত্যাশ্চর্য্য সমরবীর্য্যের ঊর্দ্ধগতি জ্যোতিঃসমূহদ্বারা প্রতিপক্ষগণের হস্তিশালা পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত এবং যাঁহাদের কীর্ত্তিপ্রবাহ প্রতি জনপদে প্রবাহিত ও ঊর্দ্ধগামিনী সুরধুনীসঙ্গসুখে স্ফূর্ত্তিহেতু কল্লোলকেলিপরায়ণ জলনিধিও যাঁহাদের ঐ সকল কীর্ত্তিপ্রবাহান্বিত স্থানসমূহের বিষয় ঘোষণা করে, অর্থাৎ সমুদ্র প্রদেশ পর্য্যন্ত যাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ বিঘোষিত, সেই সকল নৃপতিগণ উক্ত চন্দ্র হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন। ৩

ঐ সকল নির্ম্মলযশাঃ রাজগণের বংশে উদ্ভূত উদ্দামদ্বিপদর্পে দর্পিত নরহরির তনু হইতে কালবিলম্বে আবির্ভূত জ্যোতিঃস্বরূপ ক্ষিতিপতি চোড়গঙ্গ, যাঁহার অস্ত্রপ্রভাবে প্রতিপক্ষ নৃপতিগণ লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। ৪

যিনি সর্ব্বাগ্রে প্রতিপক্ষ-লক্ষ্মীর বেণীবদ্ধকেশদাম এবং পরে অনাকুলিতচিত্তে প্রফুল্লমনে তাঁহাদের যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্র স্বীয় করতলে আনয়নানন্তর উঁহাদের পুরনারীবর্গের স্তনতট হইতে মুক্তাহারচয় বিচ্যুত এবং গণ্ডস্থল দিয়া উন্মত্তমাতঙ্গমদক্ষরণের ন্যায় অবিরল ধারা প্রস্যন্দিত করেন, অর্থাৎ তাঁহাদের রাজ্যলক্ষ্মী গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত এবং সমূলে নিপাত করায় উঁহাদের পুরনারীগণ স্ব স্ব ভূষণ উন্মোচনপূর্ব্বক নিয়ত ক্রন্দন করিতে থাকেন। ৫

প্রতিকূল নৃপতিগণ যাঁহার কুটিলাস্ত্রের দর্পপ্রভাবে নিরত সন্ত্রাসিত এবং বাণপ্রহারভয়ে সর্ব্বদা কম্পিত থাকিয়াও তাহাদের যাবতীয় বল প্রদর্শনপূর্ব্বক নির্ভেজ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডমণ্ডলের ন্যায় তাঁহার প্রতিভা খর্ব্ব করিতে না পারিয়া সেই মনঃকষ্টে স্ব স্ব দর্পবিসর্জ্জন দিয়া অবশেষে তদীয়ানুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ৬

উক্ত নৃপতি হইতে কলিকল্মষবিরহিত অনঙ্গভীম (১ম) নামক নরপতির জন্ম। ইনি মদমত্ত করিব্যূহ পরিত্যাগ করিয়া কেবল্ সমকক্ষ ভূপতিবৃন্দের প্রতি ভালবাসা বিস্তার দ্বারা পুণ্যাতপত্র সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। ৭

বৎসগোত্রে গোবিন্দনামে এক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বকৃত অশ্রুতপূর্ব্ব তিনটী স্তোত্রদ্বারা গোবিন্দদেবের উপাসনা করিতেন। অনঙ্গভীমের এই এক কি মহিমা ছিল যে, তিনি সুদক্ষ জানিয়া গোবিন্দকে সাম্রাজ্য ভারবহনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৮

তাঁহা হইতে রাজেন্দ্র নামক ক্ষিতীন্দ্র জন্ম পরিগ্রহ করেন, অবিনয়ী প্রতিকূলাচারী নৃপতি-বৃন্দের কেশপাশরূপ শৈবালশিখরে তদীয় নখরাজহংস সর্ব্বদা বিরাজ করিত এবং তাঁহার পদানত ব্যক্তিবর্গমাত্রেই গৃহাশ্রমে থাকিয়া অতিশয় সুখে নিদ্রা যাইতেন।৯

উক্ত ক্ষিতীন্দ্র রাজেন্দ্রের অনঙ্গভীম নামক একটী তনয় জন্মে; ইঁহার প্রজ্জলিত প্রতাপা-নল দ্বারা তরলীকৃত স্বর্ণচূড়পর্ব্বত হইতে মেঘসমূহ ঐ দ্রবভাগ গ্রহণপূর্ব্বক যদি উহা দিবা-নিশি ইঁহাকে বারিধারার ন্যায় প্রদান করিত তাহা হইলেও তাহারা ইঁহার আশা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইত না। কিন্তু তাঁহার এই গ্রহণাতিশয্য তদীয় দানকেলির নিকট সর্ব্বদাই পরাজিত হইত। ১০

ঊর্দ্ধগামিনী স্বর্গঙ্গা ইঁহার কীর্ত্তিপ্রবাহ বহিয়া ত্রিলোককে নির্ম্মল করিতেছেন, তিনি স্বীয় বিশুদ্ধ বাক্যাবলী পরিনির্ম্মিত হারকণ্ঠে ধারণ করিলে, তাহার নিকট মুক্তাহারও ধিক্কার প্রাপ্ত হয়। ইঁহার পদনখজ্যোতির অনুকরণে যদি কোন ভূষাদি প্রস্তুত করা যায়, তাহার নিকট তদীয় প্রতিকূল নৃপালগণের ভালাবলম্বিত অতিরঞ্জিত উষ্ণীষ কোথায় স্থান পাইতে পারে? ১১

প্রতিপক্ষ ক্ষিতিপালবর্গের ভালোপরি বিন্যস্তপাদ এই রাজার দ্বিতীয় বিষ্ণুর ন্যায় বিষ্ণু-নামক এক সচিব, ইঁহার যশোরাশিদ্বারা শত শত শ্বেতচ্ছত্র নির্ম্মাণপূর্ব্বক, বলিতে কি, তদীয় ত্রিকলিঙ্গ সাম্রাজ্যকে একচ্ছত্র করিয়াছিলেন। ১২

ইঁহার সময়ে এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা এই দেখা যায় যে, যে সকল প্রতিপক্ষগণ রণাঙ্গণে অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং যাহারা অতি বিরুদ্ধভাবে দৃঢ়-বাহুতে খড়্গোত্তলন করিয়া অবস্থান করিত, এই উভয়েই অচিরকাল মধ্যে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া সংসার যাতনা হইতে মুক্তিলাভ করে; অর্থাৎ খড়্গাধারিগণ সচিবকর্ত্তৃক নিপাতিত এবং শরণাপন্ন ব্যক্তিবর্গ নির্ভয়ে পরিরক্ষিত হইয়া সংসার-ক্লেশ হইতে বিমুক্ত হইত। ১৩

বিন্ধ্যাচলের অন্তর্বর্ত্তিনী ভীমানদীতীরস্থ উপবন হইতে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত তুষ্মান পৃথ্বীপতির যাবতীয় সাম্রাজ্য ভয় চকিতচিত্তে সর্ব্বদা যেন দিঙ্মণ্ডলকে ঐ বিষ্ণু ঐ বিষ্ণু বলিয়া একরূপভাবে অনুভব করিত যে, বৈখানসগণ যাবজ্জীবন কঠোর পরিশ্রম করিয়াও জগৎকে সেরূপ বিষ্ণুময় বলিয়া বোধ করিতে পারেন নাই। ১৪

যবনসমরে অস্ত্রসঞ্চালনদ্বারা অসংখ্য সৈন্যসংঘের বিধ্বংসকারী সেনাপতি বিষ্ণুর বীরপণার বিষয় আর অধিক কি বলিব, তাঁহার বীরব্রত সন্দর্শনার্থ স্বয়ং দেবগণ অনিদ্রাবস্থায় নির্নিমেষলোচনে শূন্যমার্গে অবস্থানপূর্ব্বক মহা উৎসব করিতেন। ১৫

যেখানে সহস্রসহস্র গজবাজী স্ফূর্ত্তির সহিত বিচরণ করে, পথিমধ্যে চারিদিকে প্রফুল্ল পুণ্ডরীকদল দিগ্‌দেশ অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান থাকে। কুলাচলপর্ব্বতসমূহের সেই সকল সানুপ্রদেশোপরি পরিভ্রমণপূর্ব্বক উৎকলপতির সাম্রাজ্যলক্ষ্মীকে হস্তগত করা কাহারও কার্য্য নহে। ১৩

ভূপৃষ্ঠ, অম্বর-প্রদেশ, স্বর্গসৌধ, এমন কি ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন স্থানেই তাঁহার চরণ বিচরণ

করে, তত্তৎস্থানই আমোদিত হয়। পরিত্যক্ত অর্থাৎ যেখান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন অথবা যেখানে বর্ত্তমানে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহার প্রত্যেক স্থানেই তদীয় যশোরাশি স্বচ্ছন্দভাবে নির্ব্বিঘ্নে বিরাজ করিতেছে। ১৭

তদীয় যশোরাশিদ্বারা জগতের যাবতীয় বস্তু এরূপভাবে শুভ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, স্বয়ং মহাদেব শিরোভূষণার্থ গঙ্গাভ্রমে যমুনাকে মস্তকে ধারণ করিলেন, এইরূপ বিভ্রমবতী সুভ্রু রমণীগণ কর্ণভূষার্থ শ্বেতোৎপল ভ্রমে নীলোৎপল ধারণ এবং ভৃঙ্গবর শতদল ভ্রমে মল্লিকা-ক্রোড়ে উপস্থিত হইয়া গুঞ্জন করিতে লাগিল। ১৮

ইনি পুরুষোত্তমের প্রিয় স্থান সমুদ্রোপকূলে তুলাপুরুষদানার্থ এরূপ কতিপয় সুবর্ণ পর্ব্বত নির্ম্মাণ করেন যে, তাহাতে শত বিলাসভবন সঙ্কলনকারী ইন্দ্রের শচীবদনকমলে তরলীকৃত লোচনাবলীরও চাঞ্চল্য ঘটে অর্থাৎ ঐ সকল সুবর্ণপর্ব্বতগুলি এতই সৌন্দর্য্যশালী ছিল যে, স্বয়ং ইন্দ্র অমরাবতীর অতুল সৌষ্ঠব, এমন কি শচীর মুখারবিন্দ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া উহাদের উপর দৃষ্টিপাতে সাতিশয় ব্যগ্র হন। ১৯

তিনি পথ প্রস্তুত করিয়া তাহার ইতস্ততঃ অনেকগুলি সরোবর খনন করেন; সমুদ্র-তীরবর্ত্তী বায়ু ঐ সরোবরের ঊর্ম্মিমালা এবং তত্রত্য কুমুদকহ্লার সংস্পর্শে শৈত্যসুগন্ধযুক্ত হইয়া মন্দ মন্দ ভাবে নিয়ত পথিকদিগের অনুবর্ত্তী হয়। ২০

তর্কের কুটিলতা যাঁহার উপর কটাক্ষপাত করে, বেদ যাঁহার বদনকমল পরিচুম্বন করে, শ্রুতি যাঁহার হৃদয়ে স্বাধীনভাবে বিহার করে এবং দণ্ডনীতি যাঁহাকে নির্ভর আলিঙ্গন করে, (অর্থাৎ তর্ক বেদ, শ্রুতি ও ব্যবহারশাস্ত্রে যাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল)। ২১

উদ্ধতস্বভাববশতঃ যাহারা বিপথগামী হইয়া স্খলিতপদ হয়, তাহাদিগকে যিনি এরূপভাবে শাস্ত্রপথে আনয়ন করেন যে, তাহারা যেন জীর্ণ অবস্থা হইতে নূতনভাবে পরিণত হইয়া অবশেষে প্রতিপত্তিসম্পদ পর্য্যন্তেরও অধিকারী হয়।২২

তিনি এরূপ একটী অত্যুচ্চ শিবমন্দির নির্ম্মাণ করেন যে, তাহাতে সুবর্ণকলস, স্ফটিক-নির্ম্মিত পূর্ণকুম্ভ এবং শ্বেতধ্বজা প্রদানের আবশ্যক ছিল না, কেন না স্বয়ং সূর্য্য, চন্দ্র ও বিয়দ্গঙ্গা ইঁহারা তিন জনে যথাক্রমে ঐ তিনটী পদার্থের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ২৩

প্রধান প্রধান ধরণীধরগণ যাবৎকালপর্য্যন্ত (সমুদ্র জল হইতে) ত্রিভুবনের শান্তিরক্ষার জন্য সেতু বা বাঁধের ন্যায় অবস্থান করিবে অর্থাৎ যতদিন না স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল একার্ণবী কৃত হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত উক্ত মন্দির এই সংসারে নির্ম্মাণকারীর উদধিফেনপুঞ্জসন্নিভ যশোবিস্তার ও প্রশংসাবাদ রক্ষা করিবে।২৪

চতুর্দ্দশ ভুবন যাঁহার যশের পরিমাণ করিতে পারে না, যাঁহার বুদ্ধি চতুর্দ্দশ বিদ্যাতেও তৃপ্তি লাভ করে না, যাঁহার উপদেশপূর্ণ সুললিত বাক্যাবলী চতুর্দ্দশ মন্বন্তর পর্য্যন্তও অম্লান-ভাবে অবস্থিত, সেই কবি ভাস্করই এই প্রশস্তির রচয়িতা।২৫

রাশি-বৃক্ষ

দর্শকের	বাঁ দিক্	বাঁ হাত	বাঁ পাশ	বাঁ কাঁধ	ডা'ন কাঁধ	ডা'ন পাশ	ডা'ন হাত	ডা'ন দিক্
ফল আট	ক+চ+ছ+জ	ক+চ+ছ−জ	ক+চ−ছ+জ	ক+চ−ছ−জ	ক−চ+ছ+জ	ক−চ+ −জ	ক−চ−ছ+জ	ক—চ—ছ—জ
প্রশাখা চার	ক+চ+ছ		ক+চ—ছ		ক—চ+ছ		ক—চ—ছ	
শাখা দুই	ক+চ				ক—চ			
বীজ এক	ক							

বিশেষ দ্রষ্টব্য

রাশিবৃক্ষের কোনও দুটা ফল যেন সমান না হয়। এরূপ যেন না হয় যে,

চ=ছ+জ, ছ=চ+জ, কিম্বা জ=চ+ছ। কেননা চ=ছ+জ হ'লে ফলে দাঁড়া'বে এই যে,

$$\begin{aligned} চ-ছ &= জ \\ -জ &= -চ+ছ \\ \hline \text{সমষ্টি}=চ-ছ-জ &= -চ+ছ+জ \end{aligned}$$

অতএব ক+চ−ছ−জ=ক−চ+ছ+জ, কিনা বাঁ কাঁধ=ডা'ন কাঁধ [রাশিবৃক্ষ দেখ]

আবার ছ=চ+জ হ'লে ফলে দাঁড়াবে এই যে,

$$\begin{aligned} চ-ছ &= -জ \\ জ &= -চ+ছ \\ \hline \text{সমষ্টি}=চ-ছ+জ &= -চ+ছ-জ \end{aligned}$$

অতএব ক+চ−ছ+জ=ক−চ+ছ−জ কি না বাঁ পাশ=ডা'ন পাশ [রাশিবৃক্ষ দেখ]

তেমি আবার, জ=চ+ছ হ'লে, ফলে দাঁড়া'বে এই যে,

$$\begin{aligned} চ+ছ &= জ \\ -জ &= -চ-ছ \\ \text{সমষ্টি}=চ+ছ-জ &= -চ-ছ+জ \end{aligned}$$

অতএব ক+চ+ছ−জ=ক−চ−ছ+জ কি না বাঁ হাত=ডা'ন হাত [রাশিবৃক্ষ দেখ]

এই জন্য বলিতেছি যে, চ ছ এবং জ এ তিনটির কোনওটি যেন অপর দুইটির সমষ্টি না হয়,—এটা দেখা চাই সকলের আগে। গোড়া'র তিনটি সংখ্যা ১, ২, ৩ যদি যথাক্রমে চ-ছ-জ'র স্থলাভিষিক্ত হইতে পারিত, তবে খুবই ভাল হইত; কিন্তু তাহা হইতে পারিতেছে না শুদ্ধ কেবল এই জন্য, যেহেতু চ=১, ছ=২, জ=৩ হইলে ফলে দাঁড়ায় জ=চ+ছ, আর, জ=চ+ছ হইলে (যেমন এইমাত্র দেখা গেল) ফলে দাঁড়ায় ক+চ+ছ−জ=ক−চ−ছ+জ কিনা বাঁ হাত=ডা'ন হাত। অতএব যথাসম্ভব নিম্নতম তিনটি অঙ্ককে যদি যথাক্রমে চ-ছ-জ'র স্থলাভিষিক্ত করিতে হয়, তবে ১-২-৩ কে ছাড়িয়া দিয়া ২-৩-৪ কেই তাহা করা কর্ত্তব্য। তাহাই করা হইল; চ-কে করা হইল=২, ছ-কে করা হইল=৩, জ-কে করা হইল=৪; আর, তাহাতে ফল দাঁড়াইল এইরূপ:—

$$\begin{aligned} ক+চ+ছ+জ &= ক+৯ \\ ক+চ+ছ-জ &= ক+১ \\ ক+চ-ছ+জ &= ক+৩ \\ ক+চ-ছ-জ &= ক-৫ \end{aligned}$$

ক − চ + ছ + জ = ক + ৫

ক − চ + ছ − জ = ক − ৩

ক − চ − ছ + জ = ক − ১

ক − চ − ছ − জ = ক − ৯　　এমতে পাইলাম

ফলাষ্টক

(১) প্রান্তখণ্ড　　মধ্য খণ্ড　　(২) প্রান্তখণ্ড

ক + ৯　ক + ১　ক + ৩　ক − ৫　ক + ৫　ক − ৩　ক − ১　ক − ৯

ফলাষ্টকের মাঝের খণ্ডটাকে অপর দুই খণ্ড হইতে বিযুক্ত করিয়া লইয়া পাইলাম

(১) মাঝের চতুর্ব্বর্গ

ক + ৩	ক − ৫	ক + ৫	ক − ৩

আর উহার দুই প্রান্তের দুই ভগ্নখণ্ড একত্র জোড়া দিয়া পাইলাম

(২) প্রান্তের চতুর্ব্বর্গ

ক + ৯	ক + ১	ক − ১	ক − ৯

এই প্রান্তের চতুর্ব্বর্গটার উপাধি দেওয়া হইল, এ-বর্গ।
মাঝের চতুর্ব্বর্গটার উপাধি দেওয়া হইল, ও-বর্গ।
উভয়-সম্বলিত ফলাষ্টকের উপাধি দেওয়া হইল, জোড়াবর্গ।
জোড়াবর্গের অন্তর্ভুক্ত আটটি ফলের নাম দেওয়া হইল, বর্গীয়ফল।
এ বর্গের অন্তর্নিহিত ফল-চারিটার নাম দেওয়া হইল, এ-বর্গীয় ফল।
ও বর্গের অন্তর্ভুক্ত ফল-চারিটার নাম দেওয়া হইল, ও-বর্গীয় ফল।

ষোলোঘরিআ চৌকোণ ভবনের ঘর-পূরণ।

এ বর্গীয় চারিটা ফলের ধাপ সাজাইয়া ষোলোঘরিয়া ভবনে একটা নিম্নমুখী সোপান

গাঁথিয়া তোলা হইল; তথৈব ও বর্গীয় চারিটা ফলের ধাপ সাজাইয়া ঐ ভবনে একটা ঊর্দ্ধমুখী সোপান গাঁথিয়া তোলা হইল। পূর্ব্বেরটা অর্থাৎ নিম্নমুখীটা নীচে নামিবার সোপান; শেষেরটা অর্থাৎ ঊর্দ্ধমুখীটা উপরে উঠিবার সোপান। ক্ষেত্র দেখ :—

নিম্নমুখী সোপান			
ক+৯			
	ক+১		
		ক−১	
			ক−৯

ঊর্দ্ধমুখী সোপান			
			ক−৩
		ক+৫	
	ক−৫		
ক+৩			

এই দুই সোপানশ্রেণী নাভিস্থলে পরস্পর কাটাকাটি করিয়া, ডাহিনে বামে হাত পা ছট্‌কাইয়া, ষোলোঘরিআ ভবনের চারিকোণ জুড়িয়া বিরাজমান হওয়াতে, ষোলোঘরিআ ভবনের শ্রী হইল এইরূপ :—

ক+৯			ক−৩
	ক+১	ক+৫	
	ক−৫	ক−১	
ক+৩			ক−৯

চাহিয়া দেখ ঐ জোড়া-সোপানের প্রত্যেক দুটা'র চারি-চারিটা ধাপ দুই দুই জোড়া-ফলে পরিগঠিত। নিম্নমুখী সোপানের চারিটা ধাপ—ক±৯, ক±১ এই দুই এ-বর্গীয় জোড়াফলে পরিগঠিত; ঊর্দ্ধমুখী সোপানের চারিটা ধাপ—ক±৩, ক±৫ এই দুই ওবর্গীয় জোড়া-ফলে পরিগঠিত।

ঐ জোড়া-ফলগুলার প্রত্যেক চারিটার অন্তর্ভুক্ত দুই দুইটা বর্গীয় ফল উভয়ে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। "প্রতিদ্বন্দ্বী" বলিতেছি এই জন্য, যেহেতু উহাদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ ঘটিবামাত্র উভয়েরই ক্রোড়স্থিত অঙ্ক তৎক্ষণাৎ তোপে উড়িয়া যায়। তা'র সাক্ষী :—

ক+৯	ক+১	ক+৩	ক+৫
ক−৯	ক−১	ক−৩	ক−৫
২ক+০	২ক+০	২ক+০	২ক+০

দ্বন্দ্বীপ্রতিদ্বন্দ্বী'র একত্র-সমাগমের ফল কি হইল—দেখিলে? ক্রোড়ের অঙ্কগুলির শূন্যে পর্য্যবসান!

এটাতো জান' যে, একটা চুম্বক-শলাকা'র দুইমুড়া, ট ঠ, তথৈব, দুই মধ্য-খণ্ড, ড ঢ,

{ ট। ড। ঢ। ঠ }

উভয়ে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী? এটাও তেমি জানা চাই যে, এ-বর্গেরই বা কি, আর ও-বর্গেরই বা কি, কি-দুটা বর্গের দুই মুড়ার দুই ফল, তথৈব, দুই মধ্যখণ্ডের দুই ফল উভয়ে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। তার সাক্ষী, এ-বর্গের দুই মুড়ার ক+৯, ক−৯ এ দুটা ফলও যেমন, আর ও-বর্গের দুই মুড়া'র ক+৩, ক−৩ এ দুটা ফলও তেমি. উভয়ে

এ বর্গ

ক+৯	ক+১	ক−১	ক−৯

ও বর্গ

ক+৩	ক−৫	ক+৫	ক−৩

পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। তেমি আবার, এ-বর্গের দুই মধ্যখণ্ডের ক+১, ক−১ এ দুটা ফলও যেমন, আর ও-বর্গের দুই মধ্যখণ্ডের ক−৫, ক+৫ এ দুটাও তেমি, উভয়ে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। ক্ষেত্র দেখ :—

এ-বর্গীয়		ও-বর্গীয়	
দ্বন্দ্বী	প্রতিদ্বন্দ্বী	দ্বন্দ্বী	প্রতিদ্বন্দ্বী
ক+৯	ক−৯	ক+৩	ক−৩
ক−৯	ক+৯	ক−৩	ক+৩
ক+১	ক−১	ক−৫	ক+৫
ক−১	ক+১	ক+৫	ক−৫

এ-বর্গীয় দ্বন্দ্বী চারিটার প্রতিদ্বন্দ্বী চারিটাতে ধ যোগ করিয়া ঐ ঐ দ্বন্দ্বীর ধ-যুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম দেওয়া গেল ধনান্বিত প্রতিদ্বন্দ্বী; আর ও-বর্গীয় দ্বন্দ্বী-চারিটার প্রতিদ্বন্দ্বী চারিটা হইতে ধ খসাইয়া ঐ ঐ দ্বন্দ্বীর ধ ভ্রষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম দেওয়া গেল ধনহীন প্রতিদ্বন্দ্বী। ক্ষেত্র দেখ :—

এ-বর্গীয়		ও-বর্গীয়	
দ্বন্দ্বী	ধনান্বিত প্রতিদ্বন্দ্বী	দ্বন্দ্বী	ধনহীন প্রতিদ্বন্দ্বী
ক+৯	ক−৯+ধ	ক+৩	ক−৩−ধ
ক+১	ক−১+ধ	ক−৫	ক+৫−ধ
ক−১	ক+১+ধ	ক+৫	ক−৫−ধ
ক−৯	ক+৯+ধ	ক−৩	ক+৩−ধ

অতঃপর, ষোলোঘরিআ ভবনের নিম্নমুখী সোপানাশ্রিত এ-বর্গীয় দ্বন্দ্বীগুলার প্রত্যেক চারিটার ধনান্বিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে, তথৈব, ঊর্দ্ধমুখী সোপানাশ্রিত ও-বর্গীয় দ্বন্দ্বীগুলার প্রত্যেক চারিটার ধনহীন প্রতিদ্বন্দ্বীকে, ঐ ঐ দ্বন্দ্বীর অব্যবহিত উপরের বা নীচের খালিঘরে ভর্ত্তি করা হইল। অর্থাৎ ক+৯, ক+১, ক−১, ক−৯ এই চারিটা এ-বর্গীয় দ্বন্দ্বীর, ক−৯+ধ, ক−১+ধ, ক+১ +ধ, ক+৯+ধ, এই চারিটা ধনান্বিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে দ্বন্দ্বী-চারিটা'র অব্যবহিত উপরের বা নীচের খালি ঘরে যথাক্রমে ভর্ত্তি করা হইল। তেমি আবার, আর এক দ্বার দিয়া, ক+৩, ক−৫, ক+৫, ক−৩, এই চারিটা ও-বর্গীয় দ্বন্দ্বীর, ক−৩−ধ, ক+৫−ধ, ক−৫−ধ, ক+৩−ধ, এই চারিটা ধনহীন প্রতিদ্বন্দ্বীকে দ্বন্দ্বী-চারিটার অব্যবহিত উপরের বা নীচের খালি ঘরে যথাক্রমে ভর্ত্তি করা হইল। ক্ষেত্র দেখ—

(১)

এ-বর্গীয় দ্বন্দ্বী-চারিটার উপর-নীচের খালি ঘরে ধনান্বিত প্রতিদ্বন্দ্বী চারিটা'কে বন্দি-করণ।

ক+৯	ক−১+ধ		ক−৩
ক−৯+ধ	ক+১	ক+৫	
	ক−৫	ক−১	ক+৯+ধ
ক+৩		ক+১+ধ	ক−৯

(২)

ও-বর্গীয় দ্বন্দ্বী-চারিটার উপর-নীচের খালি ঘরে ধনহীন প্রতিদ্বন্দ্বী চারিটাকে বন্দি-করণ।

ক + ৯		ক − ৫ − ধ	ক − ৩
	ক + ১	ক + ৫	ক + ৩ − ধ
ক − ৩ − ধ	ক − ৫	ক − ১	
ক + ৩	ক + ৫ − ধ		ক − ৯

ষোলোঘরিআ ভবনের ঘরপূরণ-কার্য্য হইয়া চুকিল কেমন দেখ নির্ব্বিবাদে। ক্ষেত্র দেখ—

ষোলোঘরিআর জম্‌জমাট্ অবস্থা।

ক + ৯	ক − ১ + ধ	ক − ৫ − ধ	ক − ৩
ক − ৯ + ধ	ক + ১	ক + ৫	ক + ৩ − ধ
ক − ৩ − ধ	ক − ৫	ক − ১	ক + ৯ + ধ
ক + ৩	ক + ৫ − ধ	ক + ১ + ধ	ক − ৯

একটি কার্য্য কেবল বাকি; কাম-ধেনুটিকে (অর্থাৎ ধ ধেনুকে) দোহন করিয়া রত্নভাণ্ডার পূরণ করিতে হইবে—সেইটি কেবল বাকি। করা হইল তাহা এইরূপে সুনিষ্পন্ন।

প্রথমে পাওয়া হইয়াছিল আটটি মাত্র ফল

ক + ৯	ক + ১	ক + ৩	ক − ৫	ক + ৫	ক − ৩	ক − ১	ক − ৯

এই আটটি ফল।

তাহার পরে ঐ আটটি ফলের বীজ হইতে ফলাইয়া তোলা হইল নূতন আর আটটি ফল

ক ± ৯ + ধ	ক ± ১ + ধ	ক ± ৩ − ধ	ক ± ৫ − ধ

এই আটটি ফল।

পূর্ব্বার্জ্জিত এবং নবার্জ্জিত এই উভয়বিধ ফলাষ্টক একত্র সং৫ করিয়া পাইলাম সবিস্তরে এইরূপ :—

পূর্ব্বার্জ্জিত ফলাষ্টক	নবার্জ্জিত ফলাষ্টক
ক+৯	ক−৯+ধ
ক+১	ক−১+ধ
ক+৩	ক−৩−ধ
ক−৫	ক+৫−ধ
ক+৫	ক−৫−ধ
ক−৩	ক+৩−ধ
ক−১	ক+১+ধ
ক−৯	ক+৯+ধ

এবং সংক্ষেপে পাইলাম এইরূপ :—

পূর্ব্বার্জ্জিত জোড়াফল	নবার্জ্জিত জোড়াফল
ক±৯	ক∓৯+ধ
ক±১	ক∓১+ধ
ক±৩	ক∓৩−ধ
ক∓৫	ক±৫−ধ

এখন দেখিতে হইবে দুইটি বিষয়। প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, কোনও নবার্জ্জিত ফল যেন কোনও পূর্ব্বার্জ্জিত ফলের সহিত সমান না হয়। দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, কোনও নবার্জ্জিত ফল যেন দোসরা কোনও নবার্জ্জিত ফলের সহিত সমান না হয়। অর্থাৎ এরূপ যেন না হয় যে,

(১) কোনও নবার্জ্জিত ফল=কোনও বর্গীয় ফল।

ক−৯+ধ=ক+৯ অতএব ধ=১৮

ক−১+ধ=ক+১ অতএব ধ=২

ক+৩−ধ=ক−৩ অতএব ধ=৬

ক+৫−ধ=ক−৫ অতএব ধ=১০

ক−৯+ধ=ক±১ অতএব ধ=১০ বা ৮

ক±৩−ধ=ক−৫ অতএব ধ=৮ বা ২

ক−৯+ধ=ক±৩ অতএব ধ=১২ বা ৬

ক−৯+ধ=ক±৫ অতএব ধ=১৪ বা ৪

ক±১+ধ=ক+৩ অতএব ধ=২ বা ৪

ক±১+ধ=ক+৫ অতএব ধ=৪ বা ৬

অথবা

(২) কোনও নবার্জ্জিত ফল=দোস্‌রা কোনও নবার্জ্জিত ফল।

ক−৯+ধ=ক±৩−ধ অতএব

$$\text{ধ} = \frac{\text{১২ বা ৬}}{\text{[illegible]}} = \text{৬ বা ৩}$$

ক−৯+ধ=ক±৫−ধ অতএব

$$\text{ধ} = \frac{\text{১৪ বা ৪}}{\text{২}} = \text{৭ বা ২}$$

ক±১+ধ=ক+৩−ধ অতএব

$$\text{ধ} = \frac{\text{২ বা ৪}}{\text{২}} = \text{১ বা ২}$$

ক±১+ধ=ক−৫−ধ অতএব

$$\text{ধ} = \frac{\text{৪ বা ৬}}{\text{২}} = \text{২ বা ৩}$$

এইরূপে পাইতেছি যে, ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৮ এই 'অঙ্কগুলিকেই কেবল ধ-স্থানে বসিতে বারণ, তদ্ভিন্ন আর কাহাকেও নহে। তবেই হইতেছে যে ধ-স্থানে বসিবার যোগ্য নিম্নতম অঙ্ক=৫। অতএব ৫-কেই ধ-এর স্থলাভিষিক্ত করা কর্ত্তব্য। কাজেকাজেই তাহা করা হইবে। কামধেনু দোহন করিয়া ফললাভ করিলাম যথেষ্ট! কি? না ৫ অর্থাৎ পঞ্চগব্য! যাহাই হোক্—আর ভয় নাই—কূলে আসিয়াছি! এখন পাত-তাড়ি গুটিয়ে

ডাঙায় উঠি বেলাবেলি,
ক্ষেত্র দেখ নেত্র মেলি!

পূর্ব্বে পাইয়াছি।			
ক+৯	ক−১+ধ	ক−৫−ধ	ক−৩
ক−৯+ধ	ক+১	ক+৫	ক+৩−ধ
ক−৩−ধ	ক−৫	ক−১	ক+৯+ধ
ক+৩	ক+৫−ধ	ক+১+ধ	ক−৯

এক্ষণে ধ স্থানে ৫ বসাইয়া পাইলাম।			
ক+৯	ক+৪	ক−১০	ক−৩
ক−৪	ক+১	ক+৫	ক−২
ক−৮	ক−৫	ক−১	ক+১৪
ক+৩	ক	ক+৬	ক−৯

ভরা আদর্শ-ক্ষেত্র।				
ক+৯	ক+৪	ক−১০	ক−৩	(৪ক)
ক−৪	ক+১	ক+৫	ক−২	(৪ক)
ক−৮	ক−৫	ক−১	ক+১৪	(৪ক)
ক+৩	ক	ক+৬	ক−৯	(৪ক)
(৪ক)	(৪ক)	(৪ক)	(৪ক)	৪ক

৪৪ পূরণ।			
২০	১৫	১	৮
৭	১২	১৬	৯
৩	৬	১০	২৫
১৪	ক = ১১	১৭	২

ক'কে যদি ধরা যায় = ১২ তবে ইষ্টলাভ হ'বে ৪৮
ঐ ১৩ ঐ ৫২
ঐ ১৪ ঐ ৫৬
ঐ ১৫ ঐ ৬০ ইত্যাদি।

আদর্শ ক্ষেত্রের প্রথম পংক্তির তৃতীয় ঘরটার প্রতি একবার ঠাহর করিয়া দেখিয়াছ কি ? ঐ উপরের ঘরটিতে যখনই আমি ক – ১০কে ঢুকিতে দেখিলাম, তখনই বুঝিলাম যে, ক যে ১১ রো'র নীচে নাবিবে তাহার পথ অবরুদ্ধ, আর সেই গতিকে পূরিতব্য সংখ্যা যে ৪৪এর নীচে নাবিবে তাহারও পথ অবরুদ্ধ—যেহেতু ৪৪ = ১১ × ৪।

৩২শের পূরণ পঞ্জিকায় যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার দৈবগুণের যতই চামৎকার্য্য হউক্ না কেন—সবগুণ মাটি হইয়াছে একটি দোষে—পুনরাবৃত্তি-দোষে! সত্য কি মিথ্যা—ক্ষেত্র দেখ :—

১	*৮	৯	১৪
১১	১২	৩	৬
৭	২	১৫	*৮
১৩	১০	৫	৪

৮ (ঐ দেখ) একবার বসিয়াছে প্রথম পংক্তির দ্বিতীয় ঘরে, পুনর্ব্বার বসিয়াছে তৃতীয় পংক্তির চতুর্থ ঘরে। এ রকমের অর্দ্ধপকগোচের ৩২-পূরণ, আরো গোটা-দুই তোমাকে দিতে পারি :—এই লও একটি

১৩	৮	*১০	১
০	৫	৯	১৮
৪	৭	১১	*১০
১৫	.১২	২	৩

এই লও আর একটি (এটা আর এককাটি সরেস)

১২	৪	*৯	৫
২	৬	*৯	১৫
৫	৭	†১০	†১০
১৩	১১	১২	৪

প্রকৃত কথাটা তবে বলি:—তাহা এই যে, ৪৪শের নীচের সংখ্যা যদি পূরণ করিতে হয় তবে অন্য কোন রকমের নূতন একটা প্রণালী খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক;—বর্ত্তমান প্রণালীতে তাহা কোন ক্রমেই সংঘটনীয় নহে।

৪৪ এবং ৪৪শের উপরে চতুর্ভাজ্য সংখ্যা যত আছে, তাহারই পূরণের প্রকরণ-পদ্ধতি উপরে প্রদর্শিত হইল। কিন্তু ৪৪শের উপরের কোনও জোড়সংখ্যা যদি চতুর্ভাজ্য (অর্থাৎ divisible by four) না হয়, তবে তাহার পূরণ-প্রণালী স্বতন্ত্র। তাহা কিরূপ তাহা যদি দেখিতে চাও তবে প্রণিধান কর:—

রাশিবৃন্দের চ'কে ধরা হইল = ½
ছ'কে ঐ ১
জ'কে ঐ ২

(এস্থলে, ধার্য্যীকৃত তিনটি সংখ্যার কোনোটি যে, অপর দুইটির সমষ্টি নহে—এটার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে ভুলিও না)। এমতে পাইতেছি

ক+চ+ছ+জ=ক+৩॥০
ক+চ+ছ−জ=ক−॥০
ক+চ−ছ+জ=ক+১॥০
ক+চ−ছ−জ=ক−২॥০
ক−চ+ছ+জ=ক+২॥০
ক−চ+ছ+জ=ক−১॥০

ক−চ−ছ+জ=ক+॥০

ক−চ−ছ−ঝ=ক−৩॥০

এমতে পাইলাম :—

	চারি জোড়া বর্গীয় ফল।	চারি জোড়া নবার্জ্জিত ফল।
এ-বর্গীয়	ক±৩॥০	ক∓৩॥০+ধ
	ক∓॥০	ক±॥০+ধ
ও-বর্গীয়	ক±১॥০	ক∓১॥০−ধ
	ক∓২॥০	ক±২॥০−ধ

এই ফলগুলি দিয়া যথাবিহিত প্রণালীতে ষোলোঘরিআ ভবনের ঘর সাজাইয়া পাইলাম—

ক+৩॥০	ক+॥০+ধ	ক−২॥০−ধ	ক−১॥০
ক−৩॥০+ধ	ক−॥০	ক+২॥০	ক+১॥০−ধ
ক−১॥০−ধ	ক−২॥০	ক+॥০	ক+৩॥০+ধ
ক+১॥০	ক+২॥০−ধ	ক−॥০+ধ	ক−৩॥০

অতঃপর ধ-এর মূল্য নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। করা হইল তাহা এইরূপে :-

পূর্ব্বপ্রদর্শিত বিধানমতে দেখা চাই এইটী যে, এরূপ যেন না হয় যে,

(১)

ক−৩॥০+ধ=ক+৩॥০ অতএব ধ=৭

ক−॥০+ধ=ক+॥০ " ধ=১

ক+১॥০−ধ=ক−১॥০ " ধ=৩

ক+২॥০−ধ=ক−২॥০ " ধ=৫

ক−৩॥০+ধ=ক±॥০ " ধ=৪ বা ৩

ক±১॥০−ধ=ক−২॥০ " ধ=৪ বা ১

ক−৩॥০+ধ=ক±১॥০ " ধ=৫ বা ২

ক−৩॥০+ধ=ক±২॥০ " ধ=৬ বা ১

ক∓৷৷০+ধ=ক+১৷৷০ অতএব ধ=২ বা ১

ক±৷৷০+ধ=ক+২৷৷০ " ধ=৩ বা ১

অথবা

(২)

ক−৩৷৷০+ধ=ক±১৷৷০−ধ অতএব ধ=১ বা ২৷৷০

ক−৩৷৷০+ধ=ক±২৷৷০−ধ " ধ=৩ বা ৷৷০

ক±৷৷০+ধ=ক+১৷৷০−ধ " ধ=১ বা ৷৷০

ক±৷৷০+ধ=ক+২৷৷০−ধ " ধ=১ বা ১৷৷০

এমতে পাইতেছি যে, গোটা সংখ্যার মধ্যে ১,২,৩,৪,৫,৬,৭ এই গুলিকেই কেবল ধস্থানে বসিতে বারণ, তা বই, আর কোনোটিকে নহে। তবেই হইতেছে যে, ধ-স্থানে বসিবার যোগ্য নিম্নতম অঙ্ক=৮। অতএব ৮ কেই ধ'য়ের স্থলাভিষিক্ত করা কর্ত্তব্য। তাহাই করা হইল; আর, তা ছাড়া ক'কে ধরা হইল=খ ৷৷০।

পূর্ব্বে পাইয়াছি

ক+৩৷৷০	ক+৷৷০+ধ	ক−২৷৷০−ধ	
ক−৩৷৷০+ধ	ক−৷৷০	ক+২৷৷০	ক+১৷৷০−ধ
ক−১৷৷০−ধ	ক−২৷৷০	ক+৷৷০	ক+৩৷৷০+ধ
	ক+২৷৷০−ধ	ক−৷৷০+ধ	ক−৩৷৷০

এক্ষণে খ ৷৷০ কে ক'এর এবং ৫ কে ধ'এর স্থলাভিষিক্ত করিয়া পাইলাম,

আদর্শ-ক্ষেত্র।			
খ+৪	খ+৯	খ−১০	খ−১
খ+৫	খ	খ+৩	খ−৬
খ−৯	খ−২	খ+১	খ+১২
খ+২	খ−৫	খ+৮	খ−৩

৪৬ পূরণ।			
১৫	২০	১	১০
১৬	খ=১১	১৪	৫
২	৯	১২	২৩
১৩	৬	১৯	৮

খ'কে যদি ধরা যায়=১২ তবে ইষ্টলাভ হবে ৫০
ঐ ১৩ ঐ ৫৪
ঐ ১৪ ঐ ৫৮
ঐ ১৫ ঐ ৬২ ইত্যাদি

এতক্ষণের সাধ্যসাধনার পর দিব্য দুইখণ্ড আদর্শক্ষেত্র আমাদের হস্তগত হইল। দুয়েরই এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত, এপাশ হইতে ওপাশ পর্য্যন্ত, তথৈব, প্রত্যেক দুপাশের একোণ হইতে ওকোণ পর্য্যন্ত সদ্যপ্রসূত শস্যরাজির পংক্তি সাজানো রহিয়াছে দেখিবে মোট পরিমাণের একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া প্রথম ক্ষেত্রটির বপনীয় বীজ ক এবং উৎপাদনীয় ফল ৪ক; আর, সেইজন্য তাহার নাম দেওয়া হইল ক-ক্ষেত্র; তথৈব তাহার উৎপাদ্য ফলের নাম দেওয়া হইল ক-ফল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটির বপনীয় বীজ খ এবং উৎপাদনীয় ফল ৪খ+২, আর, সেই জন্য তাহার নাম দেওয়া হইল খ-ক্ষেত্র, তথৈব, তাহার উৎপাদ্য ফলের নাম দেওয়া হইল খ-ফল। চাহিয়া দেখ:—

ক-ক্ষেত্র।				(৪ক)
ক+৯	ক+৪	ক−১০	ক−৩	(৪ক)
ক−৪	ক+১	ক+৫	ক−২	(৪ক)
ক−৮	ক−৫	ক−১	ক+১৪	(৪ক)
ক+৩	ক	ক+৬	ক−৯	(৪ক)
(৪ক)	(৪ক)	(৪ক)	(৪ক)	(৪ক)

খ-ক্ষেত্র।				(৪খ+২)
খ+৪	খ+৯	খ−১০	খ−১	(৪খ+২)
খ+৫	খ	খ+৩	খ−৬	(৪খ+২)
খ−৯	খ−২	খ+১	খ+১২	(৪খ+২)
খ+২	খ−৫	খ+৮	খ−৩	(৪খ+২)
(৪খ+২)	(৪খ+২)	(৪খ+২)	(৪খ+২)	(৪খ+২)

এখন দেখিতে হইবে এই যে, ফল হইতে বীজ-নিষ্কাশনের প্রকরণ-পদ্ধতি দুই ক্ষেত্রে দুইরূপ; ক-ক্ষেত্রে, $\frac{\text{ক-ফল}}{৪}$ = ক-বীজ; খ-ক্ষেত্রে, $\frac{\text{খ-ফল} - ২}{৪}$ = খ-বীজ। ইহার দুইটী দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি প্রণিধান করা হো'ক্।

প্রথম উদাহরণ।

৬০ এবং ৭৮ এই দুটা ফল যদি উৎপাদন করিতে হয়, তবে ঐ দুই ফলের বীজ সংগ্রহ করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। ৬০ যেহেতু চতুর্ভাজ্য, এইজন্য উহা ক-ক্ষেত্রে উৎপাদনীয়; আর ৭৮ যেহেতু চতুর্ভাজ্য নহে, এইজন্য ইহা খ-ক্ষেত্রে উৎপাদনীয়। দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে,

$$\frac{৬০}{৪} = ১৫ \quad \text{অতএব ক-বীজ} = ১৫।$$

এটাও তেম্নি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে,

$$\frac{৭৮ - ২}{৪} = ১৯ \quad \text{অতএব খ-বীজ} = ১৯।$$

এমতে, ক-ক্ষেত্রে ১৫, এবং খ-ক্ষেত্রে ১৯, দুই ক্ষেত্রে এই দুই বীজের চাস করিলেই পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রে ৬০ এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে ৭৮, এই দুই ফল যথাক্রমে উৎপন্ন হইবে। চাহিয়া দেখ:—

ক-ক্ষেত্র।				৬০ পূরণ।			
ক+৯	ক+৪	ক−১০	ক−৩	২৪	১৯	৫	১২
ক−৪	ক+১	ক+৫	ক−২	১১	১৬	২০	১৩
ক−৮	ক−৫	ক−১	ক+১৪	৭	১০	১৪	২৯
ক+৩	ক	ক+৬	ক−৯	১৮	ক=১৫	২১	৬

খ-ক্ষেত্র।				৭৮ পূরণ।			
খ+৪	খ+৯	খ−১০	খ−১	২৩	২৮	৯	১৮
খ+৫	খ	খ+৩	খ−৬	২৪	খ=১৯	২২	১৩
খ−৯	খ−২	খ+১	খ+১২	১০	১৭	২০	৬১
খ+২	খ−৫	খ+৮	খ−৩	২১	১৪	২৭	১৬

দ্বিতীয় উদাহরণ।

এবারে উৎপাদন করিতে হইবে, ৭৬ এবং ৬২, এই দুটা ফল। ৭৬ যেহেতু চতুর্ভাজ্য, এই জন্য তাহা ক-ক্ষেত্রে উৎপাদনীয়; আর, ৬২ যেহেতু চতুর্ভাজ্য নহে, এইজন্য তাহা খ-ক্ষেত্রে উৎপাদনীয়।

দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে

৭৬ = ১৯ অতএব ক-বীজ = ১৯।

এটাও তেম্নি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে,

$$\frac{৬২ - ২}{৪} = ১৫$$ অতএব খ-বীজ = ১৫।

এমতে, ক-ক্ষেত্রে ১৯শের চাস করা হো'ক্, আর, খ ক্ষেত্রে ১৫ রো'র চাস করা হো'ক্; তাহা হইলেই ক-ক্ষেত্রে ৭৬ এবং খ-ক্ষেত্রে ৬২, দুই ক্ষেত্রে এই দুই ফল যথাক্রমে উৎপন্ন হইবে। চাহিয়া দেখ :—

ক-ক্ষেত্র।				৭৬ পূরণ।			
ক+৯	ক+৪	ক−১০	ক−৩	২৮	২৩	৯	১৬
ক−৪	ক+১	ক+৫	ক−২	১৫	২০	২৪	১৭
ক−৮	ক−৫	ক−১	ক+১৪	১১	১৪	১৮	৩৩
ক+৩	ক	ক+৬	ক−৯	২২	ক=১৯	২৫	১০

খ-ক্ষেত্র।				৬২ পূরণ।			
খ+৪	খ+৯	খ−১০	খ−১	১৯	২৪	৫	১৪
খ+৫	খ	খ+৩	খ−৬	২০	খ=১৫	১৮	৯
খ−৯	খ−২	খ+১	খ+১২	৬	১৩	১৬	২৭
খ+২	খ−৫	খ+৮	খ−৩	১৭	১০	২৩	১২

নওঘরিআর শূন্যপূরণ

নওঘরিআ ভবনের মাঝের ঘরে রাশিবৃক্ষের বীজ এবং চারিকোণে চারিটা প্রশাখা স্থাপন করা হইল এইরূপে

ক+চ+ছ		ক−চ+ছ
	ক	
ক+চ−ছ		ক−চ−ছ

তাহার পরে উহার চারিধারের দুই দুই প্রান্তের রাশিসমষ্টিকে ৩ক হইতে কাটিয়া লইয়া ৩ক'এর অবশিষ্ট অংশ ঐ দুই দুই প্রান্তের সন্ধিতে সন্ধিতে স্থাপন করা হইল এইরূপে—

ক+চ+ছ	ক−২ছ	ক−চ+ছ
ক−২চ	ক	ক+২চ
ক+চ−ছ	ক+২ছ	ক−চ−ছ

তাহার পরে চ'কে ধরা হইল ১ আর, ছ'কে ধরা হইল ২ ; এমতে পাইলাম—

আদর্শ-ক্ষেত্র		
ক+৩	ক—৪	ক+১
ক—২	ক	ক+২
ক—১	ক+৪	ক—৩

১৫ পূরণ		
৮	১	৬
৩	ক=৫	৭
৪	৯	২

ক'কে যদি ধরা যায়=৬ তবে ইষ্টলাভ হ'বে ১৮
ঐ ৭ ঐ ২১
ঐ ৮ ঐ ২৪
ঐ ৯ ঐ ২৭ ইত্যাদি।

১৫ পূরণের সাধন-মন্ত্র।

৮	১	৬
৩	৫	৭
৪	৯	২

চূড়া'র মাঝে চন্দ্র থুয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে নাবো চুয়ে ॥
ভর দিয়ে রেকাব জিনে দুই থেকে ওঠো তিনে ॥
চৌগাঁয়ে নেবে পড়' । ঘোড়া রেখে' হাতি চড়' ॥
গজের পিঠে সেজে'বেরিয়ে, ছয়ে যাও পাঁচ পেরিয়ে ॥
সিন্ধুকূলে লাগিয়ে নাও, ঘোড়ায় চ'ড়ে আটে যাও ॥
ঘোড়ার পিঠে চাবুক লাগিয়ে, ন'য়ে নাবো রাশ বাগিয়ে ॥
মত্ত হাতির এড়িয়ে হাত ! ঘোড়ার চালে কিস্তিমাত !!

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্গে ম্যালেরিয়া-জ্বরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতিকার

বহু যুগ যুগান্ত হইতে আমাদের এই মাতৃস্বরূপ বঙ্গভূমি যে ধনে ধান্যে, সুখে স্বাস্থ্যে, বীর্য্যে পরাক্রমে, প্রভৃত ঐশ্বর্য্যশালিনী ছিলেন, তাহার নিদর্শন ইতিহাস ও পুরাণে, কাব্য ও সাহিত্যে, কিম্বদন্তী ও গ্রাম্য-গীতিকায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। শস্য-শ্যামলা সুজলা সুফলা মাতৃ-ক্রোড়ে পালিত সেই পূর্ব্বপুরুষদিগের পুণ্যময়ী কাহিনী আলোচনা করিবার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা নহে; তাঁহাদিগের হীন সন্তানদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় আলোচনা মাত্র উদ্দেশ্য। ভরসা যদি বঙ্গবাসী কোন উপায়ে ভীষণ জ্বররোগ বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত, অথবা তদভাবে দমিত করিয়া আপনা-দিগের অবস্থা উন্নত করিতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধ নিম্নলিখিত কয়েকভাগে বিভক্ত হইয়া বিবৃত হইল :—

উদ্দেশ্য।

১ম—আমাদের দেশে উত্তরোত্তর লোকক্ষয় হইতেছে কি না, তাহার প্রমাণ সংগ্রহ।

২য়—যদি হইয়া থাকে তাহার কারণ অনুসন্ধান।

৩য়—যে রোগে লোকক্ষয় হইতেছে তাহা দূরীভূত করা যায় কি না।

৪র্থ—ঐ রোগ দমন করিবার জন্য পৃথিবীতে অন্যান্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার ফলাফল, ও বঙ্গে তাহার প্রয়োগ জন্য প্রার্থনা।

প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয় বিভাগ।

প্রথম অধ্যায়—লোকক্ষয় প্রমাণসংগ্রহ।

আপনাপন গ্রাম, জেলা, পরগণা প্রভৃতির অবস্থা পর্য্যালোচনা, আত্মীয়স্বজনদিগের জিজ্ঞাসা ও সংবাদ-সংগ্রহ ইত্যাদি উপায়ে দেশের উন্নতি অবনতির বিষয় অবগত হওয়া যায়। চিন্তাশীল লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এপ্রকারে অনুসন্ধান করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

প্রমাণ সংগ্রহের উপায়।

"ইদানীং একশত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষীয়দের যেরূপ বলক্ষয় ও বীর্য্যক্ষয় ঘটিয়াছে, পূর্ব্বে সহস্র বৎসরেও কোন কারণে সেরূপ কিছুই হয় নাই। বাঙ্গালা দেশীয়েরা'ত এ বিষয়ে একটী অতিমাত্র হীনজাতীয় হইয়া পড়িয়াছে। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বেও এ দেশে যেরূপ বলবান্ লোক বিদ্যমান ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। এ দেশীয় গ্রন্থকারদিগের মধ্যে কেহ যদি স্বদেশীয় পূর্ব্বতন লোকের শারী-রিক অবস্থা ও তৎসংক্রান্ত রাজা রঘুরাম, রামচন্দ্র, রাধা গোয়ালা, আশানন্দ ঢেঁকি, রাম-দাসবাবু, তারিণী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বলিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই সমস্ত বিষয় লোকের স্মৃতিপথ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হয় না। কেবল উপন্যাস লিখিয়া ও যাত্রা করিয়া আয়ুঃশেষ করা কি গ্রন্থ-কারের কার্য্য?

অক্ষয়কুমার দত্তের মত।

"অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে এদেশীয় লোকের শরীর কোন স্থলে অর্দ্ধ হস্ত কোথাও বা একহস্ত প্রমাণ হ্রস্ব হইয়া পড়িয়াছে। বলবীর্য্যের পরিমাণের ত কথাই নাই। বাঙ্গালাদেশীয় পল্লীগ্রামস্থ পাঠকগণ! নিজ নিজ গ্রাম ও অন্য অন্য পরিচিত স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিবেন দেখি, ভদ্রলোকের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে কি না? ও বংশবিশেষের লোপাপত্তি সম্ভাবনা ঘটিয়াছে কি না? আমি নিজে এ বিষয়ে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা কোনরূপ শুভ-সূচক নহে। কোন কোন বিচক্ষণ আত্মীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানিয়াছি, তাহাও সেইরূপ। অনেক স্থানে ইতরলোকের বিষয়েও সেইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক এক স্থানের বৃত্তান্ত অতীব শোচনীয়।"

ইহার পরের কয়েক পংক্তি অতিশয় মূল্যবান্। ইহার প্রতি পাঠকদিগের দৃষ্টি বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট করিতে চাহি। যথা—

"স্বজাতির উন্নতি প্রত্যাশার পূর্ব্বে তদীয় শারীরিক অবস্থা ও জন্মস্থিতিলয়ের বিষয় একবার লক্ষ্য করা আবশ্যক। শারীরিক উন্নতি সকল উন্নতির মূলীভূত।

"বিচিত্র করিতে গৃহ যত্ন কর প্রাণপণে।
কিন্তু গৃহমূলক্ষয় হইতেছে দিনে দিনে॥"

ফলতঃ সম্মুখে ঘোর অন্ধকার! ঘোর অন্ধকার!! ঘোর অন্ধকার!!!"

রোগক্লিষ্ট, শয্যাগত, আসন্নমৃত্যু অক্ষয়কুমারের তৃতীয় নেত্র যেন প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, ভবিষ্যতের বিভীষিকা বর্ত্তমানেই দেখিয়াছিলেন, তজ্জন্য প্রলাপগ্রস্ত রোগীর ন্যায় একস্থানে লিখিয়াছেন:—

"প্রায় যাবৎ জাগ্রৎকাল নানারূপ ক্লেশ করিয়া কষ্টে শ্রেষ্ঠে দিনপাত করা কোটি কোটি ব্যক্তির জীবনব্রত হইয়া উঠিয়াছে। বহুতর স্থলেই দেখিতে ও শুনিতে পাই, প্রায় সকলেই রুগ্ন, সকলেই বিব্রত এবং সকলেই সমাকুল। একটু আরাম নাই—আরাম নাই—আরাম নাই—"বাহুল্যভয়ে আর উদ্ধৃত করিলাম না। কৌতূহলী পাঠক উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয়ভাগে ১২৬-১৩২ পৃঃ দেখিবেন। ইহা ১৮৮০ সালে লেখা। তাহার পর দুইযুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ঐ উক্তি কি রোগপীড়িতের প্রলাপ না মহাঋষির ভবিষ্যবাণী?

এ প্রকারে ব্যক্তিগত মতামত অধিক সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন নাই। সমাজস্থ চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই সমাজের অবস্থার বিষয় চিন্তা করেন, সুতরাং অন্যান্য লেখকদিগের গ্রন্থাবলী অনুসন্ধান করিলে এ প্রকার পরিপোষক মত পাওয়া যাইবে। কিন্তু এ সকল মত ব্যক্তিগত;—উহাতে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা সহানুভূতি প্রকৃত তথ্য নিরূপণের পথে বিঘ্ন উৎপাদন করে। তজ্জন্য আমরা অন্য উক্ত মত ব্যতীত অন্য উপায়ে আমাদের বর্ত্তমান অবনতি প্রমাণ করিব।

ব্যক্তিগত মত দুষ্ট হইতে পারে।

কিন্তু সে উপায় ইংরাজদিগের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বনে প্রাপ্ত। ইংরাজ আমাদিগকে যে সকল নূতন কথা শিখাইয়াছেন, ইহা তাহাদিগের অন্যতম। এ বিষয়ে বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন—

"ইংরাজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে,—যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে। যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে।"*

দশ বৎসর অন্তর কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রজা গণনার ব্যাপার ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের একটী বিশাল কীর্ত্তিস্তম্ভ। পূর্ব্বে কেহ কখন এ ব্যাপার কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই। ১৮৭২ সালে ইহা প্রথম আরব্ধ হয়। ১৮৮১ সালে দ্বিতীয়বার গণনা হয় ও ৭২-৮১ সালের ১০ বৎসরের মধ্যে উন্নতি অবনতি আলোচিত হয়। ৯১ সালে দ্বিতীয়বার ও ১৯০১ সালে তৃতীয়বার গণনায় লোক সংখ্যার বৃদ্ধি বা অবনতি স্থিরীকৃত হয়। সুতরাং আমরা ৮১, ৯১ ও ১৯০১ সালে ত্রিশবৎসরে তিনবার উন্নতি অবনতি আলোচনা করিতে পাইতেছি।

আদমসুমারীর বিবরণ।

পরে উল্লেখ করিবার সুবিধার জন্য আমরা এই তিন গণনাকে সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ বলিব। সত্য সত্যই আমাদের শাস্ত্রে তিন যুগে ক্রমশঃ যে প্রকার অবনতি বর্ণিত হইহইয়াছে, এই তিনবারকার গণনাতে তদপেক্ষা অবনতি ভারতবর্ষে ও মধ্যবাঙ্গালাতে দেখা যাইতেছে। সুতরাং উক্তবিধ নামকরণ বিশেষ ভ্রমাত্মক বা অবান্তর হয় নাই।

১৮৭২ সালের পূর্ব্বে লোকসংখ্যার চেষ্টা হইয়াছিল কি না তদুত্তরে একজন প্রবন্ধ লেখকের মত উদ্ধৃত করা গেল—

"পূর্ব্বে কখনও লোকসংখ্যা হয় নাই। ইংরাজেরা দেওয়ানি প্রাপ্ত হইলে কিছু পরে অনুমিত হইয়াছিল যে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার লোকসংখ্যা এক কোটী। পরে এমত বিবেচনা হয় যে এ অনুমান অযথার্থ। লোক আরও অধিক হইবে। সার উইলিয়াম জোন্স তৎপরে অনুমান করেন ঐ প্রদেশে বারাণসী বিভাগ সমেত ২ কোটী ৪০ লক্ষ লোক আছে। ১৮০২ সালে কোলব্রুক সাহেব অনুমান করেন যে, ঐ প্রদেশে তিন কোটী লোক আছে। ১৮১২ সালে বিখ্যাত "পঞ্চম বিজ্ঞাপনীতে" দেশের লোক সংখ্যা ২ কোটী সত্তর লক্ষ বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল।

পুরাতনী লোকসংখ্যার চেষ্টা।

"১৮০৭ সালে ডাক্তার ফ্রান্সিস বুকানান নামা এক জন বিচক্ষণ ইংরাজ বঙ্গদেশ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার তত্ত্ব-সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত হয়েন। সাত বৎসর তিনি এই সকল বিষয়ে পরিশ্রম করেন। তিনি বাঙ্গালা ও বেহারের কিয়দংশের লোক সংখ্যা নির্ণীত করিতে যত্ন করেন। তাঁহার নির্ণয়ানুসারে উক্ত অংশে তৎকালে এক কোটী ৬৪ লক্ষ জন লোক ছিল। বর্ত্তমান গণনায় (অর্থাৎ ১৮৭২ সালের সুমারীতে)—তৎপ্রদেশে ১ কোটী উনপঞ্চাশ লক্ষ লোক পাওয়া গিয়াছে। অতএব বুকাননের নির্ণয়ের উপর নির্ভর করিতে গেলে বিবেচনা

* ভারতকলঙ্ক প্রবন্ধ, বঙ্গদর্শন প্রথমভাগ।

করিতে হইবে, যে পূর্ব্বাপেক্ষা লোক সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। যদি ইহা সত্য হয়, তবে আমরা নিতান্ত দুঃখিত নহি।"

ভাবিতে বড় ক্ষোভ হয়, আমাদের নব্য শিক্ষিতদের এমন এক দিন গিয়াছে যখন আমরা ম্যালথসের বড় ভক্ত ছিলাম। আমাদের দুর্ভাবনাই ছিল যে, উত্তরোত্তর লোক সংখ্যার বৃদ্ধিই আমাদিগকে দুর্ব্বল করিবে। সুতরাং লোকক্ষয় বাঞ্ছনীয়। এই কারণে ৭৫ বৎসরে লোক সংখ্যা দ্বিগুণিত না হইয়া হ্রাস হইয়াছে সিদ্ধান্ত করিয়া উক্ত লেখক আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি উক্ত প্রবন্ধে অন্য স্থানে লিখিতেছেন—"ইউরোপে যে রাজ্যে গড়ে বর্গ মাইল প্রতি ২০০ জন লোক বাস করে, সে রাজ্য বহু জনাকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। জর্ম্মণি ও ফ্রান্স পৃথিবীর মধ্যে দুইটী অতি প্রাচীন এবং সর্ব্বাংশে প্রধান ও সুসভ্য রাজ্য। কিন্তু তথায় বর্গ মাইল প্রতি ২০০ জন লোক নাই।

"ব্রিটেনে বর্গ মাইল প্রতি ২৭৩ জন লোক, বঙ্গদেশে বর্গ মাইল প্রতি তদপেক্ষা ছয় জন বেশী অর্থাৎ ২৭৯ জন লোক।

"অতএব বাঙ্গালা, বিশেষতঃ বেহার পৃথিবীর মধ্যে অতি জনাকীর্ণ প্রদেশ। এরূপ লোকের আতিশয্য মঙ্গলের কারণ নহে। অমঙ্গলের কারণ।" (চৈত্র ১২৭৯ সাল বঙ্গদর্শন।)

এখন এই তিনবার আদমসুমারীর মন্তব্য হইতে আলোচনা করা যাউক। প্রথমে গোটা ভারতবর্ষটির বিবরণ প্রথম তালিকায় দেখুন। সত্য যুগে অর্থাৎ ৭২-৮১ সালে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সঙ্গে তুলনায় শতকরা ২৩ জন হইয়াছে। তৎপর দশকে ১৩ জন বৃদ্ধি হয় ও পর দশকে ২·৪ মাত্র বৃদ্ধি হয়। কি ভয়ঙ্কর অবনতি! ত্রেতাযুগে বৃদ্ধি পূর্ব্ব যুগের অর্দ্ধেক ও দ্বাপরযুগে ত্রেতার ছয়ভাগের এক ভাগ হইয়াছে। প্রকৃত অবস্থা ইহাপেক্ষাও শোচনীয়, কারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের গণনায় অনেক লোকের সংখ্যা লওয়ায় ভুল হইবার সম্ভাবনা—কেন না প্রথম প্রথম আদমসুমারীর ব্যবস্থা প্রকৃষ্টরূপে নির্ব্বাহিত হয় নাই।

আদম সুমারীর ফলাফল আলোচনা ভারতবর্ষে।

তার্কিকগণ বলিতে পারেন, সমগ্র ভারতবর্ষে ঐ প্রকার অবনতি হওয়াই সম্ভব। কারণ বোম্বাই ও পঞ্জাব প্রদেশে প্লেগ, মধ্য ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে লোকক্ষয়ের জন্য উক্ত তালিকা এত ভয়াবহ হইয়াছে। সেই জন্য উক্ত তালিকায় সমগ্র বঙ্গ ও তাহার বিভিন্ন অংশের লোকসংখ্যা দেওয়া গেল। উহাতে দেখা যায় যে, নিজ বাঙ্গালায় সত্যযুগে ১১·৫ বৃদ্ধি, ত্রেতায় ৭.৩ ও দ্বাপরে ৫·১ মাত্র হইয়াছে। এখানেও ত্রিশ বৎসরে লোক সংখ্যার বৃদ্ধির হার অর্দ্ধেক মাত্র দাঁড়াইয়াছে। বিভিন্ন অংশের তালিকায় দেখা যায় মধ্যম ও পশ্চিম বাঙ্গালায় ত্রিশ বৎসরে অর্দ্ধেক হইয়াছে। শেষোক্ত বিভাগে—২·৭ রূপ ভয়াবহ লোক-ক্ষয়ের কারণ বর্দ্ধমান জ্বর—উহা ১৮৬১ সাল হইতে ১৮৭৬ সাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান জেলাকে প্রায় অরণ্যে

ফলাফল অবিভক্ত বঙ্গে।

পরিণত করে। কেবল পূর্ব্ববঙ্গে একটু শ্রীবৃদ্ধি দেখা যায়। যদিও অনেকে ইহার কারণ মুসলমানদিগের নিকা বিবাহ, বিধবা বিবাহের ও সামাজিক উদারতার উপর আরোপ করেন, কিন্তু আমাদের বোধ হয়, ইহার একমাত্র হেতুই তত্তৎ প্রদেশে ম্যালেরিয়া রোগের অপেক্ষাকৃত অল্প প্রাদুর্ভাব। ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমায় ও অন্যান্য স্থানে যেমন ম্যালেরিয়ার উত্তরোত্তর প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তাহাতে যদি তৎপ্রদেশবাসী পূর্ব্ব হইতে সাবধান না হন, পূর্ব্ববঙ্গ যে শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গের অবস্থায় সমানীত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমাত্মক কারণ।

আরও এক পদ নিম্নে আসিয়া বল্লালসেনের বাগড়ী পরগণা বা বর্ত্তমান কালের প্রেসিডেন্সি বিভাগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করা যাউক। এই বিভাগে সকলেই জানেন যে, পাঁচটী উপবিভাগ আছে যথা—যশোহর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, খুলনা ও চব্বিশ পরগণা। যশোহর দুইটী মহারোগের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। জ্বর ও ওলাউঠা দুয়েরই জন্মস্থান যশোহর জেলায়। যথাস্থানে তালিকা দেওয়া গেল। (২য় তালিকা দেখ) ইহাতে দেখা যায় সত্যযুগে—৩৩.৬ বৃদ্ধি ত্রেতাযুগে ২.৬ বৃদ্ধি ও দ্বাপরে—৪.২ বৃদ্ধি মৃত্যু-সংখ্যা জন্ম-সংখ্যার অধিক। যমের নিকট প্রজাপতির বোধ হয় কলিযুগে এই প্রথম পরাজয়! জানি না বর্ত্তমান যুগের আদমসুমারীর গণনায় মহাকালের বিষাণ আরও কত ভৈরব রবে নিনাদিত হইবে। এই ত যশোরের অবস্থা।

ফলাফল প্রেসিডেন্সীবিভাগে।

যশোহর জেলায় ভীষণ অবস্থা।

নদীয়া জেলার অবস্থাও ঐ প্রকার ভয়ানক। সত্যযুগে ১০.৮ বৃদ্ধি, ত্রেতায় ১.১, একেবারে কি ভয়ানক পতন ও দ্বাপরে ১.৪ মাত্র দাঁড়াইয়াছে। এখন কলিযুগের প্রায় শেষ। এ যুগের শেষে কি দাঁড়াইবে ভগবানই জানেন।

নদীয়া জেলায় প্রায় তদ্রূপ।

বাঙ্গালার মুসলমান রাজত্বের শেষ রাজধানী মুর্শিদাবাদের অবস্থাও সমান শোচনীয়। দ্বাপরে যে সামান্য উন্নতি দেখা যাইতেছে, তাহা আশাপ্রদ নয়, কেন না গত তিন বৎসরে উহার মৃত্যু সংখ্যা বাঙ্গালার অন্যান্য উপবিভাগ হইতে অধিক। এত দিনে মুর্শিদাবাদবাসিগণের চক্ষু ফুটিয়াছে, তাঁহারা মৃত্যু নিবারণ জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

মুর্শিদাবাদেও তদ্রূপ।

চব্বিশ পরগণার অবস্থা দেখিয়া অনেকে আনন্দিত হইতে চাহিবেন; কারণ ত্রেতায় ৩.১ হইতে দ্বাপরে ৯.৮ এ উঠিয়াছে। কিন্তু এ আনন্দ টুকুও উপভোগ করিবার উপায় আমাদের নাই। এই বাহ্য-দৃষ্ট উন্নতির কারণ গঙ্গার দুধারে ইংরাজ বণিকদিগের প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য মিলের (mill) উৎপত্তি ও তজ্জন্য বহু পশ্চিমদেশীয় লোকের আমদানী। তৃতীয় তালিকাই তাহার প্রমাণ। যে সকল উপবিভাগে মিল বা কল নাই (যথা—নবাবগঞ্জ, বারাসত, দেগঙ্গা, হাবড়া ও দমদমা

চব্বিশপরগণার অবস্থার উন্নতি প্রকৃত নহে।

থানা) সেখানে লোকক্ষয়ের সেই সুদীর্ঘ বিভীষিকাময়ী কাহিনী। কিন্তু মিল-বহুল স্থানে আপাত বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে।

এই মিলগুলির দ্বারা চব্বিশ পরগণার লোকের ত্রিবিধ দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথম আধিদৈবিক ;—Septic Tank এর প্রচলনে গঙ্গাজলের অপকর্ষত্ব—ইহা দেবতার কার্য্য ! দ্বিতীয় আধিভৌতিক ;—পঞ্জাবী, বেহারী, পাঠান প্রভৃতি পশ্চিম দেশীয় বহুসংখ্যক নিরক্ষর লোকের আমদানীতে ডাকাতির বৃদ্ধি—এ আধিভূতের কার্য্য ; ও তৃতীয়তঃ আধ্যাত্মিক ; গঙ্গার দুই ধারে অসংখ্য মিলের আবির্ভাবে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদিগের গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাতীরে বাস ইত্যাদি কার্য্যের সঙ্কোচ ;—ইহা অসুরের ; জানি না এই ত্রিবিধ দুঃখ দূর করিবার জন্য নূতন সাংখ্য শাস্ত্রে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে।

মিলের দুঃখ ত্রিবিধ।

বোম্বাই ও মান্দ্রাজের তুলনায় আমরা ধ্বংসের পথে কিরূপ অগ্রসর হইতেছি, ৪র্থ তালিকা তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আর বৎসর বৎসর আমাদের সর্ব্বনাশ কিরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, পঞ্চম তালিকায় তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান—টীকার প্রয়োজন নাই—প্রেসিডেন্সী ডিবিজন যে বঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা যমরাজের পীঠস্থান, ষষ্ঠ তালিকা তাহার সাক্ষ্য।

আশা করি আর তালিকার প্রয়োজন হইবে না। লোকক্ষয় যে ভীষণ ভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে তাহা যথেষ্ট প্রমাণিত হইল।

মহাতার্কিক এখনও হয়'ত হাল ছাড়িতে চাহিবেন না। তিনি হয়'ত বলিতে পারেন উক্ত ত্রিশ বৎসরে ঐ প্রকার লোকক্ষয় কেবল বঙ্গ বা ভারতবর্ষে আবদ্ধ নয়, জগতের অন্যান্য স্থানেও ঐরূপ অবস্থা। সেই জন্য ৭ম তালিকা দেওয়া গিয়াছে।

এ তালিকায় ভারতবর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা হীন স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের বাহিরে বৃটীশ রাজত্বে যেখানেই যাও, দেখিবে প্রজাবৃদ্ধি। ৫৪ হইতে ৯ পর্য্যন্ত শতকরা বৃদ্ধি। বাঙ্গালা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেও ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের অর্দ্ধেক মাত্র।

পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় ভারতবর্ষ হীনবল।

এ দিকে ৮ম তালিকা দেখিলে বুঝা যায় যে, আমাদের জন্মহার অন্যান্য দেশের অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ। ভারতবর্ষ ও বাঙ্গালার জন্মহার ৪২ বা ৪৪ এবং ইংলণ্ড ও ওএল্‌সের বৃদ্ধি ২৭ জন মাত্র। ইহাতে আমাদের অবস্থার শোচনীয়ত্ব অধিকতর পরিস্ফুট হইতেছে। বিলাত হইতে জন্ম সংখ্যা প্রায় দেড় গুণের অধিক হইলেও যখন মোটের উপর বৃদ্ধি সংখ্যা পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র, তখন মৃত্যু কি পরিমাণে হইতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়। অথচ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন অক্ষয় দত্তজ মহাশয় লোক-সংখ্যার উচ্ছেদের জন্য তাঁহার পূর্ব্বতন কালের সঙ্গে তাৎকালিক অবস্থা তুলনা করিয়া অরণ্যে রোদন করিতেছিলেন, তখন ভারতবাসীর লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার ইংলণ্ডবাসীদিগের প্রায় দ্বিগুণ ছিল। কি শোচনীয় লোক-

জন্মহার দ্বিগুণ অথচ বৃদ্ধি পাঁচভাগের একভাগ।

ক্ষয়! বোধ হয়, পৃথিবীর পরিজ্ঞাত ইতিহাসে এরূপ দ্বিতীয় লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটে নাই। এককালে যে হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় উৎফুল্ল হইয়া রাজনারায়ণবাবু বলিয়াছিলেন, "আমি দেখিতেছি আবার আমার সম্মুখে মহাবলপরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ক্রমে ধাবমান হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান-ধর্ম্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে; হিন্দুজাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে।" হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা—তাহা কি এই ক্ষীণ, দুর্ব্বল, দুর্ভিক্ষভয়ে ভীত, রোগে জরাজীর্ণ জাতি দ্বারা হওয়া সম্ভব। ইহার প্রতিকারের জন্ম কালবিলম্ব করা মূঢ়ের কার্য্য।

২য় অধ্যায়—ভীষণ লোকক্ষয়ের কারণ অনুসন্ধান।

এতক্ষণে আমাদের প্রস্তাবের প্রথম প্রশ্ন আলোচিত হইল। এখন জিজ্ঞাস্য, এ ভীষণ লোকক্ষয়ের কারণ কি? কোন কোন সমাজ-সংস্কারক বলেন, বাল্য-বিবাহ প্রত্যক্ষভাবে

কারণ বাল্য-বিবাহ ও বিধবার ব্রহ্মচর্য্য নহে।

ও বিধবার ব্রহ্মচর্য্য পরোক্ষ ভাবে এই লোক-ক্ষয়ের বৃদ্ধি করিতেছে। তাঁহারা বলেন বাঙ্গালীরা বড়ই বাল্য-বিবাহ-প্রিয়, সুতরাং বৎসর বৎসর অকালপক্ব বালকবালিকাজাত দুর্ব্বল ক্ষীণ অপরিপুষ্ট রোগগ্রস্ত সন্তানের জন্ম হয় ও তাহাদের মৃত্যুতে লোকক্ষয় বৃদ্ধি হয়। দুঃখের বিষয় তালিকা হইতে ইহার পরিপোষক তথ্য পাওয়া যায় না। ৯ম তালিকায় দেখা যায়, কলিকাতার হাজার প্রতি প্রায় ৩০৪ জন শিশু ১৯০৬ সালে মারা গিয়াছিল। ঐ সালে বিলাতে ৭টী বিখ্যাত সহরের শিশুদিগের মৃত্যু সংখ্যা ১৪৫ জন। সুতরাং কলিকাতায় শিশুদিগের মৃত্যু-সংখ্যা বিলাতের সহরগুলির প্রায় আড়াই গুণ। এ দিকে ১০ম তালিকায় কলিকাতার সমগ্র লোকের মৃত্যুসংখ্যা (৩৫·৭) লণ্ডনের মৃত্যু সংখ্যার প্রায় আড়াই গুণ (১৫·৭) সুতরাং প্রতিপন্ন হইল যে বিলাতে শিশু ও বলিষ্ট লোকদিগের মৃত্যু সংখ্যার অনুপাত যেরূপ, এখানেও তাহাই; কোন পার্থক্য নাই।

১৯০১ সালের সেন্সস রিপোর্টে কর্ণেল লেস্‌লি সাহেব দেখাইয়াছেন, বিলাত হইতে এখানে অধিক সংখ্যক সন্তান জন্মিবার কারণ এখানে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোক বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করে। জন্ম যথেষ্ট হইতেছে, সুতরাং বিধবাবিবাহ ইত্যাদি দ্বারা জন্ম সংখ্যা বাড়াইয়া প্রজাবৃদ্ধি আশা করিবার পূর্ব্বে যাহারা ইতিমধ্যে জন্মিতেছে তাহাদের রক্ষণের চেষ্টা করিলে অধিক সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।

প্রেসিডেন্সী ডিবিসনের ভূ-তত্ত্বের পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, উহার অধিকাংশ ভূখণ্ডই গাঙ্গেয় বদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত। এই বিস্তীর্ণ প্রদেশের

গাঙ্গেয় বদ্বীপের ইতিহাস।

ইতিহাসের সঙ্গে গঙ্গা মহানদীর ইতিহাস এক সূত্রে আবদ্ধ। বস্তুতঃ গঙ্গার পলিজ মৃত্তিকা হইতে ইহার উদ্ভব, গঙ্গার ভিন্ন ভিন্ন প্রবাহের গতিতেই

ইহার উৎকর্ষ এবং গঙ্গার প্রবাহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গেসঙ্গেই ইহার অবনতি। সেই জন্য প্রাচীন ঋষিগণ ও কবিগণ এবং ভাষাগ্রন্থের লেখকগণ সকলেই গঙ্গা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন দৈনন্দিন নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। প্রত্যুত: গঙ্গা প্রকৃতই আমাদের জনক-জননী-মাতৃভূমির মাতৃস্বরূপা। গঙ্গার সঙ্গে এই বিভাগের এইরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধের জন্য গঙ্গার শাখা প্রশাখাগুলির গতি, স্থিতি ও পরিবর্ত্তনের আলোচনা প্রসঙ্গতঃ আসিয়া পড়িতেছে।

গঙ্গার দক্ষিণ প্রবাহ ভাগীরথী খাতেই প্রবাহিত ছিল। প্রাচীন কিম্বদন্তী, পুরাণ ও ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দিতেছে। আধুনিক ঐতিহাসিক যুগে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বর্ণিত

গঙ্গার ভাগীরথী খাতত্যাগ ও পদ্মাখাতে বহতা।

পরিপ্লুসে ও ৭ম শতাব্দী বর্ণিত হিউএন্থসিয়াংএর বর্ণনায় ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। তৎপরে কোন সময়ে সম্ভবতঃ পৃথিবীর আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তনের বলে, গঙ্গা ভাগীরথী-তীর-সমাশ্রিত ভক্তবৃন্দের প্রতি বিরূপা হইয়া আর দক্ষিণবাহিনী রহিলেন না, পদ্মা নাম ধারণান্তর ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে আরও উত্তরপূর্ব্ব সরিয়া গিয়া সুঁতি হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত গমনান্তর পুনরায় দক্ষিণবাহিনী হইলেন।

এই পূর্ব্বগতি এক দিনে সম্পন্ন হয় নাই। প্রথমে হয় ত ভৈরব নদে পরে জলাঙ্গী ও মাথাভাঙ্গায় ও পরে ক্রমশঃ কুমার, গড়ুই বা মধুমতীতে এবং পরিশেষে মেঘনায় এই মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল।

এ দিকে গঙ্গা পূর্ব্ববাহিনী হইতে লাগিলেন দেখিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ পশ্চিমপথে গঙ্গার সাক্ষাৎকারের আশায় মধুপুরার জঙ্গল ত্যাগ করিয়া যমুনার পথে গোয়ালন্দের নিকটে গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রথমে গড়ুইএর খাতে ও পরে মেঘনা প্রবাহে ধলেশ্বরীর সংযোগে সমুদ্রগামী হইয়াছেন। এই সকল শাখা প্রশাখাগুলি ভৈরব, জলাঙ্গী, (মাথাভাঙ্গা) ও তাহার প্রশাখা চূর্ণী, ইছামতী, কপোতাক্ষ, কুমার, পাঙ্গাশী, গড়ুই, মধুমতী ইত্যাদি প্রেসিডেন্সি ডিবিসনের মধ্যে; ভাগীরথী তাহার পূর্ব্বসীমা, পদ্মা উত্তর, মধুমতী পূর্ব্ব ও অনন্ত সমুদ্র তাহার দক্ষিণ সীমা।

এই নদীগুলির মধ্যে কতকগুলি শুকাইয়া যাইতেছে, কতক শুকাইয়া গিয়াছে এবং কতক এখনও জীবিত আছে, কিন্তু ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। মুর্শিদাবাদে

গাঙ্গের বদ্বীপের অবস্থান্তর।

ভৈরব ও শিয়ালমারী নদ,————নদীয়ায় ভৈরব, কুমার, পাঙ্গাশী,————যশোরে কালীগঙ্গা, বাসী, নবগঙ্গা, পাঙ্গাশী, কটকী, চিত্রা, বা ভৈরব, ভেটনা, কোদলা, হুকার, হরিহর, ভদ্রা, হমু, ইত্যাদি। চব্বিশপরগণায় পদ্মা ও যমুনা ইত্যাদি সমস্তই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ইহারা বর্ষাকালে তৎতৎ প্রদেশের বৃষ্টি জল আপন আপন খাতে বাহিত করিয়া দেয় ও অন্য সময় জলে জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া ৫২৭ বর্গমাইল জুড়িয়া ১৪০টী বিল আছে—তাহার অধিকাংশই অগভীর ও প্রবল জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

গঙ্গার পূর্ব্বগতিই এই দুরবস্থার সর্ব্বপ্রধান কারণ। তজ্জন্য পুরাতন নদীসকল প্রচুর জল না পাওয়াতে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় কারণ বর্ষাকালে খাল বিল ডোবা ইত্যাদি জলে পরিপূর্ণ হইলে পলি পড়িয়া উত্তরোত্তর ভরিয়া উঠে। প্রজারা এই শুষ্কনদীর মধ্যভাগে বাঁধ দিয়া, ফসল দিয়া নদীকে আরও শীঘ্র মজাইয়া দেয়। ফলে একদিকের প্রবাহ বন্ধ হইয়া উঠে এবং সেই জন্য নদী অন্যপথে প্রবাহিতা হইয়া নূতন নূতন খাল বিল ডোবার সৃষ্টি করে। এই সকল স্থানে গলিতপত্র, জলজ উদ্ভিদ, চতুর্দ্দিকের ধৌত ময়লাসমষ্টি একত্র হইয়া শীত ও গ্রীষ্মকালে লোকক্ষয়কর জ্বর ও অন্যান্য রোগের উৎপাদন করে।

একদল নিশ্চেষ্ট অদৃষ্টবাদী আছেন। তাঁহাদের যুক্তি একটু অদ্ভুততর। তাঁহারা তাঁহাদের যুক্তিটাকে একটু বিজ্ঞানের আবরণ দিয়া আপাত-মনোরম করিবার প্রয়াস পান। তাঁহারা বলেন—বদ্বীপের এই প্রকার অবনতি, নদীর স্রোত ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া খাল বিলের উৎপত্তি, সঙ্গে সঙ্গে আর্দ্র মৃত্তিকার সহজাত রোগসমূহের আবির্ভাব, এ সকল নৈসর্গিক নিয়মের ফল। ইহার সঙ্গে বিরোধ করিয়া কোন ফল নাই। স্থির অবিচলিত হইয়া এই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনকে সম্পূর্ণ হইতে দাও—এখন কিছু লোকক্ষয় হইবে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে সব ঠিক হইয়া যাইবে।

অদৃষ্টবাদীর মত প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন নিরাকরণ মনুষ্যের অসাধ্য।

আর একদল আর এক পদ অগ্রসর হইয়া বলেন, এ সম্বন্ধে যদি কিছু করিবার থাকে সে রাজার,—কেননা ইহার প্রতিবিধান প্রভূত অর্থসাপেক্ষ। অতএব রাজাকে উপদেশ দেওয়াতেই তাঁহাদের সকল পুরুষকারের নিঃশেষ হইয়া যায়। ব্যক্তিগত ও সমাজগত যে একটা স্বতন্ত্র কর্ত্তব্য আছে এবং তাহা চালিত করিলে যে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়, সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে মনঃসংযোগ করিতে দেখা যায় না।

এইপ্রকার যুক্তিবাদীদিগকে আমরা আমেরিকার মিসিসিপি নদীর বদ্বীপজাত ভূমিখণ্ডের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে অনুরোধ করি। সেখানে দেখিবেন, বাঙ্গালার সমধর্ম্মাক্রান্ত দেশের অধিবাসীরা কেবল পুরুষকারের বলেই জন্মভূমিকে স্বর্ণপ্রসূ করিয়াছেন। পূর্ত্তকার্য্য দ্বারা নদীসকল আপনাপন খাতে আবদ্ধ করা হইয়াছে। নানাপ্রকার কৃত্রিম উপায়ে উহাদিগের গভীরতা ও বিস্তৃতির অবস্থান্তর হইতে দেওয়া হইতেছে না। সুতরাং অস্বাস্থ্যকর খাল বিল ইত্যাদি উৎপন্ন হইবার পথ বন্ধ হইয়াছে ও নদীদিগের গতি অব্যাহত থাকায় বাণিজ্য দ্রব্য সকল চলাচলের সুবিধা হইয়াছে; এমন কি সেখানে রেল লাইন অপেক্ষা নদীতে দ্রব্য প্রেরণ সমধিক সুলভ ও সহজসাধ্য। তাঁহাদের এই প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া কোন্ বাঙ্গালীর হৃদয় বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ উন্নতি আশায় স্ফীত না হয়।

মিসিসিপি বদ্বীপের উদাহরণে মতখণ্ডন।

অদৃষ্টবাদী হয়ত ইহা স্বীকার করিবেন না। তিনি বলিবেন এ সকল বাতুলের কথা।

রোগের বৃদ্ধি বা অবনতি মনুষ্যের চেষ্টার বাহিরে। উহা আপনিই বাড়ে এবং স্বতঃই কমিয়া যায়। তদুত্তরে আমরা পাঠকদিগের দৃষ্টি—১১শ তালিকায় আকৃষ্ট করিতেছি। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে বাঙ্গালায় হাজার প্রতি ২৯ জন লোক এই প্রতীকারযোগ্য রোগে সকলে মারা যায়, অথচ বিলাতে প্রতিকারযোগ্য রোগে ৫.৪ জন মাত্র মারা যায়। সেখানে এই সামান্য মৃত্যুসংখ্যা দমন করিবার জন্য কি প্রবল চেষ্টা না হইতেছে। নানা প্রকার নব নব উপায়, সাপ্তাহিকে, দৈনিকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকায় আলোচিত হইতেছে, বিতরিত হইতেছে ও মাঝে মাঝে বিদ্বজ্জনদিগের ও মহা মহা চিকিৎসকদিগের বৈঠকে মীমাংসিত হইতেছে। যদি কোন সপ্তাহে এই মৃত্যুসংখ্যাতে এক দশমিক মাত্র বৃদ্ধি দেখা যায় অমনি সমস্ত রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি যুগপৎ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তাঁহারা কর্ম্মবীর, হাত উঠাইয়া বসিয়া থাকেন না, সুতরাং হাতে হাতে ফল পাইতেছেন। ৭ম তালিকায় দেখিবেন ত্রিশ বৎসর অক্লান্ত ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে তাঁহারা লণ্ডনের মৃত্যুসংখ্যা ১৬ জন মাত্র আনয়ন করিয়াছেন।

বাঙ্গালার প্রতিকারযোগ্য রোগেই অধিক লোক মারা যায়।

রাজযক্ষ্মা (টিউবারকুলোসিস) রোগের নিবারণ জন্য ইংরাজদিগের এই প্রকার চেষ্টার ইতিহাস আরও বিস্ময়প্রদ। বৎসর কয়েক হইল একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক এই রোগ দূর করিবার জন্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। দেখিতে দেখিতে ক্রোরপতি হইতে কপর্দ্দহীন পর্য্যন্ত ইহার অনুসরণ করিতে লাগিল। মৃত্যুসংখ্যা ২.৩৭ হইতে ১.৩এ নামিয়া গেল। হাজার প্রতি ২.৩৭ মৃত্যু-সংখ্যাকেও তাঁহারা চিন্তার বিষয় মনে করেন।

অন্য উদাহরণ—রাজযক্ষ্মা।

বিলাতের আর একটী উদাহরণ দেওয়া গেল। ডাক্তারগণ অধুনা সাব্যস্থ করিয়াছেন যে টাইফয়েড্‌জ্বর একরকম জীবাণুর (ব্যাসিলি) ক্রিয়া। উহা খাদ্য বা অন্যান্য পদার্থ সহযোগে মনুষ্যদেহে সংক্রামিত হয়।

গত বৎসর সাউথ হ্যাম্‌টনের মেয়র একটী ভোজ দেন। সেখানে আহার করিয়া ২২ জন পীড়িত ও তন্মধ্যে ৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই জন্য বিশেষজ্ঞদিগের তত্ত্বাবধানের সিদ্ধান্ত বিস্ময়প্রদ। ইংরাজী সমাজজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে তাঁহারা ঝিনুকের মাংস (oyster) কাঁচা অবস্থায় আহার করেন। ইহা সিদ্ধ করিয়া খাওয়া রীতিবিরুদ্ধ। ঐ ঝিনুক যেখান হইতে আনা হইয়াছিল সমুদ্রের সেই অংশ সন্ধান করিয়া দেখা গেল যে সহরের দুর্গন্ধ ড্রেনের জল সেখানে আসিয়া পড়ে ও তজ্জন্য ঝিনুকগুলি টাইফয়েড্‌ বিষাক্ত হয়।

এই প্রমাণের পর তৎক্ষণাৎ আইন বিধিবদ্ধ হইল যে, যেখানে ঝিনুক সংগ্রহ করা হইবে সেখানে ড্রেনের জল আসিতে দেওয়া হইবে না।

বাঙ্গালার সঙ্গে তুলনার প্রয়োজন আছে কি ?

প্রেসিডেন্সী ডিবিজনবাসীদিগকে ১৪শ তালিকা বিশেষ করিয়া দেখিতে বলি। যশোর নদীয়া মুর্শীদাবাদ প্রভৃতি স্থানসমূহের লোকসংখ্যার হ্রাসের কারণ যে একমাত্র জ্বররোগ সে বিষয় কোন সন্দেহ থাকিবে না।

বঙ্গে লোকক্ষয়ের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে আমরা অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি। আমরা দেখিলাম প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনই ইহার প্রধান কারণ। কিন্তু ১২শ ও ১৩শ তালিকা দেখিলে বুঝা যাইবে প্রায় বারোআনা লোকের মৃত্যুর একমাত্র কারণ ম্যালেরিয়া জ্বর। এই রোগ বাঙ্গালায় কি প্রভূত পরিমাণে লোকক্ষয় করিতেছে তাহা ১৩শ তালিকায় দেখিবেন। কেবল যশোরের কথাই উল্লিখিত হইল। পাঁচবৎসরে যশোর বিভাগে ১৯ থানার প্রায় ৫৪ হাজার অধিবাসী কমিয়া গিয়াছে; বৃদ্ধি দূরে থাকুক। এতক্ষণে স্থিরীকৃত হইল যে একমাত্র ম্যালেরিয়াই আমাদের বঙ্গের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রধানতম কারণ।

৩য় অধ্যায়—এই জ্বররোগ দূরীভূত করিতে পারা যায় কি না?

এখন জিজ্ঞাস্য এই রোগের প্রবল আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা সম্ভব কি? কোন প্রতিষেধক উপায় আছে কি? তদুত্তরে আধুনিক বিজ্ঞান বলেন, ম্যালেরিয়া জ্বর প্রতিকার-যোগ্য রোগের অন্যতম।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা রোগসকলকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। যথা—

১ম দুশ্চিকিৎস্য—যে সকল রোগ নির্ম্মূল বা নিবারণ জন্য উপায় এখনও নিঃসংশয়-রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। এবং ২য়—প্রতিকারযোগ্য—সে সকল রোগের উদ্ভব, স্থিতি, সংক্রামণ ও প্রতিষেধক উপায় নিঃসংশয়ভাবে স্থির হইয়াছে। এই ম্যালেরিয়া রোগ এই প্রতিকারযোগ্য রোগের অন্যতম।

ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত বহুদিবস হইতে প্রচারিত আছে। কৌতূহলী পাঠক সে সকল সহজেই আলোচনা করিতে পারেন। এখনও দ্বাদশ বৎসর অতীত হয় নাই ল্যাভেরান্ নামক একজন সাহেব ইহার উৎপত্তির এক অভিনব উপ-পত্তি স্থির করিয়াছেন। তিনি বলেন—একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু মনুষ্যের রক্তে সংক্রা-মিত হইলে এই রোগের উৎপত্তি হয়। ঐ জীবাণু ম্যালেরিয়া পীড়াগ্রস্ত জীবের রক্ত পরীক্ষা করিলে অণুবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে সহজেই ধরা পড়ে। তিনি নানাপ্রকার পরীক্ষা ও বহু গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন যে এই সংক্রামণকার্য্য এনোফিলিস্ নামক একপ্রকার মশক সাহায্যে সম্পন্ন হয়। মশকেরা যে পীড়িত মনুষ্যের রক্ত শুষিয়া লয় তাহার সঙ্গে সঙ্গে ম্যালে-রিয়া জীবাণু মশকদেহে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। অধিকাংশ মশকেই রক্তের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত জীবাণুকে পরিপাক করিয়া ফেলে। কিন্তু এনোফিলিস মশকের দেহে এক অভিনব অজ্ঞাত রহস্য আছে যাহাতে উক্ত জীবাণু লুপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, তথায় নববল লাভ করে ও উক্ত মশকদষ্ট নূতন মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হইয়া শীঘ্র শীঘ্র বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে। রক্তের

এই অবস্থান্তর রোগী প্রথমে জানিতে পারে না। প্রায় একাদশ দিবসে সমগ্রদেহে জীবাণুদিগের ক্রিয়া অনুভূত হয় ও রোগী পিপাসা কম্প ইত্যাদি অনুভব করে। ইহাকেই আমরা জর আসা কহিয়া থাকি।

গত ১৮৯৯ সালে মান্দ্রাজের জনৈক সাহেব চিকিৎসক রোনাল্ড রস এই মত বিস্তার করিয়া উপপত্তিটীকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত করেন। অনেকেই ইহা শুনিয়া থাকিবেন এবং অধিকাংশস্থলেই ইহা বৈজ্ঞানিক কল্পনা বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে। নিশ্চেষ্ট জীবের ধর্ম্মই এই রকম। পাশ্চাত্যখণ্ডে কিন্তু যথনি তাড়িতবার্ত্তা দ্বারা এই মত প্রচারিত হইল, শত শত চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা ইহার সত্যতা প্রতিপাদন করিলেন। অতঃপর সিদ্ধান্ত হইল যে ম্যালেরিয়ারোগী ও উক্ত জীবাণুর অনুকূল এনোফিলিস্ উভয়ের সংযোগ ব্যতীত ম্যালেরিয়া হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। উক্ত মশকই এই রোগ সংক্রামণ করিবার এক মাত্র সহায়। কারণ একটী এনোফিলিস্ দ্বারা এক জন মাত্র পীড়িত লোকের রক্ত দশ বিশ জন লোকের দেহে সংক্রামিত হইতে পারে।

সুতরাং তাঁহাদের প্রথম চেষ্টা হইল এই মশকবংশ ধ্বংস করা। আমাদের রহস্তপ্রিয় বন্ধুবর্গ ইহারই নাম দিয়াছেন "মশা মারিতে কামান পাতা"।

এই মশকবংশ ধ্বংস করিতে গেলে প্রথম কার্য্য এনোফিলিস্ নির্ব্বাচন। বৈজ্ঞানিকেরা যখন দেখিলেন যে মশক জীবনের সঙ্গে মনুষ্যজীবনের এ প্রকার রহস্যময় সংসর্গ রহিয়াছে, তখন তাঁহারা মশকজীবনের তথ্য সংগ্রহে সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিলেন। বিভিন্ন প্রকার মশকদিগের বৈষম্য নির্ব্বাচিত হইল, উহাদিগের উদ্ভব স্থিতি ও লয়ের সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের মীমাংসার গুটি কয়েক সিদ্ধান্ত নিম্নে সংগৃহীত হইয়াছে।

২য় মশকমাতা প্রধানতঃ দূষিত জলে ডিব ত্যাগ করে। ঐ ডিম্ব হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট জলে উৎপন্ন হয়। ইহাদিগকে আমরা পানীয় জলে দেখিলে 'জলের পোকা' হইয়াছে বলিয়া থাকি। এই পোকা কিছু দিন বাদে রূপান্তর হইয়া গুটী ও গুটী হইতে মশক দেহ প্রাপ্ত হইয়া জল হইতে উড়িয়া বাতাসে আশ্রয় লয়। [চিত্র দেখ।]

৩য়। জলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা অতিবাহিত হইলেও উহারা জলের জীব নয়, তাহার প্রমাণ ঐ অবস্থায় উহারা প্রতি মিনিটেই জলের উপরিভাগে আসিয়া শ্বাস প্রশ্বাস লয়। কোন প্রকার আবরণ জলের উপর দিয়া উহাদের এই নিশ্বাস লওয়ার কার্য্য বন্ধ করিলে উহারা মরিয়া যায়।

৪র্থ। পুরুষ মশকেরা লোকালয়ে আসে না। উহাদের রক্ত-মোক্ষণ করিবার যন্ত্র নাই। সুতরাং যত লক্ষ লক্ষ মশা রাত্রে আবাস গৃহে দেখা যায় উহারা সকলেই স্ত্রীমশা। তাহাদের প্রত্যেকেরই দংশন করিবার জন্ত একটী বৃহৎ হুল আছে। তুলসীদাস যথার্থই বলিয়াছেন "রাতকা বাঘিনী দিনকা মোহিনী পলক পলক লহু চোষে"।

ম্যালেরিয়া মশার চিত্র।

VISVAKOSHA PRESS.
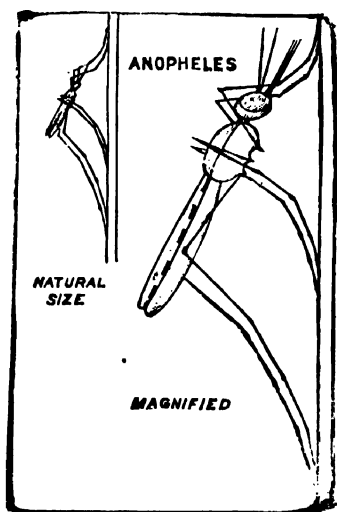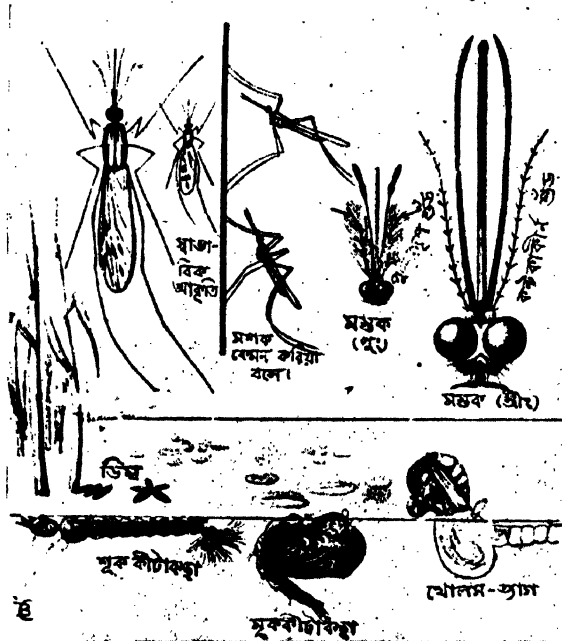
৩য়। অন্যান্য মশকেরা যেখানে একটু অপরিষ্কার জল পায়, সেখানেই ডিম্ব ত্যাগ করে। কিন্তু যে সকল ডোবার চারি পাশে নলখাগড়া বা অন্য প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিজ্জ জন্মায়, এনোফিলিস্ সেই খানে ডিম পাড়ে।

৪র্থ। মশকদিগের এই সকল পোকা মৎস্যদিগের আহার। মাছের 'পোনা' সকল, বিশেষতঃ রূপচেলা, তেচোকো প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎস্যেরা ইহাদিগকে দেখিতে পাইলেই খাইয়া ফেলে। কিন্তু নলখাগড়া ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া খাইতে পারে না।

৫ম। এই বাঘিনীরা জন্মস্থান হইতে ৪০০ হাতের অধিক দূর সাধারণতঃ যাইতে পারে না। এবং যেখানে মনুষ্যের রক্ত খাইতে পায় তাহারই নিকটে কোন অন্ধকার স্থানে দিনে লুকাইয়া থাকে। দিবসে বাহির হয় না।—জাত বাঘিনী কি না!

৬ষ্ঠ। যদি স্ত্রীমশকেরা মনুষ্যরক্ত পান করিতে না পায় তাহা হইলে ইহাদিগের বংশবৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়, এই জন্যই লোকালয়ে মশকবংশের এত প্রাদুর্ভাব ও অন্যত্র ইহারা এত সুদুর্লভ।

৭ম। তরুণ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীদিগের কুইনাইন সেবনের সঙ্গে সঙ্গে রক্তে ম্যালেরিয়া জীবাণুর সংখ্যা হ্রাস হইতে আরম্ভ হয় এবং কিছু দিন সেবনের ফলে জীবাণু সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়।

৮ম। যে সকল সুস্থ ব্যক্তি সপ্তাহে দুই দিন ৮।১০ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন সেবন করেন, তাঁহাদিগকে উক্ত এনোফিলিস্ ম্যালেরিয়া জীবাণু সংক্রামিত করিলেও উক্ত জীবাণু পরি-পোষক উপাদান অভাবে পরিপুষ্ট হইতে পারে না, সুতরাং সুস্থ ব্যক্তি জ্বর দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারেন না।

৪র্থ অধ্যায়—উক্ত উপায় সকল অন্যত্র অবলম্বনের ফলাফল।

এই সকল তথ্য সংগ্রহের পর বৈজ্ঞানিকেরা উহা প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বৃটিশশাসিত রাজ্য সমূহে রোনাল্ড রস স্বয়ং এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন। জর্ম্মণ পণ্ডিত কক্ সাহেব জর্ম্মানশাসিত রাজ্যসমূহে ও দেশবিখ্যাত চেলী সাহেব ইটালীতে কার্য্যারম্ভ করিলেন। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত পন্থা অনুসৃত হইয়াছিল :—

১ম। ম্যালেরিয়াদুষ্ট প্রদেশ সমূহ হইতে জল নিকাশের বন্দোবস্ত করা। পঙ্কিল পয়ঃপ্রণালীসম্বদ্ধ আবিল জল সম্পূর্ণরূপে ও দ্রুতভাবে দূরে প্রেরণ করা।

এ কার্য্য বিস্তর অর্থসাপেক্ষ। আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল প্রজাশক্তির ক্ষমতার বাহিরে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে রাজা এবিষয়ে সাহায্য করিতেছেন সে সংবাদ হয়ত অনেকে রাখেন না।

২য়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের উচ্ছেদ। এই সকল অব্যবহৃত ডোবা মশক উৎপাদনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। এই প্রকার জলাশয় মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে অসংখ্য আছে। সবগুলি বুঁজাইয়া ফেলা অসম্ভব, সুতরাং তদভাবে—

৩য়। দুর্গন্ধ অব্যবহৃত জলাশয়গুলিতে মাঝে মাঝে কেরোসিন তৈলের একটা আবরণ দেওয়া; তাহাতে মশক পোকা মরিয়া যায়। ব্যবহৃত পুষ্করিণীতে প্রচুর মৎস্য ছাড়িয়া দেওয়া ও চারি পাশের সমস্ত জঙ্গলের উচ্ছেদ করা। এবং

৪র্থ। বাসগৃহের নিকট ৪০০ হস্তের মধ্যে এনোফিলিস্ উৎপন্ন হইবার উপযোগী কোন প্রকার বৃহৎ বা ক্ষুদ্র জলাশয় না রাখা। এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতার প্রয়োজন। গোক্ষুরখাত ক্ষুদ্র গর্ত্তে শত শত মশক কীট দেখা যায়। সাহেবদিগের নিত্য সযত্নসিক্ত ফুলগাছের টব উক্ত মশকদিগের বিস্তীর্ণ জন্ম ও লীলাক্ষেত্র।

৫ম। সন্ধ্যার পর সম্পূর্ণরূপে দেহ আবৃত রাখিয়া বাহির হওয়া ও মশারী দ্বারা দেহ রক্ষা করিয়া শয়ন করা।

ষষ্ঠ। আবাস ঘরে দরজা জানলা এ রকম ভাবে প্রস্তুত করা যাহাতে মশক প্রবেশ লাভ না করিতে পারে। বাঙ্গালী শুনিয়া অবাক্ হইবেন অনেক স্থানে এ পরীক্ষা সত্য সত্য করা হইয়াছে এবং সাহেবেরা তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

৭ম। যখন ম্যালেরিয়ার এপিডেমিক আরম্ভ হয়, তখন সকলেরই সপ্তাহে দুইদিন উপরি উপরি দশগ্রেণ করিয়া কুইনাইন সেবন করা।

এই প্রকার পন্থা পৃথিবীর বহু স্থানে অনুসৃত হইয়াছিল। তাহার ফলাফল নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

১। ইস্মালিয়া—সুয়েজখাল উৎখাত হইলে তাহার তীরে অনেকগুলি উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ইস্মালিয়া তাহাদিগের অন্যতম। এই সহরে প্রথমে কোন প্রকার ম্যালেরিয়া ছিল না। পানীয় জলের অত্যন্ত অসদ্ভাব হওয়াতে নিকটবর্ত্তী নদী হইতে খাল কাটিয়া মিঠা জলের আমদানী করা হইল। জলের দুঃখ দূর হইল বটে, কিন্তু ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইল। ফল ১৫ তালিকার (ক) দ্রষ্টব্য। ম্যালেরিয়ার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিয়া রস্ সাহেব ১৯০২ সালে তথায় পূর্ব্ববর্ণিত ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। কত শীঘ্র কত সুফল ফলিয়াছে পরবর্ত্তী কয় সনের জ্বর-সংখ্যার হ্রাসই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

২। সুইটেনহাম—মালয় উপদ্বীপে সুইটেনহাম বন্দরে রোগসংখ্যা ১৫ তালিকার (খ) অংশে প্রদত্ত হইয়াছে। সহরে ১৯০১ সাল হইতে উক্ত নিয়মগুলি প্রতিপালিত হওয়াতে রোগীর সংখ্যার উত্তরোত্তর হ্রাস ও মফঃস্বলে কোন প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন না করাতে রোগীর সংখ্যার বৃদ্ধি তালিকায় পরিস্ফুট হইতেছে।

৩। পানামা—পানামা-যোজকের গত ২০ বৎসরের ইতিহাস এই উপপত্তির সত্যতা সমর্থন করিবে। অধিকাংশ পাঠকই জানেন যে, সুয়েজ যোজকে কৃত্রিম খাল খননকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া লেসেপ্ সাহেব জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত পানামা যোজক কাটিয়া উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যভাগ দিয়া জাহাজ যাতায়াতের একটী খাল খনন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। এই কার্য্য নানা কারণে তিনি অসম্পূর্ণ

রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে প্রধান কারণ ম্যালেরিয়া ও পীতজ্বর। এই দুই রোগে শত শত কুলী মারা যাইতে লাগিল। তখনকার বিজ্ঞানসম্মত সকল প্রকার চিকিৎসা ইহা প্রতিরোধ করিতে কৃতকার্য্য হয় নাই।

এখন কিন্তু রস সাহেবধৃত ম্যালেরিয়ার জ্বরের উপপত্তির সঙ্গে সঙ্গে পীতজ্বরের উপপত্তিও স্থিরীকৃত হইয়াছে। উক্ত রোগটীও Stegomaya Fasciata নামক অন্য এক প্রকার মশক হইতে উদ্ভূত। সুতরাং মশকবংশ উচ্ছেদকার্য্য দৃঢ়ভাবে পরিচালিত করিয়া বর্ত্তমান কার্য্যের সম্পাদক গার্গাস সাহেব এই রোগের হস্ত হইতে কুলীদিগকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"অয়নান্তবৃত্ত মধ্যে যে দুই ভয়াবহ লোকক্ষয়কর রোগে এত দিন লোক ধ্বংস হইত, এখন নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইল যে উভয়কেই সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করিতে পারা যায়। এই প্রণালী যুগপৎ সহজ ও অল্প অর্থব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং পৃথিবীর আদিমকালে যেমন উষ্ণপ্রদেশ সভ্যতার আদর্শ স্থল ছিল, পুনরায় ভবিষ্যতে উহা আবার মনুষ্যসমাজের ধনজন ও সভ্যতা এবং সমৃদ্ধির কেন্দ্র হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"

৪। ইটালী—ইটালীর সঙ্গে ভারতবর্ষের সাদৃশ্য অনেক বিষয়ে। উভয় দেশেই বিস্তীর্ণ সমতল শস্যক্ষেত্র, বৃহৎ জলাভূমি এবং উভয় ভূখণ্ডই অর্দ্ধভুক্ত অনশনক্লিষ্ট কৃষকসমাকুল। এই ইটালী প্রাচীন-কাল হইতেই ম্যালেরিয়ার লীলাভূমি। এই রোগও তদ্দেশবাসীর জাতীয় উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়। এমন কি, এক জন বিখ্যাত লেখক এক মাত্র ম্যালেরিয়া রোগকেই গ্রীস ও রোমদেশের অধঃপতনের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ম্যালেরিয়ায় জীবনী-শক্তি কি পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়, সন্তানসন্ততি কি প্রকার দুর্ব্বল হইয়া জীবনসংগ্রামে অক্ষম হয়, তাহার প্রমাণ আমাদের ঘরে ঘরে; তজ্জন্য বাঙ্গালীর নিকট ইটালীর দৃষ্টান্ত দেখাইবার প্রয়োজন নাই।

এতকাল বাদে চেলী সাহেবের প্রভূত চেষ্টায় ও তথাকার Anti-malarial Leagueএর সাহায্যে ইটালীবাসীরা এই বিপদ্ সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছে। সমগ্র রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি এই রোগ নির্ম্মূল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। প্রফেসর চেলী অনেক চেষ্টার পর আইন করাইয়া লইয়াছেন যে, কুইনাইন তথায় বিনা মূল্যে বিতরিত হইবে। তিনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে এক স্থানে বলিয়াছেন Malaria একটী "unfall" অর্থাৎ দুর্ঘটনা মাত্র। উক্ত রোগে মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে যদি কেহ মারা যায়, তবে তাঁহার আত্মীয় চেয়ারম্যানের নিকট ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লইতে পারেন, কেন না মিউনিসিপ্যালিটীর সতর্কতার অভাবই তাহার প্রমাণ"। কথাগুলি আমাদের বর্ত্তমান সমাজ ও দেশের তুলনায় প্রলাপ বলিয়া মনে হয় না কি?

এতক্ষণে দেখা গেল যে, রস সাহেবধৃত উপপত্তির প্রয়োগে পৃথিবীর বহু স্থানে সুফল পাওয়া গিয়াছে, রোগসংখ্যা বহুস্থানেই প্রভূত পরিমাণে দমিত হইয়াছে এবং অনেক

স্থানে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন এই ম্যালেরিয়া রোগের আকরভূমি বাঙ্গালা দেশে গবর্ণমেণ্ট কোন পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কি? নিম্নে তাহার ফলাফল দেওয়া গেল।

২। কুইনাইনের মূল্য হ্রাস করা হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে যাহাতে উহা লভ্য হয়, তজ্জন্য ডাকঘরে উহা বিক্রয়ার্থ রাখা হইয়াছে।

২। মিয়ানমিরে বৎসর কয়েক ধরিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল।

৩। এই রোগের প্রসার ও কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য ড্রেনেজ কমিটী নামক একটী সমিতি দ্বারা গবর্ণমেণ্ট প্রেসিডিন্সী ডিবিজনে দুই জন বিচক্ষণ সাহেব ডাক্তার নিযুক্ত করেন। তাঁহারা বিভিন্ন জেলা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

(ক) কতকগুলি বদ্ধ নদী উন্মুক্ত করিতে হইবে। যথা—মাথাভাঙ্গা, কুমার, ভৈরব, নবগঙ্গা ইত্যাদি।

(খ) কতকগুলি খাল খনন করিয়া দেশের জল সহজে নিকাশ করিতে হইবে। শুনিলাম, এই উপদেশ অনুযায়ী মগরাহাট ও বাগজোলার খাল খননকার্য্য শেষ হইয়া আসিতেছে।

(গ) পূর্ব্ববর্ণিত স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি নিম্নপ্রাথমিক ও মধ্যবাঙ্গালা স্কুলের পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিয়া দিতে হইবে। শুনিলাম, এ কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে।

(ঘ) মহেশপুর, মুর্শিদাবাদ, মণিরামপুর ইত্যাদি কতকগুলি মিউনিসিপ্যালিটীতে স্যানিটারী কমিশনারের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা চলিতেছে। এক জন সিবিল-সার্জ্জন, দুইজন এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও জন কয়েক সহকারী এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু আমরা কি করিতেছি? যাহাদিগের ঘরে ঘরে যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ, তাহারা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট। সম্মুখে প্রভূত কার্য্য স্তূপীকৃত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা বিতরণ করিয়া লোকসমাজকে শিক্ষিত করিতে হইবে। ম্যাজিক-লণ্ঠন ও অন্য উপায়ে এনোফিলিস মশক নির্ব্বাচন শিক্ষা দিতে হইবে। সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে সভা-সমিতি করিয়া কি প্রকার উপায় অবলম্বন করিলে সহজে ও সুলভে ফল পাওয়া যাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত বা পয়ঃপ্রণালী সামান্য চেষ্টাতেই পরিষ্কার হইতে পারে। গ্রামবাসীদিগকে এই বিষয়ে প্রণোদিত করিতে হইবে। শিক্ষিতসমাজের এই গুলি কঠোর কর্ত্তব্য।

অনেকে বলেন, ম্যালেরিয়ার গ্রাম ধ্বংস হওয়াতে আমাদের দেশের শিল্পসকল লোপ পাইয়াছে। এ যুক্তি আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। ম্যালেরিয়া ও বিদেশী বাণিজ্য এই দুইটী কারণের সমবায়ে গ্রামসকল ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইয়াছে; হয়ত বিদেশী বাণিজ্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অপারক হইয়া গ্রামবাসীরা নিঃস্ব হইয়া পড়িল। অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাপন্ন লোক গ্রাম ছাড়িয়া বিদেশে চাকুরীর সন্ধানে গেল, কেহবা জাতি-ব্যবসায় ছাড়িয়া অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিল। যাহারা দুই বিষয়েই অপারক, তাহারা স্বীয় গ্রামে অস্বাস্থ্যকর

ভাবে জীবনযাপন করিতে লাগিল। গ্রামে লোকের সংখ্যা হ্রাস হওয়াতে ও অধম ব্যক্তির প্রাধান্য হওয়াতে পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত রাস্তা, পথ এবং প্রণালী পরিষ্কার হইল না। বিদেশে যাহারা বাস করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের বসতবাড়ী জঙ্গলে আবৃত হইয়া গ্রামবাসীদিগের অস্বাস্থ্যের কারণ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে যাহারা অবশিষ্ট রহিল,তাহারা আর পূর্ব্বের মত শিল্পের উন্নতি করিতে পারিল না। এই রকম করিয়া শিল্পের লোপ হইয়াছিল। উক্ত বর্ণনাটি কাল্পনিক নয়। পরিপোষক মতস্বরূপ, নদীয়াজেলার তদানীন্তন ডিষ্ট্রীক্টম্যাজিষ্ট্রেট অনারেবল কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহোদয় উক্ত জেলার অবনতির কারণ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহার সার বাঙ্গালায় সংকলিত হইল :—

'বিদেশী বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্ব্বত্রই দেশীয় শিল্পের লোপ হইতেছে,—শান্তিপুর ও কুমারখালির সুতীকাপড়ের আর তেমন সমৃদ্ধি নাই,হরিণঘাটার ছুরী কাচী ইত্যাদির ব্যবসায় প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। যেখানেই যাও দেখিবে, প্রায় অধিকাংশ সমৃদ্ধিশালী গ্রামেই অবনতির করাল ছায়া পড়িয়াছে। চতুর্দ্দিক্ জঙ্গলে পরিপূর্ণ; গৃহসকল অধিকাংশই ভগ্নস্তূপ মাত্র। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জমিদার ও সদাশয় মহাত্মাদিগের দত্ত পুষ্করিণীগুলির পঙ্কোদ্ধার মাত্র হয় না। পুষ্করিণীসকল বহুবৎসরজাত জলজউদ্ভিদে পরিপূর্ণ। অধিকাংশ অধিবাসী গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। গ্রামে বসিয়া আর পারিশ্রমিক পাইবার ভরসা নাই, স্থান পূর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর; সুতরাং অধিকাংশ লোক কলিকাতা ও পশ্চিম অঞ্চলে আশ্রয় লইয়াছে। সমগ্র জেলাটীতে গঙ্গার শাখাপ্রশাখা দিয়া বাণিজ্যপণ্য নৌকাপথে গমনাগমন সহজসাধ্য ছিল। এই সকল নদীর উভয় পার্শ্বস্থ অনেক সমৃদ্ধ বন্দরে নানাপ্রকার বাণিজ্যদ্রব্যের আগম নির্গম হইত। উত্তর বাঙ্গালা ও সুদূর উত্তরপশ্চিম হইতে দেশী নৌকায় দ্রব্যসম্ভারে নদীর উভয়কূলের অসংখ্য গ্রাম লক্ষ্মীশ্রীতে সমুজ্জ্বল ছিল। কিন্তু এখন 'তেহি নো দিবসাগতা'—সে দিন আর নাই। নদীর প্রাচীন খাতসকল ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। গ্রীষ্মকালে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র মহাজনী নৌকার চলাচল পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই বাণিজ্যের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ও ধ্বংসের সর্ব্বপ্রধান কারণ রেলগাড়ীর সৃষ্টি।"

স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় আবার একপদ অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, রেলগাড়ীর চলাচলের জন্য যে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে উহাই ম্যালেরিয়ার মূলকারণ। এই রেলরাস্তা বাণিজ্য-সুগম সহরের নিকট দিয়া গিয়াছে; সুতরাং প্রায়ই দেশের জলনিকাশের বিপরীত দিক্ দিয়া লওয়া হইয়াছে। বাঁধের দুইধারে যে সকল কৃত্রিম খাত করা হয়, তাহাতে পর্য্যুষিত জল যে ম্যালেরিয়া বিস্তারের সহায়তা করে না এ কথা বলাকঠিন। ইটালীর পণ্ডিত গালা (ভেলিরিও) Galla Valerio উপদেশ দেন যে, রেললাইন করিবার সময় উভয়-পার্শ্বে খাত করিতে দেওয়া উচিত নয়। তাঁহার মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—'ইটালী ও ভারতবর্ষে রেলের সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার বিস্তার হইয়াছে এবং উভয়দেশেই লাইনের নিকট-বর্ত্তী স্থানসকল সর্ব্বদাই অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে, সম্প্রতি মুর্শিদাবাদে গত তিনবৎসর উপর্য্যুপরি

ম্যালেরিয়ার বিষম প্রকোপ হইয়াছে। পূর্ব্বে এ প্রকার দুরবস্থা ছিল না। প্রায় তিন চারি বৎসর হইল মুর্শিদাবাদ রেল-লাইন সহরের নিকট দিয়া গিয়াছে। তত্রত্য সিভিল-সার্জ্জন সাহেব এই রেললাইন এর উপর জ্বর-সংখ্যাবৃদ্ধির আরোপ করিয়াছেন।'

আমাদের গ্রাম ও জনপদগুলিকে উদ্ধার করিতে হইলে এক সঙ্গে দুই বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। প্রথম আত্মরক্ষা, দ্বিতীয় শিল্পোন্নতি। আজ কাল শিল্প উন্নতির দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে—সমস্ত শক্তি সেই দিকে চালিত হইয়াছে। শত শত মহাপুরুষ নানাপ্রকার কলকারখানা করিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া গ্রামগুলিকে সজীব করিবার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু কেবল শিল্পোন্নতি হইতে কিছু ফল হইবে না। তৎসঙ্গে এমন কি, তৎপূর্ব্বে গ্রামসকলের স্বাস্থ্য উন্নত করিতে হইবে, ম্যালেরিয়া-রূপী মহাসুরকে বিতাড়িত করিতে হইবে। অক্ষয়কুমার দত্ত মহোদয়ের সেই কয়েক পংক্তি আবার উদ্ধৃত করিতেছি, কারণ, উহা বড়ই মূল্যবান্—

"স্বজাতির উন্নতি-প্রত্যাশার পূর্ব্বে তদীয় শারীরিক অবস্থা ও জন্মস্থিতিলয়ের বিষয় এক-বার লক্ষ্য করা আবশ্যক। শারীরিক উন্নতি সকল উন্নতির মূলীভূত।

বিচিত্র করিতে গৃহ যত্ন কর প্রাণপণে।
কিন্তু গৃহমূলক্ষয় হইতেছে দিনে দিনে॥"

প্রথম তালিকা।

লোকসংখ্যার উন্নতি অবনতি শতকরা হিসাবে :—

(উন্নতি,—অবনতি)

	১ম গণনা	২য় গণনা	৩য় গণনা	মন্তব্য
স্থান—	১৮৭২-৮১	১৮৮১-৯১	১৮৯১-১৯০১	
ভারতবর্ষে	২৩.১	১৩.১	২.৪	
বঙ্গ (পুরাতন)	১১.৫	৭.৩	৫.১	
পশ্চিমবঙ্গ	—২.৭	৬.৯	৭.১	
মধ্যবঙ্গ	১১.৭	৩.১	৫.১	
পূর্ব্ববঙ্গ	১০.৯	১৪.১	১০.৪	

দ্বিতীয় তালিকা।

প্রেসিডেন্সি ডিবিজনে লোকসংখ্যার

উন্নতি,—অবনতি।

জেলা	১৮৭২-৮১	৮১-৯১	১৮৯১-১৯০১
চব্বিশপরগণা	৬'২	৩'১	৯'৮
যশোর	৩৩'৬	২'৬	—৪'২
খুলনা	৩'১	৯'৯	৬'৪
নদীয়া	১০'৮	—১'১	১'৪
মুর্শিদাবাদ	১'০৪	১'৯	৬'৫

তৃতীয় তালিকা।

চব্বিশপরগণার উপবিভাগসমূহে লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি, শতকরা হিসাবে।

ক। মিলবহুল স্থান—

উপবিভাগ	১৮৮২-৯১	১৮৯১-১৯০১
খড়দহ	+১৫'৯	+৭'৯
নৈহাটী	+১১'৮	+১১'৮
বজ্‌বজ্‌	+১৪'৩	+১২'৭
বরাহনগর	+১৪'৩	+১২'৭
সদর	১১'৮	+৮'৯

খ। মিলবিহীন স্থান—

উপবিভাগ	১৮৮২-৯১	১৮৯১-১৯০১
নবাবগঞ্জ	+৬৯'২	+৭'৯
বারাসত	+৩'৪	+১'৩
দেগঙ্গা	—৫'৪	—৯'৯
হাবড়া	—৫'৪	—০'৯
দমদম	+১৮'৮	+১'৪

চতুর্থ তালিকা।

বিভিন্ন বৎসরে হাজার প্রতি মৃত্যুসংখ্যা—

দেশ	১৮৯১	১৮৯৩	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬
ইংলণ্ড ও ওয়েলস্‌	১৯'৮	১৭	১৫'৪	১৫'৩	১৫'২	১৪'১
বঙ্গদেশ	২৬'৯	৩১'০২	৩৩'৩	৩২'৫	৩৮'৬	৩৬
বোম্বাই	২৭'২	৩১'২	...	৪১'৪	৩১'৮	...
মাদ্রাজ	২৬'২	২২'৩	...	২২'৫	২১'৪	...

পঞ্চম তালিকা।

গত বিংশ বৎসরে বঙ্গে মৃত্যুসংখ্যা হাজার প্রতি—

১৮৮৫—২৩

১৮৯৫—৩১

১৯৭৪—৩২

১৯০৫—৩৯

ষষ্ঠ তালিকা।

বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জ্বররোগে হাজারপ্রতি মৃত্যুসংখ্যা, ১৯০০ হইতে ১৯০৪ সালের হারাহারী—

প্রেসিডেন্সী	২৪·৮
বর্দ্ধমান	২০·৫
পাটনা	২১·৫
ভাগলপুর	২৩·৯
উড়িষ্যা	১২·৯
ছোটনাগপুর	১৬·৭
সমগ্র জেলা	২১·৭

সপ্তম তালিকা।

লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি শতকরা হিসাবে।

স্থান	১৮৯১-১৯০১	মন্তব্য
ভারতবর্ষ	+২·৪	
বঙ্গদেশ	+৫·১	
যুক্তসাম্রাজ্য	+৯·৯	
ইংলণ্ড ও ওয়েলস্	+১১	
স্কটলণ্ড	+৯	
আয়র্লণ্ড	−৮	
নিউজিলণ্ড	+২১·৮	
অষ্ট্রেলিয়া	+২৮·৬	
হংকং	+৯	
সিংহল	+১৮·৬	
যুক্তরাজ্য আমেরিকা	+২১·০	
নেটাল	+৫৪·২	

অষ্টম তালিকা।

বিভিন্ন দেশের জন্মহার হাজার লোকপ্রতি—

দেশ	১৮৮১	১৮৯০	১৯০১	১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬
বঙ্গদেশ	৪৭·৯	৫১·৮	৪৩·৯	৪২·৩	৩৯·৫	৫৭·২২
ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স	৩৪·৭	৩০·২			২৭·২	২৭
বেলজিয়ম	৩১·৫	২৮·৭				
জর্ম্মণরাজ্য	৩৮·৯	৩৫·৭				

নবম তালিকা

১৯০৬ সালে হাজার প্রতি শিশুদিগের মৃত্যুসংখ্যা

সহর	সংখ্যা	হারাহারী
ম্যানচেষ্টার	১৫৭	
বর্ম্মিংহাম	১৫৪	
লিভারপুল	১৫৩	১৪৬·১
এডিন্‌বর্গ	১৩৩	
গ্লাসগো	১৩১	
কলিকাতা		৩০৪·

দশম তালিকা।

লণ্ডন ও কলিকাতার মৃত্যুসংখ্যার তুলনা শতকরা হিসাবে—

সহর	১৮৬০	১৮৭০	১৮৮০	১৮৯০	১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬
লণ্ডন	২৪·৪	২২·৫	২০·৫	১৯·৬	১৬·৬	১৫·৬	১৫·৭
কলিকাতা	*	*	*	৩১·৬১	৩২·২	৩৮	৩৫·৭

একাদশ তালিকা।

১৯০৬ সালে প্রতীকারযোগ্য ও অন্যান্য রোগে বিলাত ও বঙ্গদেশে মৃত্যুসংখ্যার তুলনা হাজার জন লোকের প্রতি—

	ইংলণ্ড ও ওয়েলস	বাঙ্গালা
১। প্রতিকারযোগ্য রোগ যথা—হাম বসন্ত, টাইফয়েড জ্বর, বাত, নিউমোনিয়া ইত্যাদি	৫·৪২	৫·১৫
১ক। যথা—ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, কলেরা ইত্যাদি	... ...	২৩·৯৭

২। দুর্ঘটনা ...	০.৪৪	০.৫৩
৩। অন্যান্য কারণ	৬.১৮	৬.৪৭
	১৪.১৪	৩৬.১১

দ্বাদশ তালিকা।

বিভিন্ন রোগে মৃত্যুসংখ্যা হাজার জন প্রতি, ১৯০৬ সালে—

	জ্বর	বিসূচিকা	বসন্ত	সমগ্র মৃত্যুসংখ্যা
কলিকাতা	৪.৫৮	২.৯৫	৩.৪২	৩৫.৭৩
বাঙ্গলার সহর সকল	১৪.৩৭	৩.০৩	০.৬৪	৩৭.৭৮
প্রেসিডেন্সী ডিবিজন	২২.৯৮	৩.৫৮	০.৫৪	৩৪.৬৬

ত্রয়োদশ তালিকা।

যশোরে দশ বৎসরে অর্দ্ধ হ্রাস—

থানার নাম	লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি		সমগ্র জন্ম	সমগ্র মৃত্যু	হ্রাসবৃদ্ধি জন্মমৃত্যু
	১৮৯১-১৯০১	১৮৮১-১৮৯১	১৯০১-১৯০১	১৯০১-১৯০৬	
ঝড়কালিয়া	৪.৯	১১.৭	১৫,৮৯৭	১৪,৪১৩	১,৪৮৪
কোট চাঁদপুর	—২.৫	—৬.১	৫,৪৪৯	৬,৪৫৬	—১,০০৭
লোহাগড়া	—২.৫	১১.২	২১,২৫৮	২০,৫৭১	৬৮৭
পদ্মখালি	—৪.৬	—৫.৫	১০,৪৮৪	১০,৬৩২	—১৪৮
সর্ষা	—২.৯	—১১.১	১২,৪০৭	১২,৫১৭	—১১০
যশোর	—৭.৫	—৫.৬	২১,১২৩	২৪,৬৮৯	—৩,৫৬৬
মণিরামপুর	—৪.৯	—৩.৮	২১,৪৫২	২৫,১৯১	—৩,৭৩৯
কেশবপুর	—৭.৫	—৩.০	১২,৬৮৯	১৩,৪৪১	—৭৫২
মহেশপুর	—৩.৬	—৮.২	১৬,০৩৫	১৯,১৫৬	—৩,১২১
বনগাঁ	—৪.৬	—৭.৪	১৮,৩২৯	২১,৬৬৯	—৩,৩৪০
নড়াইল	১.৭	০.১	২৬,৪৭০	৩২,০১২	—৫,৫৪২
গোলকোপা	—০.৪	০.৪	২৯,৭৭৬	৩৫,৬০২	—৫,৮২৬
কালীগঞ্জ	—২.১	—৬.০	১১,৮৮৮	১৬,১৭২	—৪,২৮৪
মহম্মদপুর	—৮.৫	৮.৩	১৪,৯৯৯	১৭,৫৮৪	—২,৫৮৫
মাগুরা	—৯.৭	৪.৩	২৩,১০৬	৩২,৩৪২	—৯২৩৬
বাঘেরপাড়া	—৫.৯	—৯.৮	৯,২৭৫	১১,৯০৯	—২৬৩৪
পাইকাচা	—৪.৪	—৯.৭	৭,৯৯৪	৩০,০৪৭	—২০৫৩
শালিখা	—৪.৩	—৮.০	৭,৩২১	১০,৬৬৫	—৩৩৪৪
ঝিনাইদহ	—৫.৮	—১২.৩	১৩,০৭৫	১৭,৯০৭	—৪৮৩২
সমগ্র জেলা	—৪.০	—২.৬	২,৯৯,০২৭	৩,৫২,৯৭৫	—৫৩,৯১৮

চতুর্দ্দশ তালিকা।

প্রেসিডেন্সী বিভাগে জ্বররোগে মৃত্যুসংখ্যা, ১৯০১—১৯০৫ পর্য্যন্ত—

জেলা	সংখ্যা
যশোহর	৩২.৪
নদীয়া	৩৩.৩
মুর্শিদাবাদ	২৯.৭
খুলনা	২০.৮
চব্বিশপরগণা	১৮.৩
সমগ্র মৃত্যুসংখ্যা প্রেসিডেন্সী ডিবিজনে	৩৪.৬

পঞ্চদশ তালিকা।

ম্যালেরিয়া-জ্বরে মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস করিবার চেষ্টার ফলাফল।

ক। ইস্‌ম্যালিয়ার মৃত্যুসংখ্যা :—

১৮৭৭ সালে	৩০০	১৯০০ সালে	২২৮৪
১৮৮২ "	৪৮০	১৯০১ "	১৯৯০
১৮৮৭ "	১৮০০	১৯০২* "	১৫৫১
১৮৯২ "	২০৫০	১৯০৩ "	২১৪
১৮৯৭ "	২০৮৯	১৯০৪ .	৯০
১৮৯৯ "	১৭৮৪	১৯০৫ "	৩৭

* ১৯০২ সালে জ্বরের বিরুদ্ধে নূতন মতে কার্য্য আরম্ভ হয়।

খ। সুইডেনহামবন্দর—জ্বরসংখ্যা :—

বৎসর	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫
সহর	৬১০*	১৯৯	৬৯	৩২	১৩
জেলা	১৯৭	২০৪	১৫০	২৬৬	৩৬৩

* সহরে ১৯০১ জ্বরের বিরুদ্ধে কার্য্য আরব্ধ হয়, মফঃস্বলে কোন কার্য্য করা হয় নাই।

গ। হাভানায় ম্যালেরিয়া-জ্বরে মৃত্যুসংখ্যা :—

বৎসর	সংখ্যা	বৎসর	সংখ্যা
১৮৮০	৩২৫	১৯০১	১৫১
		১৯০২	১৭৭
১৮৮৮	১০১	১৯০৩	৫১
১৮৯০	১৭০	১৯০৪	৪৪
১৮৯৫	২০৬	১৯০৫	৩২
১৯০০	৩৪৪	১৯০৬	২৬

১৯০১ সাল হইতে নূতন মতে জ্বরের বিরুদ্ধে কার্য্য আরব্ধ হয়।

শ্রীচিত্তসুখ সান্যাল বি, ই,

শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ বি

সূর্য্যপদে উপানৎ

যাঁহারাই এতদ্দেশীয় দেবদেবীর প্রতিমাসম্বন্ধে কিছু না কিছু সংবাদ রাখেন, তাঁহারাই জানেন ভগবান্ সূর্য্যদেবের পদদ্বয় আজানুসমুত্থিত উপানদ্‌যুগলের মত কোন এক প্রাবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। অদ্যাবধি যত সূর্য্যমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়া কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে সমুদয়েরই পদদ্বয় তদ্রূপ। দেখিলে মনে হয় যেন সূর্য্যদেব আজকালকার বুট্‌জুতা পরিয়া রহিয়াছেন।

তাঁহার এবম্প্রকার পোষাক দেখিয়া মনে স্বতঃই এ প্রশ্ন আসিয়া উদিত হয় যে, তাঁহার এ জুতা আসিল কোথা হইতে ?

সাধারণতঃ আমাদের দেশে আমরা যে সব দেবদেবীর প্রতিমা গড়াইয়া থাকি, তাহা তাঁহাদিগের ধ্যান বা অন্য কোনরূপ রূপবর্ণনা অবলম্বন করিয়া। সূর্য্য আমাদের অনেকদিন হইতে একজন বড় দেবতা সুতরাং অনেক গ্রন্থেই তাঁর অনেকরূপ ধ্যান বা রূপবর্ণনা দেখিতে পাই। তিনি বৈদিক দেবতা হইলেও বেদ ব্যতীত আমি তাঁহার রূপসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছি পুরাণে ও তন্ত্রে। অবশ্য সমস্ত পুরাণ ও তন্ত্র অনুসন্ধান করা হয় নাই, করিয়া উঠিতে পারিব কি না, জানি না। যতদূর করিয়াছি, প্রবন্ধের শেষে তাহা উদ্ধৃত থাকিবে। পাঠকগণ দেখিবেন সে সব ধ্যানে কোথায়ও জুতার কথার উল্লেখ নাই।

তবে এ জুতা আসিল কোথা হইতে ? বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় সূর্য্যের প্রতিমা-করণ প্রস্তাবে "কুর্য্যাদুদীচ্যবেষং গূঢ়ং পাদাদুরোযাবৎ ॥" (৫৮ অ° ৪৬ শ্লো°) বলিয়া উল্লেখ আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহাকেই সূর্য্যের জুতা পরিধানের প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। পা হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত যে বেশে আচ্ছাদিত থাকে সেই উত্তর দেশীয় বেশকে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতেরা জুতা পায় পাজামা পরা বেশ বলিয়াই মনে করেন। সূর্য্যের প্রতিমা সকলে কিন্তু পাদদ্বয় গূঢ় ব্যতীত পা হইতে বুক্ পর্য্যন্ত ঢাকা এমন বেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই মনে হয় সূর্য্যের পায়ে যাহা, তাহা কি জুতা ?

অনুসন্ধান করিতে করিতে মৎস্যপুরাণে সূর্য্যঘটিত একটী গল্প দেখিলাম। গল্পে বলে, সূর্য্যের স্ত্রী সংজ্ঞা যিনি বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সূর্য্যের তীব্র তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ছায়া নামে একটী স্ত্রীমূর্ত্তিকে আপনার স্থানে বসাইয়া দিয়া গোপনে পিত্রালয়ে পলায়ন করেন। পিতা বিশ্বকর্ম্মা সংজ্ঞার এই কার্য্যে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন। তিনি তথা হইতে মরুদেশে যাইয়া ঘোটকীর আকার ধারণকরত অবস্থান করিতে থাকেন। সূর্য্য প্রথমে এসব কিছুই জানিতে পারেন নাই, ছায়াকেই সংজ্ঞা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ক্রমে যখন জানিতে পারিলেন যে সংজ্ঞা নাই, তখন একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া আমার সংজ্ঞা কোথায় বলিয়া বিশ্বকর্ম্মার বাড়ী হাজির। বিশ্বকর্ম্মা ভয়ে জড়সড় হইয়া বলিল, ভগবন্!

সংজ্ঞা আপনার তীব্র তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া আমার বাড়ী পলাইয়া আসে ও আমার তিরস্কারে আমার গৃহও ত্যাগ করিয়া উপস্থিত মরুদেশে ঘোটকীরূপে অবস্থান করিতেছে। অতএব আমার নিবেদন আপনি যদি অনুগ্রহ করেন তবে আমি আপনাকে আমার শানযন্ত্রে ফেলিয়া কিছু তেজ কাটিয়া কমাইয়া দি ও আপনাকে কতক সুদর্শন করিয়া দি। সূর্য্য এ প্রস্তাবে সম্মত হইলে বিশ্বকর্ম্মা তাহাই করিল। সূর্য্যের পদদ্বয় ব্যতীত অপর সমস্ত অঙ্গের তেজ কমাইয়া দিল, পা দুখানি কিন্তু যেমন অসহ্য দর্শন ছিল তেমনিই রহিল।

পুরাণকার ইহাতে সমাধান করিলেন যে সেইজন্যই সূর্য্যমূর্ত্তির পূজাকালে সূর্য্যের পা কেহ দর্শন করেন না এবং এমন কি, সূর্য্যের পাদদ্বয় দেখিলে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইতে হইবে, এই ভয় দেখাইয়া একেবারে নিষেধ করিয়া দিলেন যে, চিত্রতেই বল আর প্রতিমাতেই বল, ধর্ম্মার্থকামী কোন ব্যক্তি যেন কোনস্থানেই সূর্য্যের পদদ্বয় নির্ম্মাণ না করেন।

মৎস্যপুরাণের এই গল্পেই কি বরাহমিহিরের সূর্য্যপদ গূঢ় করিয়া রাখিবার ব্যবস্থার মূল নহে? অভিপ্রায় এই :—পুরাণে বলিল সূর্য্যের পদদ্বয় চিত্রে বা প্রতিমায় করিবে না, কেন না উহা বিশ্বকর্ম্মার যন্ত্রোল্লিখিত হয় নাই বলিয়া অসহ্যদর্শন, তবুও যদি কর, তবে দ্রষ্টা কুষ্ঠরোগী হইবে ইহা মনে করিও। সুতরাং নিষেধটায় বড় জোর দেওয়া হইল।

এখন বুঝিতে গেলে বুঝিতে হইবে যে, সূর্য্যের পদদ্বয় সাধারণে না দেখান'র হেতু হইল উহার তীব্রজ্যোতিঃ সুতরাং তাহা তৈয়ার করিয়াও যদি ঢাকিয়া রাখা যায় তাহা হইলে তো ফলতঃ উহা দেখানই হইল না তো বটেই। তাই কি বরাহের "গূঢ়ং" এর উদ্দেশ্য নয়?

আমার বোধ হয় তাহাই। আমরা যে সূর্য্যপ্রতিমায় সূর্য্যের পদদ্বয়ে জুতার মত কিছু দেখি উহাকে জুতা না বলিয়া যদি বলি উহা একপ্রকার প্রাবরণ বিশেষ, তাহা হইলে পুরাণাদিতে উল্লিখিত সূর্য্যধ্যান সমবায়ে জুতার কথা নাই বলিয়া আর উহার জন্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হয় না।

আর এক কথা কলিকাতা যাদুঘরে সূর্য্যের এমন শিলাপ্রতিমাও আছে, স্থপতি যাহার পা একেবারে খোদিত করে নাই।

ইহাতে কি ইহাই মনে করা সহজ নহে যে বহুপ্রাচীনকাল হইতেই সূর্য্যের পদদ্বয় দেখান নিষিদ্ধ হইয়াছে তাই কোন শিল্পী তাহা আচ্ছাদিত করিয়াছেন, কেহ বা একেবারেই করেন নাই। জুতার কথা যখন আজও পর্য্যন্ত কোথাও স্পষ্ট উল্লেখ নাই, তখন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া উহাকে জুতা না বলিয়া প্রাবরণ বিশেষই বা বলিলাম।

সূর্য্যের ধ্যান।

রক্তাম্বুজাভয়দানহস্তং কেয়ূরহারাঙ্গদকুণ্ডলাঢ্যম্।
মাণিক্যমৌলিং দীননাথমীড়ে বন্ধূককান্তিং বিলসৎত্রিনেত্রম্।
রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥

হেমাম্ভোজপ্রবালপ্রতিমনিজরুচিং চারুখট্টাঙ্গচাপৌ
চক্রং শক্তিং সপাশং সৃণিমতিরুচিরামক্ষমালাং কপালম্।
হস্তাম্ভোজৈর্দধানং ত্রিনয়নবিলসদ্ বেদবক্ত্রাভিরামং
মার্ত্তণ্ডং বল্লভার্দ্ধং মণিময়মুকুটং হারদীপ্তং ভজামঃ ॥ (তন্ত্রসার)
"পদ্মাসনঃ পদ্মকরঃ পদ্মগর্ভসমদ্যুতিঃ।
সপ্তাশ্বঃ সপ্তরজ্জুশ্চ দ্বিভুজঃ স্যাৎ সদা রবিঃ ॥ (মৎস্যপু° ৯৪ অঃ)
পদ্মাসনঃ পদ্মকরো দ্বিবাহুঃ পদ্মদ্যুতিঃ সপ্ততুরঙ্গবাহঃ।
দিবাকরো লোকগুরুঃ কিরীটী ময়ি প্রসাদং বিদধাতু দেবঃ ॥
"ইত্যেষ একচক্রেণ সূর্য্যস্তূর্ণং রথেন তু।
ভদ্রৈস্তৈরক্ষতৈরশ্বৈঃ সর্পতেঽসৌ দিবি ক্ষয়ে ॥
অহোরাত্রাদ্রথেনাসৌ একচক্রেণ তু ভ্রমন্।
সপ্তদ্বীপসমুদ্রান্তং সপ্তভিঃ সপ্তভির্হয়ৈঃ ॥" (বায়ুপুরাণ ৫২ অঃ)
সসপ্তাশ্বে সৈকচক্রে রথে সূর্য্যো দ্বিপদ্মধৃক্। (অগ্নিপুরাণ ৫১ অ°)
"প্রভাকরস্য প্রতিমামিদানীং শৃণুতদ্বিজাঃ।
রথস্থং কারয়েদ্দেবং পদ্মহস্তং সুলোচনম্ ॥
সপ্তাশ্বং সৈকচক্রঞ্চ রথং তস্য প্রকল্পয়েৎ।
মুকুটেন বিচিত্রেণ পদ্মগর্ভসমপ্রভম্ ॥
নানাভরণভূষাভ্যাং ভুজাভ্যাং ধৃতপুষ্করম্।
স্কন্ধস্থে পুষ্করে তে তু লীলয়ৈব ধৃতে সদা ॥
চোলকচ্ছন্নবপুষং কচিচ্চিত্রেষু দর্শয়েৎ।
বস্ত্রযুগ্মসমোপেতং চরণৌ তেজসাবৃতৌ ॥" (মৎস্যপুরাণ ২৬১ অ°)

ইহার এই শেষের শ্লোকটী আমার মতের পোষক। "চরণৌ তেজসাবৃতৌ" ইহার অর্থ 'তেজসা হেতুনা চরণৌ আবৃতৌ' বড় তেজ বলিয়া চরণদ্বয় আবৃত। এই অর্থই পূর্ব্বোল্লিখিত মৎস্যপুরাণোক্ত গল্পের সহিত খাটে, তেজদ্বারা আবৃত এরূপ অর্থ করিতে গিয়া কেহ যেন গোলে না পড়েন। আর "চোলকচ্ছন্নবপুষং" এবং "চরণৌ তেজসাবৃতৌ" এই উভয়ের সহিত ঐক্য করিলে বেশ বুঝা যায় যে বরাহমিহিরের "কুর্য্যাদুদীচ্যবেষং গূঢ়ং পাদাদুরো যাবৎ।" মৎস্যপুরাণেরই কথান্তর। চোলকের অর্থ কবচ।

মৎস্যপুরাণের গল্পের মূল।

"বিবস্বান্ কশ্যপাৎ পূর্ব্বমদিত্যামভবৎ সুতঃ।
তস্য পত্নীত্রয়ং তদ্বৎসংজ্ঞা রাজ্ঞী প্রভা তথা ॥
রৈবতস্য সুতা রাজ্ঞী রেবতং সুষুবে সুতং।
প্রভা প্রভাতং সুষুবে ত্বাষ্ট্রী সংজ্ঞা তথা মনুং ॥

যমশ্চ যমুনাচৈব যমলৌ তু বভূবতুঃ।
ততস্তেজোময়ং রূপমসহন্তী বিবস্বতঃ ॥
নারীমুৎপাদয়ামাস স্বশরীরাদনিন্দিতাং।
স্বাষ্ট্রীস্বরূপরূপেণ নাম্না ছায়েতি ভামিনী ॥

* * *

কাময়ামাস দেবোঽপি সংজ্ঞেয়মিতি চাদরাৎ।

* * *

বিবস্বানথ তজ্‌জ্ঞাত্বা সংজ্ঞায়াঃ কর্ম্মচেষ্টিতং।
ত্বষ্টুঃ সমীপমগমদাচচক্ষে চ রোষবান্ ॥
তমুবাচ ততস্ত্বষ্টা সান্ত্বপূর্ব্বং দ্বিজোত্তমাঃ।
তবাসহন্তী ভগবন্মহস্তীব্রং তমোনুদং ॥
বড়বারূপমাস্থায় মৎসকাশমিহাগতা।
নিবারিতা ময়া সা তু ত্বয়া চৈব দিবাকর ॥
যস্মাদবিজ্ঞাততয়া মৎসকাশমিহাগতা।
তস্মান্মদীয়ং ভবনং প্রবেষ্টুং ন ত্বমর্হসি ॥
এবমুক্তা জগামাথ মরুদেশমনিন্দিতা।
বড়বারূপমাস্থায় ভূতলে সংপ্রতিষ্ঠিতা ॥
তস্মাৎ প্রসাদং কুরু মে যদ্যনুগ্রহভাগহং।
অপনেষ্যামি তে তেজো যন্ত্রে কৃত্বা দিবাকর ॥
রূপং তব করিষ্যামি লোকানন্দকরং প্রভো।
তথেত্যুক্তঃ স রবিণা ভ্রমৌ কৃত্বা দিবাকরং ॥
পৃথক্ চকার তত্তেজঃ ... ... ।
রূপঞ্চাপ্রতিমং চক্রে ত্বষ্টা পদ্‌ভ্যামৃতে মহৎ ॥
ন শশাকাথ তদ্দ্রষ্টুং পাদরূপং রবেঃ পুনঃ।
অর্চ্চাস্বপি ততঃ পাদৌ ন কশ্চিৎ কারয়েৎ ক্বচিৎ ॥
যঃ করোতি স পাপিষ্ঠাং গতিমাপ্নোতি নিন্দিতাং।
কুষ্ঠরোগমবাপ্নোতি লোকেঽস্মিন্ দুঃখসংযুতঃ ॥
তস্মাচ্চ ধর্ম্মকামার্থী চিত্রেষ্বায়তনেষু চ।
ন ক্বচিৎ কারয়েৎ পাদৌ দেবদেবস্য ধীমতঃ ॥ (মৎস্যপুরাণ ১১ অ°)

শ্রীবিনোদবিহারিবিদ্যাবিনোদ।

শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পারিষদ ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয়ভক্ত শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্ত সুবর্ণবণিক্‌কুলে শান্তিপুরে জন্মিয়াছিলেন। জয়কৃষ্ণদাসকৃত শ্রীচৈতন্যপারিষদ-জন্মস্থান-নিরূপণ নামক প্রাচীন পুঁথিতে—

"শান্তিপুরে জনমিলা রায় মুকুন্দ। উদ্ধ(া)রণ দত্ত আর জন্ম কৃষ্ণানন্দ॥"

অনুমান হয়, শান্তিপুরে দত্তমহাশয়ের মাতামহের নিবাস ছিল এবং তিনি মাতামহ-গৃহে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি সপ্তগ্রামে পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন, তাহাতেই মুকুন্দঠাকুর-বিরচিত পদে—

"শ্রীকরনন্দন দত্ত উদ্ধারণ ভদ্রাবতীগর্ভজাত।
ত্রিবেণীতে বাস নিতাইর দাস শ্রীগৌরাঙ্গের পদাশ্রিত॥"

(সা° প° পত্রিকা ১৩১৬।১।৩৬ ধৃত)

নরহরি (চক্রবর্ত্তী) কৃত নিত্যলীলামৃত পুঁথিতে—

"জয় সপ্তগ্রাম মধ্যে উদ্ধারণদত্ত। শ্রীসুগ্রীবমিশ্র নিত্যানন্দগুণে মত্ত॥"

উদ্ধারণ সময়ে সময়ে শান্তিপুরে মাতামহের গৃহে গিয়া থাকিতেন, তাহাতেই শান্তিপুরের মুকুন্দরায়ের সহিত তাঁহার সখ্য হইয়াছিল, অতএব পুনশ্চ ঐ পুঁথিতে উক্ত হইয়াছে—

"জয় শান্তিপুরে রায় মুকুন্দের স্থিতি। উদ্ধারণ দত্ত কৃষ্ণানন্দ প্রিয় অতি॥"

শ্রীনিত্যানন্দ, নানা তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে নীলাচলে আগমন করেন এবং তথা হইতে সপ্তগ্রামে আগত হইলে তাঁহার সহিত দত্তমহাশয়ের মিলন হয়। অনন্তর তিনি প্রভুর সঙ্গে নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন, তাহাতেই দৈবকীনন্দনকৃত বৈষ্ণববন্দনার পুঁথিতে—.

"উদ্ধারণ দত্ত বন্দো হৈয়্যা সাবহিত। নিত্যানন্দ সঙ্গে যে ভ্রমিলা সর্ব্বতীর্থ॥"

শ্রীবীরচন্দ্রপ্রভু, শ্রীঅভিরাম গোপালের মহত্ত্ব-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বলেন—

"আমি শুনিয়াছি উদ্ধারণ দত্তস্থানে। তীর্থপর্য্যটন কালে ছিলা প্রভু সনে॥"

(শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বংশবিস্তার পুথি)

উত্তরকালে শ্রীনিত্যানন্দ, নীলাচলবাসী মহাপ্রভুর আদেশে গৌড়দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিয়া, সপ্তগ্রামে দত্তমহাশয়ের গৃহে আগমন করিলে তিনি শৃঙ্গবেণু, মাল্য, চন্দন, বসন ও ভূষণ দিয়া প্রভুকে বিভূষিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই মাধবদাসকৃত বৈষ্ণববন্দনা[1] পুঁথিতে—

---

(১) চতুর্ব্বিধ বৈষ্ণববন্দনার পুঁথি দেখিয়াছি। ১ম দৈবকীনন্দনকৃত, ২য় মাধবদাসকৃত, ৩য় কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামিকৃত, ৪র্থ লোচনদাসকৃত। দৈবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনা আবার দুইপ্রকার—বৃহৎ ও লঘু। মাধবদাস ও কৃষ্ণদাসের বৈষ্ণববন্দনা, বিরলপ্রচারহেতু দুষ্প্রাপ্য। কয়েক বৎসর অতীত হইল, "বিন্দাবনদাস" ভণিতাযুক্ত

"জয় উদ্ধারণ বন্দোঁ সপ্তগ্রামে বাস। যাঁর ঘরে নিত্যানন্দ প্রভুর বিলাস ॥
দ্রব্য মাল্য চন্দন বসন অলঙ্কারে। যে করিল বিভূষিত নিতাইচাঁন্দেরে ॥"

নিত্যানন্দ প্রভু, যৎকালে পানিহাটী গ্রামে গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডির উপরে বসিয়া চিড়া দধি মহোৎসব করাইতেছিলেন, তৎকালেও উদ্ধারণ তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পুঁথিতে—

"চৌতরা উপরে প্রভুর যত নিজগণ। বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলবন্ধন ॥
রামদাস সুন্দরানন্দ দাস গদাধর। মুরারি কমলাকর সদাশিব পুরন্দর ॥
ধনঞ্জয় জগদীশ পরমেশ্বর দাস। মহেশ গৌরীদাস আর হোড় কৃষ্ণদাস ।
উদ্ধ(া)রণ আদি আর যত নিজগণ। উপরে বসিলা সব কে করু গণন ॥"

(অন্ত্যখণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

"কথো দিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে। সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্বগণ সহে।
উদ্ধারণদত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে। রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেণীর তীরে ॥"

নিত্যানন্দপ্রভু, মহাপ্রভুর আদেশে বিবাহার্থ যৎকালে অম্বিকা অভিমুখে গমন করেন, তৎকালেও দত্তমহাশয় তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। প্রভু, সূর্য্যদাস পণ্ডিতের দ্বারে থাকিয়া তাঁহাকে স্বীয় আগমনবার্ত্তা জানাইবার নিমিত্ত দত্তকে তদীয় অন্তঃপুরে প্রেরণ করেন। সূর্য্যদাস, বহির্বাটিতে আসিলে, দত্ত, প্রভুর এইরূপ পরিচয় দেন—

"উদ্ধারণ কহে ইহোঁ ব্রাহ্মণ উত্তম। রাঢ়ী শ্রেণি সর্ব্বশাস্ত্রে অতিশ্রেষ্ঠতম ॥
ন্যায়চূড়ামণি ইহাঁর শাস্ত্রের আখ্যাতি। নিত্যানন্দ নাম প্রেমানন্দপুরে স্থিতি ॥"

(শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ)

বিবাহের পূর্ব্বে, একদা ব্রাহ্মণগণ, প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন—

"শ্রীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আওজন। স্বপাক করেন কিম্বা আছয়ে ব্রাহ্মণ ॥
প্রভু বলে কখন বা আমি পাক করি। না পারিলে উদ্ধারণ রান্ধহ উতারি ॥

একখানি বৈষ্ণববন্দনার পুঁথি দেখিতে পাই—উহার লিপিকাল সন ১২৩০ সাল। উহাতে "নারায়ণি সুতবন্দো বিন্দাবনদাস" এই পাঠ থাকায় মনে হইয়াছিল, এই বৈষ্ণববন্দনাকর্ত্তা দ্বিতীয় বৃন্দাবন দাস হইতে পারেন। তারপর, গত বৎসর, যখন মাধবদাসের বৈষ্ণববন্দনা, পুঁথিদৃষ্টে, সম্পাদন করি, তখন দেখি যে "বিন্দাবনদাস", মাধবদাসের বৈষ্ণববন্দনার কোন কোন পাঠের কিছু কিছু অন্যথা*, কোন কোন স্থানে এখানকার পদ্য ওখানে, ওখানকার পদ্য এখানে—এইরূপ উল্টাপাল্টা করিয়া মাধবদাসের গ্রন্থের আদ্যোপান্ত আত্মসাৎ করিয়াছেন। লোচনদাসের বৈষ্ণববন্দনা ক্ষুদ্র। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার এক লেখক লিখিয়াছেন যে, লোচনদাসের প্রকৃত নাম "ত্রিলোচন দাস"। আমরা লোচনদাসের অনেক পুঁথি দেখিয়াছি, কোনও পুঁথিতে ঐ রূপ নামের বানান নাই। সম্প্রতি "আত্মপ্রবোধিকা" নামক একখানি প্রাচীন পুঁথিতে দেখিলাম, উহাঁর প্রকৃত নাম "লোচনানন্দ"। যথা—

"দুর্লভসারেতে কহেন শ্রীলোচনানন্দ। শুনিলে জানিবে তার বাক্যের ছন্দবন্দ ॥"

* একটি পাঠান্তর এখানে উল্লেখযোগ্য—মাধবদাসের পুঁথিতে যে স্থানে "আম্বুয়া মুলুক" পাঠ আছে, বৃন্দাবন দাসের পুঁথিতে ঠিক সেই স্থানে "অম্বিকানগর" পাঠ আছে।

এই মত পরিবর্ত্তরূপে পাক হয়। শুনিঞা সভার মনে লাগিল বিস্ময় ॥
তারা কহে এ বৈষ্ণব হয় কোন জাতি। পূর্ব্বাশ্রমে কোন নামে কোথা বা বসতি ॥
প্রভু কহে ত্রিবেণীতে বসতি উঁহার। সুবর্ণবণিক্ দেখি করিনু স্বীকার ॥"

(শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বংশবিস্তার পুঁথি)

দেখা গেল, উদ্ধারণের জন্মস্থান শান্তিপুর এবং বাসস্থান সপ্তগ্রাম ত্রিবেণী। ইদানীং কেহ কেহ বলিতেছেন, দত্তমহাশয়ের বাসস্থান কাটোয়ার সন্নিহিত উদ্ধারণপুর। এইরূপ উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। নিত্যানন্দপ্রভুর দ্বিতীয়া গৃহিণী শ্রীজাহ্নবা, বৃন্দাবন হইতে জলপথে প্রত্যাগমনকালে, যে যে স্থানে গমন করেন, নরহরির ভক্তিরত্নাকর পুঁথিতে সেই সকল স্থানের মধ্যে, উদ্ধারণপুরের নাম নাই। শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী, খেতরি, বুধরি, কণ্টকনগর, জাজিগ্রাম, খণ্ড, নদীয়া ও অম্বিকা হইয়া সপ্তগ্রামে গমন করেন।

"ভাগ্যবন্ত বণিকের বালবৃদ্ধ যত। তা সভার জে আর্ত্তি তা কে কহিবে কত ॥
ঈশ্বরী দর্শনে সভে আপনা পাশরে। ঈশ্বরী গেলেন শীঘ্র উদ্ধারণ ঘরে ॥
উদ্ধারণ দত্তের বাড়ীতে স্থিতি কৈল। ঈশ্বরী দর্শনে বহু লোক ভীড় হৈল ॥
উদ্ধারণ দত্তের চরিত্র সোঙরিয়া। শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী ধরিতে নারে হিয়া ॥
নিত্যানন্দপ্রিয় উদ্ধারণের কথায়। জৈছে প্রভুগণ চেষ্টা কহনে না জায় ॥
উদ্ধারণ ঘরে রহি, নৌকায় চঢ়িলা। সভে অনুগ্রহ করি খড়দহে গেলা ॥"

(ভক্তিরত্নাকর পুঁথি—১১শ তরঙ্গ)

জগন্নাথ দাস নামক এক বৈষ্ণব, উদ্ধারণপুরে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন—নরহরি, নিত্যলীলামৃতে তাহার উল্লেখ করেন,[১] কিন্তু দত্তমহাশয়ের তথায় বাস থাকিলে, নরহরি, যে তাহার উল্লেখ করিবেন না—ইহা অসম্ভব।

শ্রীনরোত্তমঠাকুর মহাশয়[২] খেতরি হইতে শ্রীক্ষেত্রগমনকালে যে যে স্থান হইয়া গিয়াছিলেন, সে সকল স্থানের মধ্যেও উদ্ধারণপুরের নাম নাই। তিনি দত্তমহাশয়ের সপ্তগ্রামেই গিয়াছিলেন—

"নিত্যানন্দগুণে মগ্ন দত্ত উদ্ধারণ। নিরন্তর সেবে নিত্যানন্দের চরণ ॥
হেন উদ্ধারণ ঠাকুরের (বাস) সপ্তগ্রামে ॥ নরোত্তম প্রবেশে বিহ্বল হৈয়া প্রেমে ॥
লোকে জিজ্ঞাসয়ে উদ্ধারণের আলয়। করিয়া ক্রন্দন কেহ কহে এই হয় ॥
প্রভুর বিচ্ছেদদুঃখে দগ্ধি অনুক্ষণ। এই কথো দিন হৈল হৈলা সঙ্গোপন ॥
তাঁর অপ্রকটে সপ্তগ্রাম অন্ধকার। শুনি নরোত্তম-নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥
হইলা ব্যাকুল জৈছে কহনে না জায় ॥ প্রভুপ্রিয় জে ছিলেন মিলিলা তাহায় ॥"

(ভক্তিরত্নাকর পুঁথি—৮ম তরঙ্গ)

(১) "জয় প্রেমভক্তিদাতা জগন্নাথ দাস। উদ্ধারণপুরে কথো দিবস নিবাস ॥" (নিত্যলীলামৃত পুঁথি)
(২) বৃন্দাবনে ইহাঁর "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি হইয়াছিল।

শ্রীউদ্ধারণ দত্তমহাশয়ের জন্মস্থান শান্তিপুর আর বাসস্থান সপ্তগ্রাম,—তবে যে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায়, তাঁহার শ্রীপাট "উদ্ধারণপুর" লিখিত হইতেছে, ইহার কারণ কি ? কেহ বলেন—উদ্ধারণপুরে তাঁহার জমিদারির কাছারি ছিল। কেহ বলেন—তিনি জীবনকালের শেষভাগে উদ্ধারণপুরে মহাপ্রভুর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া সেবা করেন,—তাহা যদি হইত, তবে নরহরিদাস (চক্রবর্ত্তী) নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ করিতেন,—তাহা যখন করেন নাই, তখন ঐ শেষোক্ত কথা নিতান্তই অমূলক। শুনিতে পাই, উদ্ধারণপুরে উদ্ধারণ-ঘাট প্রভৃতি কীর্ত্তি আছে। উদ্ধারণপুর ও উদ্ধারণঘাট হইতে অনুমান হয়, ঐ স্থানের সহিত দত্ত-মহাশয়ের কোনও সম্পর্ক ছিল, কিন্তু তাহা হইলেও শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর, মাধবদাস ও নরহরিদাস, যখন দত্তমহাশয়ের সপ্তগ্রামে বাস বলিয়াছেন এবং উদ্ধারণপুরে[১] যখন তাঁহার বসতির কোন প্রাচীন লিখন নাই, তখন সপ্তগ্রামই তাঁহার শ্রীপাট বলিয়া স্থির নিশ্চয়রূপে প্রমাণিত হইতেছে। আমরা বাল্যকাল হইতে সাতগাঁয়ে উদ্ধারণ দত্তমহাশয়ের পাট, দাস-গোসাঞের পাট[২] ও ঝড়ু ঠাকুরের পাট[৩] দেখিয়া ও শুনিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি শুনিতে পাই, ওখানে কালিদাসের পাট[৪] নামক এক পাটবাড়ী আছে। আমাদের গৃহে যে প্রাচীন লিখন আছে, তদনুসারেও জানা যায় যে দত্তমহাশয়ের শ্রীপাট সপ্তগ্রাম।

কৃষ্ণদাস গোস্বামীর বৈষ্ণববন্দনার এক প্রাচীন পুঁথিতে—

"উদ্ধারণ দত্ত বন্দো ভাগবতোত্তম। যাহা হৈতে চরিতার্থ বণিকের গণ ॥"

ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে ভাগবতোত্তমের লক্ষণ, যথা—

"সর্ব্বভূতেষু য পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥"

যিনি, সকল প্রাণীতে ভগবানের ও আপনার সত্ত্বা দেখিতে পান এবং ভগবানে ও আপনাতে প্রাণী সকলকে দেখেন, তিনি ভাগবতোত্তম।

কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস। গদাধর দাস, দত্ত মহাশয়কে[৫] নিত্যানন্দ প্রভুর ভক্ত ও পরমেষ্ঠিতত্ত্বজ্ঞাতা বলিয়া জানিতেন, যথা—

"ভক্ত উদ্ধারণ দত্ত, পরমেষ্টিজ্ঞাতাতত্ত্ব সদা গোবিন্দের গুণ গাই ।" (জগন্নাথমঙ্গল পুঁথি)

শ্রীশিবচন্দ্র শীল।

---

(১) বেহার দেশে আর এক উদ্ধারণপুর আছে—এ পর্য্যন্ত কেহ উহাকে দত্তমহাশয়ের শ্রীপাট বলেন নাই।

(২) শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর পাট। কায়স্থকুলে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল।

(৩) ইনি ভূমিমালি জাতীয় বৈষ্ণব।

(৪) কালিদাস, দাসগোস্বামীর জ্ঞাতিখুড়া ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন।

(৫) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৬ষ্ঠ ভাগ ২য় সংখ্যায় "জেমোর পুঁথি" "বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ের পুঁথি"র কিছু কিছু উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পুঁথির পাঠের সহিত ঐ সকল পাঠ মিলাইয়া দেখিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, উক্ত দুই পুঁথির পাঠ ভ্রান্তিমূলক। আমাদের পুঁথি হইতে জানা যায়, উৎকলপতি নরসিংহদেবের রাজ্যকালে এবং "রাজচক্রবর্ত্তী সাহজাদা (সা জেহান) দিল্লীপতি"র রাজ্যের ১৫শ বৎসরে (১৬৪২ খৃষ্টাব্দে) "উৎকলে অনেক পতি কটকনগর"এর মাধনপুরে পুরাণপাঠ শুনিয়া, গদাধর এই গ্রন্থ রচনা করেন। গদাধরের সিঙ্গি (সিঙ্গি নহে) গ্রামে বাস ছিল।

মধ্যমরাজের তাম্রশাসন

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যাবিভাগের অন্তর্গত পরিকুড়ের রাজা প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার ব্লকের নিকট এই তাম্রশাসনখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন। পুরীর কলেক্টর ব্ল্যাকউড সাহেব ইহার সন্ধান করিয়াছিলেন। উক্ত বৎসরের শীতকালে তাম্রশাসনখানি ব্লকসাহেবের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম। তাম্রফলকের খোদিতলিপির পাঠোদ্ধার অতীব কষ্টকর এই জন্যই প্রকাশ করিতে এত বিলম্ব হইল। তিনখানি ক্ষুদ্র তাম্রপত্রের উপর খোদিত লিপিটি উৎকীর্ণ হইয়াছে ও এই তিনখানি পত্রের দক্ষিণভাগে এক একটী ছিদ্র আছে। ছিদ্রাভ্যন্তরে একটী স্থূল তাম্রদণ্ড প্রবিষ্ট করাইয়া তাম্রপত্রগুলি গাঁথা হইয়াছে। এই বক্রতাম্রদণ্ডের উপরে মোহরের নিম্নাংশমাত্র বর্ত্তমান আছে। প্রথম পত্রের এক পৃষ্ঠে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রের উভয় পৃষ্ঠেই খোদিতলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে।

শৈলোদ্ভববংশজ মধ্যমরাজদেব তাঁহার রাজ্যের ষড়্‌বিংশতিতম বর্ষে নানা গোত্রচরণভুক্ত ব্রাহ্মণগণকে কোঙ্গোদমণ্ডল ও কটকভুক্তির অন্তঃপাতী কোন গ্রাম দান করিতেছেন। খোদিতলিপির প্রথমাংশে শৈলোদ্ভব বংশের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই পরিচয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে শৈলোদ্ভবের বংশ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা জানিয়া রাখা উচিত। এই তাম্রশাসন ব্যতীত এই বংশের আর তিনখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে :—

১। গঞ্জামে আবিষ্কৃত ৩০০ গুপ্তাব্দে মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের রাজত্বকালে প্রদত্ত দ্বিতীয় সৈন্যভীতের তাম্রশাসন (১)।

২। মাদ্রাজের বুগুডা গ্রামে আবিষ্কৃত মাধববর্ম্মদেবের তাম্রশাসন (২)।

৩। পুরীর খুর্দাগ্রামে আবিষ্কৃত মাধবরাজের তাম্রশাসন (৩)।

ইহার মধ্যে প্রথম তাম্রশাসনখানিই তারিখযুক্ত। ইহা ডাক্তার হুলজ্ (Dr. Hultzsch) কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় মাধবরাজ ১মের পৌত্র, যশোভীতের পুত্র, মাধবরাজ ২য়, ৩০০ গুপ্তাব্দে (৬১৯ খৃষ্টাব্দে) মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের রাজ্যকালে, কোঙ্গোদমণ্ডলে, কৃষ্ণগিরিবিষয়ে ছবলক্‌থয় গ্রাম জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। তাম্রশাসনের মুদ্রায় মাধবরাজের পরিবর্ত্তে সৈন্যভীতের নাম মুদ্রিত আছে। ইহা হইতে ডাক্তার হুলজ্ অনুমান করেন যে সৈন্যভীত মাধবরাজের নামান্তর। দ্বিতীয় তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে শৈলোদ্ভববংশীয় মাধববর্ম্মা কোঙ্গোদমণ্ডলে, গুড্ডবিষয়ে খদিরপট্টকভুক্ত পুইপিণ

১ Epigraphia Indica Vol. II p. 143.

২ Ibid. Vol. III p. 44 and. Vol. VII.

৩ J. and P. A. S. B. (New Series) Vol. I. p. 284.

গ্রাম বামনভট্ট নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। ডাক্তার কীলহর্ণ এই খোদিতলিপি প্রকাশ করেন, তাঁহার মতে মাধববর্ম্মদেবের পিতার নাম সৈন্যভীত ও পিতামহের নাম যশোভীত। ডাক্তার হুল্‌জ গঞ্জামের খোদিতলিপি-প্রকাশকালে বলেন যে এই মাধববর্ম্মদেবের অপর নাম সৈন্যভীত ২য়। তাঁহার পিতার নাম যশোভীত ও পিতামহের নাম সৈন্যভীত ১ম। ডাক্তার হুল্‌জের উক্তিই যথার্থ বলিয়া বোধ হয় ও ইহার প্রমাণ যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে। তৃতীয় খোদিতলিপিখানি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ৺গঙ্গামোহন লস্কর দ্বারা প্রকাশিত হয় ও ইহা হইতে জানা যায় যে মাধবরাজ কোঙ্গোদমণ্ডলে, খোরণ বিষয়ে আরহগ্ন গ্রামের কোন বস্তু প্রজাপতিস্বামিনামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। এই খোদিতলিপি অনুসারে মাধবরাজের পিতার নাম যশোভীত ও পিতামহের নাম সৈন্যভীত, কিন্তু মুদ্রায় মাধবরাজের নামের পরিবর্ত্তে সৈন্যভীতের নাম অঙ্কিত আছে। তিনখানি খোদিতলিপিই শৈলোদ্ভবকুলজ মাধব নামক নৃপতির আদেশে উৎকীর্ণ, কিন্তু দুইখানিতে ইনি মাধবরাজ নামে ও একখানিতে মাধববর্ম্মা নামে পরিচিত। এই তিনখানির মধ্যে বুগুডার তাম্রশাসনে শৈলোদ্ভব বংশের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়ঃ—

শৈলোদ্ভব
(তাঁহার বংশে জাত)
|
রণভীত
|
সৈন্যভীত ১ম
|
যশোভীত ১ম
|
সৈন্যভীত ২য় মাধবেন্দ্র বা মাধববর্ম্মা
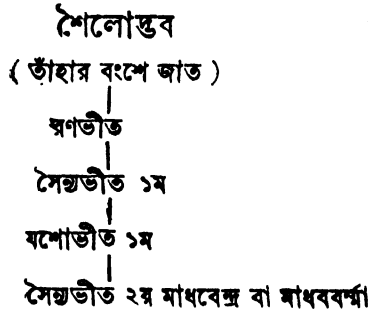
কথিত আছে, কলিঙ্গদেশে পুলিন্দসেন নামধেয় এক বিখ্যাত বীর ছিলেন, তিনি স্বয়ং রাজপদাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না, কিন্তু রাজপদোপযুক্ত ব্যক্তির কামনায় ব্রহ্মার উপাসনায় রত হন। ব্রহ্মা প্রীত হইয়া প্রস্তরখণ্ড হইতে শৈলোদ্ভব নামক মহাপুরুষের সৃষ্টি করেন। এই কয়টি শ্লোক পরিকুডের খোদিতলিপিতেও আছে। গঞ্জাম ও খুর্দার খোদিতলিপি অনুসারে মাধবরাজের নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া যায়ঃ—

গঞ্জামের তাম্রশাসন।	খুর্দার খোদিতলিপি।
মাধবরাজ ১ম	সৈন্যভীত
|	|
যশোভীত	যশোভীত
|	|
মাধবরাজ ২য়	মাধবরাজ
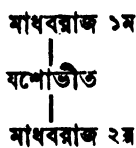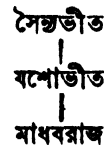
উভয় তাম্রশাসনই কোঙ্গোদ বা কৈঙ্গোদ হইতে প্রচারিত এবং উভয় তাম্রশাসনের মুদ্রাতে মাধবের পরিবর্ত্তে সৈন্যভীতের নাম পাওয়া যায়, অতএব বুঝিতে হইবে যে সৈন্যভীত,

মাধবরাজ বা মাধবেন্দ্রের নামান্তর মাত্র। সুতরাং বুগুড়ার খোদিতলিপির মাধববর্ম্মা ও সৈন্যভীত একই ব্যক্তি। ডাক্তার কীলহর্ণ বুগুড়া তাম্রশাসনের মুদ্রার পাঠোদ্ধার করিতে সক্ষম হন নাই, কিন্তু বোধ হয় ইহাতেও "সৈন্যভীত" উৎকীর্ণ ছিল। পরিকুড়ের তাম্রশাসনে মাধবরাজের পরিবর্ত্তে, যশোভীতের পরে পুনরায় সৈন্যভীতেরই উল্লেখ আছে :—

শৈলোদ্ভব
(তদ্বংশজ)
|
রণভীত
|
সৈন্যভীত ১ম
|
যশোভীত ১ম
|
সৈন্যভীত ২য়
|
যশোভীত ২য়
|
মধ্যমরাজ

গঙ্গামোহন বাবু খুর্দার তাম্রশাসন প্রকাশকালে গঞ্জামের তাম্রশাসনের অস্তিত্ব-বিষয় অবগত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি বুগুড়া ও খুর্দার তাম্রশাসন হইতে শৈলোদ্ভববংশের নিম্নলিখিত পরিচয় দিয়াছেন :—

শৈলোদ্ভব
(রাজবংশ-প্রতিষ্ঠাতা)
|
রণভীত
(শৈলোদ্ভবকুলজ)
|
সৈন্যভীত ১ম
(রণভীতসূনু)
|
যশোভীত ১ম
(সৈন্যভীতের বংশে জাত)
|
সৈন্যভীত ২য়
(যশোভীত-তনয়)
|
যশোভীত ২য়
(সৈন্যভীতের পুত্র)
|
মাধবরাজ, মাধবেন্দ্র ও মাধববর্ম্মা
(যশোভীতের পুত্র)

এতন্মধ্যে যশোভীত ২তীয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বুগুডা বা খুর্দা তাম্রশাসনে কোনই উল্লেখ পাওয়া যায় না (১)। স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লস্কর মহাশয়ের কল্পনাপ্রসূত বলিয়াই বোধ হয়। মাধবরাজ, মাধববর্ম্মা ও মাধবেন্দ্র, সৈন্যভীত ২তীয়েরই অপর নাম। ইনি যখন ৬১৯ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন তাঁহার পৌত্র খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কিম্বা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

মধ্যমরাজ দেব এই তাম্রশাসন দ্বারা শ্রীসামন্ত, মহাসান্ত, মহারাজ, রাজন্যক, রাজপুত্র, অন্তরঙ্গ, দণ্ডনায়ক, উপরিক, বিষয়পতি ও তদায়ুক্তক প্রভৃতি এবং বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ও অতীত (?) রাজপাদোপজীবিগণকে জানাইতেছেন যে তাঁহার ষড়্‌বিংশতি রাজ্যাঙ্কে তিনি কোঙ্গোদমণ্ডলে, জ্ঞাকটকভুক্তিতে কোন গ্রাম, শিলস্বামি, গোবর্দ্ধনস্বামি, বন্ধুস্বামি, কবড়িস্বামি, নারায়ণস্বামি, মাধবস্বামি, ভরণীস্বামি, ভর্গস্বামি, আদিত্যস্বামি, রুদ্রস্বামি, শিবস্বামি ও শুভস্বামি-নামধেয় ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন। তৃতীয় ফলকের অপর পৃষ্ঠে চারি পংক্তি খোদিতলিপি আছে। ইহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার অসম্ভব। শেষ পঙ্‌ক্তির শেষ-ভাগে "সম্বৎ ৮০০"……অনুমান হয়, ইহা বিক্রমাব্দের নবম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

(১) সন্দেহভঞ্জনার্থ খুর্দার তাম্রশাসনের পাঠ দিলাম :—

১ স্বস্তি জয়স্কন্ধাবারাৎ কোঙ্গোদবাসকাৎ সকলক্ষমাতলো
২ পলক্ষিত ক্ষমানয়বিনয়বিক্রমস্য প্রতাপবারিতারিসৈন্য
৩ স্য শ্রীসৈন্যভীতস্য পৌত্র প্রসৃতবিপুলামলযশস:
৪ সততমযশোভীতস্য শ্রীমতো যশোভীতস্যাত্মজো
৫ ভগবং মহস্বরচরণযুগলেকশরণ্যঃ শৈশবএব বিদ্যাচতুষ্ট-
৬ য়াভ্যাসোন্মীলিতসহজপ্রজ্ঞাতিশয়াবগতসমস্তা
৭ র্থতত্ত্ব: স্বমতবিরচিতাত্যাদ্ভুতকাব্যার্থবোধনৈককার্য্যাসক্ত হি
৮ তবিদ্বদ্বিদগ্ধোজনসমূহোনিজভুজবলাবলে পাবমি…………
৯ স্তপর্য্যন্ত সামন্তশিরোমণিমরীচিসংমূর্চ্ছিত চ[রণ]…………
১০ চ্ছিন্নান্তরে তরারাতিবগর্গো যথাক্রমপ্রবৃত্ত মনুরক্ত ঃ…………
১১ মহানিপানমিব সর্ব্বসত্ত্বৈর্যথেষ্টমুপভুজ্যমা[ন]…………
১২ বম্ভোগসারসত্বসার প্রবার্কপ্রকাশিতশৈলোস্তনাম্ববায়…………
১৩ নতসকলকলিঙ্গাধিপত্য: সকলকলাবাপ্তকৌ-মূর্ত্ত
১৪ ঘ জগতাপ্রমদ: প্রবৃত্তচক্রশ্চক্রধর। ইহ ভগবান্মাধব
১৫ শ্রীমাধবরাজ: কুশলী ইত্যাদি J. and P. A. S. B. (N. S.) Vol. I. p. 284.

বুগুডার তাম্রশাসনে বংশপরিচয়সূচক যে কয়েকটি শ্লোক আছে, তাহার একটী ব্যতীত আর সকল গুলিই পরিকুডের খোদিতলিপিতে পাওয়া যায়। বুগুডার খোদিতলিপির ১০ম শ্লোকটিমাত্র পরিকুডের খোদিত-লিপিতে নাই—

"জাতেন যেন কমলাকরবৎ স্বগোত্রমুন্মীলিতং দিনকৃতেব মহোদয়েন।
সংক্ষিপ্তমণ্ডলয়চন্দ্রগতা: প্রণাসমাশুদীপোগ্রহগণাইব তস্য দীপ্ত্যা।"

Epigraphia Indica, Vol. III. p. 41.

প্রথম ফলক

১। ওঁ স্বস্তি ইন্দোর্দ্ধৌতমৃণালতন্তুভিরিব শ্লিষ্টাঃ করৈ(ঃ) কোমলৈর্বদ্ধা-
হেররুণৈ(ঃ) স্ফুরৎ ফ

২। ণিমণৈর্দিগ্ধপ্রভাসোংশুভিঃ (।) পার্ব্বত্যা(ঃ) সকচগ্রহব্যতিকর-
ব্যাবৃত্তবন্ধশ্লথা গঙ্গাম্ভ(ঃ) প্লুতি

৩। ভিন্নভস্মকণিকা (ঃ) শম্ভোর্জটা (ঃ) পান্তু ব (ঃ)। (।) শ্রীমান উ(চ) চৈ
র্নভস্তো গুরুরচলপতে(ঃ) ক্ষোভজিৎ য়ঃ

৪। ক্ষমায়া গম্ভীরা স্তি(? স্তো) য়রাশেরথ দিবসকরাম্ভাস্বদালোককারী (।)
হ্লাদী সর্ব্বস্য চেন্দো স্ত্রি

৫। ভুবনভবনপ্রেরকশ্চাপি বা য়ো রাজা (? রাজেন্দ্রঃ) স স্থাণু
মূর্ত্তির্জয়তিকলিমলক্ষালনো মাধ

৬। বেন্দ্রঃ (॥) প্রাংশুর্ম্মহেভকরপীবরচারুবাহু কৃষ্ণাশ্মসঞ্চয়বিভেদ-
বিশালবক্ষা (।) রাজীব

৭। কোমলদলায়তলোচনাস্ত[ঃ] খ্যাত[ঃ] কলিঙ্গজনতাসু পুলিন্দসেন[ঃ]
তেনেত্থং

৮। গুণিনাপি সত্বমহতা ন্যস্টং (নেস্টং) ভুবোর্ম্মণ্ডলং শক্তো যঃ
পরিপালনায় জগত[ঃ] কোনা

৯। ম স স্যাদিতি প্রত্যাদিস্টবিভূৎসবেন ভগবানারাধিতঃ সাশ্বতং।
স্তচিতা (তচ্চিন্তা)ন্মগুণং

১০। বিধিৎ সুরদিশঘাঙ্গাস্বয়ম্ভুরপি [॥] স শিলা সকলোদ্ভেদী
তেনাপ্যালেক্য ধীম

১১। তা পরিকল্পিতসদ্বংশে প্রভুশ্শৈলোদ্ভব[ঃ] কৃতঃ। [।]
শৈলোদ্ভবস্য কুলজো রণ

১২। ভীত আসীত্তেনা সকৃ [ৎ] কৃতভীয়াং দ্বিষদঙ্গনানাং [।]
জ্যোস্নাপ্রবোধসম

দ্বিতীয় ফলক, প্রথম পৃষ্ঠা

১৩। য়ে স্বধীয়ৈব সাৰ্দ্ধমাকম্পিতোনয়নপঙ্কজলেষু চন্দ্র [ঃ' [॥]
তস্যাভবদ্বিবুধপালসমস্য পু

১৪। ত শ্রীসৈন্যভীত ইতি ভূমিপতিগৃর্গরীযান্যং প্রাপ্যনৈকশতনাশ
ঘটাবিঘট্ট লব্ধপ্রসাদ

১৫। বিজয়[ং] মুমুদে ধরিত্রী[ং] [॥] তস্যাপি বঙ্শে থ যথ[া]র্থ নাম[া]
জাতো যশোভীত ইতি ক্ষিতীশ[ঃ] যেন প্ররূ-

১৬। ঢ়োপি শুভৈশ্চরিত্রৈর্ভৃষ্ট[ঃ] কলংক[ঃ] কলিদর্পণস্য [॥]
জাতোথ তস্য তনয়[ঃ] সুকৃতী সমস্তসিমন্তি

১৭। নী নয়নষট্পদপুণ্ডরীক[ঃ] [।] শ্রীসৈন্যভীত ইতি ভূমীপতির্মহেভ-
কুম্ভস্থলীদলনদু

১৮। ল্ল লিতাসিধার[ঃ] [॥] কালেয়ৈর্ভৃতধাতৃ পতিভিরুপচিতানেক
পাপাবতারৈর্নীতা যেশাং কথাপি প্র

১৯। লয়মভিমতা কীর্ত্তিপালৈরজস্রং [॥] যজ্ঞৈস্তৈরশ্বমেধপ্রভৃতিভি-
রমরালম্ভিতা তৃপ্তিমৃ

২০। র্ব্বীমন্ত্রিপ্তারাতিপক্ষক্ষয়কৃতিপটুনা শ্রীনিবাসেন যেন। [।]
তস্যোৎখাতাখিলারের্ম্মরুদিব স

২১। নভৌ (?) ভাস্বদুষ্ণাংশুতেজা শ্রীরামানীদপাল (শ্রীরামাদীনপাল)
নরপতিযশোভীতদেবস্তনূজঃ মাতঙ্গান্যেত (?) তু

২২। ঙ্গান্বহ (ন্) মদমুচশ্চারুবক্ত্র[ঃ] প্রচণ্ডঃ (প্রচণ্ডান্) বন্ধাকর্ষত্য
খেদন্পুনরপি তপতে পদ্ম[ব]ত্ স প্রগল্ভঃ [॥]

২৩। কেচিদ্বল্ক পুরা(?)ণ সার্দ্ধমচিরস্তাআ (?) স্থিতিলীলয়া
কেচিদার্দ্ধমুখাস্সহস্রকিরণমালা

২৪। বলি প্রেক্ষণা[ঃ] কেচিদ্বল্ক (কেচিদ্বল্ক)লিনস্তথাজিনধরা [ঃ]
কেচিজ্জটাধারিণো নানারূপধরাস্তপস্তি যত্র

২৫। য়ো দিব্যাস্পদাকাঙ্ক্ষিণ[ঃ] [॥] কেচিৎ সৈলগুহোদরেষু নিয়তা
ধূমাবলী পাইন (পায়িনঃ) অন্যে চ যে পাল

২৬। স্তু ভক্ষনিরতাঃ কেচিন্নিরাহারকা ইথ্থ যোগযুগোর্বিহায় বসতিংদ্ধ্যায়ন্তি
দিব্যং পদং চিত্রং

২৭। মধ্যমরাজদেবগুণবৃ(ভৃ) রাজ্যং পিতু [ঃ] প্রাপ্তবা[ন্ ॥]
মস্তারাধানামময় সুরভবন গং

২য় ফলক পশ্চাদ্‌ভাগ
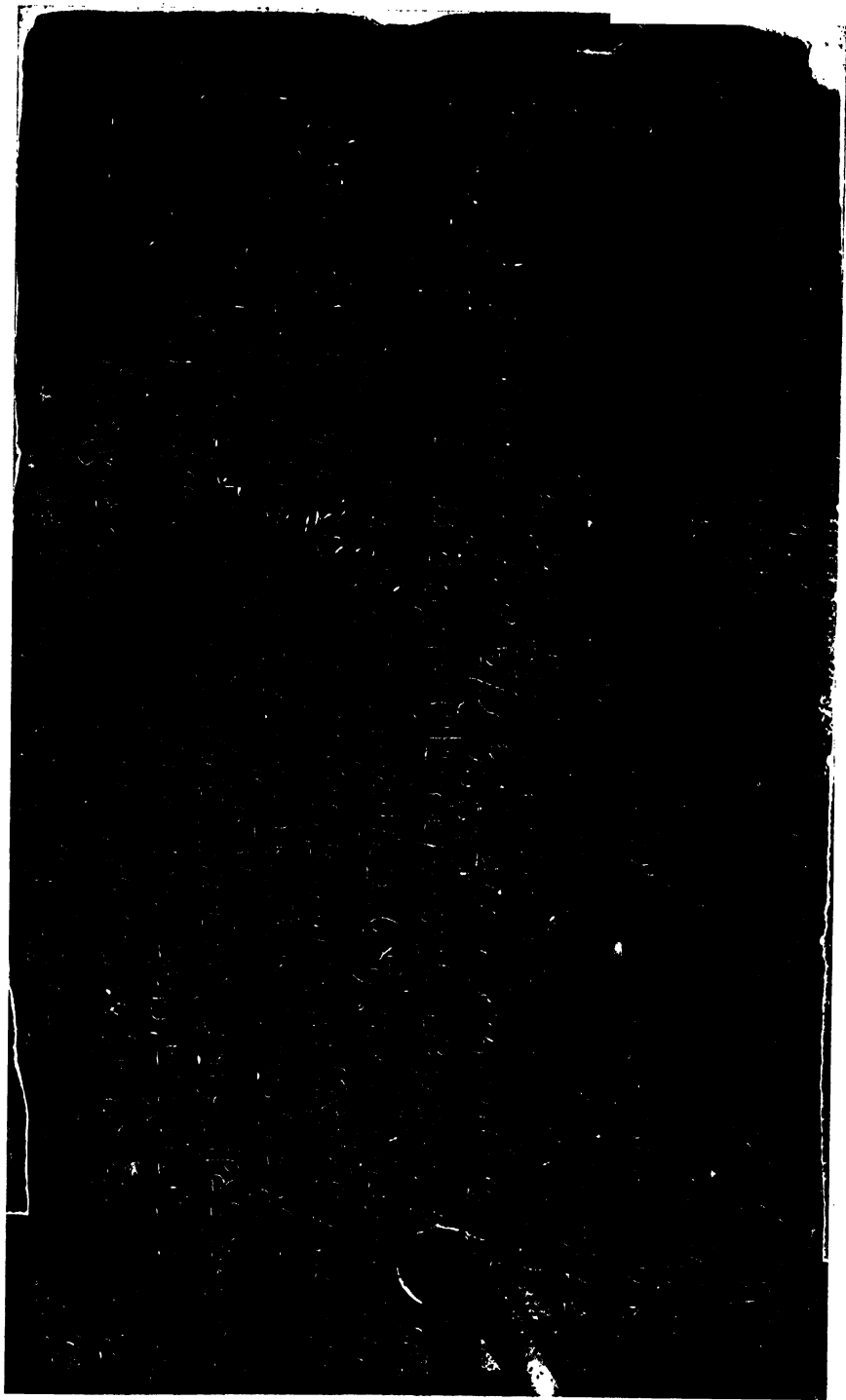
২৮। তা দিব্যসত্বা প্রগল্‌ভা [ঃ] তৈ[ঃ]সার্দ্ধং নিত্যকালং সুকৃ[তি] গুণ
কলালাপভৃদ্ যঃ প্রকুর্ব্ব[ন্] শম্ভৌ সং

২৯। স্তম্ভকারী পদমমরজবঃ শাশ্বতঃ শান্তরূপং লব্ধোৎসাহং স বীর[ঃ]
ক্ষিতিতলবসতিং নির্জ্জিতারা

৩০। তি পক্ষ[ঃ] [॥] স্থিত্যুৎপত্তি(ত্তি) বিনাশকারণপরমজ্যোতি
ব্যাহতব্যক্তাব্যক্তসমস্তশক্তিনিয়তদেবাতি

৩১। দেবো মহ[ন্] তস্যানুগ্রহকারি বিক্রমধনু[শ] চেষ্টাকরোদ্‌ভূতা[ং]
স শ্রীমানতুলশশাঙ্কধবল ক্ষৌ

৩২। ণি (?) যশখ্যাপিতা [।] আকর্ণাদতুলং বিকৃষ্য তয়া বা পদ্ধয়ে
লীলয়া হস্টভির্কপু্ রৈবিবেষ্ট্য

৩৩। ফলকো নারাদ্‌প্রভাস্যামপিপাণিভ্যচতুরঃ শিলিমুখৈর্মুখে
সুতিক্ষ্মো ভৃশঃ জতো দিব্যগতি প্রি

৩৪। থা তু শতসমং কোঙ্গদরত্নক্ষিতৌ ধর্ম্মাভ্যাসকলশরীরমসকৃৎ
সংবেষ্ট্য লীলান্বিত পীন

৩৫। ...য়োনির্ব...গব...স্তম্বঘ্নলীলয়া সদ্য শত কৃপাণতা সুখকরো ধাবত্য

৩৬। খিন্নো ভৃশং ভূপালাহমুপমপরক্রিয় ইতি খ্যাত ক্ষমামণ্ডলে।
জাতেন বপুব্যশালি

৩৭। নেব যেন সংবর্দ্ধিতকুমুদশণ্ডমিবাত্মলক্ষসঙ্কোচিঞ্চ রিপুপঙ্কজা
বৃন্দমারাধিত

৩৮। জয়তি লব্ধজয়প্রতাপ। কটশ্রীশৈলোদ্ভবকুলতিলকমহাবংশ্য বাজপেয়াশ্ব

৩৯। মেধাবভৃথস্নাননির্ব্বর্ত্তিতপ্রখ্যাতকীর্ত্তিকর্মাপরমমাহেশ্বর
মাতাপিত্রিপাদনুধ্যাত

৪০। শ্রীমধ্যমরাজদেব কুশলী অস্মিং কোঙ্গদমণ্ডলে শ্রীসামন্ত মহাসাম্ভ
মহারাজ রা

৪১। জন্যক রাজপুত্রান্তরদণ্ডনায়কোপরিকবিষয়পতি[ত]
দায়ুক্তকবর্ত্তমানভবিষ্যদ্ বা

৪২। স্তরিণ [ঃ] সকরণ্য (?) ব্রাহ্মণপরো আদিজনপদাঞ্চ যথার্হং
[মানয়স্তি বোধ]য়[ন্তি] আ

৩য় ফলক সম্মুখভাগ

৪৩। জ্ঞাপয়তি চ বিদিতমস্তু ভবতা[ং] জ্ঞকটকভুক্তি বিপ···র্ব্ব পূর্ব্বমণ্ড··

৪৪। ম দ্বাদশতিনিরপ্রমাণ সর্ব্বপীড়বর্জ্জিতশ্চাটভটাপ্রবেশ্য
ন কিঞ্চিদ্দনপ(নপ্র) [গ্রা]

৪৫। হ্য ষড়বিংশতিমে সম্বৎসরে বিজয়বর্দ্ধমানরাজ্যে মাতপিত্রোরাত্মনশ্চ
পুণ্যাভি (ব্রি)

৪৬। [দ্]বয়ে সলিলধারাপুর[ঃ]বরেণ চন্দ্রার্ক্ক ক্ষিতিসমকাল
মস্মাভি নানাগোত্রপ্রবর

৪৭। চরণায় ব্রাহ্মণা[য়] শীলস্বামিগোবর্দ্ধনস্বামিবন্ধুস্বামিকচদিস্বামি নারায়ণ

৪৮। স্বামিমাধবস্বামি ভরণিস্বামিভর্গস্বামিআদিত্যস্বামিরুদ্রস্বামিশিবস্বামি

৪৯। শু(?)ভস্বামিনে বিশ্রকে প্রতিপাদিতমতোহস্য যথাকালমুপযুজ্যতো
ন কৈনশ্চিদ্ বিরুদ্ধতা কর

৫০। ণীয়া। উক্তঞ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রে বহুভির্ব্বসুধা দত্তা(ত্তা) রাজভি[ঃ]
সগরাদিভি[ঃ] যস্য যস্য যদা ভূমি[ঃ]

৫১। তস্য তস্য তদা ফলং [॥] মা ভুদফলশঙ্কা ব[ঃ] পরদত্তেতি পার্থিবাঃ
স্বদানাৎ ফলনি অনন্ত্যং পরদত্তা

৫২। সুপালনং [॥] স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা যো হরেতি বসুন্ধরাং শ্ববিষ্ঠায়াং
ক্রিমির্ভূত্বা পিত্রিভি[স্] সহ

৫৩। পচ্যতি [॥] হরতি হারয়তি ভূমি মন্দবুদ্ধি[ঃ] তমাব্রিতা স বদ্ধো
চারুণৈ পাসৈ তি[র্]য[গ্] যোনিষু জ

৫৪। য়তি ইহি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ
সকলমিদমু

৫৫। দাহ্রিতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈ[ঃ] পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যা[ঃ] [॥]
বিদ্যুদ্বিলাসতরলামবগম্য সম্যক্ [লোক]

৫৬। স্থিতিং যশসি শক্তমনোভিরুচৈ ॥ [।"] নিত্যং পরো[পক্রিতিঃ]
মাত্ররাতি রতৈধর্ম্মাভিরাধনপরৈরনুমোদিত

শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধামরাজের শাসন

মধ্যমরাজের তাম্রশাসন

তৃতীয় ফলক—পশ্চাদ্ভাগ।
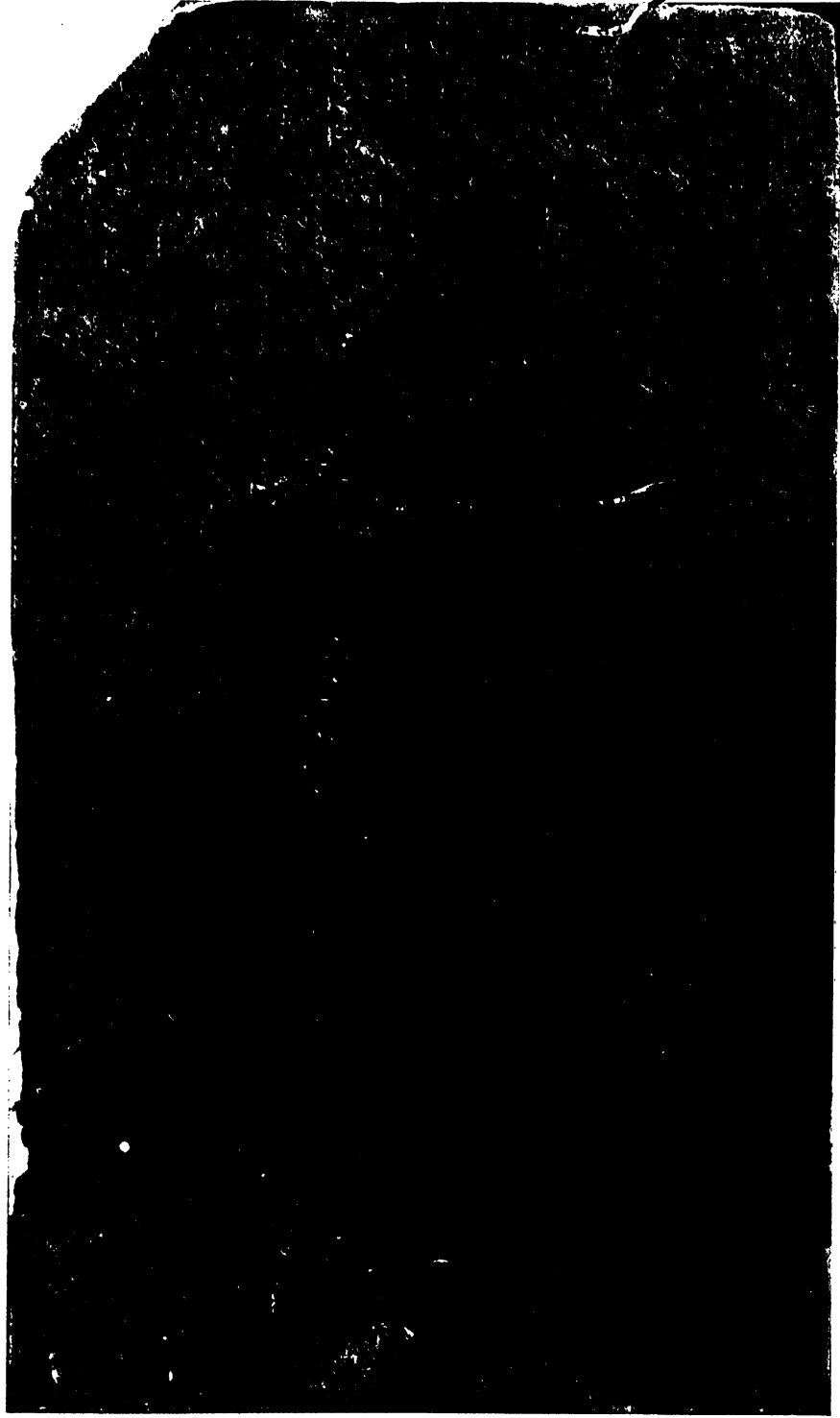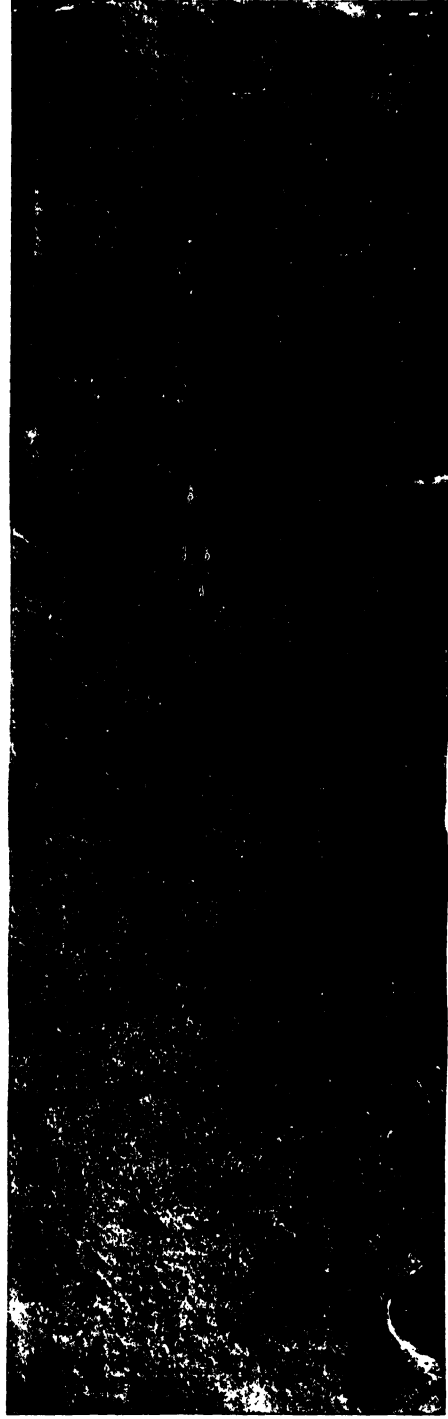
নদীয়া ও চব্বিশপরগণা জেলার কতকগুলি গ্রাম্য-শব্দ

১৩১৪ সালের ১ম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে মালদহ জেলার গ্রাম্যশব্দ-তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া গুটিকতক শব্দ সম্বন্ধে দুইএক কথা বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ঐ শব্দগুলি নদীয়া জেলা ও তৎপ্রান্তবর্ত্তী জেলাবাসী লোকে গ্রাম্য-ভাষায় ব্যবহার করিয়া থাকে।

শব্দ অর্থ

ওক—বমন। এ কথা ২৪ পরগণা এবং নদীয়া জেলায়ও প্রচলিত।

কল্ল—দুষ্ট। এ কথাটী ২৪ পরগণায়ও ব্যবহৃত হয় "দুষ্ট" অর্থে, "জারজ" অর্থে নয়। প্রয়োগ বোধ হয় কেবল স্ত্রীলোকের প্রতি।

আতায় কাতায়—যন্ত্রণাতে ছট্‌ফট্‌ করা। ২৪ পরগণা ও নদীয়া দুই জেলায়ই ব্যবহৃত হয়। কাহারও কাহারও মুখে "আতারি কাতারি" এইরূপ প্রয়োগ শুনিতে পাই।

উট্‌কান—"দোষ খুঁজিয়া বাহির করা" অর্থে নাই হউক "খুঁজিয়া বাহির করা" অর্থে ২৪ পরগণা ও নদীয়ায় ব্যবহৃত হইতে শুনিয়াছি।

উঠানা—রোজ রোজ কোন দোকান হইতে দ্রব্য লওয়া। পূর্ব্বোক্ত দুই জেলায় ইহার ব্যবহার দেখা যায়। অনেকে ইহা "উঠ্‌না" উচ্চারণ করে।

আস্‌নাই—প্রণয়। স্ত্রীপুরুষের প্রেম। ২৪ পরগণার কোন কোন লোকের মুখেও শুনিয়াছি।

গেমা ওগো—ওহে। "ওগো" শব্দ ২৪ পরগণা ও নদীয়ায় খুব প্রচলত।

খোরা—"বড় পাথরের বাটী" এই অর্থে উপরোক্ত দুই জেলাতেই চলিত আছে।

খলিফা—ওস্তাদ, শিল্পনিপুণ, দরজি। এ কথাটা ২৪ পরগণা ও নদীয়া দুই জেলাতেই প্রচলিত আছে।

ঘুস্‌কী—যে স্ত্রীলোক গোপনে পরপুরুষগামিনী হয়। এ কথাটা অন্য অনেক জেলায় চলিত।

ঘাবড়ান—ভয় খাওয়া। নদীয়া জেলায় এবং বোধ হয় ২৪ পরগণায়ও শোনা যায়।

চম্পট—পলায়ন, অদৃশ্য হওয়া। অন্য অনেক জেলায় চলিত।

জবড়জঙ্গ—জড়ভরতের মত কেমন একটা। ২৪ পরগণা ও নদীয়াও চলিত।

জুয়ারি—যাহারা জুয়া খেলে। বোধ হয় নদীয়া জেলায়ও শুনিয়াছি।

ঝুটমুট—"মিথ্যা কথা" অর্থে বোধ হয় ২৪ পরগণা ও নদীয়ায় শুনিয়াছি।

ছপ্পর—চাল। বেহারে এ কথা চলিত আছে। ঐ দেশের কোন কোন লোকের মুখে শুনিয়াছি।

টং—যেমন "রাগিয়া টং হইল"। ২৪ পরগণা, নদীয়া ও হুগলীতেও ইহা চলিত আছে।

ট্যাঙ্গস—ল্যাঙ্‌ড়াইয়া হাঁটা। ২৪ পরগণায় ইহার ব্যবহার আছে।

টিপা—কৃপণ। "টেপা" এই আকারে ২৪ পরগণা ও নদীয়া জেলায় ইহার চলন আছে।

দিগ্‌দারি—বিরক্ত করা। এ কথার উপরোক্ত দুই জেলায় চলন আছে।

ধুম্‌সা—বড় মোটা পুরুষ। "ধুম্‌সো" আকারে ইহা উপরোক্ত দুই জেলায় ব্যবহৃত হয়।

ধুম্‌সী—বড় মোটা স্ত্রীলোক। ২৪ পরগণা ও নদীয়ার চলিত আছে।

ধাপ্পা—ফাঁকি। উপরোক্ত দুই জেলায় চলিত।

ধুমধড়াক্কা—ধূমধাম। ২৪ পরগণায় এবং বোধ হয় নদীয়ায়ও এ কথা শুনিয়াছি।

বিয়া—স্ত্রীচিহ্ন। উড়িষ্যায় এ কথা চলিত আছে।

ভাতারআউলী—সধবা। ২৪ পরগণায় ইহা শুনিয়াছি।

ফটিকচাঁদ—ফুলবাবু। ২৪ পরগণায় চলিত আছে যথা—"নদের ফটিকচাঁদ"।

ফডাই—একপ্রকার জামা। "ফড়ুই" রূপে কিছুদিন পূর্ব্বে ২৪ পরগণায় ইহার ব্যবহার ছিল। এখন আছে কি বলিতে পারিলাম না।

মড়া—মৃত। ২৪ পরগণায় স্ত্রীলোককে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রতি ইহা প্রয়োগ করিতে শুনিয়াছি।

মরকা—ভঙ্গপ্রবণ। নদীয়া ও ২৪ পরগণায় "মড়্‌কা" রূপে ইহার ব্যবহার শুনিয়াছি।

পুতখাকী—যে স্ত্রীলোক পুত্রকে খায়। ইহার ব্যবহার ২৪ পরগণা ও নদীয়ায় আছে।

খস্তারাম—বলবান্। দীর্ঘাকার ও বলবান্ অর্থে "খস্তরাম" রূপে ইহার ব্যবহার ২৪ পরগণা এবং বোধ হয় নদীয়াতেও শুনিয়াছি।

লিকি—উকুন। "লিকি" রূপে ইহার ব্যবহার ২৪ পরগণায় প্রচলিত।

লগ্যা বা লগি—"লগি" অর্থাৎ লম্বা বাঁশ (নৌকার) শব্দ নদীয়ায় চলিত আছে।

সল্লা—পরামর্শ। নদীয়ায় প্রচলিত আছে। ২৪ পরগণার কথা বলিতে পারিলাম না।

হরবড়—হানি। নদীয়ায় শুনিয়াছি। ২৪ পরগণায়ও বোধ হয় চলিত আছে।

টানের বছর—অন্নকষ্টের বৎসর। বোধ হয় নদীয়ায় এরূপ প্রয়োগ শুনিয়াছি।

বরাত—প্রয়োজন। ২৪ পরগণা ও নদীয়ায়ও চলিত।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

শূন্যপুরাণ

১। শূন্যপুরাণের সম্পাদকের অনুমানে পুরাণখানির লেখক, লেখকের নিবাস ও সময়।

১৩১৪ সালে সাহিত্য-পরিষৎ হইতে পুরাবিৎ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুর দ্বারা বাঙ্গালা শূন্য-পুরাণ প্রকাশিত হইয়াছে।

মুখবন্ধে নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, ঐ পুরাণ বাঙ্গালাভাষার একখানি আদিগ্রন্থ। গ্রন্থের রচয়িতা রামাই পণ্ডিত। তিনি গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের সময়ে ছিলেন, এবং এই রাজা খৃঃ ১১শ শতাব্দীর প্রথমে ছিলেন। সে আজি নয়শত বৎসর পূর্ব্বের কথা।

কিন্তু সম্পাদক মহাশয় দেখাইয়াছেন, কালে পুরাণখানির নূতন সংস্করণ হইয়াছিল। তথাপি কোন কোন অংশের বয়স নাকি ছয় সাত বৎসর!

এই অনুমান সত্য হইলে শূন্যপুরাণখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইবে। বোধ হয়, বাঙ্গালা ভাষায় এত পুরানা পুস্তক আর পাওয়া যায় নাই। এরূপ গ্রন্থের একটু বিস্তারিত আলোচনা কর্ত্তব্য।

মুখবন্ধ হইতে জানিতেছি, বাঁকুড়া জেলা হইতে ছাপা গ্রন্থের আদর্শ সংগৃহীত হইয়াছিল। আদর্শপুথীতে গ্রন্থ সমাপ্তিকাল লিখিত ছিল না। প্রবীণ সম্পাদক পুথীর অক্ষর বিন্যাস ও অবস্থা দৃষ্টে উহাকে প্রায় তিনশ বছরের পুরানা মনে করিয়াছেন। 'এসিয়াটিক সোসাইটী'তে দুইখানি খণ্ডিত পুথী আছে। বাঁকুড়া জেলার পুথী পুরাতন বলিয়া সম্পাদক-মহাশয় সেই পুথীকে আদর্শ করিয়াছেন। আদর্শে ছিল না, এমন কতক অংশ 'সোসাইটি'র পুথী হইতে লইয়া ছাপা শূন্যপুরাণে প্রবিষ্ট করিয়াছেন।

প্রাচীন বাঙ্গালা পুথী মাত্রই বাঙ্গালা-ভাষা শিক্ষার সহায় হইতে পারে। কিন্তু যদি পুথীর রচনাকাল এবং রচকের নিবাস জানা না থাকে, তাহা হইলে সে পুথীর প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়। শূন্যপুরাণখানির রচনাকাল সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু বহু ইতিহাস উদ্ঘাটন করিয়াছেন, কিন্তু অনুমান দৃঢ় করিতে পারেন নাই, স্থান সম্বন্ধেও স্পষ্ট কিছু বলেন নাই। বলা বাহুল্য, বাঁকুড়ায় পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া শূন্যপুরাণের ভাষা বাঁকুড়ার, এ কথা বলিতে পারা যায় না। রামাই পণ্ডিতের ভণিতা আছে বলিয়া শূন্যপুরাণখানি ধর্ম্মপূজাপদ্ধতিকার রামাই পণ্ডিতের লেখা, এ কথাও বলিতে পারা যায় না। নগেন্দ্রবাবুও লিখিয়াছেন, 'শূন্যপুরাণের পুথিখানি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকের হাতে ক্রমেই কিছু কিছু রূপান্তর হইয়া আসিয়াছে। .... বলিতে কি স্থানে স্থানে এরূপ পাঠবিকৃতি দাঁড়াইয়াছে যে কোন্‌খানি আদর্শ ও কোন্ খানি নকল তাহা বাছিয়া লওয়া অসম্ভব।' পুনশ্চ লিখিয়াছেন, 'ঘনরাম, সীতারাম প্রভৃতি ধর্ম্ম-মঙ্গলকারগণ যে দাহুর-ঘাটা ও সন্নাসা-কাটার উল্লেখ করিয়াছেন, আলোচ্য শূন্যপুরাণ মধ্যে

সে অংশ পাইলাম না। মহামহোপাধ্যায় [শ্রীহরপ্রসাদ] শাস্ত্রী মহাশয় রামাই পণ্ডিতের রচিত যে ধ্যানের মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাও তিনখানি পুঁথিতেই পাওয়া গেল না।'

তথাপি শূন্যপুরাণখানিকে ধর্ম্মপূজাপদ্ধতিকার রামাই পণ্ডিতের বলিবার হেতু কি? বোধ হয়, দুই হেতু,—(১) গ্রন্থখানির মূল প্রাচীন বোধ হয়, এবং (২) রামাই পণ্ডিতের ভণিতা আছে। এই দুই হেতু তেমন বলবান্ নহে।

২। গ্রন্থ সম্বন্ধে নূতন অনুমান।

ছাপা শূন্যপুরাণখানি পড়িয়া মনে হইয়াছে,—

(১) উহা শ্বেতনীলাদি চারি বা পাঁচ প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপণ্ডিতের অন্যতম রামাই পণ্ডিতের লেখা নহে।

(২) উহা একখানি গ্রন্থ নহে, অন্ততঃ দুখানি মঙ্গলের বা গানের পুথীর সংগ্রহ।

(৩) উহা খৃঃ একাদশ শতাব্দীর পরে রচিত।

(৪) উহার সমুদায়টা বাঁকুড়া জেলার লোকের লেখা নহে।

(৫) উহা পুরাণ হইতে পারে, পদ্ধতি হইতে পারে না।

প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা উপস্থিত লেখকের উদ্দেশ্য। কিন্তু শূন্যপুরাণখানির দেশ কাল পাত্র নিরূপিত না হইলে উহা অপূর্ব্ব বস্তু হইয়া থাকিবে, ভাষা শিক্ষার সহায় হইবে না, এই হেতু উপরি লিখিত অনুমানগুলি পরিষৎ সমক্ষে উপস্থিত করা যাইতেছে।

৩। শূন্যপুরাণখানি গান ; পূজাপদ্ধতি নহে।

ছাপা শূন্যপুরাণে ১৪২ পৃষ্ঠা আছে। ইহার দুই চারি পৃষ্ঠা গদ্য, অবশিষ্ট পদ্য। পদ্যের মধ্যে ১৭টি ত্রিপদী, অপর সমস্ত পয়ার। সকল কবিতার শেষে রামাই পণ্ডিতের নাম আছে। যথা,—

১১ পৃঃ সুনিআ ভারতী রচিল রামাই পণ্ডিত।
১৮ " গাইল রামাই পণ্ডিত সুন সর্ব্বজন।
৩২ " পুষ্পপাবন গীত পণ্ডিতরামে গান।
ভকত নাএকে ধর্ম্ম চিন্তি জে (চিন্তিব ?) কল্যাণ॥
৪০ " শ্রীযুত রামাই রচিল পাঁচালী সঙ্গীত।

দুইটি কবিতার মাথায় রাগেরও উল্লেখ আছে। ভণিতায় নায়কের কল্যাণপ্রার্থনা আছে। যিনি ধর্ম্মের গান করান, গায়কেরা তাঁহাকে নায়ক বলেন। ধর্ম্মের কিংবা শিবের গাজনের পর সন্ন্যাসীরা গান গাইয়া নায়কের মঙ্গল প্রার্থনা করে, সে কথনও স্মরণ করা যাইতে পারে।

সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় (১৩০৪ সালের) মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল' নামক প্রবন্ধে ধর্ম্মমঙ্গলের বারমতি শব্দের মূল অনুসন্ধান করিয়াও করেন

নাই। তাঁহার কথায় জানিতেছি, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে শব্দটি বার্ম্মতি এবং দুই এক স্থলে ব্রহ্মতি রূপ পাইয়াছে। 'এতক্ষণে ধর্ম্মের বাম্মতি হইল সায়।'—ইহার অর্থে শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, 'এতক্ষণে ধর্ম্মকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা সফল হইল।' কিন্তু ব্রহ্মতি শব্দের মূল কি? মূল না পাইলে অর্থে সন্দেহ থাকে। ব্রহ্মতি—ব্রহ্ম স্তুতি?

শূন্যপুরাণে বার্ম্মতি ব্রহ্মতি শব্দ নাই, আছে বারমতি। যথা,—

৭ পৃঃ,　　ধর্ম্মপদরজে মধুলুব্ধ বারমতি।
　　শ্রীযুত রামাই গাএ মধুর ভারতী॥
　　(বারমতি মধুতে লুব্ধ রামাই গান করে।)

৩৪ পৃঃ,　　দেখ ঘর দানপতি সুপ্রসন্ন বারমতি।
　　ধনবংস মঙ্গল করএ যুগপতি॥

(হে দানপতি রাজা হরিচন্দ্র) ধর্ম্মরাজের ঘর দেখ, বারমতিতে সুপ্রসন্ন যুগপতি ধনবংশ করেন।)

৭৮ পৃঃ,　　ভাবি যুগেশ্বর চলিলা মুনিবর সুনিআ বারমতি ভরন॥

(নারদ মুনিবর যুগেশ্বর করিয়া এবং বারমতি ভরন (পূরন?) শুনিয়া চলিলেন।)

৯৯ পৃঃ,　　মনে আনন্দিত বারমতি গীত পূরিল ঘর।

(সকলে মনে আনন্দিত হইলেন, বারমতি গীতে ঘর পূর্ণ করিল।)

১৩৮ পৃঃ,　　বারমতি করে রামাই লয়্যা দিজগণ।

(দ্বিজগণ লইয়া রামাই বারমতি করে।)

শব্দটি বার্‌মতি হইলে ছন্দে মিলিবে না, বারমতি পড়িতে হইবে। বারমতি ক্রমে বার্‌মতি—বার্ম্মতি—এবং কোন্ পণ্ডিতের দ্বারা ব্রহ্মতি না হইতে পারে এমন নয়। আমার স্মরণ হইতেছে আমি ধর্ম্মের পণ্ডিতের মুখে বারমতি শুনিয়াছি, বার্‌মতি শুনি নাই। বারমতি পূজা—দ্বাদশ বিধ পূজা, বারমতি গীত—দ্বাদশবিধ পূজার গীত॥ মতি, ওড়িয়া—মন্তি, মতি—প্রকার। বাঙ্গালা যেমত, এমত শব্দেও সেই মতি, মত। বারমতি—যথা, টীকাপাবন, ফুলপাবন, অর্ঘপাবন, পঞ্চদেবতাপূজা, স্নান, মনুই, সন্ধ্যা, চনাপাবন, ইত্যাদি।

এই সকল ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি। শাস্ত্রী মহাশয় ধ্যানের যে মন্ত্র তুলিয়া দিয়াছেন, সে মন্ত্রে শূন্যপুরাণের সৃষ্টিপত্তনের ছায়া দেখিতে পাই। কিন্তু শেষের পদ, 'ধর্ম্মের মঙ্গল গীত পণ্ডিত রামাই গান'—হইতে বুঝিতেছি 'সৃষ্টিপত্তন'ও ধর্ম্মমঙ্গলের অংশ।

অতএব জানিতেছি, (১) শূন্যপুরাণের অধিকাংশ গান বা ধর্ম্মমঙ্গল, (২) রামাই পণ্ডিত গানের রচক, এবং (৩) তিনি অন্যের নিকট 'ভারতী শুনিয়া' গান রচিয়াছিলেন। গানকে পূজাপদ্ধতি বলা যায় না। পূজাপদ্ধতি বাঙ্গালা ভাষায় হইলেও তাহাতে সংস্কৃত পদ থাকিবার আশা করা যায়। ১৩১৩ সালের সাঃ পঃ পত্রিকায় রামাই পণ্ডিত ও যাত্রাসিদ্ধির বিবরণ দেখুন। উহা গদ্য, প্রায়ই সংস্কৃত, মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা পদ থাকিলেও সমস্তটা বাঙ্গলা নহে।

আলোচ্য গ্রন্থের দুই স্থানে পদ্ধতির লক্ষণ আছে। ৬২ পৃষ্ঠে 'অথ বারমতিপূজার পদ্ধতি লিখ্যতে।' কিন্তু যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা পদ্ধতি নহে, বেড়া মনুইর পালা! ৮৫ পৃষ্ঠে তীর্থ আবাহনে সংস্কৃত মন্ত্র আছে। এই টুকু পদ্ধতি।

৪। শূন্যপুরাণের শব্দ ও শব্দের বানান।

শব্দ দেখিলে শূন্যপুরাণ গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকের রচনা মনে হয়। ছিস্‌টি, ভূমিস্‌টি, বস্তা, বাস্তন, তপসী, পৈরাগ, তপিস্‌সা, বিছ্রাম (বিশ্রাম), ত্রিপিনী (ত্রিবেণী), একত্তর, মিত্তিকা, পচ্চিম, গড়ুর (গরুড়), মোউর (ময়ুর), লাএক (নায়ক), পান (প্রাণ), ছাওয়া (ছায়া), চান (স্নান), নিন্নঅ (নির্ণয়), ইত্যাদিতে রাঢ়ের গ্রাম্য নিরক্ষর লোকের শব্দ অবিকল পাই। মূলে কি ছিল কে জানে; এখন যাহা আছে, তাহা গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকের লেখা। শূন্য-পুরাণের সম্পাদক মহাশয় এই কারণেই বোধ হয় অনেক শব্দের ঠিক অর্থ কিম্বা কোন অর্থ করিতে পারেন নাই।

প্রায়ই নিম্নবর্ণের গায়কেরা ধর্ম্মের গান গাইয়া থাকেন। বর্ত্তমান লেখকের ভাগ্যে ধর্ম্মের গান শোনার সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলের ভাষা দেখিলে বোঝা যায়, গ্রাম্য নিরক্ষর লোকে সে মঙ্গলের পালা লিখিয়াছিল। এরূপ স্থলে শব্দের বানান দেখিয়া গ্রন্থরচনার কাল নিরূপণের চেষ্টা বৃথা। নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, 'এক সময়ে আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, রামাই পণ্ডিতের এই গ্রন্থখানি যখন ধর্ম্মপণ্ডিতগণের নিকট বেদমন্ত্রবৎ পূজ্য, তখন এই গ্রন্থের ভাষার উপর লেখনী ধারণ করিতে হয়ত কেহ সাহসী হন নাই। কিন্তু এখন নানা স্থানের তিনখানি পুথির পাঠ মিলাইতে গিয়া আমাদের সে ভ্রম দূর হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তিন পুথির উপরই তিনটী জয়গোপালের ছায়া পড়িয়াছে।'

আমাদের বোধ হয়, সম্পাদক মহাশয় শূন্যপুরাণখানিকে পূজার পদ্ধতি মনে করিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন। পুরাণ নামেও জানিতেছি, উহা 'বেদমন্ত্রবৎ পূজ্য' নহে। বাস্তবিক উহা গানের পালা। গানের পালা যেমন গায়ন-সম্প্রদায়ের হাতে পড়ে তাহার ভাষার ও বানানের তেমন রূপান্তর ঘটে। নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, 'বাঙ্গালাভাষার অতি প্রাচীন পুথিগুলি প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অনেকটা প্রাকৃতরূপ ধারণ করিত, যেমন সংস্কৃত য স্থানে প্রাকৃতে জ, শ ও ষ স্থানে স ইত্যাদি। আদর্শ পুথিতে অনেকটা সেই নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে। * * * এই পুথির বিশেষত্ব এই ণ, য, ষ এবং শ এই কয়েকটী বর্ণের তেমন প্রয়োগ নাই।'

আজকালকার গ্রাম্য লিপিকরের বানানেও ণ নাই; য জ, শ ষ স, একের পরিবর্ত্তে কলমের মুখে যেটা আসে সেটাই দেখিতে পাই। সংস্কৃত প্রাকৃত ব্যাকরণের সময়ে বর্ণের উচ্চারণ ঠিক ছিল। এখন ন ণকারের একরূপ উচ্চারণ, য জকারের একরূপ, শ ষ স-কারের একরূপ

উচ্চারণ হওয়াতে লেখকের অভিরুচি অনুসারে কোন একটা দ্বারা শব্দ বানান হইয়া থাকে। এক এক লেখকের এক এক বর্ণের দিকে ঝোঁক থাকে। ১৩১৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় যে 'সূর্য্যের পাঁচালী' ছাপা হইয়াছে, তাহা ২১৮ বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রামে লেখা। তাহাতে দেখিতেছি, ষ স স্থানে শ, এবং য স্থানে জ আছে। ঐ সালের পত্রিকায় 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ' প্রসঙ্গে শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় লিখিয়াছেন, 'ণকার স্থানে সর্ব্বত্র নকারের প্রয়োগ এবং যকার স্থানে সর্ব্বত্র জকারের প্রয়োগ, ও শকার স্থানে সর্ব্বত্র সকার প্রয়োগ; যাঁহারা প্রাচীন রীতি বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের যুক্তি কি আমি তাহা জানি না, কিন্তু কোন পুথিতে তাহা ধ্রুবসত্য বলিয়া দেখিতে পাই না।' এই কথাই ঠিক বোধ হয়। কারণ আজকাল আমরা শব্দের কৃত্রিম বানানে যতটা বাঁধা পড়িয়াছি, প্রাচীনেরা ততটা পড়েন নাই। সেকালে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, হাতের লেখা পুথি পড়িয়া এবং ধ্বনি শুনিয়া লেখককে শব্দের বানান করিতে হইত। যাঁহারা সংস্কৃত জানিতেন, তাঁহারা বাঙ্গালা শব্দ কিরূপ বানান করিতেন, ইহা জানিতে না পারিলে সেকালের বানানের রীতি ধরা পড়িবে না। অশিক্ষিত গ্রাম্য লিপিকরের বানানকে বাঙ্গালা শব্দের বানান মনে করিলে আজকাল্‌কার আদালতের মুহুরীকে বাঙ্গালা-ভাষার লেখক স্বীকার করিতে হইবে।

৫। বর্ত্তমান শূন্যপুরাণের সময় এবং লেখক।

তথাপি শূন্যপুরাণের শব্দের বানান প্রাচীনতার সাক্ষ্য দিতেছে। একটি বানান বিশেষ দ্রষ্টব্য। মাআধর, ধিআন, নারাঅন, এবং দিআ, লইআ, করিআ ইত্যাদিতে প্রায় সর্ব্বত্র 'অ আ' দেখিতেছি। আজকাল আমরা একটা নূতন স্বরবর্ণ আবিষ্কার করিয়াছি। 'য়' টাকে আমরা হলন্ত "অ" করিয়া ফেলিয়াছি। অ আ ই উ এ ও স্থানে য় য়া য়ি য়ু য়ে য়ো লিখিতেছি। এই যে পরিবর্ত্তন, ইহা অল্পকালে ঘটিতে পারে নাই। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে য় য়া লিখিয়াছিলেন। সেই সময়ের মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণেও য় য়া পাই। কৃষ্ণদাস ও কবিকঙ্কণ উভয়েই সংস্কৃতভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। শূন্যপুরাণেও দুই এক স্থানে য়া আছে। ওড়িয়াভাষায় য়-কার হলন্ত অ হয় নাই। এখানে আর এক প্রশ্ন মনে আসে। বাঙ্গালাভাষায় অকারান্ত বিশেষ্য শব্দ কতকাল হইতে হলন্ত উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে? শূন্যপুরাণে হঅ, জঅ, জঅকার আছে। কোন কোন স্থান পড়িলে মনে হয়, সেকালে হঅ, জঅ, এইরূপই উচ্চারিত হইত। (অবশ্য) জয় শব্দের জঅ উচ্চারণ একবারে ভুল।) শূন্যপুরাণের নিম্নের কবিতাটি যতি দিয়া পড়িতে চেষ্টা করিলে ঐ অনুমানে আসিতে হইবে।

"মঙ্গলরাগ—

চৌদিকে জঅজঅ   আনন্দেত পূরল

কৌতুকেত বাজএ বাজনা।

পণ্ডিত বাম্ভন বেদনিনাদন
জালিয়া ধুপ দীপ ধুনা ॥"

কিন্তু গানের সুর লক্ষ্য করিয়া ভাষার শব্দের উচ্চারণ অনুমান করা চলে না। ১৩১৫ সালের সাঃ পঃ পত্রিকায় চণ্ডীদাসের কএকটি চতুর্দ্দশ পদাবলী ছাপা হইয়াছে। পদাবলীর 'লেখক শ্রীগণেশরাম শর্ম্মণঃ সাং কুতুলপুর' (বাঁকুড়া জেলা)। পদগুলি তিন শত বৎসরের পুরাণা পুথিতে ছিল। অতএব লিপিকর, লিপিকরের বাসস্থান এবং সময়, তিনটি বিষয়ই জানা গিয়াছে। এই পদাবলীতে দেখিতেছি, অভিনত্ত হঅ অতিসঅ শ্রবন হরস সসী জার জদি জাএ ইত্যাদি আছে। সংস্কৃত শব্দের বর্ণাশুদ্ধি দেখিয়া মনে হয় 'শর্ম্মা' হইলেও লিপিকর লেখাপড়া জানিতেন না। অতএব শূন্যপুরাণের বানানের সহিত এই পদাবলীর বানান তুলনা করিতে পারা যায়, এবং পুরাণখানিকে অন্ততঃ তিন শত বৎসরের পুরাণা বলিতে পারা যায়।' নগেন্দ্রবাবুও পুথির বয়স অত মনে করিয়াছেন।

বর্ত্তমান শূন্যপুরাণের উত্তরসীমা এক রকম পাইলাম, পূর্ব্বসীমা কি? নগেন্দ্রবাবু রামাই পণ্ডিতকে প্রায় নয়শত বৎসরের পুরাতন বলিয়াছেন। ইহাতে আমাদের কোন বক্তব্য নাই। আমাদের সন্দেহ এই যে, তিনি যে রামাইর সময় দিয়াছেন, শূন্যপুরাণের গায়ক রামাইর কি বোধ হয় না সেই সময়? এই দুই রামাই এক প্রমাণ, (১) শূন্যপুরাণের স্থষ্টিপত্তনে লিখিত আছে, এক সময়েঁ রেখা রূপ বর্ণ চিহ্ন রবিশশী রাতিদিন জলস্থল পাহাড় পর্ব্বত স্থাবর জঙ্গম ঠাকুরের দেউল দেহারা পৈরাগের মাধব, ইত্যাদি কিছুই ছিল না। তখন 'দেবস্থল নহি ছিল ন ছিল জগন্নাথ।' দেবস্থল ছিল না, জগন্নাথ ছিলেন না। এই উক্তি হইতে বুঝিতেছি, বঙ্গদেশে জগন্নাথদেব প্রসিদ্ধ হইবার পর 'স্থষ্টিপত্তন লেখা হইয়াছিল। কোন্ সময়ে জগন্নাথদেব বঙ্গদেশের লোকের নিকট খ্যাত হইয়াছিলেন? পুরাবিৎ নগেন্দ্রবাবু ইহার উত্তর দিতে পারেন। পুরীর বর্ত্তমান মন্দির খৃঃ ১২ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বেও জগন্নাথ দেব ছিলেন; কিন্তু বিশেষ প্রমাণ না পাইলে দেশ দেশান্তরে তাঁহার খ্যাতি ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। পুরীর মন্দিরের 'মাদলা পাঁজী' ঐ সময়ের পরের আছে, পূর্ব্বের নাই। ইহাতেও বোধ হয় বর্ত্তমান মন্দিরনির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথ দেবের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। যাহা হউক, সন্দেহ দাঁড়াইতেছে এবং বোধ হইতেছে শূন্যপুরাণের যে টুকুও নয় শত বর্ষ পূর্ব্বের রামাই পণ্ডিতের রচিত নহে। বলা বাহুল্য, বেদব্যাস যে কালেই থাকুন তাঁহার নাম দিয়া আজিও পুরাণ রচিত হইতে পারে। (২) শূন্য-পুরাণ পড়িলে বেদব্যাসের কথা মনে পড়ে। বুড়া ব্যাস কখন ছিলেন, কে জানে। হয়ত তিনি দ্বাপরযুগে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ছিলেন। যদি তাই হয়, সেই ব্যাস যখন পুরাণ লিখিতেছেন, তখন আপনাকে হরির এক প্রাচীন অবতার বলিয়া জানাইলে সন্দেহ জন্মে। (শ্রীমদ্‌ভাগবত দেখুন)। শূন্যপুরাণেও দেখিতেছি, পূর্ব্বকালে চারিজন, কোথাও দেখিতেছি, পাঁচজন পণ্ডিত ছিলেন। সত্যযুগে শ্বেতাই পণ্ডিত, ত্রেতাযুগে নীলাই পণ্ডিত, দ্বাপরযুগে

কংসাই পণ্ডিত, কলিযুগে রামাই পণ্ডিত, এবং আর এক পণ্ডিত ছিলেন তাঁহার নাম গোঁসাই পণ্ডিত। গোঁসাই পণ্ডিত কোন্ যুগে ছিলেন, তাহা লিখিত নাই।*

পরে দেখাইতেছি, শূন্যপুরাণ একখানি গ্রন্থ নহে, অন্ততঃ ছয়খানি পুথীর সংগ্রহ। বক্তব্যের সুবিধার নিমিত্ত 'সৃষ্টিপত্তন' ব্যতীত শূন্যপুরাণের অবশিষ্ট অংশকে ক খ গ ঘ ঙ চ এই ছয় পুথীতে বিভক্ত করিবার কল্পনা করিতেছি। মোটামোটি, ২৩ পৃষ্ঠা হইতে ৪২ পৃষ্ঠা ক-পুথী, ৪৩ হইতে ৮১ পৃঃ খ-পুথি, ৮১—৯৮ পৃঃ গ-পুথি, ৯৮—১১৯ পৃঃ ঘ-পুথি, ১১৯—১৩২ পৃঃ ঙ-পুথি, ১৩২—১৪২ পৃঃ (শেষ) চ-পুথি। এই চ-পুথির সমস্তটা 'সোসাইটির' পুথিতে ছিল, আদর্শে ছিল না।

সকল পুথিতে গোঁসাই পণ্ডিতের উল্লেখ নাই, কএকখানিতে আছে। যথা,—

ক-পুথিতে (৪০ পৃঃ)

"উল্লুক মুক্ত কৈল পঞ্চম দুআর।"

এই ইঙ্গিত মাত্র আছে। ধর্ম্মমণ্ডপের চারি দ্বার শ্বেতনীলাদি চারি পণ্ডিত লইয়াছিলেন। এই হেতু গোঁসাই পণ্ডিতের নিমিত্ত এক নূতন দ্বার—শূন্য বা পঞ্চম দ্বার কল্পনা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার ঘটদাসী অভআ, কোটাল উল্লুক এবং গতি অনেক ছিল।

খ-পুথিতে (৪৭ পৃঃ)

"পঞ্চম দুআরে কে পণ্ডিত গোঁসাই সে
আইল অনেক গতি লইএ বসি।

* শ্বেতাই, নীলাই ও কংসাই পণ্ডিত কাল্পনিক বোধ হয়। শূন্যপুরাণে পাই, সত্যযুগে শ্বেতাই পণ্ডিতের শ্বেতবর্ণ ঘোড়া শ্বেতবর্ণ জোড়া, শ্বেতবর্ণ পাদুকা ছিল। তিনি ধর্ম্মমণ্ডপের পশ্চিম দ্বারের পূজক। তাঁহার ঘটদাসী বসুআ (বসুধা), কোটাল চন্দ্র, গতি বা অনুচর শিষ্য চারি শ ছিল। ত্রেতাযুগে নীলাই পণ্ডিতের নীলবর্ণ ঘোড়া, নীলবর্ণ জোড়া, এবং নীলবর্ণ পাদুকা ছিল। তিনি ধর্ম্মমণ্ডপের দক্ষিণদ্বারের পূজক। তাঁহার ঘটদাসী চরিত্রা, কোটাল হনুমান, এবং গতি আটশ ছিল। দ্বাপরযুগে কংসাই (কাংস) পণ্ডিতের কাংসবর্ণ ঘোড়া, কাংসবর্ণ জোড়া, এবং কাংসবর্ণ পাদুকা ছিল। তিনি ধর্ম্মমণ্ডপের পূর্ব্বদ্বারের পূজক। তাঁহার ঘটদাসী গঙ্গা, কোটাল সূর্য্য, গতি বার শ ছিল। কলিযুগে রমাই পণ্ডিতের তাম্রবর্ণ ঘোড়া, তাম্রবর্ণ জোড়া, এবং তাম্রবর্ণ পাদুকা ছিল। তিনি ধর্ম্মমণ্ডপের উত্তর দ্বারের পূজক। তাঁহার ঘটদাসী দুর্গা, কোটাল গরুড়, গতি ষোল শ ছিল। গোঁসাই পণ্ডিত শূন্য বা পঞ্চম দ্বারের পূজক ছিলেন। তাঁহার ঘটদাসী অভআ (অভয়া), কোটাল উল্লুক এবং 'অনেক' গতি ছিল।

শ্বেতাই নীলাই কংসাই এই তিন পণ্ডিতের নাম তবে শ্বেত নীল কাংসবর্ণ (পীতবর্ণ?) বেশভূষা হইতে আসিয়াছিল। চারি যুগ, চারি বর্ণ। শ্বেত নীল পীত রক্ত এই চারিবর্ণ সংস্কৃতে প্রসিদ্ধ। কিন্তু ক্রম অন্য প্রকার, শ্বেত রক্ত পীত নীল—চারি যুগের এই চারি বর্ণ হইবার কথা। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে, কলিযুগে রমাই পণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহার পরে গোঁসাই পণ্ডিত আসিয়াছিলেন।

উল্লুক কোটাল কোলে বন্ধ্যা আছে পাঠশালে
আমনি অভআ ঘটদাসী ॥"

এইরূপ আরও তিন স্থানে (৪৩, ৪৭, ৫৪ পৃঃ) আছে।

গ-পুথিতে (৬১ পৃঃ)

"পঞ্চম দুআরে গোঁসাঞি জার আছে অনেক গতি।"

এইরূপ আর দুই স্থানে (৬৬, ৭৫ পৃঃ) উল্লেখ আছে। অন্য পুথি গুলিতে গোঁসাই পণ্ডিতের উল্লেখ পাই না। এই গোঁসাই পণ্ডিত কে ছিলেন? নগেন্দ্রবাবুর মুখবন্ধে দেখিতেছি, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে আছে,—

"তবে রঞ্জাবতী বলে করি নিবেদন।
পণ্ডিত গোঁসাই গ্রন্থে কহিল যেমন ॥"

গোঁসাই পণ্ডিত যিনিই হউন, তিনি রামাই পণ্ডিত ছিলেন না। উভয়ে এক হইলে শূন্যপুরাণের উক্তি মিথ্যা হয়। হয়ত দুই পণ্ডিতেই ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। গোঁসাই নাম হইতে সন্দেহ হয়, তিনি হয়ত প্রথমে বৈষ্ণব গোস্বামী ছিলেন, হয়ত সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নাম গোঁসাই না হইতে পারে। যাহাই হউক, গোঁসাই শব্দ হইতে চৈতন্যদেবের পরের লোক মনে হয় না কি?

আরও দেখা যাইতেছে, যে রামাই শূন্যপুরাণ রচিয়াছিলেন, ধর্ম্মমণ্ডলের দ্বার বিশেষের (উত্তর দ্বার বা গাজন দুআরের) পণ্ডিত হইবার তাঁহার সম্ভাবনা ছিল না। লেখক আপনাকে পৌরাণিক কল্পনা করিতে পারেন; কিন্তু তাহাতেই ধরা পড়েন, তিনি হয় পৌরাণিক নহেন, কিম্বা পুরাণের লেখক নহেন। কত কাল গেলে লোকে পৌরাণিক হইয়া পড়িতে পারেন? যদি নগেন্দ্রবাবুর ইতিহাসের রামাই খৃঃ ১১শ শতাব্দীর প্রথমে ছিলেন, তাহা হইলে শূন্যপুরাণ ঐ সময়ের অনেক (দুই শত বৎসর?) পরে রচিত। (৩) উপরে খ ও গ-পুথিতে পঞ্চম পণ্ডিত গোঁসাই পণ্ডিতের উল্লেখ পাইয়াছি। ক-পুথিতে ইঙ্গিতমাত্র আছে। এই পদটিকে পরে যোজিত মনে করিতে বাধা নাই। কিন্তু খ ও গ-পুথিতে সেরূপ মনে করিতে পারি না। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ দুই পুথির ভাষার শব্দ দেখিলেও খৃঃ ১৩শ শতাব্দীর পরে আসিতে হয়। সমুদয় শূন্যপুরাণের মধ্যে শেষের কবিতাটিতে (আমাদের গণনায় চ-পুথিতে) ধর্ম্মঠাকুর নিজেই 'যবনরূপী' হইয়াছেন। এখানে যাবনিক শব্দ আছে। অন্যত্র খ-পুথিতে—

(৪৭ পৃঃ) দোকানি পাতিআ গেল হাট।
(৪৯ পৃঃ) (হিন্দুর ভূত নগরে সেন্ধাঅ)॥
কোমরেত তোপ দিল পাএত ডাড়ুকা।

গ-পুথিতে—

(৭৮ পৃঃ)　　চলিল ততঃপর মুনি বরাবর
　　　　　　　কহিল দেবর ভারতী ॥

ঙ-পুথিতে—

(১০৫)　　মাল ভাণ্ডার রইবর।
(১২৩)　　ধর্ম্মর বাজার মাঝে।

দোকানি, হিন্দু, কোমর, তোপ (?), বরাবর, মাল, বাজার—এই কএক শব্দ স্পষ্ট যাবনিক। তোপ শব্দটি তোক হইবার সম্ভাবনা। যাবনিক তৌক—শৃঙ্খল।* কেহ কেহ তোপ শব্দে কামান বুঝিয়াছেন। কিন্তু কোমরে কামান (এবং পাএ বেড়ী) হইতে পারে না। যাহা হউক, বঙ্গের ইতিহাসে পাই, খৃঃ ১৩শ শতাব্দীর আরম্ভে বখ্তিয়ার খিলিজি রাঢ় অধিকার করিয়াছিল। এই সময়ের পূর্ব্বে অতগুলি যাবনিক শব্দ বাঙ্গালা ভাষার সহিত মিশিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। বরং কিছুকাল না গেলে কোমর শব্দের মতন শব্দ সেকালে প্রচলিত দেশী শব্দকে তাড়াইয়া দিতে পারিত না। শব্দগুলি এমন কবিতায় আছে যে, সে গুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। অতএব ছাপা শূন্যপুরাণের খ গ ঙ এবং চ পুথী খৃঃ ১৩শ শতাব্দীর পরে রচিত।

উপরের তিন পুরাণ হইতে শূন্যপুরাণের রচনাকালের পূর্ব্বসীমা খৃঃ ১৩শ শতাব্দী পাই।

৬। শূন্যপুরাণ সংহিতাগ্রন্থ।

শূন্যপুরাণের সমস্তটা প্রাচীন নহে, কিম্বা সমস্তটা একখানি গ্রন্থ নহে, গ্রন্থের বিষয় দেখিয়া বুঝিতেছি একখান গ্রন্থ নহে। লিপিকর যেখানে যা পাইয়াছে, তাহাই প্রায় পরে পরে জুড়িয়া এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছে।

নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, 'শূন্যপুরাণের রচনা বহুস্থলেই পুনরুক্তি দোষ-দূষিত।' পুনরুক্তির দুই কারণ পাওয়া যায়। (এক) এখানি পদ্ধতি নহে, ধর্ম্মমঙ্গল গানের পুস্তক; (দুই) ভিন্ন ভিন্ন পুথী একত্র হইয়া বর্ত্তমান আকারে দাঁড়াইয়াছে। গানের পালার ধারাই এই যে, তাহাতে একই বিষয় লইয়া অনেক গান থাকে। প্রমাণ, 'বঙ্গবাসী ছাপাখানা' হইতে প্রচারিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী। সেখানির সমস্তটা যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের রচিত নহে, পুনরুক্তিই তাহার প্রমাণ। গায়নেরা নিজে গান রচনা করিয়া পালা লম্বা করেন, কলাবত্তাও প্রকাশ করেন, এবং অন্যের রচিত ভাল গান পাইলে নিজের পুথীর মধ্যে পুরিয়া ফেলেন।

* মাণিকরামের ধর্ম্মমঙ্গলে—
　　　　"হাতে গলে দিল তোক পায় দিল বেড়ী।"
ডাড়ুকা শব্দটি খনার পুরাতন বচনে আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে 'দাঁড়ুকা সহিত ডুবি কাঁহা বহি গেল।' এই শব্দটি কি দণ্ডিকা দণ্ড স্বরূপ বেড়ী শব্দের অপভ্রংশ? সংস্কৃত দণ্ডিকা শব্দ এই অর্থে আছে কি?

ইহাতে কৃত্তিবাসী-রামায়ণের এত সংস্করণ হইয়াছে। সেদিন কোন কথকঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ধ্রুবোপাখ্যান কথকতা করিতে বসিয়া উত্তানপাদ রাজাকে দিয়া সুনীতি রাণীকে বনবাসে পাঠাইলেন। তখন ধ্রুবের জন্ম হয় নাই। কথকঠাকুর আগাগোড়া করুণরস ঢালিবার লোভ সামলাইতে পারেন নাই।

এখন শূন্যপুরাণের বিষয় দেখি। প্রথমে সৃষ্টিপত্তন। এই অংশ একবার বই দুইবার নাই। এই সৃষ্টিবৃত্তান্ত কৌতুকাবহ, কিন্তু উপস্থিত প্রসঙ্গে আবশ্যক নাই। শেষ কথা, ধর্ম্মঠাকুর ব্রহ্মাকে সৃষ্টি, বিষ্ণুকে পালন এবং ত্রিলোচনকে সংহার করিতে আজ্ঞা করিলেন। আদ্যাশক্তি যোনিরূপা হইয়া সর্ব্বজীবে থাকিবেন। এইরূপে,

'চারিজনাঅ ছিস্‌টির ভার দিলা পরাৎপর।'

এবং 'সৃষ্টিপত্তন সমাপ্ত।'

ইহার পরে ক-পুথী আরম্ভ। এই হেতু প্রথমে 'শ্রীশ্রীধর্ম্মায় নমঃ' দেখিতেছি। সৃষ্টি-পত্তনের গোড়ায় একবার 'শ্রীশ্রীধর্ম্মায় নমঃ' পাইয়াছি। এখানে আবার পাইতেছি। ইহাতে বোধ হয়, সৃষ্টিপত্তন এবং পরের অংশ দুই পৃথক্ পুথী।

নমস্ক্রিয়ার পর পুথী আরম্ভ। প্রথমে ধর্ম্মঠাকুরের স্নান। এই নিমিত্ত ঘটদাসী কোটাল ও গতি লইয়া চারিদিকের চারি পণ্ডিত আসিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে স্নান করাইয়া সিংহাসনে বসাইলেন। এখন তিলক নিমিত্ত ঠাকুরের ষোল-শ আমিনী (ধর্ম্ম-কামিনী) চন্দন ঘষিলেন। পূজার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন হইল। ঘটদাসীরা গঙ্গাজল দিয়া পুষ্প প্রক্ষালন করিয়া হার গাঁথিলেন। 'আগে গণেশের পূজা দিয়া ফুল জল। তবে সে পূজিব প্রভু ভকত বৎসল॥" ঠাকুরের পূজা হইল। দানপতি রাজা হরিচন্দ্র তাঁহার মদনানাম্নী পাটরাণী ও একশত অপর রাণী এবং বহু কুটুম্ব বান্ধব, বাদ্যভাণ্ড লইয়া ঠাকুরপূজা দিতে আসিলেন। রাণীর পুত্রবর আকাঙ্ক্ষা। মণ্ডপের চারিদ্বার উন্মোচিত হইল, রাজারাণী চারি দ্বারে প্রণাম করিলেন। রাজা-রাণী আসিয়াছেন, ঘটা হইয়াছে। যত দেবতা স্ব স্ব বাহনে পূজা দেখিতে আসিলেন। (কবি রাজার ধর্ম্মঠাকুরের ঘরদেখা একবার পয়ারে বলিয়া আবার ত্রিপদী ধরিয়াছেন। গান বলিয়া দুইবার? ত্রিপদীটি প্রক্ষিপ্ত ?)। ধর্ম্মের পণ্ডিত রাজা-রাণীকে ঠাকুর দেখাইতে লাগিলেন। বলিলেন, এই দেখ কুর্ম্মরাজকে (ধর্ম্মঠাকুরকে) নাগরাজ বেষ্টন করিয়াছেন ; এই দেখ ধর্ম্মের ষোলশ গতি। এই দেখ, পশ্চিমে শ্বেতপণ্ডিত, চন্দ্র কোটাল, বসুয়া ঘটদাসী, চারি শ গতি। এই দেখ দক্ষিণে, ইত্যাদি। রাজা-রাণীর আগমনে বেসাতিরা হাট বসাইয়াছে। তাহারাও দেখিবে, আবার দ্বার মোচন হইল। ঠাকুর দেখা হইল, কবি বলিতেছেন, 'দুয়ার মুকুত হইল বরত হৈল সায়।' কিন্তু আরও দুইটি কাজ আছে। (বোধ হয়) সকল যাত্রীকে শান্তিবারির তুল্য শুভচূর্ণ (চনাপাবন) দেওয়া হইল, এবং ধর্ম্মঠাকুরের ব্রতকথা শুনান হইল।

আমাদের অনুমানে এইখানে ক-পুথী সমাপ্ত। কারণ পূজার আর কিছু অবশিষ্ট রহিল

না। যাঁহারা গ্রামে ঠাকুর-মণ্ডপে কখনও পূজা দিতে গিয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন উপরি লিখিত বিবরণ পূজা দিবার অবিকল অভিনয়। এইভাবে দেখিলে ক খ গ ইত্যাদি পুথী-গুলিকে পূজার পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। কিন্তু পূজার পদ্ধতির মধ্যে যমপুরাণ, ধান্যের চাষ প্রভৃতি কয়েকটী কথা কিছুতেই আনিতে পারা যায় না। মোট কথা, প্রত্যেক পুথীতেই ঠাকুরের স্নান-পূজা, হরিচন্দ্র রাজা ও রাণী কিম্বা অপর যাত্রীর পূজা দেওয়া, কোথাও মন্নুই (ঠাকুরের ভোগ,) ইত্যাদি আছে। কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে, তাহা সকল পুথীতে ঠিক এক নহে। কবিতা, কবিতার পরিমাণও এক নয়। অতএব বোধ হয় কোন্ একখানা প্রাচীন পুথী ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন লেখক গান রচনা করিয়াছিলেন।

৭। শূন্যপুরাণের রচনাস্থান।

ভাষা বিচার করিবার সময় দেখা যাইবে শূন্যপুরাণে যেমন নানা-সময়ের রচনা আছে, তেমনই একাধিক স্থানের রচনাও আছে। কারকের বিভক্তিতে ও ক্রিয়াপদে শূন্যপুরাণের ভাষার সহিত ওড়িয়া ভাষার সাদৃশ্য আছে, উত্তর-পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার সহিতও আছে। তথাপি অধিকাংশ রাঢ়ে মধ্যরাঢ়ে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। নগেন্দ্রবাবু অনুমান করিয়াছেন, মধ্যরাঢ়ের দ্বারকেশ্বর নদীতীরে রামাই পণ্ডিতের আশ্রম ছিল। এখানকার গ্রাম্য শব্দের সহিত শূন্যপুরাণের শব্দের মিল আছে। এই হেতু স্থূলতঃ রাঢ়ের ভাষা বলিতেছি।

চ-পুথীতে নিরঞ্জনের রুষ্মা নামক কবিতায় মালদহের নাম করিয়া ধর্ম্মঠাকুরের ভক্তদিগের প্রতি যবনের অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে। সে অংশটা মালদহের লোকের রচনা হওয়া সম্ভব। ঐ পুথিতে ১৩৩ পৃষ্ঠায়—

'তালের কাণ্ডারি গুআর বাখারি
চিত্র কৈল নানা ভাতি।'

গ পুথীতে অনুরূপ শ্লোক, (৫৮ পৃষ্ঠে)

'তালর কাঁড়ি লাগে গুআর বাখারি
ছিটনি তথির উপর।'

'আদি ভূপতি' (হরিচন্দ্র রাজা) ধর্ম্মের ঘর নির্ম্মাণ করাইবেন। চিত্রগড়ের কামিনা— কর্ম্মকার-বিসাস্তর আসিয়া ঘর নির্ম্মাণ করিল। এই ঘরের কাঁথ পাথরের, থাম ফটিকের, মেঝা কাঞ্চনের হইল, কিন্তু গ-পুথীতে ময়ূরপুচ্ছের, থ-পুথীতে সোনার খড়ের ছায়নি হইল * তা হউক, 'বাঅতি পাথর', 'হাতী মাড়মর পাথর,' 'রেঅটী পাথর', কিম্বা অন্য কোনও পাথর মধ্য রাঢ়ে পাওয়া যায় না। এ নিমিত্ত উত্তর রাঢ়ে কিম্বা উত্তরবঙ্গে যাইতে হইবে। মধ্যরাঢ়ে তালের কাঁড়ী সুলভ, কিন্তু গুয়া আছে দুর্ল্লভ। গুয়া গাছের বাখারী কোথায় হয়? এনিমিত্ত যশোর বরিশাল ফরিদপুর শিলেট রঙ্গপুর প্রভৃতি দক্ষিণ, পূর্ব্বে ও উত্তর বঙ্গে যাইতে হইবে।

* পাকা ছাত হইল না কেন? গ-পুথীতে ঘর নির্ম্মাণ পরে পরে দুইবার বলা হইয়াছে।

এমনও হইতে পারে, রাঢ়ের কবি ঐ স্থানে গিয়া শুয়ার বাথারী দেখিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য শব্দে এই অনুমানে বাধা দিতেছে। খ পুথীতে (৪৭ পৃঃ) 'সুনার খেড় মন্দির হইল।' নগেন্দ্রবাবু খেড় অর্থে খড় বুঝিয়াছেন। ইহাই ঠিক বোধ হয়। রাঢ়ে খেড় শব্দ নাই, পূর্ব্বকালেও ছিল না বলিতে পারা যায়, সকলেই বলে খড়। শূন্যপুরাণের অন্যত্র (৫৩ পৃঃ) 'জম দাঁতে করএ খড়।' এই খেড় শব্দের নিমিত্ত রাঢ় ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইবে। ধর্ম্মের ঘর পুখুর আড়ার উপরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাঢ়ে পুকুরের অভাব নাই, বরং বাহুল্য আছে, এবং জলের সুবিধার নিমিত্ত পুকুর পাড়ে ধর্ম্ম ঠাকুরের মণ্ডপও, দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, পুকুরের জন্যে দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়িয়া আসিতে হইতেছে। দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে ধর্ম্ম-ঠাকুর অদ্যাপি অজ্ঞাত আছেন। মোটের উপর, উত্তর রাঢ় এবং উত্তরবঙ্গে গেলে উপরের সকল বাধা মিটিয়া যায়।

শূন্যপুরাণে কোন কোন শব্দের স্বরের বিপ্রকর্ষ দেখা যায়। রাঢ়ে আদি শব্দ আইদ, আজি আইজ, রাতি রাইত উচ্চারিত হয়। কিন্তু মূল শব্দে স্বরবর্ণ না থাকিলে বিপ্রকর্ষ-প্রায় হয় না, শব্দের মধ্যে স্বর আগমও হয় না।* শূন্যপুরাণে পাই, ভাইসিতে (ভাসিতে), আইট (আট, অষ্ট), কাইঠ (কাঠ), জয়না (জনা), ইত্যাদি। হয়ত পূর্ব্বকালে রাঢ়ের গ্রাম্য লোক শব্দগুলি ঐরূপ উচ্চারণ করিত, হয়ত কোন কোন অংশ উত্তরবঙ্গ ঘুরিয়া আসিয়াছিল। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে ধর্ম্মপূজা অজ্ঞাত বটে, উত্তরবঙ্গে নহে।

৮। শূন্যপুরাণের মূল্য।

ধর্ম্মপূজা সম্বন্ধে আমি কখন আলোচনা করি নাই। শূন্যপুরাণের মূল্য সম্বন্ধে নীচের কথাগুলি ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ নিমিত্ত লিখিতেছি।

সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে (সাঃ পঃ পঃ, ১৩০৪ সাল) লাউসেন রঞ্জাবতী ইত্যাদি নাই, আছে শূন্যপুরাণের অংশবিশেষ। যথা,—

"উর উর ধর্ম্মরাজ সিদ্ধকর মোর কাজ
দানপতি আছে মুখ চেয়ে।
হরিচন্দ্র মহারাজা আনন্দে করিল পূজা
নিজপুত্র দিয়া বলিদান।
মদনা তাহার রাণী চোখে না পড়িল পানী
আত্মপূজা দিল সাবধান॥"

ইত্যাদি। এই ধর্ম্মমঙ্গলে পাই, আদি রাজা হরিচন্দ্র প্রথমে ধর্ম্মবিদ্বেষী ছিলেন। ধর্ম্মনিন্দা করাতে তিনি অপুত্রক হইয়াছিলেন। নানা ক্লেশ পাইয়া, এমন কি, বনে প্রাণ হারাইয়া এবং পরে ধর্ম্মের কৃপায় প্রাণলাভ এবং লুইচন্দ্র নামক পুত্রলাভ করেন।

---

* ময়না, কয়না, শিয়র প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের মাঝে স্বর আগম হইয়াছে। কিন্তু এরূপ শব্দ অল্প।

শূন্যপুরাণেও হরিচন্দ্র রাজার ধর্ম্মপূজা এবং তাঁহার মদনা রাণীর কথা পাই। পুত্র-লাভেচ্ছায় হরিচন্দ্র ধর্ম্মের নূতন মণ্ডপ করাইয়া সমারোহের সহিত পূজা দিয়াছিলেন।

সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় (১৩১৫ সালের ২য় সংখ্যা) ময়নামতীর গান পড়িয়া মনে হয়, এই ময়নামতী এবং শূন্যপুরাণের ও সহদেব চক্রবর্ত্তীর মদনা রাণী এক। মদনা হইতে ময়না শব্দ আসিয়াছে, (তুলনা কর, ময়না পাখী, ময়না কাঁটার গাছ)। মদনাবতী, মদনা হবতী নামে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। ময়নামতীও অপুত্রক ছিলেন, এবং রাজা মাণিকচাঁদের দেহত্যাগের পর এক পুত্র লাভ করেন। এই পুত্রের নাম গোপীচন্দ্র। হরিচন্দ্র রাজার দুই কন্যার সহিত গোপীচন্দ্রের বিবাহ হয়। অতএব ময়নামতীর গানে হরিচন্দ্র ময়নামতীর বেহাই, শূন্যপুরাণে মদনার স্বামী।

ময়নামতীর গান নামক প্রবন্ধকার রঙ্গপুরের বৃদ্ধ জুগী বা যোগীদের মুখে শুনিয়া গানের বিষয় এবং অনেক পদ লিখিয়াছেন।* এই গানের নায়ক নায়িকা উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতি ছিলেন। লেখক মহাশয় রঙ্গপুরে তাঁহাদের কীর্ত্তি-চিহ্ন পাইয়াছেন।

আমার বোধ হয়, ময়নামতীর গানের উপাখ্যান রূপান্তরিত হইয়া রাঢ়ের শূন্যপুরাণে এবং সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে দেখা দিয়াছে। এই অনুমান ঠিক হইলে মাণিকচাঁদ গোপীচাঁদ প্রভৃতির রাজত্বের বহুপরে শূন্যপুরাণ লিখিত হইয়াছিল।

আরও বোধ হয়, বঙ্গদেশের দুই প্রাচীন রাজা ধর্ম্মসেবক হইয়া ধর্ম্মপূজা প্রচার করিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গের মাণিকচন্দ্র কিম্বা হরিচন্দ্র ধর্ম্মপূজার আদ্য ভূপতি, এবং দক্ষিণ রাঢ়ের কর্ণসেন লাউসেন পরবর্ত্তী অন্য রাজা। এই দুই রাজাকে নায়ক করিয়া ধর্ম্মমঙ্গলের উৎপত্তি। ময়নামতীর গানে, শূন্যপুরাণে, সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে প্রথম রাজাকে, এবং মাণিক গাঙ্গুলীর ও ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে দ্বিতীয় রাজাকে পাই। এই দুই ভাগে সমুদয় ধর্ম্মমঙ্গল ভাগ করিতে পারা যায় কি না, তাহা ধর্ম্মমঙ্গলপাঠকের বিবেচ্য রহিল। আশ্চর্য্যের কথা, লাউসেনের রাজধানী ময়নাগড় নামে, উত্তর বঙ্গের ময়না এবং হরিচন্দ্র কিম্বা মাণিকচন্দ্রের মদনা বা ময়না নাম পাইতেছি।

ময়নামতীর গান সংগ্রাহক রঙ্গপুরের যোগীর নিকট গান শুনিয়াছেন। আমার বোধ হয়, দক্ষিণ রাঢ়ে যোগী জাতির নিকট অনুসন্ধান করিলে গোবিন্দচন্দ্রের গীত, এমন কি সমস্ত পালার পুথী মিলিবে। এই যোগী জাতি গোরক্ষনাথের শিষ্য। ইহাদের নিকট গোরক্ষনাথ মহাদেবের নাম। ওড়িশ্যাতেও গোরক্ষনাথের শিষ্য যোগী জাতি আছে, এবং ইহারাও

* লেখক মহাশয় এই পদগুলিতে প্রাচীন বানান দিয়াছেন। প্রাচীন বানান হেতু পদগুলি প্রাচীন বলিয়া ভ্রম হয়। শোনা কথার শব্দের উচ্চারণ অনুসারে শব্দের বানান যুক্তিসিদ্ধ বটে, কিন্তু সে নিমিত্ত সকল স্থলে সেকালের বানান আবশ্যক হয় না। যাহা হউক, এই গান যে মুসলমান রাজত্বের বহু পরে রচিত, তাহা মুলুক, দেওয়ান, চাকরি, খাজনা, দরবার, মোকাম, বরাবর, দরিয়া, গোলাম, বাজার, কোমার, রাইত, দোকান, বন্দী, মহল ইত্যাদি শব্দের ভূরিপ্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে।

গোরক্ষনাথ ও মহাদেব অভিন্ন ভাবিয়া থাকে। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ইহাদের জীবিকা। ভিক্ষা করিবার সময় ইহারা নানা গীতের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্রের গীতও গায়। ইহাদের ঘরে তালপাতার পুথীতে গোবিন্দচন্দ্রের সম্পূর্ণ গীত লিখিত আছে। ভিক্ষা করিবার সময় যোগীরা ঐ গীতের কিয়দংশ গায়। এমন প্রাঞ্জল ভাষায় করুণরসপূর্ণ স্বাভাবিক কবিত্ব অল্পই পাওয়া যায়।* পাঠকের কৌতূহল মিটাইবার অভিপ্রায়ে ঐ গীতের বিষয় পরে লেখা যাইবে। দেখা যাইবে, বঙ্গদেশে মাণিকচন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পাটরাণীর নাম মুক্তাদেবী। ইনি প্রথমে অপুত্রক ছিলেন। পরে গোবিন্দচন্দ্র নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। কিন্তু পুত্রের আয়ু আঠার বৎসর মাত্র জানিয়া রাণী গোবিন্দচন্দ্রকে হাড়ীপা নামক এক হাড়ীর নিকট দীক্ষিত করান। গোবিন্দ চন্দ্র যোগী হইয়া পরে অমর হন। তিনি আর গৃহবাসী হন নাই। যোগী হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার অন্নেক (১৮ গণ্ডা) বিবাহ হইয়াছিল। তন্মধ্যে রোদনা ও পোদনা, কেহ বলে রোদমা ও পোদমা, দুই রাণী প্রধানা ছিলেন। এই গীতে মুক্তাদেবীর মাতার নাম মউনা দেবী। রোদনা ও পোদনা কাহার কন্যা, তাহা ভাল বোঝা যায় না। কোন গাতে তাঁহারা হরিচন্দ্র রাজার কন্যা ছিলেন। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে গানে ও উপাখ্যানে মাণিকচন্দ্র ও হরি-চন্দ্রের মহিষীর নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে।

দক্ষিণ রাঢ়ের গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মের গাজন, শিবের গাজন, শীতলার গাজন ইত্যাদি গ্রামের দেবদেবীর গাজন হইয়া থাকে। শিবের গাজন চৈত্রমাসের শেষ দিন অর্থাৎ নববৎসরারম্ভে হইয়া থাকে। গ্রামের সাধারণের যে শিব তাঁহার গাজন হয়, গৃহস্থের প্রতিষ্ঠিত শিবের হয় না। এই গাজনে ব্রাহ্মণ ও উচ্চ জাতি ভিন্ন অন্য জাতির লোকে দিন কএকের তরে সন্ন্যাসী হয়, গলায় উত্তরীয় (যজ্ঞোপবীত) পরে এবং শুদ্ধাচারে থাকে। এই গাজনের একটা বিশেষ অঙ্গ গম্ভারীবৃক্ষচ্ছেদন,—চলিত কথায় গামারকাটা। গাজনের পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার সময় সন্ন্যাসীরা বাদ্যভাণ্ড লইয়া গামার গাছ, প্রায়ই গাছের একটা ডাল, কাটে। গাজনের দিন সন্ধ্যার সময় পূর্ব্বকালে সন্ন্যাসীরা জিহ্বাপৃষ্ঠ ফুড়িত, অগ্নিকুণ্ডের উপরে, লোহার শলাময় কাঠের পাটার উপরে উচা মাচা হইতে লাফাইয়া পড়িত, উচা কাঠের মাথায় চড়ক গাছে শূন্যে ঘুরিতে থাকিত, ইত্যাদি। কবিকঙ্কণ চণ্ডী,—'চৈত্রমাসে শিব পূজে নানা উপহারে। ঢাক ঢোল বাদ্য বাজে শিবের মন্দিরে ॥ জিহ্বা ফোড়ে জিহ্বা কাটে করয়ে চড়ক।' ইত্যাদিতে রঞ্জাবতী ও লাউসেনের দারুণ তপস্যা মনে পড়ে। মনে হয়, শিবের গাজন ধর্ম্মঠাকুরের গাজনের রূপান্তর, এবং শিব ও ধর্ম্মঠাকুর অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে শিবের গাজনের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ একত্র করিলে উহার মূলে ধর্ম্মের পূজা পাওয়া যাইতে পারে।

---

* গোবিন্দচন্দ্র রাজার গীত্তা অংশটুকু ওড়িয়াতে ছাপা হইয়াছে, কিন্তু সেটুকু গোবিন্দচন্দ্রের গীতের অসার অংশ।

গাজন শব্দ সং গর্জ্জন হইতে উৎপন্ন বোধ হয়। পাপী বিশেষতঃ ধর্ম্মবিদ্বেষীকে ঠাকুরের গর্জ্জন—তর্জ্জন বা ভৎর্সন। লোকে সন্ন্যাসী হইয়া দারুণ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া ঠাকুরের প্রসাদ ভিক্ষা করে। ঠাকুরের মাথায় ফুল চাপান হয়। সে ফুল খসিয়া পড়িলে সন্ন্যাসীরা বুঝিতে পারে ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন। না পড়িলে আরাধনা ও কাতরোক্তির অন্ত থাকে না। আশ্চর্য্যের কথা, পূর্ব্ববঙ্গে গাজন শব্দ নাই, ওড়িশায়ও গাজন শব্দ নাই, কিন্তু শবর বাউরী তাঁতী ধোবা অতি নিম্নশ্রেণীর মধ্যে গাজনের অনুরূপ ব্যাপার আছে। চৈত্রসংক্রান্তির দিন অর্থাৎ বৈশাখ মাসের প্রথম দিন ঐ সকল জাতির 'ঝামযাত' হয়। ঝাম সং ধামন্—তেজ, কিম্বা ধ্মাত—দগ্ধ শব্দ হইতে আসিয়া থাকিবে। ঝামযাত—ঝাম-যাত্রা অর্থাৎ অগ্নিযাত্রা বলা যাইতে পারে। এই যাত্রায় অগ্নির উপরে ভক্তেরা দোল খায়, অগ্নির প্রণালীর উপর চলিয়া যায়। লৌহময় পট্টে ঝম্প দেয়—এই হেতু ভক্তের নাম 'পাটুআ'। উচা বাঁশে শূন্যে ভ্রমণ করে। এই বাঁশের নাম চরখি (সং চক্র হইতে)। বস্তুতঃ পশ্চিম-বঙ্গে গাজনে যেমন কৃচ্ছ্র-ব্যাপার আছে বা ছিল, ওড়িশাতেও তেমন আছে বা ছিল। 'পাটুআ' কোথাও মহাদেবের, প্রায়ই চণ্ডিকার ভক্ত। অতএব উত্তরবঙ্গ হইতে ওড়িশার দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত ধর্ম্মের গাজন প্রচলিত আছে। ওড়িশায় ধর্ম্মঠাকুর আছেন বলিয়া অনেকে জানেন না। কিন্তু বাউরী জাতি যে প্রচ্ছন্ন ধর্ম্মঠাকুরের উপাসক তাহা নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন এবং লেখকেরও বিশ্বাস হইয়াছে। বাউরী ভিন্ন অন্য এক জাতি বাঁকি নামক স্থানে অদ্যাপি বৌদ্ধ আছে। তাহাদের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থও আছে।*

সং উপাধ্যায় শব্দ হইতে ওঝা উপাধি। কিন্তু ভূতের রোজাও উপাধ্যায় ছিলেন বোধ হয় না। বৌদ্ধ শব্দও স্বচ্ছন্দে পঝা—ওজা—রোজা হইতে পারে। রোজার অনেক মন্ত্রে 'হাড়ীঝী চণ্ডীর আজ্ঞা' আছে। ময়নামতীর গানে পাই, 'হাড়িসিদ্ধা' নামে তন্ত্রসিদ্ধ এক হাড়ী বঙ্গদেশে ছিল। সে হাড়ীর কোন ডাকিনী ঝী ছিল। তিনি ডাইনী ময়নামতী নহেন ত? ময়নামতীর প্রতি চণ্ডীর কৃপা ছিল এবং ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্রের কুলদেবী চণ্ডী ছিলেন। এ কথা ময়নামতীর গানে পাইতেছি। লাউসেনের এক স্ত্রীও চণ্ডীর ভক্ত ছিলেন।

৯। শূন্যপুরাণের ভাষা।

শূন্যপুরাণে নানা সময়ের এবং বোধ হয় নানা স্থানের লোকের ভাষা মিশিয়া গিয়াছে। তথাপি শূন্যপুরাণখানি পড়িলে বাঙ্গালাভাষার ক্রমবিবর্ত্তনের একটা স্থূল আভাস পাওয়া যায়।

কোন কোন শব্দ বুঝা যাইতেছে না। হয়ত পুথিতে লেখা অস্পষ্ট ও-অশুদ্ধ ছিল।

* গত 'সেন্‌সসে'র সময় আমার এক বন্ধু এই জাতির বৌদ্ধধর্ম্ম আবিষ্কার করেন। সে সময়ে জাতির নাম ধাম ও গ্রন্থের নাম টুকিয়া রাখি নাই। বোধ হইতেছে, সে জাতি তাঁতী।

কোন কোন শব্দে ছাপার দোষ ঘটিয়া থাকিবে। প্রাচীন পুথি ছাপান দুরূহ। ছাপিবার সময় আধুনিক মুদ্রাকর শব্দের আধুনিক রূপ দিয়া ফেলেন। সাধারণ পাঠকের নিকট প্রাচীন পুথির আদর আশা করা যাইতে পারে না। যাঁহারা আদর করিবেন, তাঁহারা পুথির প্রাচীন রূপ দেখিতে চান। এই কারণে শব্দের বানান পরিবর্ত্তন, বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন, আধুনিক কমা সেমিকোলন ইত্যাদি যোগে বিরাম কিংবা শব্দের মাথায় কমা বসাইয়া লুপ্তবর্ণ প্রদর্শন ইত্যাদি যুক্তিসঙ্গত নয়। পাঠকের অর্থবোধ সাহায্যে সম্পাদক পৃষ্ঠপাদে নিজের মত দিতে পারেন। পদবিভাগের সময়েও সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। শূন্যপুরাণে (৪২ পৃঃ) এক ভণিতায় ছাপা হইয়াছে,—

"শ্রীধর্ম্মচরণে পণ্ডিত রামে গাএ।
কন সদাশিব ভজ সুত নিরঞ্জনর পাএ॥"

এই ভণিতাটি প্রথম পড়িবার সময় মনে হইয়াছিল, সদাশিব পণ্ডিতরামকে নিরঞ্জন ভজিতে বলিতেছেন। কিন্তু বহু স্থানে আছে, 'কলুস নাসিব ভজ নিরঞ্জনর পাএ।' অতএব 'কন সদাশিব' বাস্তবিক কলুস নাসিব। এখানে পাঠ শুদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠপাদে দিলে ভাল হইত।

নগেন্দ্রবাবু ভাষার বিশেষত্ব বলিয়াছেন। এই বিশেষত্ব সর্ব্বনামপদে, কারক ও ক্রিয়াপদের বিভক্তিতে এবং কোন কোন শব্দের রূপে দেখিতে পাই। ওড়িয়াভাষার সহিত ইহাদের এত সাদৃশ্য আছে যে হঠাৎ মনে হয় পুথিখানি কোন ওড়িয়া গায়নের হাতে পড়িয়া রূপান্তরিত হইয়াছিল। ২৮ পৃষ্ঠে—

"এমন্ত ধর্ম্মর বরত ন করিব হেলা।
সংসার তরিবাত জদি বাইন্ধ হেন ভেলা॥"

এই দুইটি পদ ওড়িয়া বোধ হইবে। এমন্ত শব্দ পুথির আর কোথাও নাই। ন করিব হেলা—ওড়িয়া রীতি।

সর্ব্বনাম।	কারক।
আহ্মি, আম্মি—আমি।	কর্ম্মকারকে ক। যথা,—
আহ্মার, মোর, মোহর—আমার।	পিতাক—পিতাকে।
মুয়া—আমরা।	জাক—যাকে।
আহ্মারে, মোকে—আমাকে।	অধিকরণে ত, এ, এ। যথা,—
তুহ্মি—তুমি।	হাথত—হাথেতে, হাতে।
তুহ্মার, তুমার—তোমার।	দেহেত—দেহেতে, দেহে।
তুমাকে—তোমাকে।	মালঞ্চএ—মালঞ্চে।
কাহারে—কাহাকে।	সম্বন্ধে র। যথা,—

জলর—জলের।

ঠাকুরর—ঠাকুরের

ক্রিয়াপদ।

প্রথম পুরুষে—

জাঅ—যায়।

হএ—হয়।

কহে—কহে, কহেন।

বৈসে, বৈসএ—বসে।

কহেন্ত—কহেন।

করিলেন্ত—করিলেন।

রহিলাঞ—রহিলেন।

তুলিলেঙ—তুলিলেন।

রচিলঁ—রচিলেন।

আইলেক—আইল, আসিল।

হইলেক—হইলেন।

হইলাক—হইল।

বোলিবাক—বোলিবে, বলিবে।

মধ্যমপুরুষে—

সুনু—শুনুন, শোন।

দেহ—দিন।

রাখহ—রাখুন।

কর—কর।

দেহ—দেও।

করিব—করিবে। (এইরূপ সর্ব্বত্র)

বলিব, বলিবা—বলিবেন।

উত্তম পুরুষে—

জানি—জানি।

কহিনুঁ—কহিনু, কহিলাম।

আইলাঞ—আইলাম, আসিলাম।

নারিলাঞ—নারিলাম।

করিবু—করিব।

করিব—করিব।

অনন্তরার্থে—

করি—করিয়া।

পেএ—পেয়ে, পাইয়া।

গিএ—গিয়ে, গিয়া।

হইআ—হইয়া।

ডাকিআ—ডাকিয়া।

করিঞা—করিয়া।

রাখিঞা—রাখিয়া।

নিমিত্তার্থে—

আনিবারে—আনিতে।

পুজিবাক—পূজিতে।

করিতে—করিতে।

দেখা যায়, বানানে বিভক্তি ও প্রত্যয়ে পদের ঐক্য নাই। নানা রূপ দেখিয়া মনে হয়, পুথিখানি নানা স্থানের এবং নানা সময়ের লোকের হাত ফিরিয়াছে। ক খ প ইত্যাদি এক এক পুথিতেও একপ্রকার নয়। অশিক্ষিত গ্রাম্যলিপিকরের কলমের গুণও থাকিতে পারে।

উল্লিখিত বিশেষত্ব আর কোথাও পাওয়া গিয়াছে কি না, দেখা যাউক। চট্টগ্রামের প্রায় দুই শত বৎসরের পুরাণা 'সূর্য্যের পাচালী'তে আহ্মরা, তোহ্মরা, তুহ্মি পাই। (বোধ হয় উত্তরবঙ্গের প্রায় তিন শত বৎসরের পুরাণা) অদ্ভুতাচার্য্যের 'রামায়ণে' (সাঃ পঃ পঃ ১৩১৩ সাল) করিলেন্ত, করিলাঙ, এবং কর্ম্মকারকে ক, অধিকরণে ত পাই। (বোধ হয় পূর্ব্বোত্তরবঙ্গের প্রায় তিন শত বৎসরের পুরাণা) 'পদ্মাপুরাণে' (সাঃ পঃ পঃ ১৩১৩ সাল) বোলন্তি, এবং কর্ম্মকারকে ক, অধিকরণে ত পাই। 'মহারাষ্ট্রপুরাণে' (সাঃ পঃ পঃ ১৩১৩ সাল) বসিআ, হাসিয়া, সুনিঞা পাই। প্রায় উত্তররাঢ়ের তিন শত বৎসরের পুরাণা 'চৈতন্য-

চরিতামৃতে' মুঞি মুই মো, হঞা, পাঞা, হইলাঙ, দিমু করিমু ইত্যাদি পাই। কবিকঙ্কণচণ্ডী মধ্যরাঢ়ের তিন শত বৎসরের প্রাচীন কবির লেখা। যে যে চণ্ডী ছাপা হইয়াছে, তাহাতে শূন্যপুরাণের বিশেষত্বগুলির কিছুই পাই না। তুমাকে, কুথা, ইত্যাদি শব্দের আদ্যের ওকারকে উকার উচ্চারণ করা, এবং পাইঞা, খাঞা ইত্যাদিতে শেষের স্বর অনুনাসিক করা উত্তররাঢ়ের, এখন কি বাঁকুড়াজেলার ভাষার লক্ষণ বলিতে পারা যায়। শূন্যপুরাণের প্রায় সর্ব্বত্র কর্ম্মকারকে ক, অধিকরণে এ, সম্বন্ধে র, এবং ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ব আছে। অদ্যাপি বগুড়া রঙ্গপুর দিনাজপুরে কর্ম্মকারকে ক, অধিকরণে ত আছে। শূন্যপুরাণে এক স্থানে হাম (আমি) আছে, বহু স্থানে তুমার, এথি (এই স্থানে), সেথি (সেই স্থানে) আছে। দিনাজপুর বগুড়ায় হামি, দিনাজপুরে তুমার, বগুড়া রঙ্গপুরে সেটি সেটে আছে। পূর্ব্বে শব্দের স্বরের বিপ্রকর্ষ উল্লেখ করা গিয়াছে। তাহাও দক্ষিণরাঢ়ে পাই না।*

গ্রন্থান্তরে দেখা যাইবে, রাঢ়ের ভাষা দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই কারণে শূন্যপুরাণের বিশেষত্বগুলি অত্যন্ত নূতন বোধ হয়। কোন ধারার শুধু আদি ও অন্ত দেখিলে ক্রম-বিবর্ত্তন বুঝিতে পারা যায় না। মাঝের পদগুলি বসাইতে ধারার একত্বে সন্দেহ থাকে না।†

এখন শূন্যপুরাণের শব্দ দেখিবার কথা। কিন্তু পাঠকের ধৈর্য্য অসীম বোধ হয় না। সুতরাং শব্দের নীরস তালিকা উপস্থিত করিতে সাহসী হইলাম না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

* রংপুরের জুগীদের মুখেশুনা যে ময়নামতীর গানের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাতেও অধিকরণ কারকে ত, কর্ম্ম ও সম্বন্ধ-কারকে ক পাইতেছি। যথা,—

"তোমাকে মারিবে মএনা পেটত পাও দিআ।"

(পেটে বা পেটেতে পা দিয়া তোমাকে ময়না মারিবে)

"অবিবারক দিনা ভাণ্ডের অধোগতি!"

(রবিবারের দিনে)

"কাম কোদ্দ নাই যেটাক ভাদাই ধানের কুড়া।"

(যেটার কামক্রোধ নাই, যেন ভাদই (ভাদ্রমাসের) ধানের কুড়া (?)। কুড়া—জমিখণ্ড (?)

† আমার লিখিত বাঙ্গালাব্যাকরণে শব্দের বিভক্তি ও প্রত্যয়ের আলোচনায় শূন্যপুরাণের বিশেষত্বগুলির বিচার করা যাইবে। এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

"শূন্যপুরাণ" সম্বন্ধে মন্তব্য

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় শূন্যপুরাণের আলোচনা করিয়া ক একটী নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। তাঁহার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপর কোনরূপ মতপ্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তিনি প্রবন্ধ মধ্যে আমার মত জানিবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমার যাহা বক্তব্য আছে, তাহা অতি সংক্ষেপে জানাইতেছি।

প্রথমেই তিনি লিখিয়াছেন "শূন্যপুরাণখানির রচনাকাল সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু বহু ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, কিন্তু অনুমান দৃঢ় করিতে পারেন নাই।" (২০৩ পৃঃ) যোগেশবাবুর এই অভিযোগটী সমীচীন মনে করি না। আমি শূন্যপুরাণের মুখবন্ধে ২।৵০ ও ২৸৶০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের সময় ও গ্রন্থকারের বাসস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। যোগেশবাবুও পরে শূন্যপুরাণের রচনাস্থান প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "নগেন্দ্রবাবু অনুমান করিয়াছেন, মধ্যরাঢ়ের দ্বারকেশ্বর নদীতীরে রামাই পণ্ডিতের আশ্রম ছিল। এখানকার গ্রাম্য শব্দের সহিত শূন্য-পুরাণের শব্দের মিল আছে। এই হেতু স্থূলতঃ রাঢ়ের ভাষা বলিতেছি।" (২১৩ পৃঃ) সুতরাং শ্রদ্ধাস্পদ যোগেশবাবু এরূপ দুই প্রকার মত প্রকাশ করিলেন কেন? তিনি লিখিয়াছেন, "শূন্য-পুরাণ শ্বেতনীলাদি পাঁচ প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপণ্ডিতের অন্যতম রামাই পণ্ডিতের লেখা নহে। উহা পুরাণ হইতে পারে, পদ্ধতি হইতে পারে না। উহা খৃঃ একাদশ শতাব্দীর পরে রচিত।" (২০৪ পৃঃ) উত্তরে আমার বক্তব্য—যখন ধর্ম্মপণ্ডিতগণ আবহমানকাল এই গ্রন্থখানিকেই ধর্ম্মপূজা প্রবর্ত্তক রামাইপণ্ডিতের রচনা বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন, যখন ঘনরাম প্রভৃতি ধর্ম্মমঙ্গলের কবিগণ রামাই পণ্ডিতকেই ধর্ম্মপূজার পদ্ধতিকার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, আলোচ্য শূন্যপুরাণে যখন পূজা-পদ্ধতির অভাব নাই, এবং এখানিকে পদ্ধতি বলিয়া ধর্ম্মপণ্ডিতগণ আজও গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, তখন কি করিয়া বলিব যে এখানি ধর্ম্মপূজাপ্রবর্ত্তক রামাই পণ্ডিত-রচিত পদ্ধতি নহে? যোগেশবাবু বোধ হয় অবগত আছেন যে, এদেশে নন্দিকেশ্বরপুরাণ ও কালিকাপুরাণ অনুসারে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। অথচ উভয়ের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। সেইরূপ রামাই পণ্ডিত শূন্যপুরাণে যে ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে শূন্যপুরাণীয় ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি বলিয়া গণ্য করিতে পারি। যোগেশবাবু পরে আবার লিখিয়াছেন—"পূজা পদ্ধতি বাঙ্গালা ভাষায় হইলেও তাহাতে সংস্কৃত পদ থাকিবার আশা করা যায়। আলোচ্য গ্রন্থের দুই স্থানে পদ্ধতির লক্ষণ আছে। ৮৫ পৃষ্ঠে তীর্থ আবাহনে সংস্কৃত মন্ত্র আছে। এই-টুক পদ্ধতি।" (২০৬ পৃঃ)

যোগেশবাবুর বিশ্বাস, সংস্কৃত মন্ত্র না থাকিলে বুঝি পদ্ধতি হয় না। কিন্তু তিনি যদি গাজনের পদ্ধতি আদ্যোপান্ত আলোচনা করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে গাজনের

সময় সন্ন্যাসীরা প্রকৃত পূজা ব্যতীত নানা হাবভাবে যে নর্ত্তন কীর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহাদের উক্তিও পদ্ধতি বা পূজার রীতি বলিয়া গণ্য। সুহৃদ্‌বর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ১৩১৪ সালের সাহিত্যপরিষৎপত্রিকায় "গ্রাম্যদেবতা" প্রবন্ধে ঐরূপ পদ্ধতির আভাস দিয়াছেন, সুতরাং গান ও কথা আছে বলিয়া শূন্যপুরাণের ২য় অংশ জলপাবন হইতে ৪৮শ তাম্রধারণ পর্য্যন্ত অংশকে কেন আমরা পদ্ধতি বলিয়া ধরিব না? রাঢ়ে জামালপুরে এখনও মহাসমারোহে ধর্ম্মের গাজন হইয়া থাকে। তৎকালে উক্ত সমুদায় অংশটাই ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে। তাই আমিও শূন্যপুরাণের মুখবন্ধে লিখিয়াছি "শূন্যপুরাণ সঙ্গীত গ্রন্থ বলিয়া গণ্য ছিল না, বরং ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি গ্রন্থ বলিয়াই গণ্য ছিল। তবে পরবর্ত্তীকালে এই পুরাণমধ্যে অপর কোন কোন বিষয় সংযোজিত করিয়া সঙ্গীতের উপযোগী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের আলোচ্য এই শূন্যপুরাণ মধ্যে দুই এক স্থলে রাগরাগিণী দেখিলেই তাহা মনে হইবে। কিন্তু ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এখানি তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া সমাদৃত হইলেও কখনও সঙ্গীতগ্রন্থ বলিয়া গণ্য হয় নাই।"

আলোচ্য শূন্যপুরাণকে যোগেশবাবু খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী বলিতেছেন, ইহার কারণ এই যে ইহাতে জগন্নাথদেবের নাম আছে। তাঁহার মত "পুরীর বর্ত্তমান মন্দির খৃঃ ১২শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বেও জগন্নাথদেব ছিলেন, কিন্তু বিশেষ প্রমাণ না পাইলে দেশ দেশান্তরে তাঁহার খ্যাতি ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।" (২০৮ পৃঃ) পুরীর মন্দির খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দের প্রথমে নির্ম্মিত হইলেও জগন্নাথদেবের নাম তাহার বহু পূর্ব্বেই যে বঙ্গদেশে পঁহুছিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মপুরাণে জগন্নাথের প্রসঙ্গ আছে। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে রাজা বল্লালসেন তাঁহার দানসাগর গ্রন্থের বহুস্থানে উক্ত ব্রাহ্ম-পুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এরূপ স্থলে ব্রাহ্মপুরাণ যে তাঁহার বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল এবং এই মহাপুরাণ খানি বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

যোগেশবাবু "গোঁসাই" শব্দ দেখিয়া ভাবিয়াছেন যে শূন্যপুরাণের যে যে অংশে ঐ শব্দটী আছে, তাহা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী। কিন্তু যদি তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডী-দাস ও বিদ্যাপতির পদ, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও গুণরাজ খাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয় পাঠ করিতেন, তাহা হইলে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। আমিও স্পষ্টভাবে বলিয়াছি যে এই সুপ্রাচীন গ্রন্থের উপর অনেক হাত পড়িয়াছে। অতি প্রাচীন ভাষা পরবর্ত্তীকালে ক্রমেই অপ্রচলিত ও দুর্ব্বোধ্য হইতে থাকে, সেই সময় তাহার টীকা টিপ্পনী বা সময়োপযোগী করিয়া লইবার চেষ্টা হয়, এই কারণে শূন্যপুরাণের সংস্কৃত অংশের উপর হাত না পড়িলেও বাঙ্গালা ভাষার উপর বিলক্ষণ হাত পড়িয়াছিল। তাহাতে প্রাচীন ভাষা অনেকটা আধুনিক ভাব ধারণ করিলেও মূল বিষয়টা নষ্ট হয় নাই। যাঁহারা মহাযান বৌদ্ধদিগের আদিগ্রন্থ-গুলি দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে একই কথা শত শত বার উক্ত হইয়াছে। এই দোষ শূন্যপুরাণের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়, ইহাও প্রাচীনতার একটা অঙ্গ।

মাননীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় রমাইপণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল পাইয়াছেন, এ গ্রন্থখানি বেশী-দিনের প্রাচীন নহে, দুই কি আড়াই শত বর্ষের মধ্যে রচিত হইয়াছে। মাননীয় মিত্র মহাশয় শূন্যপুরাণ ও রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, উভয় গ্রন্থের ভাষার আকাশ পাতাল প্রভেদ। এখানে বলিয়া রাখি যে, শূন্যপুরাণ-রচয়িতার নাম রামাই পণ্ডিত এবং ধর্ম্মমঙ্গল-রচয়িতার নাম রমাই পণ্ডিত। রামাই ও রমাই কখন এক ব্যক্তি নহেন।

শূন্যপুরাণে যে পাঁচ জন পণ্ডিতের উল্লেখ আছে, তাহাও রূপক বলিয়া আমার বিশ্বাস। শ্বেত, নীল, কাংস্য ও তাম্রবর্ণ রামাই, এ ছাড়া যে শূন্যস্থ গোঁসাইপণ্ডিতের উল্লেখ আছে, এই পাঁচটীকে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপাস্য পাঁচ জন বোধিসত্ত্বের আভাস বলিয়াই মনে করি। যে কোন আধুনিক বৌদ্ধচৈত্যে পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ, পঞ্চবোধিসত্ত্ব ও তাঁহাদের বাহনের চিত্র দেখা যায়। বর্ত্তমান নেপালী বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, প্রথম আদিবুদ্ধ বা স্বয়ম্ভু, তাঁহারই জ্যোতিঃ হইতে বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘ-সিদ্ধি এই পঞ্চ ধ্যানী-বুদ্ধ এবং এই পঞ্চ ধ্যানী-বুদ্ধ ও তাঁহাদের স্ব স্ব শক্তি হইতে পঞ্চধ্যানী বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব। পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ ও পঞ্চ বোধিসত্ত্বের রূপ যথাক্রমে শ্বেত, নীল, পীত, লোহিত ও হরিৎ। এক্ষণে (কলিযুগে) ৪র্থ বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির অধিকার চলিতেছে। তিব্বতের দলইলামা যেমন পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বের অবতার বলিয়া পরিচিত, সম্ভবতঃ রামাই পণ্ডিতও সেইরূপ আপনাকে পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব মনে করিতেন। এই জন্যই বোধ হয় তিনি পদ্মপাণির ন্যায় লোহিত বা তাম্রবর্ণ চিহ্নধারণ করিতেন। বৌদ্ধ চৈত্যের চারিদিকে চারিজন দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্ব এবং তাঁহাদের শক্তি বা (ঘটদাসী) এবং প্রধান অনুচর বা (কোটাল) দৃষ্ট হয়। রাজা হরিচন্দ্র তাহাই দর্শন করিয়াছিলেন। রামাই পণ্ডিত আপনার ন্যায় তাঁহাদেরও সাক্ষাৎ আবির্ভাব কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। শূন্যপুরাণে পঞ্চম বা শূন্যস্থ গোঁসাই পণ্ডিতের যে উল্লেখ আছে, তিনিই বৈরোচন নামক বুদ্ধ বা নিরঞ্জন ধর্ম্ম, শূন্যপুরাণের সৃষ্টিপত্তনে ও সকল ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থে তাঁহার প্রধান পারিষদ উলুক ও তাঁহার আদিশক্তি অভয়ার উল্লেখ আছে। বোধিসত্ত্বরূপী বিভিন্ন পণ্ডিতপ্রসঙ্গ হইতে মনে হয় যে, পূর্ব্বকালে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের ও তাঁহাদের পুত্ররূপী পঞ্চ বোধিসত্ত্বের উপাসক উপাসিকা বিভিন্ন দল ছিল, সেই সকল উপাসক ও উপাসিকারা গতি ও আমিনী আখ্যায় পরিচিত ছিল। যোগেশ বাবু মনে করিয়াছেন যে, রামাই পণ্ডিত অন্যের নিকট শুনিয়া আপনার গ্রন্থরচনা করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা নহে। পণ্ডিতের আদিকথা হইতে জানা যায় যে,

"স্থিতি হয়ে বসিলেন পিতার ভবনে।
শিক্ষা করে নানা শাস্ত্র শুনি বিদ্যমানে॥"

সুতরাং রামাই পণ্ডিত যে ভারতী কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পিতার স্বরূপ ধর্ম্ম-নিরঞ্জনের নিকট শুনিয়া, অপর কাহারও নিকট হইতে নহে। ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ

যেমন বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির জনকস্বরূপ, এখানেও ধর্ম্মনিরঞ্জন সেইরূপ রামাই পণ্ডিতের জনকস্বরূপ হইতেছেন।

আলোচ্য শূন্যপুরাণে হাজার বর্ষের প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা হইতে আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা পর্য্যন্ত প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহার কারণ পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ঐ সকল শব্দসংগ্রহের জন্য রাঢ়দেশ ছাড়িয়া সুদূর বরিশাল বা পূর্ব্ববঙ্গে যাইবার আবশ্যক দেখি না। এখন যে শব্দ রাঢ়ে প্রচলিত নাই, পূর্ব্বে তাহা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। কবিকঙ্কণচণ্ডী ধৃত অনেক রাঢ়ীয় গ্রাম্য শব্দ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। পরবর্ত্তী কালে যাবনিক শব্দ গৃহীত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু যোগেশবাবু যে গুলিকে যাবনিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই হিন্দী শব্দ। ঐ শব্দগুলি কোন্ সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিষ্ট হয়, তাহা স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনার বিষয়। আমার বোধ হয়, যোগেশ বাবুও কতকগুলি শব্দের ঠিক অর্থ করিতে পারেন নাই। উদাহরণ "সুনার খেড় মন্দির"। (২১৪ পৃঃ) এখানে 'খেড়' শব্দের তিনিও 'খড়' অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু 'সোণার খড়ের মন্দির' হইল এ যেন 'সোণার পাথরবাটীর' মত। বাস্তবিক এখানে 'খেড়' শব্দের অর্থ 'খেল' অর্থাৎ কেলিমন্দির। উৎকলবাসী যোগেশ বাবু একটু সামান্য চেষ্টা করিলেই প্রাচীন উৎকল-সাহিত্যে 'খেড়' শব্দের ভূরিপ্রয়োগ ও তাহার 'খেল' বা 'কেলি' অর্থ বাহির করিতে পারিবেন।

যাহা হউক শূন্যপুরাণ খানি আমরা বর্ত্তমান যে আকারে পাই না কেন, ইহার মধ্যে প্রায় সহস্র বর্ষের প্রাচীন বাঙ্গালার নিদর্শন, বৌদ্ধযুগের বিকৃত সদ্ধর্ম্মের বিস্ময়জনক স্মৃতি এবং ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি রহিয়াছে। এই গ্রন্থখানি নানা দিক্ দিয়া আলোচনা ও বিচার করিবার সময় আসিয়াছে।

পত্রিকা-সম্পাদক।

আয়ুর্ব্বেদের অস্থিবিদ্যা

মীমাংসা সমালোচনা

শ্রদ্ধেয় বন্ধু কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরমোহনধর মজুমদার কাব্যতীর্থরচিত প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। যেরূপ গুণগ্রাম থাকিলে এইরূপ গভীর বিষয়ের সমালোচনা বা মীমাংসা সম্ভব হয়, এইরূপ গুণগ্রাম উক্ত মজুমদার মহাশয়ের বেশ আছে জানিয়াই আমি প্রবন্ধটী বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। বিশেষতঃ এখন ইনি দয়ানন্দ এংগ্লোভেদিক্ বিদ্যালয়ের আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদের অস্থিবিদ্যার মীমাংসা-সূত্রে তাঁহার নিকট হইতে কিছু নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিব আশা ছিল। কিন্তু প্রবন্ধ পাঠে বুঝিতে পারিলাম বস্তুতঃ ইহা তিনি নিতান্ত অনুরোধে ঠেকিয়াই লিখিয়াছেন। এই কার্য্য অনুরোধে হয় না। অনুরোধে লিখিত বিবাহের অভিনন্দনপত্রে যেরূপ বর্ষা ঋতুতে বসন্তের বর্ণনা থাকে; অনুরোধে ঠেকিয়া গায়ককে যেরূপ মধ্যন্দিনে বেহাগ গাইতে হয়, শ্রদ্ধেয় বন্ধু কাব্যতীর্থ মহাশয়ও বোধ হয় সেইরূপ নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। নতুবা প্রবন্ধ এইরূপ হইত না।

ঋষি-বাক্যে আমার অনাস্থা নাই। পরন্তু চরক ও সুশ্রুত যে আর্ষ-গ্রন্থ নহে এবং বহু আর্ষগ্রন্থ যে লিপিকার প্রমাদ বশতঃ অনার্ষ হইয়াছে, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। চরক ও সুশ্রুতের অনার্ষত্ব সম্বন্ধে "বোধ হয়" "সম্ভবতঃ" বলিয়া নিজের মন্তব্য প্রকাশ করা অপেক্ষা ঋষিতুল্য সম্মানভাজন বাগ্‌ভটের উক্তিই বলিতেছি—

"ঋষিপ্রণীতে প্রীতিশ্চেন্মুক্তা চরকসুশ্রুতৌ।
ভেলাদ্যাঃ কিং ন পঠ্যন্তে তস্মাদ্ গ্রাহ্যং সুভাষিতম্॥"

টীকা।—'ননু কিমস্মাকমুপকারকত্বাদিদ্বারেণ ঋষিপ্রণীতমেব তন্ত্রমনুরাগবশাদধেব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ,—ঋষিপ্রণীত ইতি। যদি ঋষিপ্রণীতে প্রীতিস্তত্তশ্চরকসুশ্রুতাখ্যৌ হিত্বা ভেড়জাতুকর্ণাদিমুনিপ্রণীতানি কিমিতি ন পঠ্যন্তে সর্ব্বৈরেব বৈদ্যবৃন্দেন। অপিতু সুভাষিতপ্রিয়ত্বয়া-চরকসুশ্রুতৌ বাহুল্যেন যথা পঠ্যেতে ন তথা ভেড়াদয়ঃ। তস্মাৎস্থিতমেতৎ সুভাষিতং গ্রাহ্যম্। নতু মুনিপ্রণীতমেব তন্ত্রম্। অতশ্চরকসুশ্রুতবদ্ অনার্ষমপীদং গুণবত্ত্বাম্মতিমদ্ভিগ্রাহ্যমেব।'

(কবিরাজ শ্রীবিজয়রত্নসেনকবিরঞ্জনসম্পাদিত সটীকবাগ্‌ভট উত্তরস্থান ৪০ অধ্যায় ৫৩ শ্লোক।)

বোধ হয় ইহার ভাষান্তর আবশ্যক হইবে না। যাঁহারা বর্ত্তমান চরক ও সুশ্রুতকে "আর্ষ" ভাবিয়া সমালোচনার অতীত মনে করেন, আমি তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়াই বলিয়াছিলাম "তবে ঋষিবাক্য ঠিক রাখিতেই হইবে মনে করিয়া যাঁহারা বৃথা জল্পনা বা তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহাদিগকে দূর হইতে নমস্কার করিতেছি।" হইতে পারে ইহা রাজস।

পরন্তু ইহা সত্ত্বচ্ছন্ন তমঃ নহে। অসমর্থের ত্যাগ বা ক্ষমা সত্ত্বগুণের পরিচয় নহে। শোকাতুরের বৈরাগ্য শ্মশানস্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী; ইহাও মোহজ, সত্ত্বজ নহে।

আমার প্রবন্ধের মীমাংসাচ্ছলে বন্ধু যে অবান্তর কথার অবতারণা করিয়াছেন তাহার আলোচনা আবশ্যক। মীমাংসক মহাশয় ডহ্বণ বাক্য অনুসারে 'চেষ্টাবান্' অর্থ 'চল' করিতে অভিলাষী। এখানে আমি যদি জিজ্ঞাসা করি এই চল ক্রিয়াটী কি? করে কে? এই প্রশ্নের উত্তরে মীমাসক মহাশয়কে স্বীকার করিতে হইবে, চলক্রিয়া গতির নামান্তর এবং কর্ত্তৃবাচ্যে অ প্রত্যয় করিয়া যখন চল পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তখন ইহার কর্ত্তাও সন্ধি। এতাবতা নত ও উন্নত ক্রিয়া ও চল ধাতুর অর্থে বিরোধ থাকিতেছে না। সুতরাং মীমাংসককথিত সংযোগ বিভাগ প্রভৃতি কথার অবসরই নাই। বিশেষতঃ মীমাংসককথিত "যে স্থলে সন্ধিগুলি স্থানচ্যুত হয় অর্থাৎ এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই সন্ধিকেই চল বলা যায়" এই কথার সহিত তাঁহার 'চেষ্টাবান্' শব্দের অর্থ নির্ব্বাচনের তর্ক মিলাইলে পাঠক, কোন পথে যাইবেন বলিতে পারি না।

বন্ধুবর কাব্যতীর্থ মহাশয় কশেরুকা-সন্ধিকে অচল শ্রেণীর অন্তর্গত করিবার জন্য যে অযথা চেষ্টা করিয়াছেন তাহা নিতান্ত বালোচিত। টীকাকারের মতকে সুশ্রুতের মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা কেন? যাঁহারা সুশ্রুতে কৃতশ্রম তাঁহারা জানেন টীকাকারগণের সময়ই সুশ্রুতের অনেক পাঠান্তর ঘটিয়াছিল। সুতরাং কোনটা ঠিক তাহা টীকাকারগণ নিজেরাই স্থির করিতে পারেন নাই। এরূপ স্থলে টীকাকারের মত কোন কালেই সুশ্রুতের মত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। যদিই বা গ্রাহ্য হয়, তাহাও আমার মতের অনুকূল। গ্রাবাস্থি ও পৃষ্ঠবংশের অস্থিগত গঠন ও কার্য্য প্রায় তুল্য। সুতরাং গ্রীবাস্থি চল হইলে পৃষ্ঠবংশকে চল না বলিবার হেতু কি? অস্থি ও সন্ধির গঠন এবং কার্য্য বিচার করিলে কশেরুকা সন্ধিসমূহকে চলাচল বলাই উচিত। আধুনিক বিজ্ঞানমতেও তাহাই (Amphearthrosis বা mixed joints)।

প্রতর শব্দে ভেলক বুঝায় ইহা ডহ্বনের মতে সত্য। কিন্তু ভেলক অর্থে নৌকা বুঝাইবে ইহা কে বলিল? ভেলা ও নোকা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাহা বালকেও জানে। তৎপর তিনি যে প্রত্যক্ষ করাইতে চাহিয়াছেন তাহার মূল্য বুঝিতেও বাকী নাই। সৌভাগ্যক্রমে লাহোরে যখন তিনি এ কথার অবতারণা করেন, তখন আমি তাহাকে কশেরুকাস্থির সম্মুখ ও পশ্চাৎ নির্দ্দেশ করিতে বলি। ফলে তিনি কশেরুকার উচ্চ অংশকে (Process of vertibra) সম্মুখস্থ অর্থাৎ উদরের দিকের অংশ বলেন এবং ঐ উচ্চ অংশ কি ভাবে থাকে তাহাও ঠিক নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। বন্ধুবর প্রত্যক্ষকে যত সোজা মনে করেন, ইহা তত সোজা নহে। ইহার মতে উচ্চ অংশটী নৌকার একটী গলই এবং গোল অংশটী নৌকার মধ্যদেশ। "আকাঠা নায়ের তিনটা গলই" এরূপ প্রবাদ পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত আছে। কিন্তু একটী গলই-ওয়ালা নৌকার কথা জানি না। প্রতর শব্দের অর্থনির্ব্বাচনে আমি ডহ্বনের বিরুদ্ধে যাই নাই বলিয়াই বিশ্বাস। ভেলা যেরূপ জলে ভাসে সেই একখানা অস্থির উপর আর একখানা অস্থি

বিস্তৃতভাবে থাকিয়া বেশ খেলিয়া থাকে। আমি প্রতর শব্দে ইহাই বুঝিয়াছি। এখন পাঠক বিচার করিবেন।

কোষ্ঠ শব্দ বিচার করিতে যাইয়া মীমাংসক বন্ধু অনেক কথা বলিয়াছেন। আমি কেন কোষ্ঠ শব্দের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা যদি ইনি বুঝিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে এত বাজে কথা শুনিতে হইত না। যে অস্থিসন্ধিসমূহের উল্লেখ কোষ্ঠগত সন্ধির সহিত করা উচিত ছিল, সেই ফুস্‌ফুস্ নিবদ্ধ আস্থসন্ধির গণনা উত্তমাঙ্গের সন্ধির সহিত করা হইল কেন? বিশেষতঃ সুশ্রুতে এই অস্থিগুলির বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়াই হয় নাই। এরূপ স্থলে ইহাকে ভুল-পাঠ বলা যায় না কি? মীমাংসক মহাশয় আমার যে কোষ্ঠসমূহ শব্দটী ভ্রম বলিয়াছেন, তাহা আমি স্বীকার করিতেছি। এখানে কোষ্ঠই হইবে। তবে যদি তিনি আমার পরবর্ত্তী পাঠ "সুতরাং কোষ্ঠ শব্দে হৃদয় হইতে অপান বায়ুর স্থান পর্য্যন্ত সমুদায় অংশটীকে বুঝাইতেছে" এই টুকুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা হইলে তিনি আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেন এবং উদারতার পরিচয়ও পাইতাম। তথাপি আমি এই ভ্রম স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

আমি যে সাতটী প্রশ্ন করিয়া এক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছি তাহার উত্তর মীমাংসক মহাশয় করিয়াছেন। আমার আপত্তির হেতু নির্ব্বাচনে কবিরাজ মহাশয় মহাভ্রম করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদের উপর অনাস্থা বা অভক্তি উৎপাদন এই আপত্তির হেতু নহে। আয়ুর্ব্বেদের সম্যক্ আলোচনাই ইহার উদ্দেশ্য। পরন্তু মীমাংসক মহাশয়ের উত্তরের ফলে আয়ুর্ব্বেদের প্রতি ভক্তি অপেক্ষা অভক্তির উদয় হওয়াই সম্ভাবনা।

মীমাংসক মহাশয় আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে যে কয়েকটী পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা কি সুশ্রুতের? অথবা অন্য গ্রন্থের? সুশ্রুতের এরূপ পাঠান্তর কোথা পাইলেন তাহা লিখিয়া দিলে বাধিত হইতাম। অন্য গ্রন্থের হইলে তাহা কি সুশ্রুতবৎ প্রাচীন কোনও গ্রন্থ অথবা ভাবপ্রকাশ প্রভৃতির ন্যায় অর্ব্বাচীন গ্রন্থই তাঁহার অবলম্বন। মীমাংসক মহাশয় পাঠের স্থিরত্ব সম্বন্ধেই সন্দিগ্ধ। অথচ একটা উত্তর করিতে হইবে। ইহা কেবল "পাঠ লাগান" বই অন্য কিছু কি? এইরূপ প্রবৃত্তি লইয়া মীমাংসকের উচ্চ আসন গ্রহণ করা উচিত হয় নাই।

মীমাংসক মহাশয় বলিতেছেন, "এই কণ্ঠনাড়ীকে হৃদয়ক্লোমনিবদ্ধ বলিবার অভিপ্রায় এই যে এই নাড়ীর সহিত হৃদয়-ক্লোম, নেত্র যকৃৎ প্রভৃতির নাড়ীর সহিত সম্বন্ধ আছে। অতঃপর তাহা দেখান হইবে। এই একটী নাড়ীই বক্ষঃপ্রদেশে ধাবিত হইয়া বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছে।" অঙ্গবিনিশ্চয় বিদ্যার পরাকাষ্ঠা বটে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমার আপত্তির অনুকূল নহে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে মীমাংসকও সন্দিগ্ধ। তবে তিনি যদি বচনগুলির প্রামাণিকতা সাধারণের গোচর করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের ন্যায়।

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে মীমাংসক মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিচার ভার পাঠকের উপরই দিতেছি। ইহার কোন্ কথাটা যে প্রতিবাদ তাহা বুঝিতে পারি না। তবে ইনি বলিয়াছেন, "কেহ কেহ বলেন যে, সন্ধি দুই শত দশ থাকা মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই সন্ধি আরও অধিক হইবে।" ইহার প্রামাণিকত্ব কোথা? লিখিলে ভাল হইত না কি?

ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরেও মীমাংসক পাঠান্তর দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রমাণ নাই। অপিচ নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বলিয়াছেন বলিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার কোনও প্রমাণ দেওয়া হয় নাই কেন? কোন্ গ্রন্থে কোন্ অধ্যায়ে এরূপ প্রমাণ আছে। উত্তর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের মত।

সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে হৃদয় অর্থে বক্ষঃপ্রদেশ করিয়াছেন। এই বক্ষঃপ্রদেশ বলিতে কি বুঝিতে পারি? কণ্ঠ নাড়ীর সহিত বক্ষঃ প্রদেশের সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার সহিত যাহার প্রধান সম্বন্ধ সেই ফুসফুসের উল্লেখ নাই কেন? ক্লোম পিপাসাস্থানও ভিন। এ পুরাতন কথা। বস্তুতঃ এটী কি, তাহা মীমাংসক মহাশয় দেখাইয়া দিতে পারেন কি? শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্তের মতে ক্লোম অর্থ ফুস্‌ফুসের দক্ষিণ অংশ। মীমাংসক মহাশয় তাহাই বলিবেন কি?

অস্থিসন্ধির স্থান নির্দ্দেশে গ্রন্থকার "ব্যাকুব" নাও হইতে পারেন। কিন্তু লিপিকার বা মুদ্রাকরের "ব্যাকুবি ত চিরপ্রসিদ্ধ। সে কথা যাউক, পরন্তু মীমাংসক মহাশয় সুশ্রুতের যে স্থানটীকে উদাহরণ স্বরূপ মনে করিতেছেন, বস্তুতঃ তাহা উদাহরণ কি না নিঃসন্দেহে বলা যায় না। মোট সন্ধি সংখ্যা ২১০ তন্মধ্যে ১৬৯ টীকে উদাহরণ স্বরূপ প্রকাশ করিলে বাকী ৪১টী মাত্র থাকে। উদাহরণের এইরূপ রীতি কি? যেখানে উদাহৃত বস্তু বহু, সেখানে সামান্য মাত্র কয়েকটীর নাম বলিয়া প্রভৃতি বা ইত্যাদি দ্বারা বাক্য সমাপ্তি করা হয়। উদাহরণের এই নিয়ম। সুশ্রুতে আমার বাক্যের উদাহরণ বিস্তর পাওয়া যাইবে। কেবল মাত্র সূত্র-স্থানের নবম অধ্যায় পাঠ করিলে পাঠক এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কিরূপে মূলগ্রন্থের অর্থলোপ করিতে হয়, তাহার উদাহরণ, মীমাংসক মহাশয় সুন্দরভাবে দিয়াছেন। মীমাংসক মহাশয় সুশ্রুতের "তেষামঙ্গুলিমণিবন্ধগুলফ" ইত্যাদি সংস্কৃত অংশ উদ্ধার করিয়া পরে "ইহার অর্থ এই যে অঙ্গুলী, মণিবন্ধ, গুলফ, জানু এবং কূর্পর প্রভৃতি কোর সন্ধির উদাহরণ স্থানীয়।" এবং "এইরূপ কক্ষা, বঙ্ক্ষণ, দন্ত প্রভৃতি উদূখল-সন্ধির উদাহরণ স্থানীয়।" ইত্যাদি বলিয়াছেন। প্রভৃতি শব্দটী মীমাংসকের নিজস্ব। মূলে প্রভৃতি শব্দ থাকিলে সব গোল চুকিয়া যাইত। বৈদ্যকশাস্ত্রানভিজ্ঞ পাঠকগণের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নিজের মত স্থাপনের আয়াস। "শতংবদ" স্থলে এরূপ ধূলি নিক্ষেপের ব্যবস্থা সুন্দর হইতে পারে। কিন্তু "লিখ" স্থলটা বড় শক্ত। এই জন্যই না "শতং বদ মা লিখ"। পক্ষান্তরে

মীমাংসক মহাশয়ের ব্যাখ্যা যদি স্বীকার করিয়াই লওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি কি বলিতে দিবেন যে কোর সন্ধি ও উদূখল সন্ধি আর কোথা আছে ?

মীমাংসক মহাশয় আমার উপর একটী অযথা দোষারোপ করিয়াছেন। আমি কোথাও সুশ্রুতের ভুল ধরি নাই। আমার জ্ঞান অল্প। সুতরাং এরূপ আলোচনায় সন্দেহের অবকাশ যেখানে যাহা হইয়াছে তাহা বলিয়াছি। এরূপ আলোচনায় মীমাংসক মহাশয় সন্দিগ্ধ স্থলে তাহার নিজের "মনগড়া" ব্যাখ্যাকেই যদি শিষ্ট সম্মত মনে করেন এবং ইহাই যদি শাস্ত্রালোচনার সাধুপথ মনে করেন তবে আমি নাচার।

আর একটী "ঘরগড়া" ব্যাখ্যার নমুনা দেখাইতেছি। "তজ্জন্যই তিনি (সুশ্রুত ?) সন্ধির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে যদিও উদাহরণে সমস্ত গুলি সন্ধি দেখান হয় নাই তথাপি সন্ধির যে সকল নাম করা হইল, অনুক্ত সন্ধিগুলিও তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে।" মীমাংসক মহাশয় তাহার নিজের কথা সুশ্রুতের দোহাই দিয়া বলিতেছেন। সুশ্রুতে এমন কথা কোথাও নাই। মীমাংসক মহাশয় প্রথমে ইহা সুশ্রুতের বাক্য বলিয়া সামলাইতে না পারিয়া তৎপরক্ষণেই অন্য সুর ধরিলেন, যথা "এই অভিপ্রায়েই সুশ্রুত বলিতেছেন যে 'তেষাং নামভিরেবাকৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতা'। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যদিও এ স্থলে নাম উল্লেখ করিয়া সমস্ত সন্ধির আকৃতি বর্ণন করা হয় নাই, তথাপি সন্ধির নামের দ্বারাই অনুক্ত সন্ধিগুলি বুঝিয়া লইবে।" নিজের দোষ সামলাইতে গিয়া একটা কল্পিত ভ্রান্ত ব্যাপার সৃষ্টি করা কি মীমাংসকের কার্য্য। ইহার উপর আবার "অর্থাৎ" আছে ; যথা "অর্থাৎ সমস্ত সন্ধির আকৃতিই উল্লিখিত আট প্রকার সন্ধির অন্তর্গত।" ভুলের পরাকাষ্ঠা। এই সংস্কৃত টুকুর প্রকৃত অর্থ সুশ্রুত সন্ধির আটপ্রকার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন নামও করিয়াছেন ; কিন্তু বিশেষ কোন লক্ষণ করেন নাই। এই জন্য বলিতে-ছেন "সেই সকল সন্ধিশ্রেণীর নাম দ্বারাই আকৃতি প্রায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে"। এইরূপ সমালোচনায় সত্য-গোপনের চেষ্টা বৃথা ! সুশ্রুতের সূত্রস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে শস্ত্র-সমূহের আকৃতি বর্ণনার ঠিক এই পাঠটী আছে। যথা—

"তেষাং নামভিরেবাকৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতাঃ।"

ইহার টীকায় ডহ্বন কি বলিতেছেন পাঠক শ্রবণ করুন—

"সংক্ষেপেণ শস্ত্রাকারং দর্শয়ন্নাহ,—তেষাং নামভিরিত্যাদি "তেষাং" শস্ত্রাণাং আকৃতয়ঃ লক্ষণানি নামভিরেব প্রায়েণ ব্যাখ্যাতাঃ।" এস্থলে ভানুমতীটীকাকার চরকচতুরানন শ্রীমৎ চক্রপাণিদত্ত কি বলিয়াছেন পাঠক মহাশয় তাহাও শ্রবণ করুন। "সংক্ষেপেণ শস্ত্রাকারং দর্শয়ন্নাহ তেষানামভিরিত্যাদি। নামভিরিত্যনুগতার্থৈর্নামভিঃ, তদ্‌যথা উৎপলপত্রাকৃত্যাদিনা উৎপল-পত্রমিত্যাদি নামার্থানুগমঃ।" ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক।

প্রত্যক্ষজ্ঞান কেন মজ্জাগত হওয়া উচিত—"পাঠ লাগানর" কি দুর্দ্দশা তাহা প্রমাণ করিতে আমাকে হয়ত কষ্ট পাইতে হইত অথবা শাস্ত্রান্তরের বিচারপদ্ধতিকে উদাহরণ করিতে হইত,

যদি মীমাংসক মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রকাশ না হইত। সুধী পাঠক এই মীমাংসা পাঠ করিয়াই তুষ্ট হইবেন। আমার বৃথা শ্রমের ভয় কাটিয়া গেল।

মীমাংসক মহাশয় বহুস্থলেই স্বীয় বাক্যের প্রমাণ জন্য "ডল্বন প্রভৃতি টীকাকারগণ" "টীকাকারগণ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য কি? তিনি কি সুশ্রুতের শারীরস্থানে ডল্বনের টীকা ব্যতীত অন্য কাহারও টীকা পাইয়াছেন? নাম করিতে ক্ষতি কি ছিল? এইরূপ প্রবৃত্তি সুধী সমাজে নিন্দনীয় নহে কি?

সামুদ্গ শ্রেণীতে গুদ ও ভগাস্থি সম্বন্ধে আমার যে সন্দেহ আছে এবং যে সন্দেহের পরিচয় অস্থিসন্ধির বিবরণে কটী কপাল ও পৃষ্ঠ-বংশ শব্দে দিয়াছি, তাহার বিবরণ স্পষ্ট করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছি। শ্রোণীর অস্থি-গণনা সম্বন্ধে সুশ্রুতের মত যথা—

"শ্রোণ্যাং পঞ্চ—

"তেষাং গুদভগনিতম্বেষু চত্বারি।
ত্রিকসংশ্রিতমেকম্।"

ইহাদের সন্ধিগণনা স্থলে সুশ্রুত বলিয়াছেন—

"ত্রয়ঃ কটীকপালেষু"

সন্ধির স্বরূপ নির্দ্দেশস্থলে বলিয়াছেন—

"অংসপীঠগুদভগনিতম্বেষু সামুদ্গাঃ।"

পুনরায় কটী কপালের সন্ধির স্বরূপ বলিতেছেন—

"কটীকপালেষু তুন্নসেবনী"

মীমাংসক মহাশয় এখানে 'শিরঃকটীকপালেষু' করিয়া অর্থসঙ্গতি করিতে অভিলাষী। এ অর্থ মানিয়া লইলেও জটিলতা দূর হইল কই? সন্ধিগণনায় ত্রিকসন্ধির উল্লেখ নাই। সুতরাং সন্দেহের হাত হইতে নিস্তার না পাওয়া পর্য্যন্ত কোনরূপ কাটাকুটী করা সঙ্গত মনে করি না। "চণ্ডী কেটে মুণ্ডী" এ দেশের কথা। অপিচ এ পাঠ যদি কেবল সুশ্রুতেই পাইতাম; অন্যত্র ইহার উল্লেখ না থাকিত তাহা হইলে কোন কথা ছিল না। পরন্তু কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন সম্পাদিত বাগ্‌ভটের টীকায় অরুণদত্ত শ্লোকাকারে ইহারই অনুবাদ করিয়াছেন। যথা—

'সন্ধ্যায়স্তে সন্ধয়োঽত্র চতস্রোঽঙ্গুলয়ঃ পদে।
চতসৃষ্বঙ্গুলীষু স্যুঃ প্রত্যেকং ত্রয় এব তু।
দ্বাবঙ্গুষ্ঠে বংক্ষণেস্তাদেকো গুল্‌ফে তু জানুনি।
সক্‌থ্যেকস্মিন্ সপ্তদশ তাবন্তোঽপি দ্বিতীয়কে॥
ভুজয়োঃ সক্‌থিতুল্যানি যাস্তরাধৌ ত্রিমে মতাঃ।
ত্রয়ঃকটীকপালেষু বিংশতিশ্চতুরুত্তরা॥

পৃষ্ঠে তদ্বৎ পার্শ্বয়োশ্চ বক্ষস্বষ্টাবথোর্দ্ধতঃ।
শিরো ধরাযামষ্ট স্যুঃ কণ্ঠনাড্যাং ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ॥
হৃদয়ক্লোমযকৃতাং নাড়ীষ্বষ্টাদশ স্মৃতাঃ।
দ্বাত্রিংশদ্দন্তমূলেষু চৈকৈকে ঘ্রাণকাকলে॥
মূর্দ্ধ্নি চ দ্বৌ কর্ণশঙ্খে গণ্ডনেত্রে চ বর্ত্মনি।
হনুসন্ধৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ দ্বৌ ভ্রুবোশ্চোপরি স্মৃতৌ॥
পঞ্চমূর্দ্ধকপালেষু চোর্দ্ধমেবং ত্র্যশীতিকা।
সন্ধয়স্বষ্টধা জ্ঞেয়া মণিবন্ধেহথ জানুনি॥
গুল্‌ফেহঙ্গুলৌ কোরসংজ্ঞা দ্বিজমূলেষু বংক্ষণে।
কক্ষায়াং চোলুখলাখ্যা অংসপীঠে গুদে ভগে॥
নিতম্বে চৈব সামুদ্গা গ্রীবায়াং পৃষ্ঠবংশকে।
প্রতরাঃ স্যু মূর্দ্ধকটীকপালেষু তু সীবনাঃ॥
হনুভয়ে কাকতুণ্ডা কণ্ঠস্ত পন্নগস্তথা।
হৃদয়ক্লোমনেত্রাণাং নাড্যাং মণ্ডলনামকাঃ।
শ্রোত্রশৃঙ্গাটকাখ্যেষু শঙ্খাবর্ত্তা ইতি স্মৃতাঃ॥"

পাঠক মহাশয় চিহ্নিত স্থল গুলি সুশ্রুতের পাঠ সহ মিলাইয়া দেখিবেন। যাঁহারা স্বেচ্ছাচার প্রণোদিত হইয়া শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মূলে ভুল করেন তাঁহাদের জন্যই "পাঠলাগান" কথাটা বলিয়াছি। মীমাংসক মহাশয় বলিয়াছেন "অর্থাৎ কটী কপালে, গুদাস্থি ও ভগাস্থি এই চারি খানা অস্থিতে তিন খানা সন্ধি আছে। চারিখানা অস্থিতে তিন খানা সন্ধিই হইয়া থাকে।" মীমাংসক মহাশয় নিতম্ব স্থানটাকে সরল রেখার শ্রেণী মনে করিয়াই এরূপ কথা বলিয়াছেন। যথা— — — —এই চারিটী সরল রেখার তিনটী ফাঁক তিনটী সন্ধি। বস্তুতঃ তিনি যাহা মনে করিয়াছেন তাহা নহে। চারিটী অস্থি নিতম্বে শ্রেণীবদ্ধ নহে। উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি জানু একটী সন্ধি। এখানে উরু, অষ্ঠী, ও জঙ্‌ঘার দুই খানা অস্থি সম্মিলিত হইয়াছে। এই জন্য ইহার বিশেষ সংজ্ঞা সংঘাত।

বন্ধু আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া "শঙ্খাবর্ত্ত" সন্ধি সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। মীমাংসক মহাশয় কর্ণকে কর্ণপালি বুঝিয়া একটী ভ্রম করিয়াছেন। সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ১৬শ কর্ণব্যধবন্ধবিধি নামক অধ্যায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যদি তিনি এই প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহা হইলে কর্ণপালি ও কর্ণের পার্থক্য বুঝিতে এই ভ্রম হইত না। বোধ হয় এইটী তাহার প্রমাদ বশতঃ হইয়াছে। সে যাহা হউক কর্ণের তরুণাস্থির গঠন কতক শঙ্খাবর্ত্তবৎ বটে, কিন্তু শঙ্খকাস্থির ছিদ্রটী একটী সন্ধি নহে। তবে মীমাংসক মহাশয় যে, "স্নায়ুদ্বারা অস্থিদ্বয়ের সংযোগ হয় না" এইরূপ কথা বলিয়া আমার মত খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা

তাঁহার মৃতদেহ অদর্শনের ফল। যাঁহারা আধুনিক অঙ্গবিনিশ্চয় (Anatomy) শাস্ত্রে নিপুণ তাঁহারা জানেন শঙ্খকাস্থির (Temporal bone) সহিত কর্ণের তরুণাস্থির সংযোগ কেবল স্নায়ু (Ligaments) দ্বারা হইয়াছে। মীমাংসককথিত নিম্নরেখ বাক্যটী যে নিতান্ত ভ্রান্ত তাহা আধুনিক অঙ্গবিনিশ্চয়শাস্ত্রে যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারাই জ্ঞাত আছেন যে কতগুলি অস্থিসন্ধি (Articulation) কেবল স্নায়ু (Ligaments) দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে।

উপসংহারে মীমাংসক বন্ধুবর কাব্যতীর্থ মহাশয়কে ধন্যবাদপূর্ব্বক একটী বিষয় নিবেদন করিতেছি। যে বিষয়ে তিনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, সেই বিষয়ে তাঁহার মত যোগ্য ব্যক্তিকে পাইলে দেশ ধন্য হইবে। ইতি

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন।

১৬শ ভাগ—২৩৫ পৃষ্ঠা
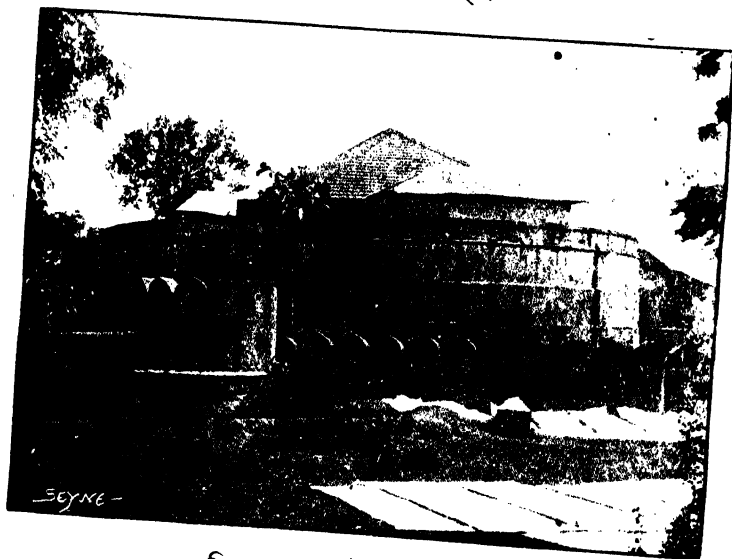
বিক্রমপুরের একটী পুরাতন দুর্গ।

বিক্রমপুরের একটি পুরাতন দুর্গ

বিক্রমপুরে অনেকস্থানে পুরাতন ইতিবৃত্ত-সংশ্লিষ্ট অনেক জীর্ণ অট্টালিকাদি বিদ্যমান আছে, তাহা পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের কৌতুহল উদ্দীপ্ত করিবে, সন্দেহ নাই। যে সকল সুন্দর মঠ, দেবমন্দির প্রভৃতি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরবের স্মৃতি মস্তকে লইয়া দণ্ডায়মান ছিল, তাহার কোনটী বা কালের কবলে, কোনটী বা পুরাকীর্ত্তি-সংহারিণী প্রচণ্ডপ্রবাহা পদ্মা কিম্বা অন্য কোন নদীর গ্রাসে পতিত হইয়া চিরকালের জন্য আমাদের স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। পূর্ব্বপুরুষগণের এই কীর্ত্তিস্তম্ভগুলির বিবরণ একত্র সঙ্কলিত হইয়া ইতিহাসের অক্ষয় পৃষ্ঠায় স্থাপিত না হইলে, আমাদের জাতীয় ইতিহাস অসম্পূর্ণ এবং অনেক পুরাতত্ত্ব অনুদ্ঘাটিত থাকিয়া যাইবে।

আমরা বিক্রমপুরস্থ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান প্রতিষ্ঠিত একটী প্রাচীন দুর্গের চিত্রসম্বলিত ক্ষুদ্র বিবরণ উপস্থিত করিতেছি। দুর্গটী আয়তনে বৃহৎ না হইলেও ইতিহাসের অনেক তথ্য ইহার সঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং ইতিহাসের হিসাবে ইহার মূল্য কম নহে।

দুর্গটী বিক্রমপুরের অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ মহকুমার এক অতি প্রকাশ্য স্থানে অবস্থিত। সম্পূর্ণ দুর্গ এখন বিদ্যমান নাই, যাহা বর্ত্তমান আছে তাহাও প্রাচীরপরিবেষ্টিত একটী ক্ষুদ্র দুর্গের ন্যায়। পুরাতন দুর্গের ইহাই[১] বিদ্যমান আছে; অবশিষ্টাংশ নদীগর্ভে নিমজ্জিত অথবা ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ইহার উত্তর ও পশ্চিমে অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত দুর্গের ও সৈন্যবাসের উপযুক্ত নাতিক্ষুদ্র কুঠুরী, অট্টালিকা ও প্রাচীরাদির অনেক ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, দুর্গের প্রসার এক সময়ে নিতান্ত কম ছিল না। যে সব ইতিহাসে ইহার উল্লেখ আছে তাহাতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ নাই; সুতরাং ইহার সীমা ও পরিধি নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। দুর্গটী ইছামতী (বর্ত্তমান ধলেশ্বরী) নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। বুভুক্ষু নদী তীরবর্ত্তী প্রাচীরাবলী গর্ভভূত করিয়া সমগ্র দুর্গটাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল; কালক্রমে নদীতে চড়া পড়িয়া দুর্গের অবশিষ্টাংশ রক্ষা পাইয়াছে এবং নদী অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে সরিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে দুর্গের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের ভূমিভাগ বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ করিলে উহার গঠন নিতান্ত আধুনিক বলিয়াই বোধ হয়। এই সব স্থানের মৃত্তিকা বালুকাময় এবং বৃক্ষাদিও ততদূর প্রাচীন নয়।

বৃহৎ দুর্গের ভিত্তিভূমি গোলাকার[২] ছিল; ইহার ভিত্তিভূমির পশ্চিমাংশ সমচতুষ্কোণ

---

(১) চারি বৎসর অতীত হইল স্থানীয় ভূতপূর্ব্ব সবডিভিসনল অফিসার শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র সিংহ মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে এই অংশের জীর্ণ সংস্কার হইয়াছে।

(২) See Hunter's Statistical Account of Dacca, P. 72.

এবং পূর্ব্বাংশ অসমান্তরাল চতুর্ভুজের ন্যায়। পশ্চিমাংশ হইতে পূর্ব্বাংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং একটী প্রাচীর দ্বারা ইহা দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান দুর্গের সংস্থান এবং অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে অনুমিত হয়, ইহা দুর্গের মধ্যে দক্ষিণদিকে অবস্থিত ছিল।(৩) দুর্গের এই অংশ যে পরিখা পরিবেষ্টিত ছিল তাহা প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার পূর্ব্বদিকস্থ পরিখা একটী সুন্দর গভীর জলাশয়ে পরিণত হইয়াছে এবং এই জলাশয়ের মধ্য হইতে পূর্ব্বদিকের প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিক্ সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত; প্রাচীরগাত্রে কামান সজ্জিত করার ছিদ্র সকল বর্ত্তমান আছে। প্রাচীরাবলী মৃত্তিকা-নিম্নে প্রোথিত হওয়ায় উহার উচ্চতা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। ঐ দুর্গের চারিকোণে বৃত্তাকার চারিটী উচ্চতর প্রাচীর আছে; তাহাও প্রাচীরগাত্রের ন্যায় সচ্ছিদ্র। পূর্ব্বাংশে উত্তর-পূর্ব্বকোণেও ঐরূপ একটী গোলাকার প্রাচীর আছে; তাহা আয়তনে উক্ত চারিটী হইতে ছোট। পশ্চিমাংশের প্রাচীরাবলী উচ্চতায় স্থানে স্থানে ১২ ফিট্ হইবে; পূর্ব্বাংশে ইহার উচ্চতা কোথাও ৩ ফিট, কোথাও বা ৪ ফিটে পরিণত হইয়াছে। এই দুর্গে কোন স্থাপত্যবিদ্যার নিদর্শন নাই সত্য, কিন্তু ইহার গঠনপ্রণালী অতীব সুন্দর এবং দৃঢ়। আজও ইহার প্রাচীরাবলী বজ্র সদৃশ কঠিন। চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর ৩ ফিট্ পুরু এবং উপরিভাগ সমতল না হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্দ্ধবৃত্তাকারে সংবদ্ধ হইয়াছে। দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিবার একটী মাত্র তোরণদ্বার। এই দ্বারটী পশ্চিমাংশের উত্তরদিকস্থ প্রাচীরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা উচ্চে ১২ ফিট ও প্রস্থে ৯ ফিট এবং ইহার বেধ ৭ ফিট্।

দুর্গের মধ্যে পূর্ব্বাংশে ইষ্টকনির্ম্মিত একটী সুবৃহৎ "টিলা" (?) আছে। এই টিলা এক সময়ে খুব উচ্চ ছিল এবং ইহার উপর হইতে সৈন্যদল বিপক্ষীয় রণতরী সকল পর্য্যবেক্ষণ করিত। ইহাও ক্রমে মৃত্তিকানিম্নে প্রোথিত হইয়া যাইতেছে। আজও উচ্চে উহা ৪৫ ফিটের কম হইবে না এবং ইহার উপর হইতে নদী দৃষ্টিগোচর হয়। এই টিলার গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর, ঐরূপ প্রায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার চতুর্দ্দিক্ নিখুঁত গোলাকার। ইহার উপরিভাগ (ছাঁদ) খিলানের উপর স্থাপিত। ভিতর পূর্ব্বে ফাঁপা ছিল, পরে উহা সর্পসমাকীর্ণ হইয়া বিপজ্জনক হওয়ায় মৃত্তিকা ও বালুকা দ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছে। টিলার মধ্যে প্রবেশ করিবার একটী মাত্র দ্বার ছিল, তাহাও জীর্ণ সংস্কারের সময় একেবারে রুদ্ধ করা হইয়াছে। ঐ দ্বার হইতে তলদেশ পর্য্যন্ত যে সিঁড়ি ছিল, তাহা বংশখণ্ড সাহায্যে প্রমাণিত হইত। এই টিলাটীর আয়তন কত বড় হইবে, তাহা চিত্রদৃষ্টেই কতক বুঝিতে পারা যায়। ইহার ব্যাস ৩০ গজ। বর্ত্তমান দুর্গের পরিধি ৬০০ গজের কম নয়।

সম্ভবতঃ এই ক্ষুদ্র দুর্গমধ্যে যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র এবং ধন রক্ষিত হইত; সেজন্যই ইহাকে

---

(৩) বর্ত্তমান দুর্গের বহির্ভাগে কিছু উত্তরে একটী সুন্দর মসজিদ আছে। এই স্থানে নাকি পূর্ব্বে একটী পুরাতন মসজিদ ছিল এবং তাহা বৃহৎ দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিল; পরে তাহা সংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমান সুন্দর নূতন মসজিদে পরিণত হইয়াছে। লেখক।

দুর্গমধ্যে স্থাপন করিয়া ইহার রক্ষার নিমিত্ত নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। কিম্বদন্তী এইরূপ টিলার মধ্যে ধনাগার স্থাপিত ছিল। এই দুর্গের মধ্যভাগে পশ্চিমাংশে একটী জলাশয় আছে এবং সেই জলাশয় হইতে টিলার উপরিভাগ পর্য্যন্ত প্রশস্ত সিঁড়ি আছে। এই সোপানাবলীর বামপার্শ্বে নিম্নে একটী গোলাকার কুঠুরী দৃষ্ট হয়; লোকে বলে, উহাতে বারুদ রক্ষিত হইত। ইহাও জীর্ণসংস্কারের সময় রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

টিলার উপর হইতে দক্ষিণপূর্ব্বকোণে নিম্নাভিমুখে একটী সংকীর্ণ রাস্তা আছে। সম্ভবতঃ ইহা গুপ্তদ্বার রূপে ব্যবহৃত হইত। এই রাস্তার পার্শ্বভাগেই টিলার মধ্যে প্রবেশ করিবার দ্বার ছিল। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, যাহারা শত্রুগতিরোধ এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত এই বিপুল আয়োজন করিয়াছিল, তাহারা পলায়নের সুবন্দোবস্ত করিতেও ত্রুটী করে নাই। যে দুর্গ একদিন শত শত সৈন্যের ভীষণ হুঙ্কারে ও কলরবে এবং অগ্নিবর্ষী কামানের হৃদয়দ্রাবী শব্দে ও অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় শব্দায়মান ছিল, আজ তাহা শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালী ডেপুটীর বাঙ্গলা, তৎসমীপবর্ত্তী জেলখানা এবং জন কত পুলিশ প্রহরীর আবাসে পরিণত হইয়াছে। ডেপুটীর বাঙ্গলা টিলার উপর অবস্থিত। যখন মুন্‌সীগঞ্জে মহকুমা স্থাপিত হয় এবং তদুপযোগী স্থান পরিষ্কৃত করা হয়, তখন এই দুর্গ জঙ্গল-সমাকীর্ণ ছিল। আজ ইহা পরিষ্কৃত হইয়া সুরম্য প্রাসাদে পরিণত হইয়াছে।

দুর্গের চিত্র স্বতন্ত্র পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল। উহা দুর্গ মধ্যস্থিত জলাশয়ের পশ্চিম পার হইতে তোলা হয়। সুতরাং ইহাতে চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরাবলী সম্যক্ দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল জলাশয় হইতে উত্থিত সোপানাবলী, টিলা, তদুপরিস্থ বাঙ্গলা; দুর্গের মধ্যস্থ প্রাচীরের কিয়দংশ এবং নিম্নে সোপানাবলীর বামপার্শ্বের গোলাকার কুঠুরী মাত্র দেখা যায়।

দুর্গটী ১৬৬০ খৃঃ অব্দে মোগল সম্রাট্ অরঙ্গজেবের রাজত্ব সময়ে বাঙ্গালার সুবেদার মীরজুমলা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। টেলার সাহেব তাঁহার "Topography of Dacca"-তে এই দুর্গের উল্লেখ করিয়াছেন; ক্লে সাহেব কৃত "Principal Heads of the History & Statistics of the Dacca Division"এ ইহার যে ক্ষুদ্র বিবরণ আছে, তাহাতে ইহা "ইদ্রাকপুর কেল্লা" নামে বর্ণিত। তখন ঐ স্থানের নাম ইদ্রাকপুর ছিল এবং ঐ স্থানের নামানুসারে দুর্গের নামকরণ হইয়াছিল। "মুন্সীগঞ্জ" নাম খুব আধুনিক, ইহা সম্ভবতঃ স্থানীয় মুসলমান জমিদারের নাম হইতে উদ্ভূত। বর্ত্তমান সময়েও মুন্সীগঞ্জের এক অংশের নাম ইদ্রাকপুর। টেলার সাহেব ১৮৩০ খৃঃ অব্দে এই স্থানে দুর্গ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তখনও দুর্গ নদীর তীরে অবস্থিত ছিল এবং নদী ঐ স্থান আক্রমণ করে নাই। সেই সময়ে তিনি ঐ স্থানে অনেক অট্টালিকা ও ঘাট ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, ইদ্রাকপুর মুসলমান রাজত্ব সময়ে পূর্ব্ব-বাঙ্গালার একটী প্রধান নগর ছিল এবং ঐ স্থান হইতে বিক্রমপুর-পরগণার জলকর, শুল্ক ইত্যাদি সংগৃহীত হইত। টেলার সাহেব এই দুর্গ সম্বন্ধে অতি সামান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কি উদ্দেশ্যে এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা আলোচ্যের বিষয়। ইদ্রাকপুরের ভৌগোলিক সংস্থান পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, বাঙ্গালার তদানীন্তন রাজধানী ঢাকা নগরীকে সুরক্ষিত করিবার জন্য ঐরূপ স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করা আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ইদ্রাকপুর মেঘনা, ধলেশ্বরী ও লক্ষ্যা এই তিন নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। পূর্ব্ব-বাঙ্গালা নদী-বহুল স্থান; শত্রুগণের ঐ প্রদেশ আক্রমণ করিতে হইলে জলযুদ্ধ ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না এবং সাধারণতঃ ঐ প্রদেশে নৌযুদ্ধই সংঘটিত হইত। ইদ্রাকপুর যেরূপ স্থানে স্থাপিত, তাহাতে ইহাকে ঢাকার প্রবেশদ্বার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঢাকানগরী আক্রমণ করিতে হইলে ঐ স্থান অতিক্রম করিতে হইত এবং ঐ পথ ভিন্ন অন্য জলপথ ছিল না। সুতরাং ঐ স্থান সুরক্ষিত হইলে ঢাকা একরূপ শত্রু-আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইবে সেই উদ্দেশ্যে এই দুর্গ ইছামতী নদীর দক্ষিণপারে স্থাপিত হয়। নদীর অপরপারে হাজিগঞ্জে এইরূপ অন্য একটি দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল; তাহারও ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই উভয় দুর্গ আফগান (পাঠান), আসামী, ফিরিঙ্গি ও মগ প্রভৃতি শত্রুগণের আক্রমণের প্রতিরোধ করিত।

ঢাকা নগরী সংরক্ষিত করা ব্যতীত এই দুর্গস্থাপনের অন্য এক মহত্তর উদ্দেশ্য ছিল। একদিকে পূর্ব্ববঙ্গবাসী যেমন আসামী ও আফগানের আক্রমণে বিপর্য্যস্ত, তেমনি মগ ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুর অত্যাচারেও উৎপীড়িত হইয়াছিল। নদীবহুল পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় এই ফিরিঙ্গি ও মগের প্রকোপ এত বাড়িয়া উঠে যে, ইহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত মুসলমান শাসন-কর্ত্তাদিগকে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়, ইদ্রাকপুরে ও হাজিগঞ্জে দুর্গ-স্থাপন ইহার একতম উপায়। পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগকে মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার হইতে উদ্ধার করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ঐতিহাসিকগণও—(রিয়াজ্ উস্-সালাতিন্ রচয়িতা মিরজা মহম্মদ কাজেম প্রভৃতি) লক্ষ্যা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলে মীরজুমলা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নৌদুর্গের (Naval fort) নির্দ্দেশ করিয়াছেন।*

মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুগণের অত্যাচারে সমগ্র বঙ্গভূমি সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের ঘৃণিত ও পশুতুল্য অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিলে আজও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। তৎকালে একমাত্র আরাকান প্রদেশই গোয়া, কোচিন, মালাক্কা প্রভৃতি স্থান হইতে নির্ব্বাসিত চরিত্রহীন ফিরিঙ্গিগণের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। আরাকান-রাজ মোগলের আক্রমণ হইতে সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার নিমিত্ত ইহাদিগকে চাটগাঁও বন্দরে স্থাপন করেন এবং সেখানে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। তখন চাটগাঁও "পোর্ট গ্রাণ্ডো" (Porto Grando) নামে অভিহিত হইত এবং উহা মগরাজের অধীনে ছিল। ফিরিঙ্গিগণ ঐ স্থানে বাস করিত এবং নানারূপ দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এই উদ্দেশ্যে তাহারা এত ঘৃণিত ও নিষ্ঠুর কার্য্য করিত যে তাহা শ্রবণ করিলে তাহাদিগকে সভ্য-জাতির

* See Taylor's Topography of Dacca,—p. 76 and Clay's. Principal Heads of the History and Statistics of the Dacca Division, p. 35.

সন্তান বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। ইহারা যে কেবল বঙ্গোপসাগরের উপকূলের আতঙ্ক-স্বরূপ হইয়াছিল তাহা নহে, ইহারা মগগণের সহিত মিলিত হইয়া উন্মুক্ত নৌকায় আরোহণ করিয়া পদ্মা, মেঘনা এবং তাহাদের শাখানদী ও খাড়ির মধ্যে ভ্রমণ করিয়া লোক-জনের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। তাহারা নদীতীরস্থ গ্রামে গিয়া গ্রাম জ্বালাইয়া দিত এবং স্ত্রীপুরুষ সকলকে ধরিয়া লইয়া যাইত। অক্ষম বৃদ্ধদিগকে অসহনীয় নির্য্যাতন করিয়া ছাড়িয়া দিত; কিন্তু যুবক ও প্রৌঢ়গণকে লইয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত, অথবা তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া স্বীয় দলভুক্ত করিয়া লইত। হাট বসিবার দিনে, বিবাহ দিবসে বা অন্য কোন পর্ব্বোপলক্ষে যখনই লোক সমাগম হইত, তখন তাহারা অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া সমবেত জনসঙ্ঘের উপর পতিত হইত এবং তাহাদিগকে হত্যা করিয়া অথবা বন্দী করিয়া লুণ্ঠনকার্য্য সমাধা করিত। ইহাদের অত্যাচারে গঙ্গা ও পদ্মার মোহনাস্থিত অনেক স্থান জনশূন্য হইয়া ব্যাঘ্র-ভল্লুকের আবাসরূপে পরিণত হইয়া যায়। † আজও পূর্ব্ববঙ্গবাসী বিশেষতঃ ঢাকা অঞ্চলের লোক ফিরিঙ্গি ও মগের নাম শুনিলেই ভীত হইয়া উঠে। বর্ণিয়ার সাহেব ইহাদের অমানুষিক অত্যাচার-কাহিনী তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে বিবৃত করিয়াছেন, তাহা পড়িতে পড়িতে ক্রোধ ও ঘৃণায় শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ফিরিঙ্গিরা জাতিতে খৃষ্টান হইলেও ইহাদের আচার-ব্যবহার বর্ব্বরের তুল্য ছিল। তখনকার ভ্রমণকারী বর্ণিয়ার সাহেবের উক্তি তাহার সমর্থন করিতেছে।

সুদক্ষ ও দূরদর্শী মীর জুম্‌লা আসামী ও কোচগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্ব-বাঙ্গালা মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার* হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইছামতীর দুই পারে (ইদ্রাকপুর ও হাজিগঞ্জে) এই দুই দুর্গ স্থাপন করেন এবং তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য অতিরিক্ত সৈন্যও নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে পুনরায় "নাওয়ার মহল" গঠিত হইয়াছিল। উক্ত উভয় দুর্গেই একই প্রকারের দুইটী উচ্চ টিলা নির্ম্মিত হয়। এই টিলার উপর হইতে সৈন্যদল শত্রুর রণতরী সকল পর্য্যবেক্ষণ করিত এবং সর্ব্বদা স্বপক্ষীয় রণতরী সকল ঘাটে বাঁধা থাকিত। শত্রু দৃষ্টিগোচর হইলে সৈন্যদল রণতরী আরোহণ করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিত। এইরূপে মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার নিবারিত হয়। মীরজুম্‌লার শাসন সময়েই বাঙ্গালায় মোগল-শাসন সবিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করে এবং পূর্ব্ববঙ্গবাসী মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়া শান্তিসুখভোগে সমর্থ হয়।

ঐ দুর্গ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। এই দুর্গ-বিষয়ে প্রচলিত কিম্বদন্তী এবং লোক-মতের সঙ্গে ঐতিহাসিক কোন সত্যের সামঞ্জস্য নাই। স্থানীয় লোকের কাহারও কাহারও বিশ্বাস, ইহা "মগের কেল্লা," কাহারও ধারণা ইহা পর্ত্তুগীজের স্থাপিত। শেষোক্ত

† In Major Rennell's Bengal Atlas a considerable district marked as "Lands depopulated by the Maghs".

দল তাঁহাদের মত সমর্থন করিবার জন্য এই দুর্গ হইতে ১ ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে স্থাপিত "ফিরিঙ্গি বাজার" গ্রাম নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন, "ফিরিঙ্গি-বাজারে পর্ত্তুগীজগণ বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত এই স্থানে দুর্গ স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু উভয়পক্ষের ধারণাই যে ভ্রমমূলক তাহা ঐতিহাসিক আলোচনা করিলে সম্যক্ উপলব্ধি হয়। প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাসে ফিরিঙ্গি-বাজারের নামোল্লেখ আছে।

নবাব মীরজুম্‌লা মুআয়েম খাঁর মৃত্যুর পর মগগণের শক্তি আবার বাড়িয়া উঠে। এই সময় নবাব সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার সুবেদার নিযুক্ত হন। তিনি ঢাকায় আসিয়া মগ ও পর্ত্তুগীজের সমূল-উচ্ছেদ করিবার সংকল্প করেন এবং বহুসংখ্যক রণতরী ও সৈন্যবল সহ হোসেন বেগকে চাটগাঁও প্রেরণ করেন। এই সময় পর্ত্তুগীজগণের কোন পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না; তাহারা মগদের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিত এবং আরাকান-রাজার অধীন ছিল। হোসেন বেগ পর্ত্তুগীজগণকে ভয়প্রদর্শন করেন এবং আরাকানরাজও তাহাদিগকে অবিশ্বাস করেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া ফিরিঙ্গিগণ হোসেন বেগের শরণাপন্ন হয় এবং কতক মোগলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মগদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও সৈন্য দলভুক্ত হয়। (এই যুদ্ধে মগগণ পরাভূত হয় এবং চাটগাঁও মোগলের করায়ত্ত হইয়াছিল।) অবশিষ্ট সকলকে হোসেনবেগ ঢাকার সায়েস্তা খাঁর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাহাদিগকে "ফিরিঙ্গিবাজারে" স্থাপন করেন। তদবধি এই স্থানের নাম ফিরিঙ্গি-বাজার হইয়াছে। মোগল রাজত্বের সময় ফিরিঙ্গিবাজার একটী সমৃদ্ধিশালী জনপদে পরিণত হইয়াছিল। ঢাকানগরীর অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এই স্থানেরও অবনতি এবং অধুনা ফিরিঙ্গিবাজার একটী গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছে। ষ্টুয়ার্ট সাহেব ও টেলার সাহেব এই স্থানের বিবরণ তাঁহাদের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এখনও ঐ স্থানে ফিরিঙ্গিদের বংশধরগণ বাস করে। ইহারা এখন ব্যবসা ছাড়িয়া লাঙ্গল ধরিয়াছে, এবং ইহাদের সঙ্গে বর্ত্তমান দেশীয় কৃষকের কোনই পার্থক্য

* মগ ও ফিরিঙ্গীর অত্যাচার সেই সময় কিরূপ ভীষণ ও বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তৎসাময়িক গ্রন্থাদিতেও তাহার আভাষ পাওয়া যায়। ইহারা যে সকলকে ধরিয়া লইয়া যাইত, তাহা কবিকণ্ঠহার প্রণীত সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা গ্রন্থের একটী শ্লোকে প্রমাণিত হয়। মগেরা বৈদ্যজাতীয় জনৈক ভদ্রলোকের একমাত্র পুত্রকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যায়, তাহাতে তাহার বংশ একেবারে বিলুপ্ত হয়। শ্লোকটি এই—

"মহেশসেনজামাতুর্গোপীনাথাৎ সুতো ভবেৎ।

চাটীগ্রামমসৌ নীতোবলান্মঘচমূচরৈঃ॥"

অর্থাৎ "মহেশ সেনের জামাতা গোপীনাথের একমাত্র পুত্র ছিল, তাহাকে মগের বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যায়।" এই গ্রন্থ ১৫৭৫ শক (১৬৫৩ খৃঃ অব্দে) রচিত হইয়াছিল সুতরাং শ্লোকটী সেই সময়ের মগের অত্যাচারের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইহা শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন সঙ্কলিত কবিকণ্ঠহারের ৫৭ পৃষ্ঠায় আছে।

দৃষ্ট হয় না। সেখানে একটী গির্জ্জাঘর আছে, তথায় একজন রোমান কাথলিক পাদরী আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাস করেন এবং ইহারা প্রতি রবিবারে গির্জ্জাঘরে গিয়া থাকে। কিন্তু মহামারী কিম্বা বসন্তের প্রকোপ হইলে ইহারা রক্ষাকালী ও শীতলা দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করে। দুই বৎসর হইল মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী দেওভোগ-নিবাসী এক জন ভদ্রলোক এই স্থানে মৃত্তিকা নিম্নে "দুই জোড়া কাঁটা চামচ" পাইয়াছিলেন। ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্য আছে স্বীকার করিতে হইবে। এ ছাড়া আজও অনেক ভগ্ন ইমারত ও পুরাতন ইষ্টকাদি ইহার অতীত গৌরব ও কালের কঠোর শাসনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

৺সুখবিন্দু সেনগুপ্ত *

* প্রবন্ধলেখক সাহিত্যপরিষদের একজন উদ্যোগী ছাত্রসভ্য ছিলেন। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই প্রবন্ধটী আমাদের হস্তগত হইবার অল্পদিন পরেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। পত্রিকা-সম্পাদক।

ঢাকার গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সকল জেলার দেশজ শব্দ নিবদ্ধ একখানি অভিধানের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করিতেছেন, এরূপ একখানি অভিধান সঙ্কলন করা বহু সময়সাপেক্ষ। ইহা কাহারও ইচ্ছার ইঙ্গিতে বা অঙ্গুলি হেলনে সুসম্পন্ন হইতে পারে না। সেতুনির্ম্মাণে কাঠবিড়ালির সাহায্যের ন্যায়, ঢাকা জেলায় বিশেষতঃ মাণিকগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত কতগুলি গ্রাম্যশব্দের তালিকা নিম্নে উপস্থিত করিলাম। বলা বাহুল্য, তালিকাভুক্ত অনেক শব্দ অন্যান্য জেলায়ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুসলমান-প্রভাব হেতু ঢাকার কথ্য ভাষায় অনেক মুসলমানী শব্দ আছে।

অখন—এখন। অদ্দু—বিস্ময়সূচক অব্যয়; ইতর-প্রয়োগ উদ্দে। অবুঝ—বুদ্ধিহীন, বিপক্ষের প্রতি মিতভাষীর কটুবাক্য। অয়্-অ—অবিশ্বাসসূচক অব্যয়; তুমি যাহা বল তাহা আমি কিছুমাত্র বিশ্বাস করি না, এতদর্থে ইতর-প্রয়োগ; হাঁ-হাঁ বা "হু-হু" হইতে উৎপত্তি কি? অলপ্-পাইয়া—অল্পায়ু, স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত কটুবাক্য। অংথার—অহঙ্কার, জাঁক।

আ

আই আই—ছি ছি। আইজান—বন্ধ করা, যথা কপাট আইজাও। ঘুচান দেখ। আইড়া—যে সহজে তর্কে হার মানে না; কটুবাক্য বিশেষ; তুঃ * অবুঝ। আইয়ো—এয়ো, সধবা স্ত্রী, তদ্রূপ আইস স্থলে পশ্চিমবঙ্গে এসো। আইলসা—আগুন রাখিবার মৃৎপাত্র। আকল—কষ্ট, প্রতিশোধ; যথা, কেমন আকল। আখা—উনান, চুল্লী। আখুট—শিশুর আবদার। আগর্—দুরূহ, শক্ত। আঙ্গুট—আংটী, অঙ্গুরি। আচই, আচি—নারিকেলের মালা, নারিকেলের বহিরাবরণ দ্বারা নির্ম্মিত বাটি; মালই শব্দও ব্যবহৃত। আচানি শাল—আহারের পর আচমনের স্থল, আঁস্তাকুড়। আজা—মাতামহ। আজীসা—মাতামহী, তুঃ অন্যত্র প্রচলিত আই বা আই-মা। আঁজুলা—অঞ্জলি শব্দজ। আঠু—হাটু। আড়া, আড়গোড়া—বলিদানের হাড়িকাঠ। আধলা—আধ পয়সা। আপনে—আপনি। আবাগী—অভাগী, গাল বিশেষ। আবু—খোকা (ক্বচিৎ), ময়মনসিংহে বিশেষ ব্যবহৃত। আমচুর—ফালি ফালি কাটা রৌদ্রে শুকান আম, আমসি। আম্বল—অম্বল, টক্। আলগুচ্চে—আলগোচে, সম্যক্ স্পর্শ না করিয়া। আসা—আবহমান কাল প্রচলিত পারিবারিক আচার বা বিধি; যথা, আমাদের বাড়ীতে পাট কাপড় পরিয়া সাধ খাওয়া

* তুঃ—cf বা "তুলনা কর" কথার সঙ্কেতরূপে ব্যবহৃত হইল।

আস্য। আসন—আরোগ্য, ইতরপ্রয়োগ। আস্তে—ধীরে, নিঃশব্দে; বেত্রপাণি গুরু-মহাশয় হাঁকেন "আস্তে!" আহাল—অবস্থা। আসলে—বাস্তবিক।

ই

ইচা মাছ—চিংড়ি। ইটা—ইষ্টক খণ্ড, ঢিল, ঢাকা দেখ। ইফিরা—এবার, তুঃ সেফিরা বা সেবার। ইলসা—ইলিস মৎস্য। ইসে—যাঁহাদের শব্দের প্রতি বিশেষ আধিপত্য নাই এমন লোকদের ব্যবহৃত শব্দসংযোজক অব্যয়; বিক্রমপুরে অসহনীয় ব্যবহার।

উ

উচা—উচ্চ, উচু। উফড়া—মুড়কি। উরুণ—মুড়ি। উরুস—ছারপোকা, তল্পকীট। উলু—উই, রুই, বল্মীক।

ঊ

ঊনা—কম, শূন্য, খালি। ঊরাৎ—উরুদেশ, জানুর উপরিভাগ।

এ ঐ

এউগা—একটা, অশিষ্ট-প্রয়োগ। ঐষ্টক্ষণ—অষ্টক্ষণ বা অষ্ট-প্রহর অর্থাৎ সর্ব্বদা, ইতর-প্রয়োগ।

ও

ওমা-ওমা—ঈষদুষ্ণ। ওয়াড়—বালিসের খোল। ওস্—হিম, ঠাণ্ডা। ওচা—অল্প জলে মাছ ধরিবার যন্ত্রবিশেষ।

ক

কছু—ইঁচড়, অপক্ক কাঁঠাল। কনথে—কোথা হইতে, ইতর-প্রয়োগ। কনে—কোথায় কম্মা, কর্ম্মা—সাংসারিক কাজকর্ম্মনিপুণা বালিকা বা বধূ; যথা, বউটী-তো বেশ কম্মা। কল্লা—ঝগড়াটে মুখরা স্ত্রীলোক, যার গলা কল্ কল্ করে। কলস—কলসী, ঘড়া। কলি—কুঁড়ি, কোরক। কাইজা ক্যালাঙ্কার—অনর্থক ঝগড়া। কাইঠা—কচ্ছপ, কূর্ম্ম, কমঠ, দুরা। কাইড়া—নৌকার মাঝিদের বংশনির্ম্মিত তৈলাধার। কাইয়া, কাউয়া—কাক। কাইল্লা লোথ—কড়ে অঙ্গুল। কাইলা—মেঘযুক্ত আকাশ। কাকই—মাথার চিরুনী। কাচি—কাস্তে, শস্য-কর্ত্তনী। কানি, তেনা—ছিন্নবস্ত্র খণ্ড, নেকড়া। কাম—কর্ম্ম, কাজ। কামলা—মজুর। কারুরে—কাহাকেও। কাশ—কাশি। কাসন্দ—কাসুন্দি। ক্যা, ক্যান্—কেন, কিজন্য। ক্যাতকুতু—কুতুর কাতুর। কিরা-কাড়া—শপথ বা দিব্য-গ্রহণ, তুঃ মাথার কিরা। কিসের লাইগা—কিসের লাগি, কেন; ক্যা দেখ। কিষ্ট বাবু—কৃষ্ণবাবু। কুকী—খুকী, শিশুকন্যা। কুচুকৈরা—কুচক্রী, দুষ্ট; যথা কুচুকৈরা পোলাপান অর্থাৎ দুষ্ট ছেলে; স্ত্রীলোকের প্রয়োগ। কুটকুটা—অতিশয় ময়লা, কালা কুটকুটা কাপড়; তুঃ ঘুটঘুটা, ফুরফুরা ইত্যাদি। কুচকুচা—উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ। কুত্তা—কুকুর। কুশইল—ইক্ষু,

আক, গ্যাণ্ডারি। কেইছা—কেঁচো, মহীলতা। কেম্বে, ক্যাম্বায়—কেমনে, ইতর-প্রয়োগ। কৈতর—কবুতর, পায়রা। কৈলাম—কিন্তু; যথা, দেখ, সে কৈলাম যাইবো (যাবে) না। কৈলকত্তা—কলিকাতা। কোকা—খোকা, নন্ত দেখ। কোটা—আকুঁষি, আকর্ষণী। কোরাণি—নারিকেল কুরিবার দন্তবিশিষ্ট গোলাকৃতি যন্ত্র। কোল-বালিস—পাশ বালিস। ক্ষীরাই—স্থূল ও খর্ব্বাকার শশাবিশেষ।

খ

খড়ি—জ্বালানি তৃণকাষ্ঠাদি, লাকরি, কাঠি। খপ্পৎ করিয়া—হঠাৎ, আচম্বিত। খয়—খয়ের, খদির। খসখসা—অমসৃণ। খাইজ, খাউজ—চুলকানি। খাড়া—দাঁড়ান। খাড়া-কখাড়া—অতিশীঘ্র, তাড়াতাড়ি। খাড়ু—মল, পায়ের গহনা। খাদা—জমীর পরিমাণ, ষোল পাখীতে এক খাদা। খাপ—মলাট। খাপ্পা—কুপিত। খাবাসি—বাখারী, বংশোদ্ভব শলাকা। খাম—ঘরের খুঁটি, দারুস্তম্ভ। খামাখা—অনর্থক, মিছামিছি; অকারণ। খালি—কেবল, তুঃ মোটে। খানে—স্থানে, কোন্ খানে কোথায়; তুঃ এখানে, সেখানে। খ্যাড়, নাড়া—খড়, তৃণ। খিদা—ক্ষুধা। খুবরী দেওয়াল—কুলুঙ্গি। খেদান—তাড়াইয়া দেওয়া। খুইষ্টা—শৌচাশৌচ জ্ঞানবিহীন, খৃষ্টান বা খিষ্টান শব্দজ। খেরকি—জানালা।

গ

গতর—গাত্র, শরীর; গতর খাটা—শারীরিক শ্রম। গব গব—জলপতনের শব্দ। গলই, গলি—নৌকার দুই অন্তভাগ, আগাগলি ও পাছাগলি। গয়া—ফড়িং বিশেষ। গাঙ্গ—নদী, ইতরপ্রয়োগ, গঙ্গা শব্দজ। গাছা—প্রদীপ রাখিবার কাষ্ঠাধার। গিরু—গাঁইট, গ্রন্থি, গিরা। গুদারা—খেয়া ঘাট। গুইসাপ—গোসাপ। গোড়—গুঁড়ি; গাছের গোড়ে—গাছের মূলে, তুঃ আগা—গোড়া। গুরমুড়া—পায়ের গোড়ালি। গুড্ডি বা ঘুড্ডি—ঘুড়ি। গুয়া—সুপারি। গো—দের, বহুবচনান্ত ষষ্ঠী-বিভক্তি; আমাগো—আমাদের; কাগো—কাদের ইত্যাদি। গোদানি—উল্কী। গোসা—অভিমান; বালকবালিকার—অভিমান অর্থে প্রয়োগ। গোয়াল—গয়লা, গোয়ালা। গোহাইল বা গোয়াইল—গোশালা, গোয়াল।

ঘ

ঘন্টা—রম্ভা বা কদলীর শব্দের ন্যায় অশিষ্টপ্রয়োগ; যথা, তাঁহার কাছে কিছু প্রত্যাশা কর!—ঘন্টা—কিছুই নাই—ঠন্ ঠন্। ঘশি—ঘুটে, শুষ্ক গোময়। ঘাও—ঘা, ক্ষত। ঘ্যাগ—গলগণ্ড। ঘিলু—মস্তিষ্ক, মগজ। ঘুচান—খোলা; যথা কে ভিতরে?—কপাট ঘুচা। ঘুটঘুটা—খুব আঁধার, যথা অন্ধকার ঘুটঘুটা।

চ

চকি, চৌকি—তক্তপোষ, খাট। চঙ্গ—মই। চলা—জ্বালানি কাষ্ঠখণ্ড, চেলা।

চাকা—লোষ্ট্র, ঢিল। চাকু—ছুরি। চাঙ্—মাচা। চারি—হাতের বা পায়ের নখ; লোখ্ দেখ। চান্দরা—দোচালা ঘরের দুই অন্তঃস্থ ত্রিভুজাকৃতি স্থান, যথা চান্দরার বেড়া। চ্যাগা—দলিত হইয়া চেপ্টা। চিকা—ছুঁচা। চিবি—ফাঁক, যথা কবাটের চিবিতে (ফাঁকে) কাইয়া লোখে (কড়ে আঙুল) চেঙ্গী লাগছে (চাপা পড়েছে)। চীথৈর—চীৎকার, চেঁচান। চীলা কুঠুরি—দালানের ছাদে উঠিবার সিঁড়ির উপর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। চুকা—টক, অম্ল। চুকি দেওয়া—উাক, গোপনে থাকিয়া দৃষ্টি করা। চেঙ্গড়া—বালক। চেংরাপানা—ছেলেমি। চোট্টা—প্রবঞ্চক। চেঙ্গি—চাপা, চিবি দেখ। চোকলা, চোচা—ফলের খোসা। চোখা—সূক্ষ্ম, যথা, তাহার নাক চোখা, "বোচা" না। চেল্লা—বিছা, বৃশ্চিক। চোখ উদান—চোখ উঠা।

ছ

ছচি—অশুচি, অশুদ্ধ; যথা, আমারে ছুঁইস না, আমি ছচি কর্‌ছি। ছঞ্চা—ঘরের চালের অধোপ্রান্ত। ছন—উলুখড়। ছাও—ছানা, শাবক। ছাইলা, ছাওয়াল, পোলা—ছেলে, পুত্র। ছাওয়াল-পান—ছেলেপিলে। ছাতি—ছাতা, ছত্র। ছানা—বোরা, গুণ। ছিম—শিম, আনাজ বিশেষ। ছিয়া-বিয়া—বিশৃঙ্খল। ছেমড়া—ছোকরা, বালক তুচ্ছার্থে। ছেপ—নিষ্ঠীবন, থুথু। ছেবলা—অল্পবুদ্ধি ও বহুভাষী লোক, নিন্দার্থে। ছোচা—লোভী, পেটুক। ছোটকালে—বাল্যকালে, ছেলে বেলা। ছোৎ করিয়া—শীঘ্র। ছোবা—ছোবড়া। ছৈদ—ছুলি। ছাড়-দেওয়াল—চারিদিকে ঘেরা পাঁচীল। ছ্যামায়—কাছে, সামনে।

জ

জালা—বৃহৎ মৃণ্ময় জলাধার, ঢাকাই জালা দেখিবার জিনিস। জালি—কচি, যথা জালি পাতা। জালালি কৈতর—কৃষ্ণবর্ণ পারাবত। জিগাইলে—জিজ্ঞাসা করিলে। জুনি পোক—জোনাকি পোকা। জেঠি—জেঠাই। জো—তুক-তাক্, ঔষধ দ্বারা বশীকরণ, পানের সাথে অষুদ দিয়া জো (জয় ?) করেছে। জোকার—হুলুধ্বনি বা উলু, জয়কর শব্দ। জুইত—সুবিধা।

ঝ

ঝাইল—বেত্রপেটিকা বা পেটেরা, এখন ট্রাঙ্কের আমল। ঝাকা—চাঙ্গাড়ি। ঝারী—গাড়ু, ভৃঙ্গার। ঝিনই—ঝিনুক। এখন দুগ্ধপোষ্যদের জন্য চামচ হইয়াছে। ঝাওয়া, ঝামা—বেশী দগ্ধ ইষ্টক। ঝোমন—তন্দ্রা, ঘুম পাওয়া। ঝড়ি—ঝড়।

ট

টাগা—ঘুনসি, বাইটা, শব্দও ব্যবহৃত। টাবলা—অনর্থক বহুভাষী বাচাল, ছেবলা দেখ। টালা দেওয়া—বৃক্ষারোহী বালকের মস্তকে পাখীর চঞ্চুপ্রহার, ছানা রক্ষার জন্য। টুকটুকা—লালরঙ্গ, ছোট জিনিস উপলক্ষে; বড় হইলে ডুগডুগা। টেঙ্গুড়—এক পায়ে হাঁটা। টুরি—ক্ষুদ্র ডালা ডালা, দেখ। টাল্‌কা—ঠাণ্ডা, শীতল।

ঠ

ঠাটা—বাজ, বজ্র। ঠাই ঠ্যান্—কাছে, ঠেঁয়ে, যথা বাপের ঠাই চাও, আমার ঠ্যান্ নাই। ঠৈটা—প্রবঞ্চক, যে খেলায় দুষ্টামি করে। ঠেটাপানি—ঠেটামি, বজ্জাতি। ঠোকর—গালে ঠোনা মারা, স্ত্রীলোকের ব্যবহার।

ড

ডখি—মৃণ্ময়পাত্রবিশেষ, মালসা। ডা, ডি—টা, টি, কোনডা, কোনডি ইত্যাদি স্থলে ব্যবহার। ডাটা—বৃন্ত, বোঁটা। ডাব-ছোলা—ছোট দা, নারিকেল ভাঙ্গিতে ও উহার শাঁস সংগ্রহে ব্যবহৃত। ডালা—বংশনির্ম্মিত পাত্র, মুড়ি মুড়কি ভোজনের জন্য; চুপড়ী। ডর—ভয়। ডুগডুগা বা ডগডগা—বেশীলাল, টুকটুকা দেখ। ডৈল—গঠন। ডোয়া—গৃহের ভিত্তি। ডোল ধান—ধান, চাল প্রভৃতি শস্য রাখিবার বৃহৎ আধার।

ঢ

ঢলঢল—কাতর, যথা খিদায় (ক্ষুধায়) ঢলঢল করিয়া ফিরে (বেড়ায়); বিষে ঢলিয়া পড়া। ঢাহা—ঢাকা, ইতর-প্রয়োগ। ঢুম—ঢোল, শিশুদের-প্রয়োগ।

ত

তখিৎ—অনুসন্ধান, তদ্বির। তগো—তোদের। তর—তোর। তয়কা—তাকিয়া। তা—অনির্দিষ্ট বিষয়সমূহের সর্ব্বনাম; যথা সকল তা ঠিক রাখ। তালাস—খোজ, অনুসন্ধান। তাইল্লাইগা—তাই লাগি, সেইজন্য। তামুক—তামাক। ত্যানা, তেনা—নেকড়া, ছিন্ন বস্ত্র খণ্ড, কানি। ত্যানে—তা-হ'লে, তাহা হইলে। ত্যান্দর—দুষ্ট। তিকিচ্ছা—চিকিৎসা। তুলতুলা—খুব নরম (তূলার ন্যায়)। তূ—কুকুরকে আহ্বান সঙ্কেত। তেড়িবেড়ি—বক্র-ভাব, অসারল্য। তৈলাচোরা—তেলা-পোকা, আরসুলা।

থ

থনে, থিকা—হইতে, থেকে, চেয়ে, চাইতে, অপেক্ষা। কোহান্ থনে—কোত্থেকে, ইতর-প্রয়োগ। থাপড়—চাপড়, চড়, থাবড়া। থাপা—থাবা, থাবড়া দিয়া কাড়িয়া লওয়া। থোওন—রাখন, স্থাপন। থোড়—মোচা, কদলীফুল। থোৎমা—চিবুক, দাড়ি, থুতি। থ্যাতা—চেপ্টা।

দ

দকনা—অমুক, ফলনা দেখ। দলামোচড়া—কোন জিনিস (কাপড় কাগজ ইত্যাদি) হস্তের মুষ্টিতে লইয়া নিষ্পেষণ করা। দাও—দা, কাটারি। দানা—স্ত্রীলোকের কণ্ঠাভরণ, মালা; এখন হার ব্যবহার। দিকশিক বা ত্যাক ত্যাক—মানসিক প্রফুল্লতার অভাব। দুত্তোরিনা—ঐ ভাব; যেমন দুত্তোরিনা! বড় দিকশিক লাগে—কিছু ভাল লাগে না—যাই চলে ইখান থিকা। দিশা বিশা—ভাল বন্দোবস্ত বা শৃঙ্খলা করা। দুয়ার—দ্বার, ঝাপ, যথা দুয়ারটা দেও অর্থাৎ কপাট বন্ধ কর; অন্যার্থ উঠান, আঙ্গিনা। দুর্দ্দশা—দুর্ম্মতি, দুষ্ট অপচয়কারী বালকের প্রতি

অভিভাবিকার কটু বাক্য। দুঃখু পাই! —উঃ লাগে! (চিমটী কাটিলে)। দৈলা—পিটালি নির্ম্মিত পুলী, পিষ্টকবিশেষ।

ধ

ধন্না—কড়িকাঠের উপর চালের অবলম্বন স্বরূপ খর্ব্ব বংশদণ্ড। ধারা—চেটাই, মাদুর বিশেষ। ধুরু।—অবিশ্বাসসূচক অব্যয়, যথা ধুরু। তাও কি হয়; "দূর হ" কথা হইতে। ধুৎ—ঐ। ধামা—বেতের চাঙ্গাড়ী, টুকরি।

ন

নণ্ড—খোকা। না করা—অস্বীকার বা মানা করা; যথা, সে "না করে" যাইবার (যাইতে) পারিবে না; তিনি আমারে যাইবার "না করেন"। নয়া—নতূন, নূতন। নাড়া—বীচালি, শুষ্কতৃণ। নাইড়া মুড়া—চুলহীন ন্যাড়া মুণ্ড। নাড়ি—কাপড়ের পাড়। নাহাক—বৃথা, মিছামিছি। নি—তো, কি; সে ভাল আছে নি? তুমি নি ইহা করিতে পারিবে? নীলদাঁড়া—মেরুদণ্ড, পিঠের শিরদাঁড়া। নে—দূর ভবিষ্যৎবোধক অব্যয়; যথা, আচ্ছা, করিবনে বা করুমনে অর্থাৎ করিব যখন সুবিধা পাই। নছল্লা—ন্যাকামি। নালিতা—পাট।

প

পলান—লুকাইয়া থাকা, পলায়ন শব্দজ। পলো—বিড়াল প্রভৃতি হইতে দুগ্ধাদি রক্ষার নিমিত্ত বংশনির্ম্মিত আবরণবিশেষ। পাও—পা। পাছ-দুয়ার—খিড়্কি। পান বানা—পান সাজা। পাটা-পুতা—শিলনোড়া। পাতিল—মালসা। পাতুরি—মাছের তরকারি। পাখি—জমীর পরিমাণ বিশেষ। পাটখড়ি—পাটকাঠি, প্যাকাটি। পালান—বাগিচা, উদ্যান। পান খাউনি—চুণের সঙ্কেত নাম; মেয়েলি শাস্ত্রানুসারে চুণ বিনামূল্যে বা ধারে আনিতে নাই; সুতরাং প্রতিবেশীর নিকট হইতে চাহিয়া লইতে গেলে "পান খাউনি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। পারা—পদ দলন, পা দিয়া মাড়ান; পদাঙ্ক, যথা লক্ষ্মীর পারা। পাঁচড়, পাঁচড়া—খোস। পাঁক্—পঙ্ক কাদা। পালা পানসারা—দাঁড়ি-পাল্লা। পোক—পোকা। পোলা—ছেলে, পুত্র, ছাওয়াল দেখ। পোলা-পান—ছেলেপিলে।

ফ

ফলনা, দফনা—অমুক। ফাল—লাফ, লম্ফ। ফালা—ছিন্ন, বিদীর্ণ, ছেঁড়া; কাপড় খানার মধ্যে মস্ত এক ফালা। ফাঁসা—ফাঁক। ফিরা—বার, যথা, ইফিরা এবার, সেফিরা সেবার। ফিরন্—বেড়ান, চলা ফিরা। ফুটা—ছিদ্র, ছ্যাঁদা। ফুর ফুরা—খুব ধলা। ফেকন—ছুঁড়ে ফেলা, নিক্ষেপ। ফেউর—শিয়াল। ফৈর—পাখীর পালক। ফোট—ফোঁড়া। ফুষ্টি, ফুটানি—জাঁক, গর্ব্ব। ফাৎরা—কলা গাছের ছোবড়া।

ব

বইল, বউল—মুকুল। বয়লা—বালা, হাতের গহনা। বল্লা, বয়লা—বোলতা।

বন্ধ—বন্ধ, যথা স্কুল বন্ধ। বরই—কুল (ফল)। বাউলী—বেড়ী (রন্ধন কার্য্যের)। বাইত—বমি। বাথি—অর্দ্ধপক্ক ফলের প্রতি প্রযুক্ত। বাগুণ, বাইগণ—বেগুণ। বারুণ—ঝাঁটা, সম্মার্জ্জনী। বারি দেওয়া—লাঠি প্রভৃতির আঘাত। বাঙ্গি—ফুটি (ফল)। বাদ—মনোমালিন্য। বানান—গড়া, তয়ের করা। বাইটা—মাজার ঘুনসি, টাগা। বাহারের—বাহার যুক্ত, বেশ সুন্দর। বাইল পড়া—ধন্না দেওয়া। বিলাই—বিড়াল। বিলাত যাওয়া—নাপিতদের খৌরকার্য্যে বাহির হওয়া। বিষ করা—বেদনা অনুভব; আমার পেট বিষ করে। বীচি—বীজ। বিহান—প্রাতঃকাল। বুড্‌ডুরে!—খেলায় বিজিতের প্রতি জেতার বিদ্রূপ অভিব্যক্তি। বেজী—নকুল, নেউল। বেবাক—সমুদয়। বেকা-কোকা—বেশী বক্র। বেজকন্যা—বৈদ্য-কন্যা; দ স্থলে জ, ধ স্থলে ঝ চির নিয়ম; তুঃ অদ্য আজ, মধ্য মাঝ। বোচা—খাঁদা নাক। বোলে—নাকি; যথা, সে বোলে আজই ঢাকা যাইবো (যাবে)।

ভ

ভাইস্তা—ভাইপো, ভ্রাতুজ, ভাতিজা। ভাজ পাওয়া—টের পাওয়া। ভাদাইল—কলাগাছের মধ্যস্থ সারাংশ, আনাজ বিশেষ। ভেঙ্কি, ভেঙ্গান, ভেংচি—মুখবিকৃত, ভেঙচনা। ভোগা দেওয়া—ছলনা করা, মিথ্যা ব্যবহার। ভাও—দর।

ম

মচ্ছপ—মহোৎসব, ভোজ। মজগুড়—মাগুর মাছ। মটুক—মুকুট, টোপর। মরিচ—লঙ্কা। মর্ত্ত মর্ত্তন—বাস্তবিক, ঠিক বলছি ইত্যর্থে প্রয়োগ; যথা আমারে ৫৲টী টাকা এখন দেও, আমি মর্ত্ত কাইল বিহানে ফিরৎ দিমু। মস্তরাম—খুব বড়। মাইচা—চেয়ার, কেদার। মাইজাশাল—ঘরের মধ্যস্থল। মাইথানী—মধ্যাহ্নে অন্নভোজনের পূর্ব্বে চাকর বাকর ও মজুরদের 'জলপান' মুড়ি, চিনি ইত্যাদি। অনুমান হয় পূর্ব্বে কৃষকেরা মধ্যাহ্নে ঐরূপ আহার করিত, পরে ক্ষেত্র হইতে অপরাহ্নে বা সায়ংকালে আসিয়া অন্নভোজন করিত। মাইয়া—মেয়ে। মাচি—মাচা, মঞ্চ। মাছ মারা—মাচ ধরা। মাজা—কোমর। মাঠা—ঘোল, তক্র। মাকর—মাকড়শা। মালই—নারিকেলের মালা। মিস্থি—মুটে, কুলী, (ঢাকা সহরে ব্যবহৃত); যাহারা মেহনত বা পরিশ্রম করে এই অর্থে বোধ হয়। মুজা—মোজা। মোছ—গোঁপ। মোটে—কেবল, সবে মাত্র। মোটেই—একেবারেই, সে মোটেই যায় নাই। মুছুল্লুম—বেবাক, সমুদয়, সব। মেরকুট্টি—অতি দুর্ব্বল।

য

যুয়ান—যুবক, যুবাপুরুষ। যাতা লাগা—চাপা পাওয়া। যানি—যেন; সে কোথায় যানি গিছে।

র

রচনা—পূজার নৈবেদ্য, লাড্ড়ু, মুড়কি, মিষ্টান্ন প্রভৃতি যাহা ঘরে তয়ের করিতে হয়।

রাইঙ্গ—মৃত্তিকাপাত্র বিশেষ, হাঁড়ি। রাম—তামাকের গুড়, অন্য নাম লোচা, নালি। রাঁধুন ঘর—রান্নাঘর, রন্ধন-গৃহ। রাংতা—ডাকের সাজ। রে—কে, কর্ম্মকারকের বিভক্তি, তাহারে আমারে ইত্যাদি।

ল

লটকা—বর্ষাকালে জাত এক প্রকার ক্ষুদ্র বন্য ফল। লগ্গি—নৌকা-চালনার দীর্ঘ বংশদণ্ড। লগে—সঙ্গে, সাথে; লগ্ন শব্দজ। লাইগা—লাগি, জন্য; তগো লাইগা—তোদের জন্য। লাগুর—সাক্ষাৎ; যদি দিনের লাগুর পাই—যদি আমার সুদিন হয়। লাগে—উচিত কর্ত্তব্য ইত্যর্থে; তোমার ইহা কারণ লাগে (করা উচিত, করিতে হয়)। লাথ্‌থি—লাথি। ল্যাঠা—মুস্কিল, শক্ত। লেমু—লেবু। লোখ্‌—আঙ্গুল; নখ, অন্য নাম চারি। লোড়—দৌড় দেওয়া।

শ

শলা—বড় ঝাঁটা, প্রাঙ্গণসম্মার্জ্জনী। শরীল—শরীর। শাস্ত্রের কথা—উপকথা, রূপকথা। শুলাক—ছিদ্র। শুধাশুধি—মিছামিছি, খামকা, বৃথা।

স

সপ—মাদুর। সবরী আম—পেয়ারা। সর্ত্তা—গুবাকাদি ছেদনার্থ বঁটি। সাজি (সজ্জা শব্দজ) ছোট ডালা, ফুল বা তরকারি রাখিবার জন্য; "ফুলের সাজি", "বাজারের সাজি" চুপড়ী বিশেষ। সাতীব—কড়ি কাঠ। সামলান—লুকাইয়া রাখন। সামাতি—ঘরের চালে সামতি দেওয়া, তলা হইতে একজন মজুর কর্ত্তৃক চালের উপর উপবিষ্ট অন্য মজুরকে বন্ধন রজ্জু চাল ভেদ করিয়া প্রদান। সা-দরজা—সদর দ্বার বা সিংহদ্বার; সা-রাজা সুতরাং শ্রেষ্ঠদ্বার। সিদা—অতিথি সৎকার নিমিত্ত চাল, ডাল প্রভৃতি উপকরণ সমষ্টি। সোড়া মাছ—শীতকালের শুষ্ক মাছ। সিংটাল—হিংসা, "সিংহে বর্ণবিপর্য্যয়ঃ"। সুল্‌পি—সড়কি, বর্ষা।

হ

হ—হঁা। হল্লিয়া রে!—খেলায় বিজিতের প্রতি জেতার বিদ্রূপ অভিব্যক্তি, তুঃ বুড্‌ডুরে। হাউস—সাধ। হাস—হাসি। হাবোল—বাসাবাড়ী। হাড্ডি—হাড়। হাচুন—ঝাঁটা, বারুণ। হাবাইতা—লোভী, পেটুক, ছোঁচা। হেচি—হাচি। হোগলা—মাদুরবিশেষ, চেটাই।

শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়।

সাঁওতালী গান

হিন্দুজাতি ও সাঁওতাল-জাতি একই বঙ্গজননীর সন্তান। সাঁওতাল জাতি তাহাদের বুদ্ধিমান-হিন্দু ভাইদিগকে অতিশয় সম্মানের চক্ষে দেখে এবং উহাদিগকে আদর্শ করিয়া সতত আপনাদিগের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু হিন্দু-ভাইগণ তাহাদিগের এই অবোধ, অথচ সরল, নিরীহ ও সবল শ্রমপটু ভাইদিগের প্রতি একবার ফিরিয়া চাহিয়াও দেখেন না। কাজে কাজেই ইহাদিগকে মিশনরীগণের আশ্রয় লইতে হইতেছে। মানভূম সম্বন্ধে অনেক পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ আলোচনা হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি মহোদয়গণের মত পণ্ডিতবর্গ এই মানভূমের প্রত্নতত্ত্ব, পুরাতন রাজবংশ ও শিলালিপি প্রভৃতি লইয়া বিস্তর পরিশ্রম এবং গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু এই, মানভূমে সজীব অনার্য্যজাতিগণ রহিয়াছে; যাহাদের ভাষা, উপকথা, আচার-ব্যবহার ও গান বোধ হয় ভগ্ন শিলালিপি প্রভৃতি অপেক্ষা অতীতের রহস্য অধিকতর উদ্ঘাটিত করিতে সমর্থ। বঙ্গ-সাহিত্যে এই অনার্য্য-জাতিগণকে লইয়া বিশেষ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ইহারা চিরদিনই তাহাদের হিন্দু-ভ্রাতৃদিগের প্রতি মুখ চাহিয়া রহিয়াছে। কিন্তু হিন্দু-ভ্রাতৃগণ ইহাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাকাইয়া ইহাদের অবজ্ঞা-প্রদর্শন ব্যতীত সুখে দুঃখে কখনও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন এরূপ মনে হয় না।

সাঁওতাল জাতির গান তাহাদের জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ। ইহারা পরিশ্রমশীল, কর্ম্ম করিতে করিতে শ্রমভার লাঘবের জন্য গান করিয়া থাকে, বিশ্রামের সময় সঙ্গীত উপভোগ করাই ইহাদের একটি প্রধান আনন্দ। বিবাহ এবং উৎসবাদির সময় দলবদ্ধ হইয়া বাজনার সহিত নৃত্য করিয়া গান করাই ইহাদের প্রধান স্ফূর্ত্তি।

যদি ইহারা কোনও ঘটনা দেখে এবং যাহা ইহাদিগের নিকট আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় ইহারা তখন সেই বিষয়টি লইয়া গান বাঁধিতে চেষ্টা করে। নমুনা-স্বরূপ গান নীচে দেওয়া গেল। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, সাঁওতালী কথা অনেক স্থলে বাঙ্গালা ভাষায় ঠিক লেখা যায় না; কারণ সাঁওতালী কথার উচ্চারণ অনেক স্থলে বাঙ্গালা অর্থাৎ সংস্কৃত বর্ণমালায় প্রকাশ করা যায় না। মিশনরীগণ সাঁওতালীভাষা লিখিবার জন্য একরূপ ইংরাজী রোমান বর্ণমালা সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাতে কতকগুলি নূতন বর্ণও সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। যাহা হউক অধিকাংশ এই নূতন বর্ণমালার সাহায্য না লইয়াও সাঁওতালী উচ্চারণের ধাঁজ বাঙ্গালা অক্ষরে বুঝান যায়। তবে একটি অক্ষরের দরকার। এইটি পার্শী 'আয়েন' অক্ষরের স্বরূপ অর্থাৎ Guttural অ। এইটি আমরা লুপ্ত অকার দিয়া প্রকাশ করিব। যেমন পার্শী—'মালুম' এই কথাটির উচ্চারণ আমাদের কৃত বর্ণমালায় 'মহলুম' এইরূপভাবে প্রকাশিত হইবে।

নিম্নলিখিত সাঁওতালী গানটি বোধ হয় কোনও অতীত ঘটনার বর্ণনা।

চেতাঙ্গ দিসুম্‌রে ঝুরিকরা লতাঙ্গ দিসুম্‌তে ঝুরিকরা
কিন্ আড়্গই সড়ক সড়ক্‌তে।
তালি সাকামতে কিম পঢ়ক্সি উলি ডেরই তিকিম কলম
রাম রাম কিন পড়াহে।

অর্থ—পশ্চিমের দিক্ হ'তে এক জোড়া ছোকরা পূর্ব্বের দিকে চলে গেল রাস্তায় রাস্তায়। তালপাতের বই আমপাতার শিরের কলম রাম রাম ক'রে পড়ছে।

সাঁওতালী কবিগণের ভাষার কথার সংখ্যা অতি কম ছিল। সাঁওতালী জীবনের ঘটনায় বৈচিত্র্য তদধিক কম। কিন্তু বোধ হয় কতকগুলি গানে সাঁওতাল কবিগণ তাহাদের দৈনিক জীবনের সামান্য ঘটনা লইয়া গভীরতর ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

অত্‌লো সেরমাসিতুম, সিতুম কান্দে মনেওয়া—
সিতুম কান্দে মনেওয়া। হররিগি চাটানি
হররিগি বাড়ি উমুল উমুলান পে মানেওয়া—
উমুলান পে মানেওয়া।

অর্থ—জমীটি গরম, উপরে রৌদ্র রৌদ্র লাগছে রৌদ্র লাগছে।
রাস্তার পাথর আছে রাস্তায় বড় গাছের ছাওয়া আছে।
জুড়ায়ে লও মনুষ্যেরা, জুড়ায়ে লও মনুষ্যেরা।

এই সংসারে দুঃখ কষ্ট এবং পরিশ্রমের পর পরিণামে শান্তি আছে, পণ্ডিতগণ ও দার্শনিকবৃন্দ মনুষ্যগণকে ইহাই বুঝাইয়া শান্তি প্রদান করিতে চেষ্টা করেন। সাঁওতালগণও যখন দ্বিপ্রহর রৌদ্রে গরম পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া কাঠ কাটে, তখন এই গান লইয়া তাহাদের মনকে ঐরূপ প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে।

নীচের গানটি কোনও বিরহ কাতর সাঁওতাল যাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে তাহারই গান।

ওড়াং আরে মা ইঞ্চা আপা।
রাচা রেমা আতো হও।
ওকা রেবা মেদা ইঞ্চ যদা।
ইঞ্চ রেয়া দায়া বাড়ে সেনাতাম খান্।
রেঞ্চেঃ কইড় মেদা যদ্ মে।

অর্থ—ঘরেতে মা বাপ্।
আঙ্গনাতে তো গাঁয়ের লোক।
কোথায় চোখের জল আমি মুছে দি।
আমার জন্য দয়া তোমার আছে ত।
ঘুরে দেখে চোখের জল মুছে দে।

এই গ্রামে সরল প্রাণ সাঁওতাল তাহার মনকে প্রবোধ দিতেছে যে, যদিও তাহার স্ত্রী-বিরহ দুঃখে বুক ফাটিয়া আসিতেছে, তথাপি তাহার মা বাপ রহিয়াছে, গাঁয়ের লোক রহিয়াছে, যাহারা তাহার স্ত্রী অপেক্ষা কম অন্তরঙ্গ নহে। ইহারা যদি তাহাকে আপনার ভাবিয়া জল মুছাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার হৃদয়ের বেদনা লঘু হইয়া যাইবে। যদি ব্যক্তিগত দুঃখ কষ্ট ঘুচাইবার একটী প্রধান উপায় বিশ্বজনীন দুঃখ কষ্টে আপনাকে মিলাইয়া দেওয়া। সাঁওতাল তাহাদের সরল প্রাণে যে এই সত্যের উপলব্ধি করিয়াছে, তাহা আজকাল্‌কার সভ্য-জগতের অতি অল্প জীবই অনুভব করিতে পারে।

সাঁওতালী গানের কোন কোন স্থানে দুই এক লাইন খাঁটি বাঙ্গালা থাকে। নিম্নলিখিত গানটি উহার উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। এই গানটি ছেলে ঘুমপাড়ান গান।

চেত্তাঙ্‌ দিসম্‌ ক্ষণ হেয় একালা কয়লার যুগী
মাসে মাবাঙ কহ কয়দে ইমাই মে
কোলে আছে সোনের বঁধু কয়দে ইমাইমে।

অর্থ—উপর থেকে আসছে ভিক্ষুক যোগী
দিয়েদে বড় বধু ভিক্ষা দিয়ে দে
কোলে আছে সোনার খোকা ভিক্ষা দিয়ে দে।

আর একটী গান দেওয়া হইল। ইহার দুই লাইন সাঁওতালী এবং দুই লাইন বাঙ্গালা। যথা—

অত্‌মা লো লোকান্‌   ডাঞান লোহকান্‌।
সের্‌মা সেতুন কান্‌   হবমঞ লোহকান্‌।
মনে কর হে ছাতা ধর।   মুচীকে বল হে পায়ে জুতা।

অর্থ—জমী গরম আছে   পাদুটি জ্বলে্ছ আমার
উপরে রৌদ্র আছে   শরীরটি জ্বলছে
ছাতা ধরতে মন কর   মুচীকে পায়ের জুতা
তৈয়ারী করিতে বল।

নিম্নলিখিত গানটিতে সূর্য্য-গ্রহণ কেন হয় তাহা বুঝাইবার চেষ্টা আছে।—

মারাঙ্‌ বুরুয়ে দুসেৎ বেরইলে কানায়
হায়া লতার লতার তে
মানেওয়া হড়কো বেরইলে কানায়
মানাওয়া মায়া জালাতে
চাদবঙা জনম্‌ জনমে হইড়ি এনায়।

অর্থ—বড় পাহাড়ে দুসেৎ লোকেরা ছিল
মানুষ পাহাড়ের নীচের জমীতে ছিল

ছিল লোকেরা এক সঙ্গে ঘর করে
• ছিল পরস্পরের মায়ার বাঁধনে।
ভগবান্ সূর্য্য জন্মে জন্মে ঋণ শোধ করিতে পারিতেছেন না।

গানের মর্ম্মটি সাঁওতালদের এই বিশ্বাসটি জানিলে বুঝা যায়। সাঁওতালদের ধান এবং ধানের চাষ ছিল না। ভগবান্ সূর্য্য সাঁওতালদের মঙ্গলের জন্য দোসাৎ জাতির নিকট হইতে এক মুঠা ধান ধার করিয়া সাঁওতালদের প্রদান করেন। ভগবান্ সূর্য্যের এই ধার সুদে সুদে বাড়িয়া যাইতেছে, শোধ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সেই জন্য দোসাৎ জাতির কর্ত্তা কথনও কথনও সূর্য্যদেবকে ধারের জন্য পীড়ন করেন এবং তাঁহার তেজ কাড়িয়া লয়েন। সেই জন্য সূর্য্য-গ্রহণ হইল।

রামায়ণের ঘটনা লইয়া সাঁওতালদের অনেক গান প্রচলিত আছে। উদাহরণ স্বরূপ দুই একটি নীচে দেওয়া গেল।—

সীতা কারণতে লংকা গাড়
লএনো জরি জারা ওরে
ওঁনাতেড়ং তবোয়তেড়ং
হাঙুম্ চাদ লএ না রে

অর্থ—সীতার কারণে লঙ্কাগড় জ্ব'লে গিয়ে ছিল
ওই কারণে সেই কারণে হনুমানও জ্ব'লে গিয়েছিল।

আর একটি গান দেওয়া গেল। যথা—

উরিন বীরতে রামে লক্ষণকে বল এনা
কইকি ইস্পাত কাপাট অলকেদা
রামে লক্ষণ কি বনবাসিন

অর্থ—অরণ্য বনেতে রাম লক্ষ্মণ চলে গেল
কৈকেয়ী কপাটে লিখে মেরে রেখে ছিল
'রাম লক্ষ্মণের বনবাস'।

শ্রীসরসীলাল সরকার।

কালকেতুর চৌতিশা

(শ্রীচাঁদদাস রচিত)

ইহার দুইখানি প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে। এক খানার বয়স ৬৮, এবং অপরখানার ৫১ বৎসর। প্রথমোক্তটির লেখকের রামচন্দ্র কেরাণী; ইহার নিবাস—'কধুরখীল' গ্রামে। ইনি বহুতর বারমাস ও চৌতিশা সংগ্রহ ক রয়া গিয়াছেন। ২য় প্রতিলিপি লেখকের নিবাস—চট্টগ্রাম—'করণ-খাইন' গ্রামে। রচয়িতার কিন্তু কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় নাই। দুইখানি প্রতিলিপির মধ্যে অবশ্য পাঠ-পার্থক্য আছে। পাদ-টীকায় ২য় পুঁথি হইতে পাঠান্তর সন্নিবিষ্ট করিয়া দিলাম। অনাবশ্যক বোধে কেবল একটীমাত্র শব্দের বিভিন্নতা সর্ব্বত্র, প্রদর্শন করিলাম না। কিম্ভূত কিমাকার ধারণ করে বলিয়া অনুচিত হইলেও, অনেকস্থলে বর্ণাশুদ্ধি শোধন করিয়া দিয়াছি। বলা বাহুল্য, সমস্ত চৌতিশারই রচনা-পদ্ধতি অতি অদ্ভুত ও হাস্যকর। এই একটিতেই যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইতি। *

নমঃ গণেশায়।

কান্দে কালকেতু বীরে, কষ্ট পাইআ কলেবরে, কর্কশ বন্ধন কারাগারে।
কৃপা কর রাঙ্গা পদে, কঙ্কনের অপরাধে, (১) কলিঙ্গে কাটিবো কালি মোর ॥১
খলের নাহিক ভ্রম, খুদ্র রিপু নরাধম, খিছটিআ বন্দি কৈল মোরে। (২)
খাটে বসি মহারাজে, খলের পাঠিলা কাজে, খাপ দিআ বন্দি কৈল মোরে ॥২
গোধারূপে পন্থ যুড়ি, গড়াইআ আছিলেন গৌরী, জ্ঞান না ছিল মোর মনে।
গলে দিয়া গুণ কাসি, গাণ্ডিবে বান্ধিলুম আসি, গৃহে দিলাম গৃহিনীর স্থানে ॥
ঘরিণী ফুলরা রামা, ঘিরিআ ধরিল তোমা, ঘিছটিল কাটিতে তত্‌কাল্।
ঘরের সেবক জ্ঞানে, ঘাইট না লইলা মনে, ঘুচাইতে পশুর জঞ্জাল ॥৪
উগ্রচণ্ডা নারায়নী, উমে কালী কাত্যায়নী, উপজিলা গোধারূপ ধরি।
উপমা দিবারে নারি (৩) উলমত্ত বয়স ধরি, উপর্জিলা অম্বিকা সুন্দরী ॥
চাতুরি দেখিআ তোর, চপল চঞ্চল(৪) মোর, চুকাইআ কৈলা মোর ঠাই।
চাহিআ(৫) রহিলু গৃহে, চমকি উঠিল দেহে, চন্দ্রবদনী চণ্ডিকাই(৬) ॥৬

---

* ৮ম বর্ষের "পরিষৎ-পত্রিকায়" ৩য় সংখ্যায় মল্লিখিত 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' শীর্ষক প্রবন্ধে একথার এই চৌতিশার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গিয়াছিল। (১৩শ পুঁথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

(১) 'অপবাদে'—২য় পুথি। (২) 'খেজাইল নৃপতির তরে।—ঐ।

(৩) 'বলিতে'—২য় পুঃ। (৪) 'চরিত্র'--ঐ। (৫) চাহিতে চলিলুম গৃহে'—ঐ।

ছাড়িআ কৈলাশ দেশ, ছিন্ন ভিন্ন করি ভেস, ছোট ঘরে কৈলা অধিষ্ঠান।
ছলরে পাইলু ভএ, ছিদ্র পাইআ মহাশএ, ছল করি লইবো মোর প্রাণ॥৭
জানিআ জঞ্জাল বড়, যুগল করিআ কর, জিজ্ঞাসিলু জননী বোলিআ।
জগত জননী আই, যুক্তি কৈলা মোর ঠাই, জয় দুর্গা নাম হরজায়া॥৮
ঝটা কাজে নারায়ণি, ঝঙ্কারিআ বাম পাণি, ঝিলি মিলি করেতে কঙ্কন (৮)।
ঝাটে দিলা মোর তরে, ঝাটে লইলু ইন্দু শিরে (১০), ঝগড়া হইল তেকারণ॥৯
ঞিঅম-কারিনি মাএ, ঞিস্তারিতে রাঙ্গা পাএ, নৃপে যদি (১১) করে হুরাহুরি।

ঞিশ্চিন্তে আছিল আমি, ঞিবিঘ্নে পালিলা তুমি,
ঞিগর (নিগড়) বন্ধন কেনে মোরে(১২)॥১০

টামন দেশের লোক, টুকেক নাহিক শোক, টানিআ বান্ধিল হাত পাও।
টল মল করে প্রাণ, টুটিল সকল জ্ঞান, টল মল (১৩) করে সর্ব্ব গাও॥১১
ঠাঠ দেখি চতুর্ ভিত, ঠেলা দিলে (১৪) অনুচিত, ঠাকুরাণি সঙ্কটনাশিনি।
ঠেকিআ বিপক্ষগণ, ঠারাঠারি অনুক্ষণ, ঠগে করে উপহাস্য বাণী॥১২
ডম্বুরুধারিণি গৌরি, ডাঙ্গ ডাবুস ধরি, ডর হোতে কর পরিত্রাণ।
ডানে বামে দিআ হানা (১৬), ডগমগ করে সেনা, ডলিআ সবের লএ প্রাণ॥১৩
ঢঙ্গ মতি নৃপদলে, ঢাক শক্তি তোরআনে, ঢাকি রহিছে কারাগারে।
ঢোল করে নিশিপতি, ঢাক ঢোল বাহে অতি, ঢেসা দিআ বলি দিবো মোরে॥১৪
আন নাহি আন মতি, আন জনে করে ক্ষিতি (১৭) আন জনে কেনে কর মান(১৮)
আনহ খাবর অসি, আনন্দ বিস্তার বসি, আনন্দে রুধির কর পান॥১৫
তুমি ব্রহ্মা হরিহর, তুমি স্বর্গ ধরাধর, (১৯) তব পদ ভাবে তিন লোকে।
তরাইতে পশুগণ, তোমার হইল মন, তুষ্ট হৈআ বর দিলা মোকে॥১৬
থর্যাদা করিআ ঘটে, (২০) স্থিতি কৈলুম গুজরাটে, স্থানান্তর হোতে আনি প্রজা।
স্থাবর কাটিলু হেলে, স্থিতি কৈলু সর্ব্ব বলে, থানা দিআ মুক্তি হৈলুম রাজা॥১৭
দোলা ঘোড়া করি বর, দিলা দেবি বহুতর, দোহাই মান এ সর্ব্বলোকে!
দুন্দুভি বাজনা বাজে, দশ দিগে পাইকে সাজে, দুঃখহীন নাহি রোগ শোক॥১৮
ধরাই ধবল ছত্র, ধীর মুখে শুনি শাস্ত্র, ধর্ম্ম প্রশংসা ব্রতকথা।
ধনের নাহিক ক্লেশ, ধার্ম্মিক সকল দেশ, ধর্ম্মপুত্র সম প্রজা দাতা॥১৯

---

(৬) 'চণ্ডী আই'—ঐ। (৭) 'ছলের নাহিক ভয়'—ঐ। (৮) 'রতন'—২য় পুঃ।
(৯) 'করে'—ঐ। (১০) 'ঝটকি লইলুম শিরে'—(১১) 'কেনে'—ঐ (১৫) 'ঠমকে—২য় পুঃ।
(১৬) 'থানা'—ঐ (১৭) 'আনের না লইছি খিতি'—ঐ (১৮) 'আনে কেনে করে অপমান—ঐ
(১৯) 'ভুজা'—ঐ। (২০) 'থৈর্য্য (স্থৈর্য্য?) করিলুম ঘটে'—২য় পুঃ।

নিত্যকি এ নিতা করে, নগরে পতাকা উড়ে, নআনে দেখিতে সুললিত।
নাহি মোর কোন ভএ, নিত্তি থাকি নিজালএ, নাম মোর নারায়ণীর সুত॥
পরম কতুক রঙ্গে, পুত্র তুল্য প্রজা সঙ্গে, পঙ্কজচরণে মাত্র আশ।
পতিতপাবনী তুমি, পতিত পাতকী আমি, পলকে করিলা সর্ব্বনাশ॥২১
ফান্দে বন্দি কৈলা মোরে, ফুকরিআ ডাকম্ তোরে, ফিরিআ বারেক কর দৃষ্টি।
ফনীরূপে ধর থিতি, ফুট বাসে (ভাষে ?) করম স্তুতি, ফল দেঅ দূর কর রিষ্ট[২১]॥২২
বহিআ শর্ব্বরী জাএ, বেদনা না সএ (সয়) গাএ; বন্ধনে ঢালিআ দেঅ পানি।
বিঘ্ন হৈবে রাঙ্গা পাএ, বন্ধনে প্রাণি জাএ, বেদে বোলে বিপদনাশিনী॥২৩
ভবানী ভাবিআ[২২] গৌরি, ভদ্রকালী মাহেশ্বরি, ভবের বনিতা সর্ব্বজয়া[২৩]।
ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধরি, ভস্ম কর জথ ঐরি (অরি), ভয় হেতু ভাবম্ অভয়া॥২৪
মৈষাসুর আদি করি, মহাকালী রূপ ধরি[২৪], মোরে রক্ষা (রক্ষ ?) মঙ্গলচণ্ডিকা।
মহিমা অনন্ত গুণে, মোরে দয়া নাহি কেনে, মাহেশ্বরি[২৫] রুদ্রাণি অম্বিকা॥২৫
যঅন্তি বিজয়া জয়া, যগতের মহামায়া, যানিআ ধরিছম্ তুআ পাএ।
যোড় হস্তে বোলম্ তোরে, যশ দেও সেবকেরে, যন্ত্রণা দিবারে না যুআএ[২৬]॥২৬
রক্তবীর্য্য সংহারিলা, রুধির সকল 'পলা', রণ মধ্যে রাখিলা খেআতি।
রোপনা করিআ চণ্ডী, রক্ষা কৈলা বিরগতি, রাঙ্গা পাদ কর[২৭] অভ্যাঅতি॥২৭
লম্পটে পাইল রাজ,[২৮] লইল সকল কাজ,[২৯] লণ্ড ভণ্ড কৈল প্রজাগণ।
লাঘব হইছে[৩০] অতি, লক্ষ্মীমাতা সরস্বতী, লীলাএ মোরে করহ মোচন॥২৮
বারাহিণি বৈষ্ণবানি, বজ্রদণ্ড সনাতনি, বজ্র হস্ত দিআ রাখ মোরে।
বিমানে করিআ ভর, বিপক্ষ বিনাশ কর, বিপত্তিতে ডাকম্ তোমারে[৩১]॥২৯
শাবিত্রী গায়ত্রী মেধা, শক্তিরূপা স্বাহা স্বধা, শক্তি হস্তে অসুরঘাতিনি।
শঙ্খ চক্র গদা লৈআ, সর্ব্ব শত্রু সংহারিআ, সেবকেরে রক্ষ সনাতনি॥৩০
ষক্র সান সুরগণে, ষেবা করে এক মনে, ষঙ্কর-ঘরিণি দশভুজা।
ষঙ্কটমোচন জানি, ষানন্দিত হৈআ পুনি, ষহস্র-লোচনে করে পূজা॥৩২
সিবানি সারদা ষষ্টি, সকল তোমার সৃষ্টি, স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ভুবন।
সুম্ভ নিশুম্ভ বলি, সংহারিলা শিব শূলি, সারঙ্গে পূজিল দেবগণ॥৩২

---

(২১) 'ফল দেঅ দূর হউক রিষ্টি'—২য় পুঃ।
(২২) 'ভবানী'—২য় পুঃ। (২৩) 'হরজায়া'—ঐ।
(২৪) মহিষাসুরমর্দ্দিণী। মহাকালী কাত্যায়নী—ঐ।
(২৫) 'মোরে রক্ষা (রক্ষ)'—ঐ। 'যুগাএ'—ঐ। (২৬) 'মাগম্'—ঐ।
(২৭) 'কার্য্য'—২য় পু (২৮) 'লুটিলা সকল রাজ'—ঐ (২৯) 'করিলা'—ঐ।
(৩০) 'বিপত্তি ডাকম তোরে'—ঐ। (৩১) 'হহুকারে দিআ হানা'—২য় পুঃ।

হস্ত জোড়ে করম্ স্তুতি, হরিষ হইআ মতি, হিত কর হরের ঘরিনি।
হুহুঙ্কার মারি হানা;৩১ হত কর নৃপ সেনা, হিমগিরি রাজার নন্দিনি ॥৩৩
ক্ষেমঙ্করি থর্গধরি, ৩২ ক্ষয় কৈলা ৩৩ জথ অরি, ক্ষেম দোষ অভয়া পার্ব্বতি।
ক্ষেণে ক্ষেণে প্রণামিআ, ক্ষিতিতলে লোটাইআ, শ্রীচান্দ দাসের কাকুতি ॥৩৪

"ইতি কালকেতুর চৌতিশা সমাপ্তং। ১১৯৭ মঘি।"*

শ্রীআবদুল করিম।

(৩২) 'রূপ ধরি'—ঐ। (৩৩) 'কর'—ঐ।

* ইতি কালকেতুর চৌতিসা লিক্ষতে সোণএ অএরসে চ
মাআদিষ্টঃ মামা চ লেখীতং তবা অদি যুদ্ধমযুদ্ধং
তার এত, সাধু পণ্ডিত, কৃষ্ণ কৃষ্ণতি কৃষ্ণেতি জো মাং
স্বরতি নিত্য অনং ভিন্না জথা * * ইতি কাল-
কেতুর চৌতিসা সামপত্ত স্বেঅক্ষর শ্রীউমাচরণ গোহ দাস দার্থ।" ২য় পুথি। ইহা সন ১২১৪ মঘির লেখা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনের

কার্য্য-বিবরণী

১৩১৬

প্রথম মাসিক অধিবেশন

স্থান—পরিষৎ-মন্দির।

সময়—২৩শে জ্যৈষ্ঠ (১৩১৬), ৬ই জুন (১৯০৯), রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম এ, বিএল্ (সভাপতি):

আলোচ্য বিষয়—(১) গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। (২) পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। (৩) সভ্য-নির্ব্বাচন (৪) প্রবন্ধ—(ক) মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ বিএল্ সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত "বন্দিপুরের শ্যামরায়" নামক প্রবন্ধ ও (খ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত "লক্ষ্মণ সেন ও বখ্‌তিয়ারের বাঙ্গালা জয়" নামক প্রবন্ধ। (৫) প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় কর্ত্তৃক মুসলমানের বাঙ্গালা জয় সম্বন্ধে নবাবিষ্কৃত খোদিতলিপির প্রতিলিপি। ৬। বিবিধ।

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি এল্ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত	রায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর	শ্রীযুক্ত	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন
,,	উমেশনারায়ণ চৌধুরী	,,	মন্মথমোহন বসু বিএ
,,	দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী	,,	বনওয়ারীলাল চৌধুরী বি এস সি
,,	ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র	ডাঃ ,,	পশুপতিনাথ ঘোষ।
,,	সতীশচন্দ্র সরকার	,,	রামকমল সিংহ
,,	সতীন্দ্রসেবক নন্দী	,,	ইন্দুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
,,	গৌরহরি সেন	,,	বিনোদবিহারী গুপ্ত
,,	কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	,,	অমৃতগোপাল বসু

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" অমৃতলাল শীল এম্,এ
" শরৎচন্দ্র দত্ত
নরেন্দ্রকুমার বসু বি,এল,

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রকুমার বসু
" বাণীনাথ নন্দী
" যতীশচন্দ্র সমাজপতি

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ সম্পাদক
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় }

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে পর কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল,—

উপহারদাতা	উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকাদি
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল	(১) সাহিত্য-রত্ন (নরেশচন্দ্র মজুমদারপ্রণীত)
"	(২) নববিধান কি ? (৺কৃষ্ণবিহারী সেন)
গিরীশচন্দ্র দত্ত বি এ	(৩) আর্য্য-নীতি-বিজ্ঞান (স্বরচিত)
প্রমথনাথ তর্কভূষণ	(৪) মায়াবাদ "
কেদারনাথ মজুমদার	(৫) ময়মনসিংহের ইতিহাস "
	(৬) সারস্বতকুঞ্জ
কুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি এ	(৭) সিন্ধুগৌরব
রায় লক্ষ্মীনারায়ণ আচ্য	(৮) ভাতু
" বিশ্বনিন্দুক রায় ওরফে বি, এন, রায়	(৯) হিন্দুবিজ্ঞান সূত্র
" সার রোপার লেথব্রিজ, কে,সি,আই,ই	(১০) India & Imperial Preference
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সম্পাদক	(১১) ১৩১৪ সালের প্রথম সম্মিলনের সম্পূর্ণ কার্য্যবিবরণ
" ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর সম্পাদক	(১২) Catalogue of Books Pt II.
" দীননাথ সান্যাল এম, বি,	(১৩) কুমারসম্ভবকাব্য (স্বরচিত ভাবানুবাদ)

অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, ঢাকুরিয়া, ২৪ পরগণা।
শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়		শ্রীদুর্গাচরণ ভট্ট এম,এ, ৫৮।১ হ্যারিসন রোড।
শ্রীমহেন্দ্রলাল মিত্র		শ্রীঅমূল্যকুমার বসু Servants of India Society, Poona.

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি,এ ১৬ হরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট।
,,	,,	শ্রীনিরঞ্জন পাকড়াশী এম্,এ
,,	,,	শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় এম,এ
শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীজগন্নাথ রায় ম্যানেজার ইম্পীরিয়াল মেডিক্যাল হল গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর।
,,	,,	শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায় ইম্পীরিয়াল মেডিক্যাল হল, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর।
,,	,,	শ্রীতারাপদ রায় Watch & Clock-maker, গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর।
,,	,,	শ্রীবেচারাম লাহিড়ী বি, এল, উকিল কৃষ্ণনগর।
,,	,,	শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি,এল,
,,	,,	শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এমএ, বি,এল উকীল, কৃষ্ণনগর।
,,	,,	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এল,
,,	,,	শ্রীনরেন্দ্রলাল রায়, শিক্ষক, এ, ভি, স্কুল কৃষ্ণনগর।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীকৃষ্ণগোপাল ঘোষ বি,এল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বহরমপুর।
,,	,,	শ্রীকাঙ্গালীচরণ চৌধুরী বি, এল, উকিল, কাটোয়া।
,,	,,	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি,এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট গিরিডী।
,,	,,	শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি, এ, সব-ডেপুটী নড়াইল।
,,	,,	শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ রায় মায়ের কুটীর, কান্দী।
,,	,,	শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার ৫৬।১।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীগোপীনাথ নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত ৫০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত ১২০।২ মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় স্বলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। এই সূত্রে সভাপতি মহাশয় একখানি ২৫০।৩০০ শত বৎসরের প্রাচীন পুঁথি প্রদর্শন করিলেন,—এবং বলিলেন, ইহার নাম অনিল পুরাণ। ইহাও ধর্ম্মের গান এবং রমাই-পণ্ডিতের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। রচনা হইতে শূন্যপুরাণপ্রণেতা রমাই পণ্ডিত ও এই রমাই পণ্ডিত এক ব্যক্তি বলিয়া মনে হয় না, তবে ইহার অনেক স্থলের সহিত শূন্যপুরাণের বিষয়গত মিল আছে। ঘনরাম বা মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলের উপাখ্যান ইহাতে নাই। শূন্যপুরাণ অপেক্ষা হিন্দুপুরাণের প্রস্তাব ইহার মধ্যে বেশী মিশ্রিত। ইহার রচনাকাল এখনও নির্নীত হয় নাই। তৎপরে তিনি জানাইলেন। যদি পরিষৎ এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তিনি ইহার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন।

তৎপরে রাখাল বাবু তাঁহার প্রবন্ধের সার সঙ্কলন করিয়া শুনাইলেন। তিনি নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন ও শিলালিপির সাহায্যে প্রমাণ করিলেন যে মুসলমানের বাঙ্গালা জয়ের কাল প্রচলিত কালের অনেক পরে, তখন লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যু হইয়াছে সুতরাং লক্ষ্মণ সেনের আহারকালে উড়িষ্যায় পলায়নের প্রবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। বখ্‌তিয়ার নবদ্বীপ বা নদীয়ায় আসেন নাই। সে স্থানের নাম নওদিয়ার বা নূতন দেশ। প্রথম সংস্করণের ষ্টুয়ার্টের ইতিহাসে তাহাই আছে। মহম্মদ ঘোরী দিল্লীপতি পৃথ্বীরাজকে জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু কনোজের জয়চন্দ্রকে জয় করিতে পারেন নাই বা জয়চন্দ্র বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই। জয়চন্দ্রের পর তাঁহার পুত্র হরিশ্চন্দ্র সাত বৎসরকাল স্বাধীন রাজা ছিলেন। তাঁহার দানপত্র পাওয়া গিয়াছে। বিশ্বকোষে কেশব সেনের তাম্রশাসনকে বিশ্বরূপ-সেনের তাম্রশাসন বলিয়া উল্লেখ করা ভুল হইয়াছে। লক্ষ্মণ সেনের পর কেশব সেন, বিশ্বরূপ সেন, মাধব সেন প্রভৃতি বাঙ্গালার বিভিন্ন অংশে স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন।—এই সকল ভ্রম একমাত্র মিনাহাজের তবকতি নাসিরির বর্ণনা উপলক্ষে চলিয়া আসিতেছে। পারসিক ঐতিহাসিকগণের আর কেহ ঐ সকল ঘটনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না লেখায় ঐ ভুল এতাবৎকাল অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। আপাততঃ এই সকল খোদিতলিপির আবিষ্কারে ঐ ভুল ধরা পড়িয়াছে। এখন তবকতি নাসিরির ঐ অংশটা ফেলিয়া দিবার যোগ্য হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি তাঁহার কথার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নলিখিত প্রামাণ্য সকলের উল্লেখ করেন,—বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত খসদেশের অধিপতি অশোক চল্লদেবের বুদ্ধপ্রতিমাপ্রতিষ্ঠাবিষয়ক খোদিত লিপি। লক্ষ্মণ সেনদেবের অতীত রাজ্যাঙ্ক ৫১ অব্দে অর্থাৎ ১১৭০ খৃষ্টাব্দে এই লিপি উৎকীর্ণ। ইহা দ্বারা

প্রমাণিত হইতেছে যে লক্ষণ সেন ১১৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে স্বর্গগত হইয়াছিলেন। সুতরাং বখ্‌তিয়ারের বাঙ্গালা জয়কালে তাঁহার বর্ত্তমান থাকা একান্ত অসম্ভব। উক্ত তাম্রফলক অশোক চল্লদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমারপাদ (যুবরাজ) দশরথের ভাণ্ডাগারিক (ধনাধ্যক্ষ) সহন পালের বুদ্ধপ্রতিমা প্রতিষ্ঠার খোদিতলিপি। ইহাও লক্ষ্মণ সেনের অতীত রাজ্যাঙ্ক ৭৪ অব্দে বৃহস্পতি ১২ বৈশাখ তারিখে খোদিত, ইহা ইংরাজী ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে ১৭ই মে। সুতরাং ইহা দ্বারাও পূর্ব্বকথা সমর্থিত হইতেছে। এই খোদিতলিপিতে লক্ষ্মণ সংবতের একটি মাস বার ও তারিখযুক্ত পূর্ণ রোজের হিসাব পাওয়ায় স্থির হইয়াছে যে ১১১৯ খৃষ্টাব্দের অক্‌টোবর নভেম্বর মাসে (কার্ত্তিক মাসে) লক্ষ্মণ সংবতের সূচনা হইয়াছিল, ইহা অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হইয়াছে। গয়ার পাদপদ্ম মন্দিরের নিকটে প্রাপ্ত বৌদ্ধ প্রতিমার গাত্রস্থ খোদিতলিপি হইতে প্রমাণ হইয়াছে যে গোবিন্দ পাল ১১৬১ খৃষ্টাব্দে নালন্দের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেনরাজগণের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না। তিনি ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে গয়া অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু অতি অল্পকাল পরেই উক্ত স্থান হইতে তাড়িত হন। উক্ত খোদিতলিপিতে এই ঘটনার তারিখ ১২৩২ বিক্রম সংবৎ উল্লিখিত আছে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে কানুপাদাচার্য্য রচিত পঞ্চকার নামক মহাযানীয় বৌদ্ধগ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে, গোবিন্দপাল দেবের রাজত্ব তাঁহার ৩৮ রাজ্যাঙ্কে (১১১৯ খৃষ্টাব্দে) বিনষ্ট হয়, সুতরাং বখ্‌তিয়ারের বঙ্গজয় ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে হওয়া অসম্ভব, এমন কি তাহা ১১৯৯ খৃষ্টাব্দেরও পরের ঘটনা। এই গোবিন্দপালের রাজ্যনাশ সম্ভবতঃ বখ্‌তিয়ারের দ্বারা হইয়াছিল। কান্যকুব্জের প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রকূটবংশীয় মহারাজ জয়চন্দ্র ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে হত হইলেও ঐ সময়ে কনোজের রাষ্ট্রকূট রাজ্য ধ্বংস হয় নাই। ১২৫৭ বিক্রম সংবৎসরে (১২০০ খৃষ্টাব্দে) উক্ত জয়চন্দ্রের পুত্র মহারাজ হরিশ্চন্দ্র কনোজে রাজত্ব করিতেছিলেন। গত বৎসর জৌনপুর নগরের নিকটে দুর্ভিক্ষ জন্য রিলিফের কার্য্যে নিযুক্ত মজুরেরা ক্ষেত্র খননকালে এই হরিশ্চন্দ্রের একখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হয়। এই তাম্রশাসনখানি জাল নহে, কারণ মহারাজ জয়চন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের জন্মদিনে জাতকর্ম্ম উপলক্ষে কুলপুরোহিতকে যে দুইখানা গ্রাম দান করেন, সেই দানপত্রের তাম্রশাসন দুইখানি এখনও লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে আছে। উহাতে কুমার হরিশ্চন্দ্রের নাম আছে। যোধপুরের চারণ মুকজীর কুলগাথায় রাষ্ট্রকূটবংশে মহারাজ জয়চন্দ্রের পর মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে যে সংযুক্তা-স্বয়ম্বরের প্রতিশোধ লইবার জন্য জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে মুসলমানের সহিত মিলিত হইয়া দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই বা স্বরাজ্য ভ্রষ্ট হন নাই। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ৭ বৎসর কাল কান্যকুব্জের সিংহাসনে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনিই অবশেষে মুসলমান কর্ত্তৃক উপদ্রুত হওয়ায় কান্যকুব্জ ছাড়িয়া যোধপুরের মরুভূমিতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন পূর্ব্বোক্ত চারণের

ইতিহাস হইতে এই বিবরণ জানা যায়। তৎপরে তিনি বলেন, খোদিতলিপির প্রমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অকাট্য। উহাতে ভ্রমের আশঙ্কা নাই, ভুলের সম্ভাবনা নাই। লিখিত গ্রন্থ রচনার সময় হইতে একাল পর্য্যন্ত কত শতবার অনুলিপি হয় তাহার সংখ্যা কে করে। প্রাচীন যে কোন গ্রন্থের দুই খানি পাইলেই পাঠান্তর দেখা যায়। লিপিকর প্রমাদ, লিপিকরের দেশ ভেদে, ভাষার ভেদে, বিদ্যার পরিমাণ অনুসারে আসল পুস্তকের বিবরণের পরিবর্ত্তন ইত্যাদি হাতের লেখা গ্রন্থে এড়াইবার উপায় নাই। এরূপ স্থলে সাহিত্যিক প্রমাণকে খুব দৃঢ়রূপে অভ্রান্ত প্রমাণরূপে সর্ব্বত্র উপস্থিত করা নিরাপদ নহে। ঐতিহাসিক তত্ত্বের প্রমাণার্থে খোদিতলিপি ও মুদ্রালিপিই সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ।—কথা প্রসঙ্গে তিনি সভাপতি মহাশয়ের প্রদর্শিত অনিলপুরাণ সম্বন্ধে বলেন—সভাপতি মহাশয় এই গ্রন্থখানিকে প্রাচীন রমাই পণ্ডিতের রচিত নহে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, কিন্তু যদি স্বীকার করা যায় যে উহা সেই রমাই পণ্ডিতেরই লিখিত, তবে গ্রন্থের আসলরূপ আর এখন বর্ত্তমান নাই। হাজার বৎসর ধরিয়া যে গ্রন্থের লিপি প্রতিলিপি হইয়া আসিতেছে, তাহার আসল রূপ বর্ত্তমান থাকা দুষ্কর। তবে এ সম্বন্ধে পুঁথিখানি আলোচনা না করিলে ঠিক বলা যাইবে না। তৎপরে তিনি ৭ খানি লিপির প্রতিলিপি প্রদর্শন করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন—রাখালবাবু আজ বাঙ্গালার ইতিহাসের যে অংশের আলোচনা করিলেন, উহা বড়ই জটিল। ঐ অংশের প্রকৃত বিবরণ পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। তিনি আজ যে সকল নূতন তথ্যের কথা শুনাইলেন, ইহার বিশেষরূপ আলোচনায় তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতার এবং প্রশংসার পাত্র।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সহ-সম্পাদক। সভাপতি।

কার্য্য-বিবরণী

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন।

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—৬ই আষাঢ়, ২০শে জুন রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্, এ, বি, এল্।

আলোচ্যবিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সভ্যনির্ব্বাচন।

৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

৪। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ মহাশয় কর্ত্তৃক "পঞ্চবটী ভ্রমণ নামক প্রবন্ধ পাঠ। ৫। বিবিধ।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্, এ, বি, এল

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্,এ, বি, এল্
" পান্নালাল সিংহ (জিয়াগঞ্জ)
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ
" রাজকুমার বেদতীর্থ
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি,এ
" কুঞ্জবিহারী সেন
" আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই (রঙ্গপুর)
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্, এ
" যতীশচন্দ্র সমাজপতি
" মন্মথমোহন বসু বি,এ
" হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।
" নিত্যানন্দ রায়
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ
" নিশিকান্ত সেন
" বাণীনাথ নন্দী
" সুরেশচন্দ্র সরকার
" সুশীলগোপাল বসু

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী
পশুপতিনাথ ঘোষ
অমৃতগোপাল বসু
যোগেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ
বিনোদেশ্বর দাস গুপ্ত বি, এ
তারকনাথ বিশ্বাস
নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
পূর্ণচন্দ্র দত্ত
হরিচরণ দত্ত
ত্রৈলোক্যনাথ দাস মিত্র
করুণাচন্দ্র মজুমদার
উপেন্দ্রনাথ দে
অখিলকৃষ্ণ শীল
রামকমল সিংহ
বিনোদবিহারী গুপ্ত
ইত্যাদি

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় } সহঃ সম্পাদক

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধি-বেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। ২। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর, বর্দ্ধমান।
„	„	শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্, এ বি,এল্, বর্দ্ধমান।
„	„	শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বি, এল্, বর্দ্ধমান।
„	„	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু বি, এল্ বর্দ্ধমান।
„	„	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্ বর্দ্ধমান।
„	„	শ্রীযুক্ত শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি,এল্ বর্দ্ধমান।
„	„	শ্রীযুক্ত উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, রাজকলেজের অধ্যক্ষ, বর্দ্ধমান।
„	„	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন বসু বি,এ Asst. Hd. Master Municipal School, Burdwan.
„	„	শ্রীযুক্ত রাজবল্লভ মুখোপাধ্যায় বি,এল্ Pleader, Rahillapara, Burdwan.
„	„	শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল হামিদ গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল মিত্র	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় Servants of India Society, Poona City.
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র বিশ্বাস বি,সি,ই ৩৬।১ হ্যারিসন রোড।
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২১।১ ঝামাপুকুরলেন।

৩। অতঃপর নিম্নোক্ত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল,—

১। শ্রীযুক্ত ডাক্তার পশুপতিনাথ ঘোষ ১৪। ব্যবসায়ী (১৩১২) শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

১৫। শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত।

১৬। The Society's Registration Act. (1860. Act 1 of 1860)

২। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৭। সার্ব্বজনীন উপাসনা ও সাম্যবাদ—শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী প্রণীত।

৪। অতঃপর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়, তাঁহার "পঞ্চবটীভ্রমণ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধের প্রথমে পঞ্চানন বাবু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে তাঁহার অবস্থিতিকেন্দ্র বোম্বাই হইতে ১১৭ মাইল দূরবর্ত্তী নাসিক পর্য্যন্ত রেলপথের উভয় পার্শ্বস্থ সমুদ্র ও পার্ব্বত্য প্রদেশ-সুলভ বিচিত্র নৈসর্গিকচিত্র এবং সহ্যাদ্রি, ও পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতের থলঘাট নামক গিরিসঙ্কটের মধ্যবর্ত্তী রেলপথ, পর্ব্বত-মধ্যবর্ত্তী সুড়ঙ্গ এবং "ভায়াডাকট্" প্রভৃতি নির্ম্মাণে মানুষী প্রতিভার আশ্চর্য্য নিদর্শন সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন। রেলগাড়ী সমুদ্রতলবর্ত্তী বোম্বাই হইতে ২০০০ ফিট উচ্চ সহ্যাদ্রি পর্ব্বতে আরোহণ করিতে যে সকল সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ এবং ভায়াডাকট্ বা উপত্যকাসেতু অতিক্রম করিয়াছিল, পঞ্চানন বাবুর উজ্জ্বল বর্ণনায় সে গুলির বিস্ময়কর সৌন্দর্য্য বেশ অনুভূত হইয়াছিল। তৎপরে তিনি দণ্ডকারণ্য অর্থাৎ সত্যযুগের পদ্মপুর, ত্রেতাযুগের জনস্থান এবং কলির নাসিকের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিয়া ভ্রমণ বৃত্তান্তের অবতারণা করেন। এই ইতিহাস হইতে জানা যায় যে ভোজবংশীয় নরপতি দণ্ডকের বিশাল সাম্রাজ্য ভার্গব শুক্রাচার্য্যের শাপে দণ্ডকারণ্যে পরিণত হয়, এবং তাহাই পরে পঞ্চবটীতীর্থরূপে পরিগণিত হয়। বর্ত্তমানকালে গোদাবরী তীরবর্ত্তী এই পঞ্চবটীর যাবতীয় দর্শনীয় রমণীয় স্থান, মন্দির, দেবায়তন, তপোবন প্রভৃতির বর্ণনা করিয়া পঞ্চানন বাবু পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণের অর্থাৎ বাল্মীকি, ভর্ত্তৃহরি, কালিদাস, ভবভূতি, কৃত্তিবাস, মধুস্থদন প্রভৃতি সকলেরই উজ্জ্বল বর্ণনার সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বিষয়ের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য বিবৃত করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি নাসিকের বর্ত্তমান কালের জল বায়ু, উৎপন্ন সামগ্রী, অধিবাসীর আচার ব্যবহার, তপোবনের দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও যবক্ষেত্র এবং তথাকার মৃগযূথ প্রভৃতির সুন্দর বিবরণ শুনাইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি পঞ্চবটীর তপোবন হইতে ত্র্যম্বকেশ্বর পর্য্যন্ত উডুম্বর বৃক্ষমূলে গৌতমী গঙ্গা বা গোদাবরীর উৎপত্তিস্থানের রমণীয় দৃশ্য ও গঙ্গাপুর নামক স্থানের দেবালয় এবং নিকটবর্ত্তী জলপ্রপাতের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করেন। তৎপরে রামলীলার এই প্রধান লীলাক্ষেত্রের সকল কথার যথাযথ বর্ণনা করিয়া পঞ্চানন বাবু প্রবন্ধ শেষ করেন।

অতঃপর হীরেন্দ্র বাবু প্রবন্ধলেখকের বর্ণনা-কৌশলের, পর্য্যবেক্ষণের এবং সুন্দর ভাষার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, পঞ্চাননবাবু আজ সকলকে সুন্দর তৃপ্তি প্রদান করিয়াছেন। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধ শুনিয়া ঐ সকল স্থান পরিদর্শনের কৌতূহল উদ্দীপিত হইয়াছে। পঞ্চানন বাবু আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি
২৮শে আষাঢ় ২১ই জুলাই রবিবার।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

সময়—২৭ শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্, এ, বি, এল্।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ-পাঠ। ২। পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ—ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় কর্তৃক "প্রাকৃত ব্যাকরণ ও অভিধান" নামক প্রবন্ধ পাঠ। ৫। বিবিধ।

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম, এ, বি, এল্ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্, কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায়
" ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুর
" অম্বিকাচরণ রায় এম্, এ, বি, এল্
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" মন্মথমোহন বসু
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি,এ
" আনন্দমোহন সাহা
" রসিকরঞ্জন সিদ্ধান্তভূষণ
" মধুসূদন সেনগুপ্ত
" তারকনাথ বিশ্বাস
" সতীশচন্দ্র চৌধুরী
" অমৃতগোপাল বসু
" উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন
" সতীন্দ্রসেবক নন্দী
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" বাণীনাথ নন্দী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি, এ, কবিরাজ
" পশুপতিনাথ ঘোষ ডাক্তার
" হরিদাস চট্টোপাধ্যায় "
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ (সম্পাদক)
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্, এ,
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
} সহঃ সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী
" শ্যামাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত
" রামকমল সিংহ
" বিনোদবিহারী গুপ্ত

১। সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্, এ, বি, এল্, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

১। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গোস্বামী ৩৪ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	"	" যোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত Block C. Room no 16, Simla.
"	"	" কেশবচন্দ্র রায় সিমলা
"	"	" প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, সিমলা।
শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার ২৫ নং হোগলকুঁড়ে গলি।
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস,	শ্রীহেমচন্দ্রদাস গুপ্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেব এম্ এ, কর্ণেলগঞ্জ, এলাহাবাদ
শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীপূর্ণচন্দ্র গোস্বামী	শ্রীহেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ কলিকাতা।
	"	শ্রীভবানীনাথ রায় চিথলিয়া, মীরপুর, নদীয়া।
	"	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় চিথলিয়া, মীরপুর, নদীয়া।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীপূর্ণচন্দ্র মল্লিক শ্রীনগর, কাশ্মীর
„	„	শ্রীচুনিলাল রায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনগর, কাশ্মীর)
„	„	শ্রীঋষিবর মুখোপাধ্যায় জজ, শ্রীনগর, কাশ্মীর।
„	„	শ্রীআশুতোষ মিত্র ডাক্তার, শ্রীনগর, কাশ্মীর।
„	„	শ্রীনলিনাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় Supdt, State Engineers' office, Srinagore,
„	„	শ্রীহরিপ্রসাদ মজুমদার State Engineers' office, Srinagore, Kashmir,
„	„	শ্রীউপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু Prof Prince College Jammu, Kashmir;
„	„	শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় Prof Prince College, Jammu, Kashmir,
„	„	শ্রীতারকনাথ সান্যাল Prof Prince College Jammu, Kashmir,
„	„	শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত Electric Engineer Kashmir
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত বি, এল, ধানবাদ।
শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীগিরিজাভূষণ হালদার ৬৬নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
„	„	শ্রীফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২৮ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
„	„	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পণ্ডিত ১নং মদন ঘোষের লেন, কলিকাতা।
„	„	শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি,এল্, ১৩নং ভীম ঘোষের লেন।
শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীতারণকুমার মজুমদার ৬৩।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীআনন্দমোহন সাহা	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহরিচরণ শাস্ত্রী ২৩।২ রাজা রাজেন্দ্রমল্লিকের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	জে, কে, দাসগুপ্ত Prof. A. T. Institution 92 Upper circular road.
	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী এম্,এ Prof. Presidency College.
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৭ ব্রাহ্মসমাজ লেন।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত		শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৩।২ বলরামদের ষ্ট্রীট।
		শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫।২।১ প্রেমচাঁদ বড়ালের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র		শ্রীইন্দ্রনারায়ণ দে বি,এ (ছাত্রসভ্য) ৪ রামতনু বসুর লেন।

৩। অতঃপর নিম্নোক্ত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল,—

১। শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন	১৮। Plays from Molier.
২। গুজরাট ভার্নাকিউলার সোসাইটী	১৯। বুদ্ধি-প্রকাশ ২০। ৫০ বৎসরের রিপোর্ট ২১। হীরকমহোৎসব } সোসাইটীর প্রকাশিত।
৩। শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন	২২। চৈতন্য লাইব্রেরীর বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা। প্রকাশক চৈতন্যলাইব্রেরী।
৪। " রাসমোহন সরকার	২৩। শ্রীরাধিকার জন্মকথা। (পুঁথি)
৫। " যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৪। কুলশাস্ত্র-দীপিকা (স্বরচিত)
৬। " উমেশচন্দ্র বসু	২৫। উপসর্গ (স্বরচিত)
৭। স্যার টি, এইচ্, হল্যাণ্ড্, ডাইরেক্টর, জি, এস, আই	২৬। A sketch of the Geography & Geology of the Himalaya mountains & Tibet.
৮। আর, আর, সেন স্কোয়ার	২৭। The Triumph of Valmiki (স্বরচিত)
৯। সম্পাদক, গুজরাট সাহিত্য-সভা	২৮। ১ম বার্ষিক রিপোর্ট। (সভা হইতে প্রকাশিত)
১০। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	২৯। আর্য্যনারী ২য় ভাগ (স্বরচিত)

১১। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত

৩০। Nature Vol XLV } সাময়িক-পত্র
৩১। Nature Vol XLVI }

৪। অতঃপর শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় তাঁহার "প্রাকৃতব্যাকরণ ও অভিধান" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)।

৫। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক বলিয়াছেন যে কথিত ভাষার ব্যাকরণ হয় না। প্রবন্ধলেখকের এই মত সম্বন্ধে আমার আপত্তি আছে। কথিত ভাষাতে যদি কেবল গ্রাম্যভাষা থাকে, তাহা হইলে তাহার ব্যাকরণ হইতে পারে না বটে, কিন্তু কথিত ভাষা সাধুভাষাও হইতে পারে এবং তাহা হইলে তাহার ব্যাকরণও থাকিতে পারে। সংস্কৃতভাষা কথিত ভাষা ছিল এবং তাহার ব্যাকরণও আছে। ইংরাজী ভাষারও ব্যাকরণ আছে, কিন্তু ইহা পরিবর্ত্তনশীল। প্রাকৃতভাষা সংস্কৃতমূলক। এক সময় পৃথিবীর সমস্ত লোক সংস্কৃতভাষায় কথা বলিত। পৃথিবীর সমস্ত আর্য্যভাষাও সংস্কৃতমূলক এবং সমস্ত আর্য্যজাতির আদিম নিবাস ভারতবর্ষ ছিল। সংস্কৃতভাষার প্রথম ব্যাকরণ দেবরাজ ইন্দ্র, দ্বিতীয় চন্দ্র ও তৃতীয় মহেশ প্রস্তুত করেন। সাধু ভাষার ব্যাকরণ হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলেন, যে ব্যাকরণের উদ্দেশ্য শিষ্টপ্রয়োগ দেখান। সাধারণ কথাগুলি শব্দভাণ্ডার হইতে বাদ দেওয়া উচিত নহে। শিক্ষিত ও সাধারণ, দুই প্রকার ভাষারই আবশ্যকতা আছে। অপরাপর ভাষা হইতেও শব্দগ্রহণ করা উচিত। বেদের ভাষা সংস্কৃত ভাষা কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। কথিত ভাষার ব্যাকরণের প্রয়োজন আছে এবং কথিত ভাষার শব্দগুলি অভিধান হইতে বাদ দেওয়া উচিত নহে।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে, প্রবন্ধ-লেখকের মতে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা এক। সংস্কৃত লিখিত ও বাঙ্গালা কথিত। এই মত অনেকেই স্বীকার করিবেন না। বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে সম্প্রতি দুইটী দল হইয়াছে। এক দল বলেন যে ইহা সংস্কৃত হইতে একেবারে বিভিন্ন। অন্য দল বলেন যে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা এক।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলেন যে ১৫ বৎসর হইল সাহিত্য-পরিষৎ প্রাদেশিক অভিধান ও ব্যাকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। অভিধানের শব্দসংগ্রহে মতপার্থক্য চলিতেছে। একদল বলেন, বাঙ্গালাভাষায় যে সমস্ত মৌলিক শব্দ পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ সংস্কৃত, অর্দ্ধ মাগধী ও পৈশাচপ্রাকৃত হইতে উৎপন্ন। সংস্কৃত শব্দগুলি পণ্ডিতগণের কৃপায় অবিকৃত আছে। কিন্তু প্রাকৃতগুলি লোকমুখে স্থানভেদে বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। অপর একদল বলেন যে, আর্য্যগণের সঙ্গে সংস্কৃত ও তদুৎপন্ন প্রাকৃতভাষা এদেশে আসিবার পূর্ব্বে এ দেশের প্রচলিত ভাষার সহিত এ সকল সংস্কৃতাদি ভাষা আক্তে

আন্তে মিশিয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালাভাষা গঠন করিয়াছে। প্রচলিত সমস্ত শব্দ পরিষদের সংগ্রহ করা উচিত। কিছুই বাদ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

৬। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলেন যে, এই সভায় যে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা হইয়াছে, তাহাতে অনেক গুরুতর বিষয় আছে। ইহাদের শেষ সিদ্ধান্ত হয় নাই এবং হইবে কি না তাহাতেও সন্দেহ আছে। ভাষার মূল কি তাহা বলা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সংস্কৃতভাষা সমস্ত ভাষার মূল, ইহা প্রমাণ করিতে পারিলে আমাদের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়, কিন্তু মঙ্গোলিয়ান ভাষা যে সংস্কৃতভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ইহা বলা অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার। প্রাকৃতভাষা কি ও তাহার মূল কি, সে সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে সংস্কৃতভাষা হইতে প্রাকৃতভাষা হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন যে প্রাকৃতভাষা ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে কোনও সম্পর্ক নাই এবং তাহারা সমসাময়িক ভাষা। আবার কেহ কেহ বলেন যে প্রাকৃতভাষা হইতে সংস্কৃতভাষা হইয়াছে। এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া অত্যন্ত দুরূহ। কথিত ভাষার অপরিবর্ত্তনশীল ব্যাকরণ সম্ভব নয়। বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা করিবার জন্য আমাদের ব্যাকরণের তত আবশ্যকতা নাই, কিন্তু বিদেশীরা যদি আমাদের ভাষা শিক্ষা করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাদের জন্য ব্যাকরণের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু এই ব্যাকরণ পরিবর্ত্তনশীল হইবে। ব্যাকরণ পরিবর্ত্তনশীল হইলেও ইহার মূল সূত্রগুলি সংস্কৃত ভাষা হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের দুইখানা অভিধানের দরকার। একখানি সাধুভাষার ও অপরখানি গ্রাম্যভাষার। যতদূর সম্ভব সংস্কৃতভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করা উচিত এবং ইহা করিলে যদি সমস্ত ভারতবর্ষে কখনও একভাষা হওয়া সম্ভবপর হয়, সে পক্ষে অনেক সহায়তা করিবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত
সহঃ-সম্পাদক।

শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ
সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন।

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

সময় ৩০শে শ্রাবণ, ১৫ই আগষ্ট, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

১। এই সভাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন—

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বি,এল্ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ বি,এল
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্,এ বি,এল
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
„ নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার এম্,এ বি,এল
„ শিবচন্দ্র শীল
„ চিত্তসুখ সান্যাল
„ বোধিসত্ত্ব সেন এম,এ
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
„ সচ্চিদানন্দ গুপ্ত
„ প্রফুল্লনাথ রায়
„ পুলিনবিহারী দত্ত
„ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ দুর্গাদাস শীল
„ সুরেশচন্দ্র দত্ত রায়
„ শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক
„ গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ
„ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ মৌলিক
„ যতীন্দ্রনাথ রায়
„ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ বাণীনাথ নন্দী
„ নগেন্দ্রনাথ বসু
„ সতীশচন্দ্র সরকার

শ্রীযুক্ত অমৃতগোপাল বসু
„ রামকমল সিংহ
„ গোপালদাস চট্টোপাধ্যায়
„ মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
„ বিনোদেশ্বর দাসগুপ্ত
„ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
„ অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
„ নিশিকান্ত সেন
„ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ গৌরগোপাল সেন কবিরাজ
„ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় বি,এ
„ নরেন্দ্রচন্দ্র পাল বি,এ
„ তারাপ্রসন্ন ঘোষ
„ সতীশচন্দ্র চৌধুরী
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্,এ
„ সুরেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
„ অক্ষয়কুমার সেনগুপ্ত
„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ প্রমথনাথ গুপ্ত
„ যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী
„ ইন্দুপ্রকাশ গাঙ্গুলী
„ প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়
„ যোগেন্দ্রলাল মিত্র এম,এ বি,এল্
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ (সম্পাদক)

" হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম্, এ, } সহঃ সম্পাদক

" ব্যোমকেশ মুস্তফী }

২। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বি, এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	শ্রীবৈদ্যনাথ শাহ	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় বি, এল্, উকিল বেহালা, ২৪ পরগণা
"	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীললিতমোহন পাল আদাচাকি, ভাঙ্গাবাড়ী, পাবনা
"	"	শ্রীদীনেশচরণ দাস গুপ্ত ইঞ্জিনীয়ারিং হোষ্টেল, ঢাকা
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রক্ষিত ৫৬।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্
"	"	শ্রীপ্রশান্তভূষণ গুপ্ত ৫৯ পটুয়াটোলা লেন
"	"	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন ৩২ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট্
"	"	শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় বি, এ ১২০ লোয়ারসার্কুলার রোড
"	"	শ্রীইন্দ্রনারায়ণ দে বি,এ ৪নং রামতনু বসুর লেন।
"	"	শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র পাল বি,এ ২৮নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীরেবতীমোহন চক্রবর্ত্তী ৫নং সুকিয়া ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র দাস Scottish Church College Square.
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	"	শ্রীশরৎকুমার লাহিড়ী S. K. Lahiri & Co., College square.

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতনসভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীচিরসুহৃদ্ লাহিড়ী ৭।৮ জরিফ্‌স্ লেন।
„	„	শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় Private Secy, Maharaja P. K. Tagore. Pathuriaghata.
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীতিনকড়ি ভট্টাচার্য্য বি,এল্ Bar Library, Alipore.
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীউদয়কান্ত ভট্টাচার্য্য পীরগাছা, রঙ্গপুর।
„	„	শ্রীনীরজনাথ ঠাকুর সব্ পোষ্টমাষ্টার, আউট্রাম পোষ্ট পার্কষ্ট্রীট।
শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী আল্লাবাদ, নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ।
„	„	শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী আল্লাবাদ, নিমতিতা মুর্শিদাবাদ।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপ্রমথনাথ দাসগুপ্ত সব্রেজিষ্ট্রার, গৌরীপুর ময়মনসিংহ।
„	„	শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্,এ বি,এল্ রঙ্গপুর।
শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী এম্,এ বি,এল
শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅমরনাথ দত্ত বি,এল্ ৫নং গড়পার রোড।
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত		শ্রীযামিনীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী ৬ পাতুলা খাঁর লেন, ঢাকা।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় জগন্নাথকলেজ, ঢাকা।
শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীগৌরগোপাল সেন কবিরাজ ৩১নং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের লেন।
		শ্রীপ্রফুল্লনারায়ণ রায় ১৩ সরকার্স লেন।
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ৬৭নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীশচন্দ্র গুহ, ১৮নং রতন ষ্ট্রীট।
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী ৬২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু ১৮নং রামকান্ত বসুর ফার্ষ্ট লেন।
শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত	”	শ্রীসুখময় দাসগুপ্ত বি,এল্ উকিল, যশোহর।

৪। অতঃপর নিম্নোক্ত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্ত যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল :—

১। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ ৩২। নিত্যানন্দচরিত (স্বরচিত)
২। „ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৩৩। আনার কলি ঐ
৩। „ দীন মহম্মদ ৩৪। ক্রুসেড্ ও জেহাদ ঐ
৪। „ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ৩৫। শ্রীশ্রীবৈষ্ণববন্দনা ঐ

৫। তৎপর সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দ্বয়কে বিশিষ্ট সভ্যরূপে নির্ব্বাচন জন্য যে পত্র সভ্যদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ২৮২ জন সভ্যের পত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজন সভ্য ব্যতীত অপর সমস্ত সভ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নির্ব্বাচনে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং পরিষদের নিয়মানুসারে ইঁহারা উভয়েই পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বাঁকুড়া জেলা হইতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক প্রেরিত একখণ্ড ইষ্টক প্রদর্শন করেন। এই ইষ্টকখণ্ড বাঁকুড়া সহরের নিকটবর্ত্তী ছাৎনা গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায়কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। দেবেন্দ্রবাবু বলেন যে প্রাচীন কবি চণ্ডীদাসের উপাস্য বাশুলী দেবীর মন্দির এই ছাৎনা গ্রামে ছিল। এই মন্দির ভগ্নাবস্থায় মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত হইয়াছে এবং সেই মৃত্তিকাস্তূপ হইতে এই ইষ্টকখণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে। মন্দিরের সম্মুখে একটি সুন্দর রাজপথ এবং রাজপথের পরপারে একটি অনতিবৃহৎ পুকুর আছে। শুনা যায় যে, রামী ধোপানী এই পুকুরে কাপড় কাচিত এবং ঘাটের একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে বসিয়া চণ্ডীদাস কবিতা লিখিতেন। এই প্রসঙ্গে ব্যোমকেশ বাবু বলেন যে, দেবেন্দ্র বাবুর মতে ছাৎনা গ্রামে বাশুলী দেবীর মন্দির ছিল, কিন্তু দীনেশ বাবু বলেন নান্নুর গ্রামে বাশুলী দেবীর মন্দির ছিল।

৭। অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের লিখিত 'কুমারগুপ্তের তাম্রশাসন' নামক প্রবন্ধের সার সঙ্কলন করিয়া সভ্যদিগকে জানাইলেন। (এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

তৎপরে শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের 'প্রবাদ-প্রসঙ্গ' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে প্রচলিত অনেকগুলি প্রবাদের ইতিহাস প্রবন্ধলেখক সভ্যদিগকে জানাইলেন।

৮। অতঃপর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় শ্রীবৃন্দাবন দাসকৃত "শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার" ও জয়কৃষ্ণ দাসকৃত "শ্রীচৈতন্যপারিষদজন্মস্থাননিরূপণ" নামক পুঁথি দুইখানি ও সেই পুঁথি দুইখানি হইতে সম্পাদিত গ্রন্থদ্বয়ের পাণ্ডুলিপি প্রদর্শন করেন এবং এই দুইখানি গ্রন্থের মুখবন্ধ পাঠ করেন। (এই পাণ্ডুলিপি ও মুখবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

৯। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।

বি, সি, শীল
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন।

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—২৭শে ভাদ্র, ১২ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

১। উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার শীল এম্,এ বি,এল
মাননীয় " সারদাচরণ মিত্র এম্,এ বি,এল্ (সভাপতি)
রায় " যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ বি,এল্

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি,এ
" রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার
" যোগেশচন্দ্র সিংহ
" বাণীনাথ নন্দী
" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্,এ

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম্,এ বি,এল্
" জগৎবন্ধু মোদক
" ভুবনেশ মুস্তফী
" নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" সতীশচন্দ্র চৌধুরী
" প্রভাসচন্দ্র আচার্য্য
" সুরেন্দ্রনাথ ঘোষাল
" অমৃতগোপাল বসু

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত এম্,এ বি,এল্
" অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্,এ বি,এল্
" হেমচন্দ্র সরকার এম্,এ
" বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি, এস, সি
" বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
" যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি,এল্
" হরিদাস মুখোপাধ্যায়
" ভবানীচরণ ঘোষ
" প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় বি,এল্
" অজিতকুমার সোম
" রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার
রায় " চুনিলাল বসু বাহাদুর
" রামকমল সিংহ
" শশিকান্ত সেনগুপ্ত
" সুখবিন্দু সেনগুপ্ত
" মণীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
" বিনোদবিহারী গুপ্ত

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্,এ (সম্পাদক)
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ
ব্যোমকেশ মুস্তফী সহকারী সম্পাদক
" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্,এ

২। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার শীল এম্,এ বি,এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত, স্বর্ণগ্রাম, ঢাকা।
শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীবিপিনবিহারী রায়চৌধুরী ফরিদপুর।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	"	শ্রীবিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য
"		পাশ্চাত্যপাড়া, রাজপুর, সোণারপুর।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	মিঃ প্রমথনাথ বোস বি, এম্, সি ; এফ্, জি,এস্ ; রাঁচি।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামনাথ ভট্টাচার্য্য ২৮ ভবানীচরণ দত্তের লেন।
শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	"	ডাঃ শরচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত ৮ পামারবাজার রোড।
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী কবিরাজ	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীকৃষ্ণকুমার দাস বি,এ Supdt. P. W. Minister's office. শ্রীনগর, কাশ্মীর।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীমনোমোহন ঘোষ ৩৮নং বেনেটোলা লেন।
		শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু, উইলকিন্সপ্রেস।

প্রস্তাবক	সমর্থক	ছাত্রসভ্য
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীবিপিনবিহারী সেনগুপ্ত ৮২ মাণিকতলা মেনরোড।
শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	ডাঃ উপেন্দ্রনাথ নাগ এল্,এম্,এস্ রাজহাঁসপাতাল, কালনা।
শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্রজসুন্দর রায় এম্,এ অধ্যাপক, বঙ্গবাসীকলেজ।
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেরম্বচন্দ্র চৌধুরী জমীদার, হেমনগর, ময়মনসিংহ।
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেবরায় পোর্ট ব্লেয়ার, আণ্ডামান।
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বসু বি,এ ম্যানেজার, কুজং, কটক।
শ্রীললিতমোহন দে	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্যাসিয়ার, বেলিফ্‌স্ আপীস, স্মলকজকোর্ট, রেঙ্গুন।
„	„	শ্রীআশুতোষ সেন বেঙ্গলী ইণ্টারপ্রিটার, স্মলকজকোর্ট, রেঙ্গুন।
„	„	শ্রীজগৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বেঙ্গলী ইণ্টারপ্রিটার, ম্যাজিষ্ট্রেট্‌স্‌কোর্ট, রেঙ্গুন।
„	„	শ্রীকালিধন ঘোষাল ক্যাসিয়ার, ডি, সউজা এণ্ড্ কোং, ডালহাউসিষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনন্দলাল দে, ৭ সৃষ্টিধর দত্তের লেন
শ্রীবঙ্কুবিহারী দাস	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস ৩৪নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।
„	„	শ্রীপুলিনবিহারী দাস ১৬নং সাউথ, শিয়ালদহরোড।
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৪নং টেগোর ক্যাসল্‌স্ রোড।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত ৫৯ পটুয়াটোলা লেন।
„	„	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি,এ ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট।

৪। অতঃপর নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল :—

১। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্,এ—

৩৬। বিবাহ বা উদ্বাহতত্ত্বের গূঢ়রহস্য—শ্রীযুক্ত বসন্তলাল মিত্র প্রণীত।

৩৭। বাঙ্গালা ব্যাকরণ—শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ শাস্ত্রী প্রণীত।

৩৮। সাহিত্যপ্রবেশ বাঙ্গালাব্যাকরণ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন-প্রণীত।

৩৯। আরবী শিক্ষক (১ম খণ্ড)—শ্রীরহিমউদ্দিন প্রণীত।

৪০। Opinions on life of Ramtanu Lahiri by Lethbridge.

৪১। The Colour line in the Indian Educational & Scientific department, by R. Chatterjee,

৪২। A Dying Race by U. N. Mookerjee.

৪৩। Murshidabad District Gazetteer Statistics, 1901-02.

৪৪। Bangabasi College Magazine, June 1909.

৪৫। বিবিধ মাসিক পত্রিকা ৭ সংখ্যা।

৪৬। পুরুষ বা আত্মা—শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য প্রণীত।

৪৭। Report of the National Council of Education, Bengal, 1908.

৪৮। Calcutta University Convocation Address by the Hon'ble Mr. Justice Ashutosh Mookerjee, Sarasvati F.R.A.S., F.R.S.

৪৯। Scheme of Examination 1909 of the National Council of Education, Bengal.

৫০। The Froebil Society of Great Britain & Ireland 34th Annual Report 1908

২। শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ—

৫১। নেত্রাবলি—(স্বপ্রণীত)

৩। রেজিষ্ট্রার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—

৫২। History of the Medæval School of Indian Logic by Mahamahopadhyaya Satish Chandra Bidyabhusan,

৫৩। Minutes of the year 1908 Part III.

৪। অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ—

৫৪। A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Calcutta Sanskrit College.

৫। মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্যচৌধুরী—

৫৫। শিকার-কাহিনী—(১ম খণ্ড) মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য প্রণীত।

৬। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চৌধুরী—

৫৬। সুখ-শর্ব্বরী—যোগমায়া দেবী প্রণীত।

৫৭। Helps to Conjugation and Parsing by Dwarka nath Chowdhuri B. A.

৫৮। রাধানাথ সঙ্গীত ঐ

৭। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

৫৯। ভারত-শিল্প (স্বপ্রণীত)

৬০। The Deeper meaning of the Struggle by A. K. Chowduri.

৮। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নাগ—

৬১। দুর্য্যোধন—স্বপ্রণীত।

৬২। কাকলী ঐ

৯। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত—

৬৩। সবিতা-সুদর্শন ও বর্ষবর্ত্তন।

৬৪। কবিবর ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবন চরিত ও গ্রন্থসমালোচনা ও বাসবদত্তা।

৬৫। গীতরত্ন গ্রন্থ।

৬৬। সচিত্র আয়ুর্ব্বেদোক্ত উদ্ভিদ্ সংগ্রহ—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সাহা প্রণীত।

১০। শ্রীযুক্ত ভবানীনাথ রায়—

৬৭। হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্র (সম্পূর্ণ) স্বপ্রণীত।

৬৮। মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির ১ম বর্ষীয় কার্য্য-বিবরণী (২ খানা)

১১। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ পণ্ডিত—

৬৯। গুরুগোবিন্দ সিংহ।

৫। অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক বালগড় হইতে সংগৃহীত মিনাকরা ইষ্টক ও প্রস্তর প্রদর্শন করেন। এই গড় দিনাজপুরের অধীন গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত রাজীবপুর গ্রামে স্থিত। সম্প্রতি সাঁওতালগণ আবাদ করিবার জন্য এই স্থানের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে এবং এই সমস্ত প্রদর্শিত ইষ্টক ও প্রস্তর সাঁওতালদের হল তাড়নায় মাটির নীচে হইতে বাহির হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বগুড়া জেলার অন্তর্গত করতোয়া নদীতীর-স্থিত মহাস্থান গড় নামক স্থান হইতে স্ব-সংগৃহীত কাল ও নীল মিনা করা ইষ্টক প্রদর্শন করেন। মহাস্থান গড় একটি বৃহৎ দুর্গের ভগ্নাবশেষ।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় কাশ্মীর হইতে সংগৃহীত দুইটি জীবাশ্ম প্রদর্শন করেন।

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় "বিক্রমপুরে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বরমূর্ত্তি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। (এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।) শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয়ের শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। (এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

৭। অতঃপর সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, পেশোয়ারের নিকটে বুদ্ধদেবের যে অস্থি পাওয়া গিয়াছে, সে সম্বন্ধে প্রকাশ যে গবর্ণমেণ্ট চীন, জাপান, সিংহল প্রভৃতি স্থানে এই বুদ্ধাস্থি বিতরণ করিবেন। ইহাতে পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করেন যে, যদি সমস্ত ভারতবাসী গবর্ণমেণ্টের এইরূপ অভীপ্সিত কার্য্যের প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলে হয়ত গবর্ণমেণ্ট এই প্রতিবাদে কর্ণপাত করিতে পারেন। এ বিষয়ে পরিষদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য একটি পরামর্শ-সভা আহূত হইয়াছিল। সেই সভাতে স্থির হইয়াছে যে যাহাতে বুদ্ধাস্থি ভারতে সংরক্ষিত হয়, সেইজন্য (ক) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরণ করা হইবে ও (খ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নেতৃত্বে একটি সাধারণ সভা আহূত হইবে। সম্পাদক মহাশয় আরও জানাইলেন যে, এক সপ্তাহ মধ্যে এই সভা আহূত হইবে।

সম্পাদক মহাশয় আরও জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার আবিষ্কৃত অবলোকিতেশ্বর দেবের মূর্ত্তি পরিষদে উপহার দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং এই মূর্ত্তি পরিষদে রক্ষিত হইবে। এই দানের জন্য যোগেন্দ্রবাবু পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। এই প্রসঙ্গে ব্যোমকেশ বাবু জানাইলেন যে কেন্‌সিংটন মিউজিয়ামের কর্ত্তৃপক্ষগণ ২৫০৲ টাকা মূল্য দিয়া এই মূর্ত্তি ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু যোগেন্দ্রবাবু কোনও মূল্য গ্রহণ না করিয়া এই মূর্ত্তি পরিষদে উপহার দিতেছেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় বলিলেন যে এই মূর্ত্তি কোথায় ও কি প্রকারে পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ যোগেন্দ্র বাবুর মুদ্রিত প্রবন্ধে থাকা বাঞ্ছনীয়।

৮। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন।

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—২৪শে আশ্বিন, ১০ই অক্টোবর ১৯০৯, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

উপস্থিত সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্, (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্, এ,
রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
" যাদবচন্দ্র মিত্র
" কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী
" বরদাপ্রসাদ বসু
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক
" পশুপতিনাথ ঘোষ
" তারকনাথ বিশ্বাস
" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
" কৃষ্ণকিশোর গুপ্ত
" কমলকৃষ্ণ গুপ্ত
" শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত
" গৌরহরি সেন
" অম্বিকাপ্রসাদ মিত্র
" সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ
" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
" বনমালী দত্ত
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ,
" চুনিলাল রক্ষিত
" প্রবোধচন্দ্র গুপ্ত
" হৃষীকেশ মিত্র
" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
" পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু
" নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
" রামকমল সিংহ
" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" সুরেশচন্দ্র কুণ্ডু বি,এ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, (সম্পাদক)
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, } সহঃ সম্পাদক।
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্, এ, }

২। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস Acct, Scottish Churches Collegiate School.
শ্রীললিতমোহন দে	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	মিঃ যোগেশচন্দ্র কাস্তগীর বি, এল্, এড্‌ভোকেট, রেঙ্গুণ।
”	”	শ্রীদীনেশচন্দ্র মুন্সী বি, এল্, এড্‌ভোকেট, রেঙ্গুণ।
”	”	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বি, এল্, এড্‌ভোকেট, রেঙ্গুণ।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্, এ, অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
”	”	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন এম্, এ, বি, এল্, অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
”	”	শ্রীনেপালচন্দ্র রায় বি, এ, অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ এম, এ, অধ্যাপক, মেদিনীপুর কলেজ।
”	”	শ্রীসত্যচরণ কর, একাউন্ট্যাণ্ট, পুলিস অফিস, মেদিনীপুর।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীদামোদর ভকতচাঁদ সা, তৃতীয় সহকারী সা ট্রেণিং কলেজ, রাজকোট।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীবারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এম্. বি, ৮৮ নং বেচুচাটুয্যের ষ্ট্রীট্।
শ্রীজিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, রামপুরহাট
”	”	শ্রীহরিতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় এল্, এম্, এস্ রামপুরহাট।
”	”	শ্রীজ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বি, এল্, রামপুরহাট।
”	”	শ্রীশ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায়, উকিল, রামপুরহাট।
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন	”	শ্রীসতীশচন্দ্র সেন, বি, এল্, সরকারী উকিল চট্টগ্রাম।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন বি, এল, উকিল, চট্টগ্রাম।
”	”	শ্রীঅন্নদাচরণ দত্ত, এম্, এ, বি, এল্, উকিল, চট্টগ্রাম।
”	”	শ্রীনরেন্দ্রলাল দাস, বি, এল্, উকিল, চট্টগ্রাম।
”	”	শ্রীমহিমচন্দ্র দাস বি, এল, উকিল, চট্টগ্রাম।
”	”	শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন বি, এল, উকিল চট্টগ্রাম।
”	”	শ্রীদীনেশচন্দ্র রায়, জমীদার, চট্টগ্রাম।
”	”	শ্রীযামিনীকান্ত সেন, বি, এল্, জমিদার, চট্টগ্রাম।
”	”	শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত, এম্, বি, চট্টগ্রাম।
”	”	শ্রীমোক্ষদারঞ্জন রায়, জমীদার, নোয়াপাড়া চট্টগ্রাম।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীবিজয়চন্দ্র পুরকায়েত, বেহার, পাটনা।
”	”	শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঐ

ছাত্র-সভ্য।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীলালমোহন সোম ১নং বলদেপাড়া রোড কলিকাতা।
”	”	শ্রীসমতুলচন্দ্র সেনগুপ্ত ১২০ নং লোয়ার সার্কুলার রোড।
”	”	শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চৌধুরী ৬৩নং হ্যারিসন রোড।
”	”	শ্রীপ্রমথনাথ বিশ্বাস ৩০।৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
”	”	শ্রীবিজয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৭৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	”	শ্রীশরৎলাল বিশ্বাস

৪। তৎপরে নিম্নলিখিত-পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল :—.

শ্রীদৌলত আহম্মদ এম, এম্, দাহার — ১০। মুকুর,
শ্রীসারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্, — ১১। উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য,
১২। বিদ্যাপতির পদাবলী,
শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু ১৩। শকুন্তলা, ১৭। সীতার বনবাস, ১৫। 88. Irving's Rip Van Winkle & The Legend of Sleepy Hollo.

অতঃপর শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত শ্রীকিরণকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রাপ্ত শিলিট (Scheelite) নামক খনিজ পদার্থ প্রদর্শন করেন। এই খনিজ পদার্থ নাগপুর জেলাতে পাওয়া গিয়াছিল, এবং ভারতবর্ষে এই খনিজ পদার্থ ইতিপূর্ব্বে আর কেহ প্রাপ্ত হন নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "মধ্যমরাজ দেবের তাম্রশাসন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে শৈলোদ্ভব-বংশীয় মধ্যমরাজ কর্তৃক কংগোদ বিভাগস্থ অ্যাকটক জেলাতে কতিপয় ব্রাহ্মণকে ভূমিদান-বিষয়ক তিনখানি তাম্রশাসনের উল্লেখ আছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় কর্তৃক লিখিত "বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই সংস্কৃত মহাকাব্য ভারতে লুপ্ত হইয়াছিল। প্রবন্ধলেখক তিব্বত রাজ্যের রাজধানী লহাসা নগর হইতে উদ্ধার করিয়া পণ্ডিত কুঞ্জবিহারী ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের সাহায্যে ইহার বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

অতঃপর ৺রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করা হয়। এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, পরলোকগত প্রাণশঙ্কর বাবু নানাপ্রকার দেশ-হিতকর কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন ও কিছুকাল তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যরূপে পরিষদের কার্য্যে অনেক পরিমাণে সহায়তা করিয়াছিলেন।

অতঃপর মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে মিঃ এ, রসুল কর্তৃক প্রেরিত নিম্নলিখিত পত্রখানি সভাপতি মহাশয় পাঠ করেন :—

14. Royd Street.
Calcutta the 13th September 1909.

Dear Sir,

I beg to state that at a public meeting of the Mussalmans, held in Calcutta on the 27th June last, a committee was formed to examine dramas & other publications offensive to the Mahomedans and take steps that such publications & the staging of such dramas are prevented & then

on the 4th July a meeting of the committee was held to discuss how to proceed in the matter and the following is one of resolutions adopted at the meeting:—

"That this committee do approach the recognised leaders of the Hindu community with a view to solicit their co-operation in the promotion of the objects of the committee.

To give effect to the above resolution, I, as President of the said committee, approach you, in the hope that you will readily come forward to co-operate in this matter and bring about better feelings between Hindus and Mussalmans, by trying to remove all causes that have unfortunately created a tension between them over this affair. I am dirceted by the committee to request you to exercise your influence over Bengali authors and managers or proprietors of theatres in this connection and I think this can be done by holding a meeting of prominent Hindu and Mahomedan leaders and others directly or indirectly interested in the matter.

Awaiting the favour of an early reply,

I remain,
Yours faithfully.
(Sd.) A. Rasul.
President of the committee.

এই পত্র সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের মধ্যে অসদ্ভাব হওয়া উভয় সমাজের পক্ষেই অমঙ্গলজনক; সুতরাং এই পত্রানুযায়ী সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে একটি সঙ্কল্প করা উচিত বলিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি স্থির করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় জানাইলেন যে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে এইরূপ এক প্রস্তাব করা হইয়াছিল। তৎপরে অনেক আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতি ক্রমে নিম্নলিখিত সঙ্কল্প গৃহীত হইল:—

"ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষভাব উৎপন্ন হয় বা এতদুভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি-বন্ধনের ব্যাঘাত ঘটে, এমন কোন পুস্তক বা সন্দর্ভ ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিয়া যাহাতে রচিত না হয়, তৎসম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বঙ্গভাষার লেখকগণকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন।

"যদি ঐ প্রকার জাতিগত বিদ্বেষপূর্ণ এবং প্রোক্ত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতিবন্ধনের ব্যাঘাতক কোনও নাটকাদি থাকে, তাহা হইলে, তাহা যাহাতে সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত না হয়, তজ্জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছেন।"

তৎপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, বরোদাতে সাহিত্য-সম্মিলন হইতেছে এবং সেই সম্মিলনে পরিষদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি-প্রেরণের জন্য নিমন্ত্রণপত্র আসিয়াছে। যাঁহারা পরিষদের পক্ষ হইতে বরোদাতে যাইতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক সম্পাদক মহাশয়কে স্বীয় অভিলাষ জানাইবেন।

তৎপর সভাপতি মহাশয় ৺রাজা রামমোহন রায়, ৺রাজনারায়ণ বসু ও ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়গণের চিত্রের উন্মোচন করিয়া বলেন যে ইহার মধ্যে ৺বটব্যাল মহোদয় "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ" নামকরণ করিয়াছিলেন।

তৎপরে সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ৺ রাজনারায়ণ বাবুর ও ৺ বটব্যাল মহাশয়ের পুত্রগণ তাঁহাদের পিতৃদেবের চিত্র পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহারা সকলেই পরিষদের ধন্যবাদের পাত্র। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই ধন্যবাদের প্রস্তাব গৃহীত হইল। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়
সভাপতি।

৭ম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৭শে অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা।

উপস্থিত সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্ এ, বি, এল্ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল্
" অক্ষয়কুমার বড়াল
" বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি,এল্
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" লোকনাথ চক্রবর্ত্তী
" শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্, এ

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রমোহন রায়
চিন্তাহরণ ঘটক,
ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
ভূপেন্দ্রনাথ বসু
হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়
শৈলেন্দ্রনাথ বসু
কনকেন্দ্রনাথ বসু
অমূল্যচরণ চট্টোপাধ্যায়
ডাক্তার পশুপতিনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র, এম্, এ
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়, বি, এ
„ চারুচন্দ্র বসু
„ সুরেশচন্দ্র সরকার
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ তরণীমোহন চন্দ্র
„ যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি, এল্
„ প্রসাদদাস গোস্বামী
„ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম্, এ
„ আনন্দমোহন সাহা
„ নরেন্দ্রনাথ বসু
„ নরসিদনজী
„ মণীন্দ্রনাথ মিত্র
„ যতীন্দ্রনাথ সেন
„ ললিতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ কিরণচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্,এ, বি এস্ সি,
„ সুধীরকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী
„ নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার,এম্,এ বি,এল্
„ অমৃতগোপাল বসু
„ রামকমল সিংহ
„ বিজয়কৃষ্ণ রায়
„ রাজকুমার চন্দ্র
„ মহেন্দ্রনাথ বসু
„ যোগেশচন্দ্র মিত্র
„ শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
„ সুরেশচন্দ্র বসু
„ সুরেন্দ্রমোহন সিংহ
„ নলিনীমোহন সিংহ
„ পান্নালাল বড়াল
„ অনন্তলাল বসু
„ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ
„ সতীশচন্দ্র বর্ম্মণ
„ নবকৃষ্ণ ঘোষ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ (সম্পাদক)
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, এম্, এ
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
} সহঃ সম্পাদক।

২। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্, এ বি,এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীভবতারণ সরকার বি, এ ৯।২ হরিতকীবাগান লেন।
শ্রীললিতমোহন দে	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য Anditor's office Burmah, Rangoon.
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	„	রায় পূর্ণচন্দ্র মৌলিক বাহাদুর এম্, এ, বিএল্, ডেপটী ম্যাজিষ্ট্রেট, জাজপুর, কটক

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২ জগন্নাথ সুরের লেন।
"	"	শ্রীপশুপতিনাথ শর্ম্মা, ৪ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
শ্রীললিতমোহন দে	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীঅরুণচন্দ্র পাল, ৬নং ৩১ সংখ্যক ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।
শ্রীমণিমোহন সেন	শ্রীনিখিলনাথ রায়	শ্রীরাখালরাজ রায় বি এ, দ্বিতীয় শিক্ষক, নিউস্কুল, বর্দ্ধমান।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী, , রায়গ্রাম, যশোহর।
"	"	শ্রীগোপালেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, কলম, রাজসাহী
অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ১৬নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।
"	"	শ্রীনরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১০নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।
শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীঅজিতকুমার সেনগুপ্ত ৪নং জগদীশনাথ রায়ের লেন।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়	শ্রীশরচ্চন্দ্র সিংহ Supdt., Kandi Raj-Estate. কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীমনোহর গুপ্ত এম্, এ, Sub-Dy Kandi. Murshidabad.
"	"	শ্রীসতীন্দ্রমোহন রায়, ৩।১ গৌড়ীবেড়ে লেন।
শ্রীহরিশচন্দ্র ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীধীরাজকৃষ্ণ মিত্র ১৮নং ঘোষের লেন।
শ্রীমণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	"	শ্রীকালীনাথ ভাদুড়ী Acct., Dt. Engineer's, office Bhagalpur.
"	"	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জমীদার, খলিফাবাগ, ভাগলপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীমণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু, এম্ এ, বি,এল, উকিল, ভাগলপুর।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উকিল, মশাকচক, ভাগলপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীমণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম্ এ বি,এল্ উকিল, ভাগলপুর।
শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২০নং বিডনষ্ট্রীট্।
শ্রীঅখিলকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্রদাস গুপ্ত	শ্রীহরেন্দ্রকুমার ঘোষ বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, চট্টগ্রাম
"	"	শ্রীরমণীরঞ্জন দত্ত বি, এ, General Manager, Court of Wards, Chittagong.
"	"	শ্রীধূর্জ্জটীকুমার দত্ত, কানুনগো, চট্টগ্রাম।
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার	"	শ্রীহেরম্বচন্দ্র চৌধুরী, জমীদার, হেমনগর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, ৭নং ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন।
শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	"	শ্রীরাজচন্দ্র চন্দ্র, এম্,এ এটর্ণী, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীশশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, এটর্ণী। জেলিয়াটোলা লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার, বি এল্, ভবানীপুর।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র দেব ৩১৪ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার ১৮নং রসারোড।
"	"	শ্রীকেশবলাল গুপ্ত, এম্. এ, বি, এল্, উকিল, পুলিসকোর্ট
শ্রীকেদারনাথ দাশগুপ্ত	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, জমীদার ৩০নং সুকিয়া ষ্ট্রীট

প্রস্তাবক	সমর্থক	ছাত্র-সভ্য
শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীশরৎচন্দ্র ভাদুড়ী সূত্রগড়, শান্তিপুর, নদীয়া
,,	,,	শ্রীদ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, Head Master, Municipal School শান্তিপুর, নদীয়া।
,,	,,	শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্ Head Master, H. E. School, বাঘনাপাড়া, বর্দ্ধমান।
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	,,	পণ্ডিত শ্রীকানাইয়ালাল শর্ম্মা গোপালাচার্য্য, ২২০ হ্যারিসন রোড।
শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল	,,	শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সরকার, জমীদার, ডামোর বিবহরা, রাজশাহী।
	,,	শ্রীগণেশচন্দ্র নন্দী, Collecting Supdt. Gumaniganj Kachari, Bhawaniganj, Rungpur.
,,	,,	শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সরকার ঘোড়ামারা রাজশাহী।
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীহেমচন্দ্রদাশগুপ্ত	শ্রীনরসিদনজী ৪৮নং এজরা ষ্ট্রীট।
শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীআশুতোষ সাহা বি, এল্, চোরবাগান।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীগোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু প্রামাণিক ১৭নং গোবিন্দচন্দ্র সেনের লেন।
,,	,,	শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, বাবডাঙ্গা, জেমো, মুর্শিদাবাদ।
,,	,,	কুমার শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় জেমো, মুর্শিদাবাদ।
,,	,,	রাজা শ্রীভুবনমোহন রায় রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম।
,,	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীবিধুভূষণ গোস্বামী এম্, এ, অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ।
,,	,,	শ্রীহেমনাথ সেন, ২২নং মতিঘোষের লেন হাবড়া।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহেমন্ত কুমার কর সারস্বতনিকেতন, মুলাজোড়, শ্যামনগর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	ছাত্র সভ্য
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীপুলিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৭নং প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রোড।
,,	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ পল্লীবাসী কার্য্যালয়, কালনা।

৪। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহার পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল :—

১। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি — বিবিধ মাসিক পত্র (১১০০ সংখ্যা)

২। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী — ৭৫। বনৌষধি দর্পণ ২য় ভাগ

৩। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—
- ৭৬। The New Testament. E. B, N. D. Church Dispensation.
- ৭৭। কুসুম-মালিকা (যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত)
- ৭৮। ৺মনোহারিলাল সেনের স্বর্গারোহণে অশ্রুধারা
- ৭৯। বিমাতৃক (রাজেশ্বর সাধু খাঁ প্রণীত)।
- ৮০। বঙ্গীয় সমালোচক (বাউল ফকির চাঁদ বাবাজী বিরচিত)
- ৮১। সাতনারী (অঘোরনাথ কুমার প্রকাশক)
- ৮২। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাবলী (রামচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত)
- ৮৩। হাতেম তাই (বর্দ্ধমান রাজবাটী)

৪। শ্রীপ্রসাদচন্দ্র ঘোষ — ৮৪। ভারতের শেষবীর নাটক (স্বরচিত)

৫। ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী — ৮৫। Keshab Chandra Sen on British Rule in India, Reprinted from New Dispensation July 1881.

৬। শ্রীদুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী রায়-সাহেব — ৮৬। স্থপতি-বিজ্ঞান (স্বরচিত)

৭। ডাঃ অম্বিকাচরণ মজুমদার — ৮৭। চিকিৎসক (স্বরচিত)

৮। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস, সি, পি, এচ্ ডি, — ৮৮। বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার ২য় খণ্ড (স্বরচিত)
- ৮৯। A history of the Hindu Chemistry Vol 1-IV (স্বরচিত)

৯। শ্রীআনন্দনাথ রায় — ৯০। ফরিদপুরের ইতিহাস—পরিষৎ-গ্রন্থাবলী

১০। সতীশচন্দ্র ঘোষ — ৯১। চাকমা জাতির ইতিহাস ঐ

১১। Librarian. Govt. Oriental — ৯২। A descriptive Catalogue of the Manuscript Library, Madras. Sanskrit Library.

১২। শ্রীসুমনস হরিলাল ধ্রুব — ৯৩। প্রবাস-পুষ্পাঞ্জলি (এস্. ধ্রুব লিখিত)

১৩। শ্রীহরকুমার সরকার — ৯৪। ইতিহাসমালা (W. Carey প্রণীত, ১৮১২ সালে মুদ্রিত)

১৪। ৺সুখবিন্দু সেনগুপ্ত — ৯৫। প্রেমলহরী
৯৬। দূতী-বিলাস

১৫। শ্রীরজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় — ৯৭। চিকিৎসা-প্রণালী
৯৮। ঔষধ সারসংগ্রহ

১৬। শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — ৯৯। শৈশব-লহরী
১০০। মধুমতী

১৭। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত — ১০১। বিক্রমপুরের ইতিহাস—পরিষৎ-গ্রন্থাবলী

১৮। শ্রীনরেন্দ্রনাথ দে — ১০২। অভিনয় প্রণালী ও আখার
১০৩। হাসিকান্না

১৮। শ্রীযুক্ত নন্দলাল ঘোষাল—১০৪। Diary of an Austrian Secretary of Legation at the Court of the Czar Peter the Great, Vols 1—II. ১০৫। Alexandri Magni ১০৬। Juvenal's Satires ১০৭। The Eight books of Medicines of A. C. Celsus. Vol II. ১০৮। The Indian Evidence Act. 1891. ১০৯। The Arian Witness (খণ্ডিত) ১১০। The Prayer Book. ১১১। Archæological Remains in Kachh (খণ্ডিত)। ১১২। Report on the Vernacular news-papers and periodicals published in the N. W. P. during 1872. ১১৩। Indian Epic Poetry, Oxford Lectures by Monier Williams. ১১৪। Taylor's Law of Evidence, Vols. I & II. ১১৫। The Pentatouch on the Book of Joshua Colenzo. ১১৬। Anglo-French Dictionary. ১১৭। Geography. ১১৮। Scriptures ১১৯। Bible Hand-book. ১২০। Words of Places. ১২১। Dramas of Southey. ১২২। Latin-English Dictionary. ১২৩। Josephus' Works. ১২৪। Lyra Germanica (Christian life.) ১২৫। Question and Answer for Matriculation etc. ১২৬। Papers relating to the Uncovenented Service Examination in Madras. ১২৭। Discourse of Dante (Latin). ১২৮। The Regulations of the Bengal Code. ১২৯। A Code of Civil Procedure in Burmese. ১৩০। Davidson's Precedents of Forms in Conveying. ১৩১। Greek Accidents (Arnold). ১৩২। Lectures on the Law of Evidence. ১৩৩। Austin's Jurisprudence. ১৩৪। Hebrew and English Lexicon. ১৩৫। General and Civil Circular of Judicial Commissioner of Lower British Burmah. ১৩৬। Chreslomathie (a French book). ১৩৭। Indian Penal Code (in Burmese). ১৩৮। French Grammar (Eton). ১৩৯। Question for Law Stu-

dents. ১৪০। Law of Evidence (Starkee) ১৪১। Liviticus (Greek), ১৪২। A Guide to the Exam. at the College of Fort Williams. ১৪৩। Several Law Pamphlets. ১৪৪। Trinunus. ১৪৫। A treatise on French Conjugation. ১৪৬। Spanish Grammar. ১৪৭। History of the Greek Dramas. ১৪৮। A Grammar of the Greek Language. ১৪৯। English and Tamil Dictionary. ১৫০। Appendix to the Eton Greek Grammar. ১৫১। Matriculation Greek paper. ১৫২। Method of Acquiring Languages. ১৫৩। Grammar of the Hansa Language ১৫৪। Psalms & Proverbs in Burmese. ১৫৫। Austin's Jurisprudence, Vols. I & II. ১৫৬। Chronological Table of Greek and Roman History. ১৫৭। The Chinese Repository (magazine). ১৫৮। Gradus-ad-Parnassume (French). ১৫৯। Tamil Minor Poets. ১৬০। Indian Antiquary 1888 (Feb. March. June.) ১৬১। The Alps, Switzerland, Savoy & Lombardy. ১৬২। The Pentatouch and Book of Joshua Colenzo, pt. V. ১৬৩। Prose Works of Henry Ware. ১৬৪। A Synopsis of Criticism on old Testament ১৬৫। The Exm. Directory. ১৬৬। Nineveh. ১৬৭। Literature History of the Veda. ১৬৮। A New and Complete Grammar of the Burmese Language. ১৬৯। General Summary of the History of Burmah. ১৭০। Report on the Administration of British Burmah. ১৭১। Post-Office in British Burmah. ১৭২। Euripides' Tragedy. ১৭৩। Arnold's Greek Prose Composition pt. I-II. ১৭৪। Æschylus' Works. ১৭৫। A Gazetteer of the Province of Oudh, (A to G (খণ্ডিত). ১৭৬। Life and Writings of Sallust. ১৭৭। A Geneological and Heraldic Dictionary of the Landed Gentry of Great Britain and Ireland by J. Burke Vol. I and II. ১৭৮। Latin Hexameters (Bland). ১৭৯। History of the Conquest of Mexico Vols. I-II & III. ১৮০। Eclogœ Ovidienæ (Arnold) ১৮১। English and Tamil grammatical vocabulary. ১৮২। Judson's Burmese-English Dictionary., ১৮৩। Euripides' Tragedy (Greek) Vol. II. ১৮৪। Greek and Latin Lexicon. ১৮৫। Memoirs of Kemble and History of the Stage .Vol. I and II. ১৮৬। Hebrew and Chaldic Lexicon. ১৮৭। Petrifactions and their Teachings. ১৮৮। Arnold's Latin Prose Composition pt, I and II. ১৮৯। A Latin Grammar (Madviz) ১৯০। Roman Antiquity (Alexander Adam) ১৯১। English and Hebrew Vocabulary. ১৯২। Selection from the Edinburgh Review I. III. V. ১৯৩। A Dutch School Grammar (in Dutch) ১৯৪। Persian Works. ১৯৫। Burmese Works. ১৯৬। De. Digtees. ১৯৭। Materials from French Prose Composition. ১৯৮। Atlas.

৫। অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কান্দী-নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় কর্ত্তৃক সাহিত্য-পরিষদের জন্য সংগৃহীত তিনটী ধাতুমূর্ত্তি প্রদর্শন করেন। এই তিনটি মূর্ত্তি মধ্যে দুইটি মূর্ত্তি Indian Museum বা British Museumএ নাই। এই মূর্ত্তিগুলি সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনের সময়ের। এই মূর্ত্তিত্রয়ের একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি ও একটী বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি ও বিষ্ণুমূর্ত্তির মাঝামাঝি কোন মূর্ত্তি এবং তৃতীয় মূর্ত্তিটী কাহার তাহা এখনও ঠিক করিয়া বলা যায় না। তৎপরে রাখাল বাবু মিসেস্ জোন্‌স্ (Mrs. Jones) কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রস্তর মূর্ত্তি ও বুদ্ধগয়ায় তাঁহার নিজ সংগৃহীত কতকগুলি মৃণ্ময় ছাঁচের প্রতিমা (Seal) প্রদর্শন করেন। গরিব তীর্থযাত্রিগণ এইরূপ seal ব্যবহার করিত। অতঃপর পরিষদের পুথি-সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রেরিত চৈতন্যদেবের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি এবং সম্রাট্ শাহ আলমের সময়ের তাম্রমুদ্রা ও অপর কতকগুলি মুদ্রা রাখাল বাবু প্রদর্শন করেন।

ফরিদপুর হইতে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ ঘটক মহাশয়ের প্রেরিত একটী কামান শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হয়।

এই প্রদর্শন-প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয় জানান যে, রাখাল বাবু কর্ত্তৃক প্রদর্শিত মুদ্রাগুলি তিনি নিজে উপহার প্রদান করিয়াছেন ও মিসেস্ জোন্‌স্ অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বিহার অঞ্চল হইতে বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলি পরিষদে প্রেরণ করিয়াছেন। রাখাল বাবু ও মিসেস্ জোন্‌স্‌এর ধন্যবাদের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল রচিত 'যশোরযুদ্ধ' নামক কবিতা শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় পাঠ করেন। প্রতাপাদিত্য ও মোগলদের যুদ্ধ উপলক্ষ্য করিয়া এই পদ্য লিখিত হইয়াছে।

৭। অতঃপর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এল্, এম্, আর, এ, এস্, মহাশয় 'বাঙ্গালা ভাষার দ্রাবিড়ী উপাদান' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। (সমগ্র প্রবন্ধ পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।) এই প্রবন্ধে বিজয়বাবু বলেন যে আর্য্যনিবাসের পূর্ব্বে বঙ্গে যে সকল দ্রাবিড় জাতির বাস ছিল, তাহাদের ভাষার অনেক শব্দ এবং প্রত্যয়াদি বাঙ্গালায় ব্যবহৃত আছে। যে মাগধী প্রাকৃতের ক্রমবিকাশ বা পরিবর্ত্তনে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, সেই প্রাকৃত হইতে ওড়িয়া ভাষারও জন্ম। বাঙ্গালার এবং ওড়িয়ার প্রাচীন ব্যাকরণ বিশ্লেষণ করিলে মূলতঃ এই দুইটী ভাষা যে এক ছিল, তাহাও যেন ধরিতে পারা যায়। বাঙ্গালা ভাষায় যে সমস্ত 'দেশী' শব্দ আছে, তাহাদের মধ্যেও অনেকগুলি তেলেগু, ওড়াও, তামিল, কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে ;—

জাতি	শব্দ	অর্থ	দেশী বাঙ্গালা শব্দ	অর্থ
তেলেগু	আকালি	ক্ষুধার আতিশয্য	আকাল	দুর্ভিক্ষ
তামিল	ইতুরাক্কিতু	বাজ	ঠাটা (পূর্ব্ব)	বাজ

জাতি	শব্দ	অর্থ	দেশী বাঙ্গালা শব্দ	অর্থ
ওড়াও	কোকা, কোকি,	ছেলে, মেয়ে	খোকা, খুকি (পশ্চিমবঙ্গ)	ছেলে
			(পূর্ব্ববঙ্গ)	মেয়ে
তেলেগু ও তামিল	চাপা,	চপ	সপ মাদুর,	সপ
তামিল	পিল্লৈ	ছেলে		
তেলেগু	পিলল্ল	ছেলে	পোলা (পূর্ব্ববঙ্গ)	ছেলেপিলে
ওড়িয়া	পিলা	ছেলে		
তামিল	মোটা	গাঁটারি	মোট	গাঁটরি

বিজয়বাবু আরও বলেন যে, এমন অনেক দেশী শব্দ আছে, যেগুলি এখন ওড়িয়ায় যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যেও ঠিক সেই অর্থে ব্যবহৃত হইত এবং ইহাদের কতকগুলি শব্দ এখনও বঙ্গের নানাস্থানে তদর্থে ব্যবহৃত আছে, অনেকগুলি শব্দ যেগুলি ভদ্রমহলে উচ্চারিত হয় না অথচ ভাষায় যাহাদের ব্যবহার আছে, তাহাদের উৎপত্তি আর্য্যভাষামূলক নহে, কিন্তু অনার্য্যভাষামূলক। প্রাচীন বাঙ্গালার ব্যাকরণ ও প্রাচীন উড়িষ্যার ব্যাকরণ মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। তামিল ভাষার প্রভাবও বাঙ্গালা ও উড়িয়া ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত বিষয় ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিয়া বিজয়বাবু বলেন যে, এক প্রাকৃত ভাষায় যাহারা কথা কহিত, তাহারা যদি বহুদিন একস্থানে থাকিয়া পরে বঙ্গে এবং উড়িষ্যায় গিয়া স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে, বঙ্গের কোন্ প্রান্তের ভাষাতে এখনও শব্দের ও ব্যাকরণের প্রাচীন আকার অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে, তাহা দেখিয়া কোন্ দিক্ বা কোন্ স্থানে আর্য্যজাতির আদিম উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, সেই প্রশ্নের মীমাংসা করা যাইতে পারে।

৮। অতঃপর সম্পাদক মহাশয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে সমস্ত পৃথিবীই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। দত্ত মহাশয় পরিষদের অন্যতম স্থাপয়িতা এবং অনেকদিন সভাপতিরূপে পরিষদের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। দত্ত মহাশয়ের জন্য একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হইবে। দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি পরিষদের পক্ষ হইতে সহানুভূতিসূচক পত্র দত্ত মহাশয়ের শোকক্লিষ্ট পরিবারবর্গের নিকট প্রেরণ করেন। সেই পত্রের উত্তরে মিষ্টার অজয়চন্দ্র যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাও সম্পাদক মহাশয় পাঠ করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলেন যে, প্রাণকৃষ্ণ দত্তের সমস্ত জীবন নিষ্কাম ধর্ম্মের একটী উজ্জ্বল উদাহরণ। অতঃপর

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও সম্পাদক মহাশয় ছাত্রসভ্য সুখবিন্দু সেনগুপ্ত বি এ মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করেন।

এই তিনটী প্রস্তাবের প্রত্যেকটি সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করেন।

৯। অতঃপর শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি, এল, মহাশয় নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী 'বল্লাল ঢিপি' নামক একটী স্তূপের ও বল্লাল দীঘির উল্লেখ করিয়া এই স্তূপ ও দীঘি সম্বন্ধে বিশেষ্ ভাবে অনুসন্ধান করার জন্য সাহিত্য-পরিষৎকে অনুরোধ করেন।

এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইলে পর স্থির হয় যে, পরিষদের কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতি যজ্ঞেশ্বর বাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে যথোপযুক্ত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের লিখিত কবিতার ন্যায় কবিতা গত দশ বৎসরের মধ্যে দৃষ্টি-গোচর হয় নাই।

১১। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সহঃ সম্পাদক	সভাপতি।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন।

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

সময়—২৫শে পৌষ রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা।

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ; বি, এল্—(সভাপতি)।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ বি,এল	শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস
রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী	,, রামেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ বিএল্	মৌলবি ওয়াহেদ হোসেন বিএল্
,, বরদাচরণ মিত্র এম্ এ, সি এস্	,, অনুকুলচন্দ্র বসু
,, বীরেশ্বর পাঁড়ে	মহম্মদ শ্রীযুক্ত মোজাম্মেল হক
,, ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী এল্ এম্ এস্	শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার বসু বিএ,
,, চারুচন্দ্র বসু	শ্রীযুক্ত চিন্তামণি সান্যাল
,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্এ	ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী
" যাদবচন্দ্র মিত্র
" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন
শ্রীযুক্ত অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বিএ
" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র
" মণিমোহন সেন
" অমরনাথ শর্ম্মা
" কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" সতীন্দ্রমোহন রায়
" নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
" সতীশচন্দ্র বসু
" পূর্ণচন্দ্র দত্ত
" বিনোদেশ্বর দাস গুপ্ত বিএ
" নরেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" হৃষীকেশ মিত্র
" আবদুল ওয়াহেদ
" হামেদুল হক্
" পশুপতিনাথ ঘোষ
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" রামকমল সিংহ
" পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু
" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" সতীন্দ্রসেবক নন্দী
" খগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
" অমৃতগোপাল বসু
" দ্বারকানাথ দাস
" নন্দলাল সিংহ এম্‌এ, বিএল্
" বেণীমাধব ঘোষাল

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্,এ (সম্পাদক)
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ } সম্পাদক
" ব্যোমকেশ মুস্তফী }

২। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌এ, বি এল ; মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীমহেশচন্দ্র সরকার	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসতীশচন্দ্র দে এম্, এ অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর কলেজ।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীভবানীচরণ সেন কালীতলা, দিনাজপুর।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র মিত্র এম্,এ ১ নং লাল ওস্তাগরের লেন।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীশচন্দ্র মিত্র এম্‌এ, বিএল্ ৪৮।১ বীডন রো।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
মেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীপিয়ারীলাল হালদার এম্,এ বি,এল্, ১৩ গৌর লাহার ষ্ট্রীট
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	সিদ্ধেশ্বর বাৎস্যবেদার্থী বেলুন, পাণ্ডুয়া।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	শ্রীগঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত এম্,এ, ময়মনসিংহ।
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনরসীজন জী, একবা ষ্ট্রীট।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীপুরুষোত্তম সিংহ বি,এ, ৬৮।৬ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।
মহারাজা শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী	কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়	মহারাজকুমার শ্রীগোপালদাস রায় ১১ নং চৌরঙ্গী লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি,এ, বি, এল ; ৩ রায়ের লেন।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুস্তফী দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট, বাগবাজার।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীকুঞ্জবিহারী মণ্ডল ডি, এল, এম্, এস্ ; ৫৬ বেণ্টিক ষ্ট্রীট।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	কবিরাজ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন ১৫ সেণ্ট্ জেম্স লেন।
		ছাত্র সভ্য
কবিরাজ শ্রীদুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীঅবনীকান্ত উপাধ্যায় কাব্যব্যাকরণতীর্থ
,,		শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র ভঞ্জ
,,		শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন ব্যাকরণতীর্থ
		শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীরামকমল সিংহ	মুন্সি মহাম্মদ মোজাম্মেল হক ২।১ ক্রীক রো।
	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী বি,এ, ৫৬।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি,এ, ৪১ মির্জাপুর ষ্ট্রীট।

৪। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহার প্রাপ্ত পুস্তকাদির জন্ত যথারীতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইল :—

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নন্দী ২০১। শিখ দুঃখকাব্য (স্বরচিত)

শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ ঘোষ ২০২। Maharsi Swami Dayananda Saraswati, ২০৩। গুরুকুল বিস্থালয় সম্বন্ধে নিবেদন, ২০৪। বেদবিষয়ে ইংরাজীমতের প্রতিবাদ—শশধর তর্কচূড়ামণি প্রণীত—২০৫। Sankhya-Yoga Karma-Yoga by Swami Atmananda.

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত ২০৬। কাব্যকণা (স্বরচিত)

মৌলবি শ্রীযুক্ত মোজাম্মেল হক ২০৭। জাতীয় মঙ্গল ঐ

শ্রীযুক্ত দৌলত আহম্মদ এম্ এম্ দাহার—
২০৮। The stair-case of improvement (স্বরচিত) ২০৯। রাজউৎসব ২১০। বঙ্গভিখারী, ২১১। হর্ষাষ্টক।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্,এ ২১২। রাজনারায়ণ বসুর আত্মজীবনী।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিস্থাসাগর সি, আই, ই
২১৩। ভ্রান্তিবিনোদ ২১৪। ভক্তির জয়, ২১৫। নিশীথ চিন্তা, ২১৬। প্রভাত চিন্তা, ২১৭। নিভৃতচিন্তা।

শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল চৌধুরী ২১৮। মণিপুরের ইতিহাস (স্বরচিত)

শ্রীমতী সরোজিনী দেবী ২১৯। আদর্শ জীবনী ঐ

শ্রীযুক্ত শশধর রায় ২২০। ভাষা—আদিরস এবং পরবশতা ঐ

Mr. Jules Bloch Castes-et-Diabates-En-Tamul (স্বরচিত)

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ২২২। খোকা-খুকির-খেলা (স্বরচিত)
২২৩। মা বা আহুতি ঐ

পুঁথি

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ বি,এ, মনসামঙ্গল (ক্ষেমানন্দ) ২। বিরাটপর্ব্ব (কাশীরাম দাস)
দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ —১। বঙ্গীয় শব্দাভিধান (১২৪৫ সাল)

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ মহাশয় ইস্পোলা নামক স্থানে প্রাপ্ত বৌদ্ধস্তূপের মধ্যস্থ স্বর্ণনির্ম্মিত ভস্মাধার ও পেশোয়ারে নবাবিষ্কৃত কণিষ্কস্তূপে প্রাপ্ত স্ফাটিক ভস্মাধারের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া জানাইলেন যে, গত বৎসর পেশোয়ারের নিকট যে ভস্মাধার পাওয়া গিয়াছে তাহাতে চারিটি খরোষ্ঠী লিপি আছে। কিন্তু তাহার তিনটি মাত্র স্পষ্টরূপে পাঠ করা গিয়াছে। এই তিনটি ভস্মাধারে কাহার ভস্ম রক্ষিত হইল এ সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই। চতুর্থ খোদিত লিপির যত টুকুর অস্তিত্ব আছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে তাহাতে বুদ্ধের কিম্বা বুদ্ধের অস্থি সম্বন্ধে কোনও কথা নাই। ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের অস্থি

যদি এই ভস্মাধারে রক্ষিত হইত, তাহা হইলে খোদিত লিপিতে নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ থাকিত। খোদিত লিপিতে বুদ্ধাস্থি সম্বন্ধে কোনও কথা না থাকায় প্রমাণ হইতেছে যে পেশোয়ারে আবিষ্কৃত অস্থি গৌতম বুদ্ধের নহে। বুদ্ধের মৃত্যুর ১২।১৩ শত বৎসর পরে হিউয়েনসং ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে গৌতম বুদ্ধ সম্বন্ধে এতদূর বিস্মৃতি ঘটিয়াছিল যে তিনি কতকাল পূর্ব্বে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, তাহা কেহই স্থির বলিতে পারিত না। সুতরাং কেবল একজনের উক্তির উপর বিশ্বাস করিয়া বুদ্ধাস্থি রূপ গুরুতর ব্যাপারের মীমাংসা হওয়া উচিত নহে। ইস্‌পোলা স্তূপের ভস্মাধারের ন্যায় শত শত ভস্মাধার গান্ধার দেশে নিত্য আবিষ্কৃত হইতেছে, কিন্তু কোনটিতে কাহার অস্থি আছে, তাহা একেবারেই বলা যায় না।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস মহাশয় "বাঙ্গালা ভাষায় স্ত্রী সর্ব্বনামের প্রয়োজনীয়তা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে উঠিয়া বলিলেন,—'আমি' ও 'তুমি' এই উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের সর্ব্বনামের লিঙ্গভেদ না করিলে চলে বলিয়াই কোন ভাষাতেই নাই। পারসী ও হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় লিঙ্গভেদে ক্রিয়ার রূপ-ভেদ হয় বলিয়া, সেই সকল স্থলে "আমি" ও "তুমি"র উদ্দেশ্য-পদের লিঙ্গ সহজেই বুঝা যায় কিন্তু 'আমি' 'তুমি' ভিন্ন অন্য সর্ব্বনামে অর্থাৎ তৃতীয় বা প্রথম পুরুষের সর্ব্বনামের লিঙ্গ-ভেদ না করিলে, অনেক সময়ে কাজ আটকায়; এই জন্য অধিকাংশ ভাষায় প্রথম পুরুষের দ্বিবিধ বা ত্রিবিধ লিঙ্গভেদ আছে। বাঙ্গালা ভাষায় লিঙ্গভেদে ক্রিয়ার রূপ ভেদও হয় না বা প্রথম পুরুষের সর্ব্বনামের লিঙ্গভেদও নাই। এজন্য ভাষায় অনেক স্থলে অর্থবোধের জটিলতা ঘটে, বিশেষতঃ আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থাদিতে বড়ই সঙ্কট উপস্থিত হয়। আমার গ্রন্থাদিতে এই সঙ্কট মোচনের জন্য অনেক বিচার বিতর্ক করিয়া প্রথম পুরুষের লিঙ্গভেদে শব্দভেদ করিতে হইয়াছে। আমি নূতন কিছু করি নাই, ভাষায় যাহা চলিত আছে, ব্যবহারে যাহাকে অল্প সংখ্যায় পাইয়াছি, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। এই রূপে পুংলিঙ্গে তিনি —সে রাখিয়াছি, স্ত্রীলিঙ্গে সা—তস্যা লইয়াছি। বাঙ্গালা প্রথম পুরুষের কর্ত্তাকারকে "তিনি" 'সে'-র স্ত্রীলিঙ্গে সংস্কৃত "সা" শব্দটি লইয়াছি, এইটি প্রথম গ্রহণ কিন্তু ঋণ নহে, অপহরণ নহে। যে সংস্কৃতের শব্দভাণ্ডার হইতে আমাদের মাতৃভাষার অধিকাংশ শব্দ লওয়া হইয়াছে, ইহা সেই সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারেই প্রাপ্ত। তস্যা শব্দটি পুরাতন দলীল দস্তাবেজ ও ভট্টাচার্য্য লিখিত প্রাচীন বাঙ্গালায় পাইয়াছি। সম্প্রতি বঙ্গবাসী পত্রিকায় রাণী ভবানীর যে পত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যেও এই সংস্কৃত শব্দটিই বাঙ্গালায় প্রথম পুরুষের সর্ব্বনামের স্ত্রীত্ব প্রকাশার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে আমার অন্যান্য যে সকল যুক্তি আছে, তাহা আমার প্রবন্ধে আমি বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছি, তাহা পড়িয়া শুনাইতে গেলে আপনাদের বিরক্তিকর হইবে। প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, আপনারা আমার প্রস্তাবের সারবত্তা, পোষণার্থ যুক্তি এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উদ্ভাবিত উপায়গুলি লইয়া আলোচনা করিতে পারিবেন। এ সম্বন্ধে আমি ডাঃ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি ; তাঁহারাও সঙ্কটের স্থলগুলি বিচার করিয়া প্রতিকার যে আবশ্যক, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। আমি যাহা ভাল বুঝিয়াছি, তাহা আমার গ্রন্থে চালাইয়াছি, হোমিওপ্যাথির ছাত্রেরা তাহা পড়িতেছে এবং তাহা দ্বারা তাহাদের এবং তাহাদের শিক্ষকদিগের কাজ বেশ চলিয়া যাইতেছে। এক্ষণে আপনাদের নিকট সাহিত্য পরিষদের নিকট বাঙ্গালা সাহিত্যের বিচক্ষণ লেখকদিগের এ বিষয় উপস্থাপনের উদ্দেশ্য এই যে, আপনারাও আমার মত এ বিষয়টা লইয়া আলোচনা করুন, চিন্তা করুন এবং কর্ত্তব্য অবধারণ করুন। প্রতিকারের জন্য আমি যে নকল শব্দ লইয়াছি, ভাল বোধ হয় সেইগুলিই রাখুন নতুবা উপযুক্ত শব্দ-নির্ব্বাচন করিয়া দিন, আমিও তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। এ সম্বন্ধে একদিনে কাজ হইবে না, এ সম্বন্ধে বিচার-বিতর্কের জন্য সময় আবশ্যক, আপনারা এ বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া কাজে অগ্রসর হউন, এই আমার প্রস্তাব।

তৎপরে উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় জানাইলেন যে তাঁহার প্রবন্ধ কিছু দীর্ঘ—পড়িতে সময় অধিক লাগিবে। সভাপতি মহাশয় এজন্য প্রস্তাব করিলেন যে উহা অন্য অধিবেশনে পাঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হইবে। এই প্রস্তাবে বিদ্যারত্ন মহাশয় সম্মত হইলে, তাঁহার প্রবন্ধপাঠ এ অধিবেশনে স্থগিত রহিল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার "বিক্রমপুরে সৌরপ্রভাব" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ ১৩১৬ সালের ফাল্গুন মাসের 'সুপ্রভাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। যোগেন্দ্র বাবু প্রবন্ধে স্থূলতঃ দেখাইয়াছেন যে, যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে বৈদিক কাল হইতেই ভারতে সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল। পুরাণবর্ণিত শাম্বোপাখ্যান হইতেও তাহাই সূচিত হয়। ক্রমশঃ সূর্য্য-পূজা ও সূর্য্য-প্রতিমা বাঙ্গলা দেশেও ছড়াইয়া পড়ে, শেষে পদ্মা, মেঘনার চর ও বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামেও যে এককালে অসংখ্য সূর্য্য-প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এখন ও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই স্থলে বক্তা মূলচর গ্রামে প্রাপ্ত এক সূর্য্য-প্রতিমার ফটোগ্রাফ দেখাইয়া বলেন এরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু সূর্য্য-প্রতিমা এখনও গ্রাম্যদেবতারূপে নানা নামে বিক্রমপুরের নানা গ্রামে পূজিত হইতেছেন। অতঃপর তিনি বিক্রমপুরে সূর্য্যপূজার এখন কি অবস্থা, সূর্য্যব্রতের নিয়মাদি বিবৃত করিয়া এবং আনু-সঙ্গিক বাঙ্গলার আরও দু এক স্থানের সূর্য্যপূজার কথা উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করেন। সূর্য্যোপাসনায় যে রোগ মুক্ত হয়, শাম্ব যে কুষ্ঠ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, রামায়ণে যে শত্রুবধার্থ রামের আদিত্য-হৃদয় স্তব পাঠের ব্যবস্থা দেখা যায় এবং সূর্য্যবরে দ্রৌপদীর অক্ষয় অন্নপাত্র লাভ হইয়াছিল, চিন্তাদেবী সূর্য্যবরে স্বরূপ লুকাইয়া কুরূপের আবরণে সতীত্ব রক্ষা করিতে পারিয়া-ছিলেন, যোগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধে এ সকল কথাও আছে।

ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী সূর্য্যরশ্মি দ্বারা ব্রণপীড়া আরোগ্যের কথায় বলিলেন, এক্স্‌-রের সাহায্যে কর্কট (Cancer) রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে।

পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বলিলেন, প্রবন্ধ বেশ মনোরম, ভাষা প্রাঞ্জল এবং বিষয়টি বিশদ ভাবে লিখিত হইয়াছে। কেবল বিক্রমপুর নহে, পূর্ব্ব বঙ্গের বহুস্থানে সূর্য্যপূজা, সূর্য্যব্রত আছে। খুঁজিলে সূর্য্যমূর্ত্তিও পাওয়া যায়। মগ ব্রাহ্মণেরাই আদি সূর্য্যপূজক নহে, তাহাদের অনেক আগে আর্য্যেরা সূর্য্যপূজা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

চাকমা-জাতির ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন, চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের মধ্যে ঠিক সূর্য্যপূজা নাই। চাকমা জাতি "বৃহৎ তারা" নামে এক জ্যোতির্ম্ময় তারকার পূজা করে। তাহাদের সেটি তারাই—সূর্য্য নহে। এই তারা-দেবতাই তাহাদের ধনধান্যের দেবতা। চট্টগ্রামের অধিবাসী মগদিগের মধ্যে সূর্য্যপূজা নাই। হিন্দু রমণীরা মাঘী শুক্ল রবিবারে কোন প্রসিদ্ধ স্থানে রবি-ব্রতের জন্য জড় হয়—স্থানটিকে সূর্য্যখোলা বলে। জ্যৈষ্ঠ-পুরা ও ফতেয়াবাদের সূর্য্যমেলা বিশেষ প্রসিদ্ধ। নিঃস্ব লোকেরাও ঘৃতদীপাদি দ্বারা পূজা করে।

কবিরাজ দুর্গানারায়ণ শাস্ত্রী বলিলেন, সূর্য্যের পূজা প্রতিমা দ্বারা কতকাল প্রচলিত হইয়াছে, তাহা যোগেন্দ্র বাবু বা বিদ্যারত্ন মহাশয় আমাদের বলিয়া দিলেন না। তাহা না জানিলে সূর্য্য প্রতিমা মগদিগের আনীত কি না বলা যায় না। চন্দ্রশেখর বাবুর প্রবন্ধ-সম্বন্ধে মীমাংসা বাঞ্ছনীয়। এজন্য বিশেষজ্ঞদিগের একটা সভা হওয়া আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বলিলেন, আউটশাহী গ্রামে ৭।৮ হাত উচ্চ সূর্য্যমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। ৫০।৬০ জন লোক ও পুষ্করিণীর গর্ভ হইতে ইহা উঠাইতে পারে নাই। বিক্রমপুরে এত সূর্য্যমূর্ত্তি কি করিয়া আসিল? ইহা অনুসন্ধান-যোগ্য।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, চন্দ্রশেখর বাবুর চেষ্টা প্রশংসনীয়, তবে তাঁহার প্রস্তাবের মীমাংসা শীঘ্র হইবার নহে. দশ বছরেও হইবে কি না সন্দেহ। বুঝিতে পারিতেছি, স্ত্রী সর্ব্বনামের প্রয়োজন ডাক্তার বাবুর যতটা হইয়াছে, সাধারণের হয়ত ততটা হইবে না। শব্দের আকার, শব্দের সংখ্যা, এমন কি, বাক্যের বিস্তৃতিও কমাইয়া দেওয়াই ভাষার একটা লক্ষ্য। অনেক ভাষায় স্ত্রী সর্ব্বনাম আছে বটে, আবার অনেক ভাষায় নাই। অনেক ভাষার সংস্কার হইয়াছে, সাতটা কারকের বিভক্তি এখন অনেকেই কমাইয়া দিয়াছে, অনেক ভাষা দ্বিবচন ত্যাগ করিয়াছে, বাঙ্গলাতে স্বভাবতঃ এগুলা নাই, এখন স্ত্রী-সর্ব্বনাম বাড়ান উচিত কি না, বাড়াইতে পারা যাইবে কি না, তাহা বিবেচ্য। এসম্বন্ধে পরিষদের কি কর্ত্তব্য তাহা কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে ঠিক করা যাইবে। যোগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের ভাষার ও রচনার পারিপাট্যের প্রশংসা করিতে হয়। সূর্য্য পূজা বহুকালের। বেদেও আছে আর যে দেশে বেদ নাই, সে দেশেও আছে। বাঙ্গালার সূর্য্য-পূজা ধার করা নহে, বেদের উপদেশ হইতেই সূর্য্য-পূজা বাঙ্গালায় চলিয়াছে। সূর্য্য-প্রতিমার উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণা আবশ্যক, তাহার পর অন্য কথার মীমাংসা হইতে পারিবে। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন
সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

স্থান,—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

সময়,—২৪শে মাঘ, ৯ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

উপস্থিত—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম্ এ।
,, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
,, বীরেশ্বর পাঁড়ে।
,, উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন।
,, অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।
কবিরাজ যোগেন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ এম্ এ।
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন।
,, বিরিঞ্চিমোহন সেন।
,, অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি,এ
,, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ
,, চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ বি, এল্।
,, মন্মথমোহন বসু বি, এ।
,, গোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু প্রামাণিক।
,, রামপদ সিংহ।
,, করুণাচন্দ্র মজুমদার।
,, যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র।
,, পুলিনবিহারী দত্ত।
,, গৌরহরি সেন।
,, হেমন্তকুমার কর।
,, গৌরগোপাল সেন।
,, তারাপ্রসন্ন সেন।
,, ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।
,, মাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার।
,, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ।
,, অমৃতগোপাল বসু।
,, তারকনাথ বিশ্বাস।
,, বরদাপ্রসন্ন মিত্র।
,, যোগেশচন্দ্র মিত্র।
,, নগেন্দ্রনাথ সেন (খুলনা)
,, সত্যেন্দ্রনাথ সেন।
,, যাদবচন্দ্র মিত্র।
,, হৃষীকেশ মিত্র।
,, অম্বিকাচরণ মিত্র।
,, আশুতোষ সিংহ।
,, নিশিকান্ত সেন।
,, ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
,, শ্রীশচন্দ্র বসু।
,, ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, করুণাকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
,, সুরেশচন্দ্র কুণ্ডু।
,, খগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।
,, বাণীনাথ নন্দী।
,, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
ডাক্তার শ্রীযুক্ত বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়।
,, সুরেশচন্দ্র সরকার।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (সম্পাদক)

হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত।
ব্যোমকেশ মুস্তফী (সহঃ সম্পাদক)

১। সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে রঙ্গপুরের পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, ১৫।২ সীতানাথ রোড।
	”	শ্রীসত্যচরণ বসু এম্, এ, ৩।১ ঈশ্বর ঠাকুরের লেন।
	”	শ্রীবেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায় এমারেল্ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক, সিমলা ষ্ট্রীট।
	”	শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র এম্ এ ২৩ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
	”	শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এটর্ণি, ৫নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
	”	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত ষ্টারথিয়েটার।
	”	শ্রীবিদ্যুৎপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার, প্রাসাদ, পাথুরেঘাটা।
	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্, এ, ১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্এ, বিএল, ১৬নং হরিশচন্দ্রের লেন ভবানীপুর।
শ্রীহেমন্তকুমার রায়	”	শ্রীসচ্চিদানন্দ লাহিড়ী ৫নং নীলমাধব সেনের লেন।
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু	”	শ্রীবিশ্বেশ্বর প্রসাদ ঘোষ ৪৭নং বীডন ষ্ট্রীট।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	”	শ্রীদেবব্রত বিদ্যারত্ন এম্, এ, ১৩নং ঘোষের লেন

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ৯নং ভীমঘোষের লেন।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসতীশচন্দ্র রায় Private Secy, Moharaj-Kumar Gopal Lal Ray. ১১ নং চৌরঙ্গী লেন।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দী ১১নং আপার সার্কুলার রোড।
শ্রীহেমেন্দ্রমোহন বসু	ঐ	শ্রীযামিনীমোহন মিত্র এম্ এ, Personal Assistant to the Registrar, Co-operative Credit Society. Bengal Writers Bdg. Calcutta.
শ্রীসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়		শ্রীজীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ বঙ্গবাসী কলেজ ৪১নং হ্যারিসন রোড।
		শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি,এ ৬৪নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
		শ্রীনীহারচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৭৫।১নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব	শ্রীসুবলকৃষ্ণ বসু ১২নং নীলমণি মিত্রের লেন।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসারদাচরণ মিত্র	শ্রীসতীশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫নং বেনেটোলা লেন।
শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব	শ্রীজীবনকৃষ্ণ বসু ১২।১ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট।
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীউমেশচন্দ্র বসু ২৮।২ অখিল মিস্ত্রীর লেন।
	ঐ	শ্রীরেবতীমোহন সেন ২৮।২ অখিল মিস্ত্রীর লেন।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন, এম্ এ,বি, এল্ অধ্যক্ষ হেতমপুর কলেজ।
	ঐ	শ্রীসন্তোষচন্দ্র গুপ্ত, এম্ এ, সব্ ডেপুটী, সিউড়ী বীরভূম।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন, বি এল, Extra Asst. Commr. Naogaon.
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীনারায়ণদাস মজুমদার, এল্.এম্ এস্, নশীপুর মুর্শিদাবাদ।
শ্রীসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীঅবনীনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্, এ, ১০৬।৯ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র বসু, ৬৩ বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীশিশিরকুমার দত্ত, ৫৬ বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীরাধারমণ সিংহ, ৫৬ বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
	"	শ্রীহরিপদ মৈত্র, বি, এ, ২৯।১১ মদন মিত্রের লেন।
শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	"	শ্রীদিগেন্দ্রনাথ সেন, সাক্রাইল, টাঙ্গাইল।
শ্রীপ্রমথনাথ নন্দী	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এল্, এম্, এস্, Junior Medical officer.Haddo, Port Blair.
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	"	শ্রীনীলমণি চক্রবর্ত্তী, এম্, এ, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ।
"	"	শ্রীপশুপতিনাথ মিত্র, এম, বি,
শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরেবতীমোহন দাশগুপ্ত, এম, এ, Hd. Asst. Municipal Dept. E.B.& Assam Secretariat. Shillong.
"	"	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন, Teacher. Govt. High School. do.
"	"	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, Laban Lodge, Shillong.
"	"	শ্রীকামিনীমোহন সেন, Laban Lodge, Shillong.
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্, এ, E. B. & Assam Secretariat Financial Dept, camp-Office Dacca.

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীহেমচন্দ্র সেন, E. B & Assam Secretariat General Dept. Shillong.
শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহরিনাথ ঘোষ, কাম্বেল হাঁসপাতাল।
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, কোন্নগর।
শ্রীললিতমোহন দে	„	শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, Sub-Divisional Officer P. W. D. Construction Division No. 2. Rangoon.
শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী	শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষাল কশবা ঢাকুরিয়া ২৪ পরগণা।
„	„	শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন ১৫ সেণ্টজেমস্ লেন।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীতারাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত বি, এ, ৭নং মধুসূদন গুপ্তের লেন।
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক বিএ ৫৭নং হ্যারিসন রোড।
		ছাত্র সভ্য—
	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীঅতুলচন্দ্র দাশগুপ্ত তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী, সংস্কৃত কলেজ।

অতঃপর নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকগুলির জন্য উপহারদাতৃদিগকে কৃতজ্ঞতা জানান হইল ;—

উপহার-দাতা	উপহৃত পুস্তকাদি।
১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২২৪। রাঙ্গা পা দুখানি (রসিক লাল দে)
	২২৫। কলাপ ব্যাকরণ সন্ধিবৃত্তি—নবীনচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ
	২২৬। „ „ চতুষ্টয় বৃত্তি „ „
	২২৭। পুষ্পাঞ্জলি—রসিকলাল দে
২। শ্রীযুক্ত শশধর রায়	২২৮। উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—১ম ভাগ
৩। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন	২২৯। বিবিধ ধর্ম্মসঙ্গীত (সঙ্কলিত)
৪। শ্রীদাউদ আহম্মদ	২৩০। নববোধ (স্বরচিত)

উপহার-দাতা — উপহৃত পুস্তকাদি

৫। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি এস্‌সি; এফ্ জি, এস্; এম্, আর্, এ, এস্;—

২৩১। Hindu Civilisation under British Rule Vol. 1

২৩২। " " " 2

২৩৩। " " " 3

২৩৪। Essays, lectures on the Industrial Development of India & of the Indian subjects.

২৩৫। Note on the geology and mineral resources of Mayurbhanj.

২৩৬। " " of the Rajpipla State.

২৩৭। " " of. Narnaul District (Patiala State)

২৩৮। " " of Sikkim.

২৩৯। Notes on the Geology of a part of the Tenassarim valley with special reference to the Tendaw Kamanying coalfield

২৪০। Report on the Umrileng coal beds, Assam.

২৪১। Note on granite in the Districts of Tavoy and Margui.

২৪২। The Darjeeling coal between the Lisu and Ramthi rivers, explored during Season 1889-90.

২৪৩। Memoirs of the Geological Survey of India Vol XXI, part 1.

৬। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ এম্ ডি — ২৪৪। Life of Dr. Mahendralal Sarkar

৭। " সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি,এ — ২৪৫। শেফালি

৮। " পুলিন বিহারী দত্ত — ২৪৬। কাব্যকণা

পুথি।

৯। শ্রীযুক্ত কামিনী নাথ রায় — ১। চৈতন্য ভাগবত (সম্পূর্ণ)

২। চৈতন্যদেবের হস্তাক্ষরের ফটো

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, গত বুধবারে বঙ্গের অদ্বিতীয় পণ্ডিত, সর্ব্বদেশমান্য বিদ্বান্ মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। বঙ্গভাষার উন্নতি ও পুষ্টি সাধনের নিমিত্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্ম। যিনি মাতৃভাষার পুষ্টির জন্য, সৌষ্ঠববর্দ্ধনের জন্য অন্য ভাষার রত্নগুলি অনুবাদ করিয়া মাতৃভাষায় আনিয়া দেন, তিনি মহামনা মহাপুরুষ। পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের ফেলোশিপের বক্তৃতামালা বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত দর্শন-শাস্ত্রের জ্ঞান-প্রচারে যেরূপ সাহায্য করিয়াছে, বঙ্গসাহিত্যকে যেরূপ পুষ্ট করিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। গত বুধবারে সেই চন্দ্রকান্ত সমস্ত দেশ কাঁদাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার ন্যায় রত্নকে যথার্থই চন্দ্রকান্তমণি স্বরূপ পণ্ডিত-

বর চন্দ্রকান্তকে ময়মনসিংহের নিভৃত প্রদেশ হইতে সন্ধান করিয়া আনিয়া সংস্কৃত কলেজে স্থাপন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত চন্দ্রকান্তের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সেকালের গভীর জ্ঞানবিশিষ্ট পণ্ডিত সমাজের শেষ উজ্জ্বল-রত্ন অন্তর্হিত হইল। আরও দুঃখের বিষয় অতি অল্প দিনের মধ্যে ময়মনসিংহ তাহার দুইটি উজ্জ্বলমণি চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত সদৃশ পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত ও মহারাজ সূর্য্যকান্তকে হারাইল! আমি প্রস্তাব করিতেছি পরিষদের পক্ষ হইতে গভীর শোক ও সমবেদনা তাঁহার পুত্রগণকে জানান হইবে।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন আমাদের অদ্যকার বিজ্ঞাপন পত্রে এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত নাই, তাহার কারণ পত্র ছাপা হইয়া যাইবার পর এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। পরিষদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট স্নেহ এবং শ্রদ্ধা ছিল। পরিষদের এই মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় তিনি পীড়িত ছিলেন, তথাপি ইহার প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধাবশতঃ তিনি গাড়ী ভাড়া করিয়া আসিয়া উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন এবং স্বরচিত শ্লোকে ইহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। পরিষৎ তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতকে বিশিষ্ট সভ্যের পদ দিয়া তাঁহার মান-মর্য্যাদা কিছুই বাড়াইতে পারে নাই, কিন্তু নিজের গৌরব যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছিল। তিনি কয়েকবার পরিষদের সহকারী সভাপতিও হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের স্মৃতিরক্ষার্থ একটা কিছু করা আবশ্যক। আমি ইতিমধ্যেই একটু চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাঁহার স্বদেশী এবং আমাদের সকলেরই সুপরিচিত ও শ্রদ্ধার্হ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল, গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, সেরপুরের জমিদার এবং বিজ্ঞান-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি, এ, বি এস সি, ময়মনসিংহের প্রধান জমিদার মহারাজকুমার শশিকান্ত আচার্য্য বাহাদুর, শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী ও হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়গণকে লইয়া এ বিষয়ে কর্ত্তব্য অবধারণ করিবার জন্য একটি সমিতি গঠিত করিয়াছি। ইহার কার্য্যপ্রণালী পরে স্থির হইবে। এক্ষণে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া অনুরোধ যে এই শোক প্রস্তাব আমরা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করি।

রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবমত সভাস্থ সমস্ত লোক দণ্ডায়মান হইয়া পণ্ডিতবরের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিলে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় ৺পিয়ারীচাঁদ মিত্র (টেক চাঁদ ঠাকুরের) তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া উহার প্রতিষ্ঠাকল্পে বলিলেন, পিয়ারীচাঁদ আমাদের বাল্যকালেই আমাদের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন, কেবল আমাদের বাল্যকালেই বা কেন, বঙ্গভাষার বাল্যকালেই তিনি সর্ব্ব-পরিচিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার রচনাগুলি সর্ব্বজন বিদিত ও সর্ব্বত্র প্রশংসিত। এক সময়ে 'টেক চাঁদী' ভাষা 'আলালী' ভাষার উপর মহা আক্রমণ চলিয়াছিল বটে কিন্তু কালে সেই অনাড়ম্বর, সরল, সহজ রচনা প্রণালীই দেশগ্রাহ্য ও দেশ-ব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা যেমন পিয়ারীচাঁদের কৃতিত্বের পরিচায়ক, তেমনি ভাগ্যেরও পরিচায়ক। তাঁহার ন্যায় সাহিত্যিকের ছবি এই সাহিত্য-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ইহারও গৌরব বৃদ্ধি হইল।

এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় জানাইলেন, ছবিখানি মৃত মহাত্মার অন্যতম পৌত্র নাগপুরের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। তিনি উপস্থিত নাই কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ ও আত্মীয়বর্গ আজ এখানে উপস্থিত আছেন। আমি তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন, কেবল এই ছবিখানিই নহে, আমরা উঁহাদের নিকট হইতে মৃত মহাত্মার ইংরাজী ও বাঙ্গালা হস্তাক্ষরও দুইটি প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি পাইয়াছি। ইহাও আমাদের চিত্রশালায় অতি মূল্যবান বস্তুরূপে রক্ষিত হইবে। আরও একটি দ্রব্য যাহা উহঁাদেরই বদান্যতায় আমরা পাইয়াছি, তাহার দ্বিবিধ মূল্য এবং পরিষদের পরম আদরের। এখানি সমাচার চন্দ্রিকার সম্পাদক ৺ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রকাশিত হরিতালাক্ত কাগজে মুদ্রিত শ্রীমদ্ভাগবত। এই গ্রন্থখানিই একখানি দুর্লভ পদার্থ, সুতরাং ইহা সংগৃহীত হওয়াতে পরিষৎ পুস্তকালয়ের গৌরব বর্দ্ধিত হইল এবং এই পুথিখানি স্বর্গীয় পিয়ারী চাঁদের অতিমাত্র প্রিয় ও সর্ব্বদা পাঠের বস্তু ছিল বলিয়া তাঁহার স্মৃতির একটি নিদর্শন স্বরূপ ইহার আরও আদরের কারণ রহিয়াছে। আমি প্রস্তাব করি, এই সকল দানের জন্য দাতৃদিগকে যথারীতি কৃতজ্ঞতা জানান হইবে। এই উপলক্ষে ব্যোমকেশ বাবুর লিখিত প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় কুমার-সম্ভবের "হরযোগভঙ্গ" দৃশ্য অবলম্বনে অঙ্কিত একখানি রঞ্জিত লিথোগ্রাফ ছবি উপহার দিয়া বলিলেন,—৪০ বৎসর পূর্ব্বে এই ছবি ও ইহার জোড়া মদন-ভস্মের ছবি একখানি ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাইয়াছিলেন। বিষবৃক্ষের ৪৪শ পরিচ্ছেদে (স্তিমিত-প্রদীপে) সূর্য্যমুখীর শয়নকক্ষের বর্ণনায় যে সকল ছবির বর্ণনা আছে, তাহার মধ্যে "একখানি কুমারসম্ভব হইতে নীত" বলিয়া বঙ্কিম বাবু যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার আদর্শ ছবি এই খানি। এইখানি অবশেষে বঙ্কিম বাবু তাঁহার "ক্ষণভিন্ন সৌহৃদ" আমার পিতা ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়কে উপহার দিয়াছিলেন। ছবিখানির বঙ্গসাহিত্যে প্রথম উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে উল্লেখ আছে বলিয়া এবং এদেশীয় লিথোগ্রাফ ছবির একখানি প্রাচীন নিদর্শন বলিয়া পরিষৎ-চিত্রশালায় রক্ষিত হইবার উপযুক্ত মনে করিয়াই অদ্য পরিষদে আনিয়াছি। ইহার যুগ্মক মদনভস্মের ছবিখানির অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু পাই নাই। অতঃপর ললিতবাবু বিষবৃক্ষ হইতে বঙ্কিম বাবুর বর্ণনা পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন,—গত রাসপূর্ণিমার দিন পূর্ণিমা-মিলনের সভায় ললিত বাবু এই ছবিখানি দানের কথা আমায় বলেন। উহার যুগ্মকখানি আমারও দেখা ছিল, সুতরাং উহা পাওয়া যাইবে না শুনিয়া আমি উহার অনুসন্ধান করিতে ছিলাম। আপনাদের ক্ষোভের কারণ নাই,—ছবিযুগ্মকও একের অভাবে 'জোড়ভাঙ্গা' হইয়া থাকিবে না। শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার বাড়ীর প্রাচীন চিত্রাবলীর

মধ্য হইতে এই 'মদনভস্ম' ছবিখানি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। (উভয় ছবিই প্রদর্শিত হইল)।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্,এ মহাশয় প্রাচীনকালের পটুয়ার হাতের আঁকা কৃষ্ণকালী ও দুর্গার দুইখানি ছবি এবং অভ্রের উপরে আঁকা উষ্ট্রারোহী কোন হিন্দুস্থানী রাজা বা বণিকের মূর্ত্তির ছবি উপস্থাপিত করিয়া জানাইলেন, এই প্রাচীন ছবিগুলি জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় পরিষদে উপহার প্রদান করিয়াছেন। আমি প্রস্তাব করি ললিত বাবু, গোপেন্দ্র বাবু এবং মণীন্দ্র বাবুকে এই সকল উপহারের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান হইবে।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় "সংস্কৃত ভাষাই সমস্ত আর্য্য-ভাষার আদি জননী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ 'উপাসনা' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। প্রবন্ধের সারাংশ এই,—দেবগণ যখন তাঁহাদের পিতৃভূমি, দেবভূমি, আদি স্বর্গপ্রদেশ (আধুনিক মঙ্গোলিয়া) হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্বে চীন ও পূর্ব্ব-উপদ্বীপে পশ্চিমে অন্তরীক্ষ অর্থাৎ আফগানিস্থান, পারস্যদেশে, উত্তরে (উত্তরকুরু সাই-বিরিয়া) ও দক্ষিণে ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের সকলেরই একভাষা ছিল। সেই ভাষা অসংযত ছিল, তাহার ব্যাকরণ ছিল না। অন্যান্য দেবতার অনুরোধে ইন্দ্র প্রথমে তাহার ব্যাকরণ করিয়া তাহাকে সংস্কৃত করেন। যে দেবতারা প্রথমে ভারতে বাস করেন,—তাঁহারা এদেশে আসিয়া আপনাদিগকে আর্য্য (Lord) নামে অভিহিত করেন। ভারতবর্ষ হইতে এই আর্য্যগণ আবার পশ্চিমদিকে তুরস্ক, আরব, তাতার, পারস্য, ইউরোপ ও আফ্রিকায় গমন করেন। এইরূপে আর্য্যগণ যখন নানা দেশে অভিযান করেন, তখন তাঁহাদের এই সাধারণ ভাষা সংস্কৃতেই তাঁহারা কথোপকথন করিতেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহা কোথাও অবিকৃত কোথাও বা বিকৃতভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। কালে যখন চীন, জাপান, প্রভৃতি পূর্ব্বদেশে, গ্রীস, ইতালি, ফ্রান্স, পারস্য, আরব, তুরস্ক, প্রভৃতি পশ্চিম দেশে আর্য্য-বাস বর্দ্ধিত হইতে লাগিল তখন সেই সমস্ত দেশেই আর্য্যগণের নীত আদিম সংস্কৃত ভাষাই দেশকাল-ভেদে বিকৃত হইয়া নানা দেশ-ভাষা উৎপাদন করিয়াছিল। পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ যে সমস্ত ভাষাকে আর্য্যভাষা ও সেমিটীক ভাষা এই দুই পরস্পর বিপরীত রীতির শ্রেণীতে বিভাগ করেন, তাহা ঠিক নহে। সকল ভাষারই আদি জননী সংস্কৃত। অতঃপর বক্তা তাঁহার মত সমর্থন ও ব্যাখ্যার জন্য কতকগুলি ইংরাজী, কতকগুলি আরবী, কতকগুলি গ্রীক, কতকগুলি ল্যাটিন, কতকগুলি হিব্রু, কতকগুলি জাপানী ভাষার শব্দ লইয়া আলোচনা করেন এবং বর্ণব্যত্যয়বিধির সাহায্যে ঐ সকল শব্দের মূলই যে সংস্কৃত শব্দ ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া বলেন যে, ইহার আলোচনা অল্প সময়ে হইবার নহে। বিকার বহুবিধ প্রকারে বহুকালে হইয়াছে, বহু চেষ্টায় সে সকল বিকার খুঁজিয়া বাহির করিলে তবে এ প্রস্তাবের সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে। আমি বিভিন্ন ভাষা হইতে

মোটামুটি কতকগুলি শব্দ ও তাহার মূল সংস্কৃত শব্দের তালিকা উল্লেখ মাত্র করিলাম। বর্ণব্যত্যয়বিধির নিয়মাদি ধরিয়া প্রত্যেক শব্দের বিকার সাধনার ইতিহাস আলোচনা সভায় দাঁড়াইয়া হইবারও নহে। এ সকল কথার মূলে যে সত্য আছে, তাহা পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিজ্ঞাপিত করাই আমার উদ্দেশ্য। তাঁহারা পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্বান্বেষীদিগের সিদ্ধান্ত দ্বারা বিপথে নীত না হন, ইহাই আমার অনুরোধ। নিজেরা সকলে পড়ুন, দেখুন, চিন্তা আলোচনা করুন, শব্দবিশ্লেষণ করুন, বর্ণব্যত্যয়বিধির নিয়মাদি আবিষ্কার করুন, দেখিবেন এই সংস্কৃত সকল ভাষার আদি জননী। এ সকল কথা আমার কল্পনাপ্রসূত নহে। এ সকল জগতের আদি-গ্রন্থ বেদে সুস্পষ্ট উল্লিখিত আছে। তবে কোথাও কোথাও অর্থ-বোধের জন্য শঙ্কর, সায়ণ, দুর্গাদাস, মহীধর, যাস্ক প্রভৃতির অর্থের অনুসরণ করিলে চলিবে না। তাঁহারা প্রাচীন কালের ব্যক্তি, তাঁহারা ঋষি-কল্প ব্যক্তি, তাঁহাদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তি রাখিতে হইবে বলিয়া তাঁহাদের ব্যাখ্যা যে সর্ব্বত্র অভ্রান্ত এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লইলে চলিবে না অথচ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তাঁহাদের ব্যাখ্যার অপ-ব্যাখ্যা বা বিকৃত ব্যাখ্যা করিতে হইবে এরূপ অনুরোধ আমি করি না। এই ব্যাকরণ, এই অভিধানের সাহায্যেই ব্যাখ্যা করিয়া লইতে হইবে, তবে কেবল যুক্তিকে প্রধানরূপে অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। এই বলিয়া বক্তা ঋগাদি বেদ হইতে বহু মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া এবং তাহার পরিপোষণার্থ অন্যান্য শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত করিয়া স্বমত প্রতিপাদনে চেষ্টা করিলেন।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় বক্তাকে তাঁহার গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের জন্য প্রশংসা করিয়া, তাঁহার সাধুচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা ও তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়া প্রস্তাব করিলেন, প্রবন্ধটি পরিষৎ পত্রিকায় বিশুদ্ধরূপে প্রকাশ করা উচিত। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় কবিরত্ন মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন, এ সকল প্রবন্ধ স্থির-ধীরভাবে পাঠ করিতে না পারিলে এ প্রবন্ধে কিছু বলা যায় না, করাও যায় না। আমার বহু প্রবন্ধে এই সকল বিষয়ে অনেক কথার আলোচনা বহু পূর্ব্বেই আমি করিয়াছি। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

তৎপরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম্,এ মহাশয় বক্তার ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সারগর্ভ আলোচনার জন্য প্রশংসা করিয়া বলিলেন, এই গুরুতর বিষয়ে অল্পবয়স্ক শ্রোতৃবর্গের আগ্রহ না থাকিলেও প্রবীণ ব্যক্তিরা সুতৃপ্ত হইয়াছেন। তবে সমস্ত বিষয়েই যে বক্তার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সকলে একমত হইতে পারিয়াছেন, তাহা নহে,—তাহা হইতেও পারে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই যে সমস্ত অভ্রান্ত সত্য, তাহা আমরা স্বীকার করি না। তাঁহাদের মতে পাণিনি ২০০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। আমরা এ কথা স্বীকার করি না। বক্তা যে তাঁহার প্রবন্ধে সংস্কৃত ভাষার পূর্ব্বে একটা অসংবত ভাষা থাকার কথা বলিয়াছেন, পাণিনিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'চিদ্মরং ও চিন্ময়ং' এই দুই শব্দের মধ্যে পাণিনি প্রথমটিকে ভাষা ও পরেরটিকে শুদ্ধ শব্দ

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার 'ত্রিম্বক' শব্দ ছান্দসি অর্থাৎ ছান্দস রচনায় দেখা যায়; কিন্তু পাণিনি বিশুদ্ধ 'ত্র্যম্বক' শব্দই ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। আর্য্য-ভাষার কথায় একটা কথা বলিতে হয়,—আমরা আর্য্য না অনার্য্য ইহাই এখন বিচার্য্য দাঁড়াইয়াছে। আর্য্য ও অনার্য্যের নির্ব্বাচন এখন গণ্ডাস্থি ভালাস্থি ও করোটীর গঠনের উপর নির্ভর করে। জর্ম্মণিতে পুরাকালে সাতটি মানবমণ্ডলী ছিল, তাহাদের গঠন-ভেদ ছিল। ইহাদের মধ্যে পাঁচটি মণ্ডলের বংশধরের বর্ত্তমানতা প্রমাণিত হইয়াছে, অপর মণ্ডল দুইটির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। কেহ কেহ দয়া করিয়া বলেন,—আমরা হিন্দুরা ঐ দুটির মধ্যে একটির বংশধর হইলেও হইতে পারি। তবে নাকি আমাদের গণ্ডাস্থির পরিমাণ তদনুকূল নয়। যাঁহারা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করেন, তাঁহারাও বলেন, আর্য্য-ভাষার লক্ষণ যখন বিভক্তিযোগে শব্দরূপের পরিবর্ত্তন (Inflectional) তখন তোমরা আর্য্য হইলেও হইতে পার। অতএব সমস্ত ভাষার মূল যে আমাদের এই সংস্কৃত ভাষা, ইহা আমাদের প্রমাণ করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইবে; বহু আলোচনা, গবেষণা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিতর দিয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায় বলিলেন, সাহিত্য-পরিষদের প্রতি নিবেদন এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত সত্যটি যাহাতে কেবল বাঙ্গালা ভাষায় আবদ্ধ না থাকে, বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া পণ্ডিত সমাজের গোচরীভূত হয়, তাহার জন্য পরিষৎ চেষ্টা করুন। এ সকল কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যেও প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, বিদ্যারত্ন মহাশয় আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তিনি আমাদিগকে অনেক গবেষণার কথা শুনাইয়াছেন। সংস্কৃত আদি ভাষা ইহা বিশ্বাস করিবার হেতু আছে। তিনি অনেক ভাষার উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি ভাষারও যে আদি-জননী তাহা এখনও সর্ব্বত্র গ্রাহ্য নহে। অধ্যাপক Mann সাহেব প্রত্যেক Saxon শব্দকে সংস্কৃত করিতেন। 'Self' শব্দকে তিনি 'স্ব' শব্দের রূপান্তর প্রমাণ করিয়া দিতেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যেও কেহ কেহ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত এক-মতাবলম্বী। এই সকল বিষয়ের আলোচনায় যে কেবল ভাষাতত্ত্ব বুঝা যায়, এমন নহে। আমাদের শব্দতত্ত্বের আলোচনায় ঋষিরা ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা দেখাইয়া গিয়াছেন—শব্দই ব্রহ্ম। শুধু শব্দ কেন, আমরা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বলিয়া জ্ঞানের সাধন করিয়া থাকি, তেমনি স্বদেশী বিদেশী সকল শব্দ লইয়া আলোচনা করিলে হয় ত কালে নিশ্চিতরূপে পণ্ডিত উমেশচন্দ্রের উক্তি,—সংস্কৃতই সকল ভাষার আদি জননী বলিয়া বুঝিতে পারিব, সমস্তই সংস্কৃতময় দেখিব।

পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ শিক্ষাপ্রদ ও প্রয়োজনীয়। ইহা কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া আলোচিত হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়। পরে কিশোরীবাবুর প্রস্তাব মত অনূদিত হইলেই চলিবে।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন,—আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি। পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশিত হইতে এখনও ৪।৫ মাস বিলম্ব হইবে, সুতরাং ছয় মাস পরে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া অপেক্ষা অন্য কোন পত্রিকায় বাহির হইলে বিশেষ আনন্দের হইবে এবং আজ এ বিষয়ে বিদ্বান্‌দিগের যে আগ্রহ দেখা গেল, তাহাও তৃপ্ত হইবে। বিদ্যারত্ন মহাশয় যে বিষয় প্রতিপাদনে অগ্রসর হইয়াছেন অথবা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন,—ইহার জন্য দেশীয় এবং বিদেশীয় বহুভাষাবিৎ পণ্ডিতগণের একযোগে আলোচনা প্রয়োজন। তাঁহার প্রদত্ত উদাহরণরাশির তালিকা ও শব্দ প্রকাশিত হইবে। পরিবর্ত্তনের নিয়মাদির আলোচনা আবশ্যক। অতএব ইহা যত শীঘ্র প্রকাশিত হয় ততই ভাল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, বিদ্যারত্ন মহাশয় আজ আমার মত নবাগত অতিথিকে যে উপঢৌকন দিলেন, তাহা আর কখন পাই নাই। সংস্কৃত হইতে সকল ভাষার উৎপত্তি একথা সকলে স্বীকার করেন না,—কেহ কেহ আবছায়া রকমে স্বীকার করেন। সাহেবেরা হাতে কলমে লেখা পড়ায় একথা স্বীকার করিতে বড় রাজি নহেন। ভারতটা বড় প্রাচীন দেশ, বেদগুলা অতি প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন, অতএব হিন্দুরা বড় প্রাচীন সভ্যজাতি, ইহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ না দেখাইলে ইউরোপ সভ্য হয় না, আভিজাত্য থাকে না, তাই প্রথম প্রথম ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃতের সহিত গ্রীক লাটিনের সম্পর্ক স্বীকার করিতেন। তাহার পর কি জানি কেন, তাহা ভাল লাগিল না, হিন্দুদিগকে আর আর্য্য বলিতে তাঁহারা রাজি নহেন। লোকগণনার সময় রিজ্‌লি সাহেব রঙ্গপুরে ছিলেন। জাতিতত্ত্ব আলোচনা করিতেন। একদিন একটা শ্মশান হইতে একটা রাজবংশী-জাতীয় লোকের মড়ার মাথা আনাইয়া মাপ করিয়া বলিলেন,—তোমরা আর্য্য নও এটা ঠিক, আর আমরা আর্য্য কি না ঠিক জানি না, স্কান্দিনেবীয়গণই ঠিক আর্য্য। আমি বলিলাম, আমরা তবে কি?—সাহেব বলিলেন তোমরা সঙ্কর। আমি সেলাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। ইউরোপ এখন সেয়ানা হইয়াছে, আর্য্যামির দিক্ দিয়াও আমাদের—নেটিভদের সহিত আর মিলিতে চাহে না। যাহা হউক, সগররাজের সময় যখন এদেশের কতকগুলি ব্যক্তি দণ্ডিত হইয়া বিভিন্ন দেশে যাইয়া বাস করে, তখন তাহাদের ভাষা বিভিন্ন দেশে গিয়া কালক্রমে বিভিন্ন ভাষারূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। আরবী পারসীর সহিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য নাই ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন, কিন্তু আরবী আল্লা শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণ দ্বারাও ঈশ্বরার্থ শব্দ বলিয়া গণ্য করা যায়। রহিম ও করীম শব্দ দুই বীজমন্ত্রের একীভূত বলিয়া মনে হয়, আপ, জল, বাত, বায়ু ইত্যাদি। এ বিষয়ে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গবেষণা বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছে। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

১০ম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা।

উপস্থিত সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্, এ, বি, এল্, (সভাপতি)
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (বেদান্তরত্ন) এম্, এ, বি, এল্,
„ বীরেশ্বর পাঁড়ে
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
কবিরাজ „ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
„ কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় বি, এ,
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ মন্মথমোহন বসু বি, এ,
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ,
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ চারুচন্দ্র মিত্র এম্, এ, বি, এল্,
„ চারুচন্দ্র বসু
„ সুরেশচন্দ্র সরকার
„ যাদবচন্দ্র মৈত্র
„ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
পণ্ডিত „ উমাপতি দত্তজী পাঁড়ে বি, এ,
„ বোধিসত্ব সেন এম্, এ,
„ সতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ,
„ হেমন্তকুমার কর
„ নরেশচন্দ্র সিংহ এম্, বি, এল্,
„ রামকমল সিংহ
„ কুঞ্জবিহারী মণ্ডল
„ রণজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
„ বিমানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ পশুপতি দত্ত
„ নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এ,
„ মনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ,
„ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ কুঞ্জবিহারী দত্ত
„ নরেন্দ্রনাথ শেঠ এম্, এ, বি, এল্,
„ রামহরি ভঁড় বি, এল্,
„ সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়
„ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী
„ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ হরিপদ মৈত্র বি, এ,
„ শ্রীশচন্দ্র বসু
„ ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ডাক্তার „ পশুপতিনাথ ঘোষ
„ পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র সেন
„ রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় }
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ সম্পাদক।

২। সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্, মহাশয় উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে সভাপতির আসন প্রদান করেন।

৩। অতঃপর পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৪। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইল—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীবিনয়কুমার সেন এম্, এ, ১৩নং কড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট।
শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীশিবশঙ্কর সাহা ৬৭নং নিমুগোস্বামীর লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ ৩নং পদ্মনাথ লেন।
শ্রীবৈদ্যনাথ সাহা	,,	শ্রীললিতমোহন রায় এম্.এ.বি.এল্ উকীল ভাগলপুর।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীচন্দ্রশেখর সরকার এম্.এ.বি,এল ভাগলপুর।
,,	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বি, এল্, ভাগলপুর।
শ্রীকুমার শরৎকুমার রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন সিংহ, ভাগলপুর।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীচারুচন্দ্র বসু এম্, এ, বি,এল্, ভাগলপুর।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মনসুরগঞ্জ, বাঙ্গালীটোলা, ভাগলপুর।
	,,	শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল এম্, এ, T. N. Jubilee College, Bhagalpur.
	,,	শ্রীসুধাংশুভূষণ রায় বি, এল্, ১৭নং কোতোয়ালী রোড, ভাগলপুর।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীকুমুদনাথ চক্রবর্ত্তী এম্, এ, অধ্যাপক, টি, এন্, জুবিলি কলেজ, ভাগলপুর।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	রায় শ্রীপূর্ণচন্দ্র মৌলিক, বাহাদুর, এম্ এ বিএল্ ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট, জাজপুর, কটক।
শ্রীবানীনাথ নন্দী	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরাখালচন্দ্র পালিত এম্ এ বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল কলেজ
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীপ্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্এ, বিএল, রাঁচি।
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনরেন্দ্রমোহন চৌধুরী ৬৫ হরিশ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
		শ্রীরামরতন চট্টোপাধ্যায় ১১নং চাউলপটি রোড।
শ্রীসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীললিতমোহন কর কাব্যতীর্থ এম্এ, ডুপ্লে কলেজ চন্দননগর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীললিতমোহন দে	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী বিএ, বি,এল of the firm of Messers Singha & Roy Chowdhury, Advocate, Rangoon.
শ্রীললিতমোহন দে	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীশশিভূষণ দাস Advocate Sarfaraj Rd. 49 Soolay Pagoda Road, Rangoon
শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়	"	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৩।৫ বেণেটোলা ষ্ট্রীট
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	"	শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দেব রায় এম্ এ, বি এল, ২৫ পদ্মপুকুর রোড।
"	"	শ্রীক্ষেত্রনাথ ঘোষাল বি এল্, ভাগলপুর।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ বি এল্, ভাগলপুর।
শ্রীনীলমণি ভট্টাচার্য্য	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীনুটুগোপাল ভট্টাচার্য্য, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসরলকুমার বসু, ৪৭ চুণাপুকুর লেন।
শ্রীমহেন্দ্রলাল মিত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	ডি, ডি, বানার্জ্জি Telegraph Supdt. মজঃফরপুর।
শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বাগ্‌চি এম এ বি এল্, উকিল ভাগলপুর।
"	"	শ্রীললিতমোহন ঘোষ বি এল্ উকিল, ভাগলপুর।
"	"	শ্রীরণজিৎ সিংহ বি এল্ উকিল, ভাগলপুর।
"	"	শ্রীকুমারেন্দ্রচন্দ্র রায়, জমিদার বাঁশবেড়িয়া।
"	"	শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল্ উকিল ভাগলপুর।
"	"	শ্রীসারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকিল ভাগলপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত এম্ এ বি এল্, উকিল হাইকোর্ট। ৪ গঙ্গারাম বাবুর লেন।
"	"	সমরেন্দ্রনাথ বসু, উকিল, হাইকোর্ট ৮৪ হরিশ মুখার্জ্জির রোড।
"	"	শ্রীহেমচন্দ্র বসু এম্ এ বি এল্ উকিল, মুঙ্গের।
"	"	শ্রীতারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল উকিল, মুঙ্গের।
"	"	গুণদাচরণ সেন এম্ এ বি এল্ উকিল, হাইকোর্ট ২৫ বলরাম বাবুর ঘাট রোড।
"	"	শ্রীনীরেন্দ্রনাথ খাস্তাগির বি এল্ উকিল হাইকোর্ট ৭৩ সাঁখারিটোলা লেন।
"	"	শ্রীব্রজলাল চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী এম এ বিএল উকিল, হাইকোর্ট ৫০।৬ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মিত্র এম এ বি এল উকিল হাইকোর্ট ৭০ পদ্মপুকুর রোড।
"	"	শ্রীউমাকালী মুখোপাধ্যায় বি এল উকীল হাইকোর্ট ১০।১ গড়বাড়ী রোড, খিদিরপুর।
"	"	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বি এল উকিল, হাইকোর্ট চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
"	"	মাননীয় বিচারপতি শ্রীদিগম্বর চট্টোপাধ্যায় এম্ এ বিএল। ৬৩ কাঁসারীপাড়া রোড।
"	"	শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ বি এল উকীল হাইকোর্ট, ২ বলরাম বসুর ফার্ষ্ট লেন।
"	"	শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এম্ এ বি এল, উকীল হাইকোর্ট কাঁসারিপাড়া রোড।
"	"	শ্রীজয়গোপাল ঘোষ বি এল উকিল, হাইকোর্ট ১৬৭ রসারোড।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম এ বি এল উকীল হাইকোর্ট ৪২ কাঁসারিপাড়া রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুহ এম এ বি এল উকীল, হাইকোর্ট ৬৯।২ পদ্মপুকুর রোড।
"	"	ডাং শরচ্চন্দ্র বসাক এম্ এ ডি এল উকীল হাইকোর্ট ২ কুণ্ডুর রোড।
"	"	শ্রীঅতুলকৃষ্ণ রায় বি এল্ উকীল, উকীল হাইকোর্ট ৯ হালদার পাড়া লেন।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ বি এল্ উকীল হাইকোর্ট বেহালা।
"	"	সজনীকান্ত সিংহ বি এল উকীল, হাইকোর্ট ৮৪ বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।

৫। অতঃপর নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকগুলির জন্য উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল :--

উপহার-দাতা	উপহৃত পুস্তকাদি
১। শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি এল্	২৪৭। শরশয্যা।
২। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ	২৪৮। কালিদাস।
	২৪৯। দত্তকবিধিবিচার।

৩। শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন—

২৪৯। The Chaitanya Library Journal Vol 1

২৫০। " " " " " 2

২৫১। " " " " " 3

২৫২। " " " " " 4

৪। শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন সেন গুপ্ত

২৫৩। A key to the English Entrance Course for 1905

২৫৪। A safe guide to the English Entrance Course for 1909

২৫৫। A safe guide to the English Entrance Course.

২৫৬। শারদীয়াঞ্জলি। ২৫৭। নবীন কুসুম।

৫। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী —২৫৮। Indian Folklore by Ramsatya Mukerjee ২৫৯। স্বয়ব্রহ্মচর্য্যবিধিঃ—শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত ২৬০। চট্টলা-বিলাপম্ (রজনীকান্ত কাব্যতীর্থ) ২৬১। রচনা-পদ্ধতি (গিরীন্দ্র কুমার সেন) ২৬২। রচনা পদ্ধতি (জয়গোপাল কবিরত্ন) ২৬৩। বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ ২৬৪। বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ গিরীন্দ্রকুমার সেন ২৬৫। সহজে সংস্কৃতশিক্ষা—বনমালি বেদান্ত-

তীর্থ এমএ। ২৬৬। মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির ১ম বর্ষ (বিপিন বিহারী ঘোষ সম্পাদক) ২৬৭। Translation of passages from English into Bengali by P. K. Roy B. L. ২৬৮। Report of the Society for the promotion of Technical Education in Bengal July 1906—June 1908. ২৬৯। বৈরাগ্যশতক (বাগেশ্বর বিদ্যালঙ্কার) ২৭০। ধর্ম্মতত্ত্ব ২৭১। পার্সিভাষা লিখিত পুস্তক ২৭২। A key to Professor H. H. Wilson's System of Transliteration. ২৭৩। ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা (বঙ্গমহিলা প্রণীত) ২৭৪। অমর ১ম স্তর (জগচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত বি, এ,) ২৭৫। ভাববার কথা (স্বামী বিবেকানন্দ) ২৭৬। সুললিত ইতিহাস (রামলাল মিত্র) ২৭৭। পঞ্চবটী (দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার) ২৭৮। প্রবন্ধ পাঠ (পূর্ণচন্দ্র দে) ২৭৯। রোমাবতীর উপাখ্যান (বামাসুন্দরী দেবী) ২৮০। গোপালকামিনী (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন) ২৮১। Matriculation Practical Geometry by Krishna Lal Bhattacharjee.

৬।	শ্রীযুক্ত সম্পাদক—কায়স্থ পত্রিকা	২৮২।	কায়স্থ পত্রিকা।
৭।	শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ	২৮৩।	কলাপসার ব্যাকরণ ১ম ভাগ (শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য)
		২৮৪।	সায়াহ্নারতিস্তোত্রম্।
৮।	সম্পাদক শ্রীগৌরাঙ্গ-পত্রিকা	২৮৫।	ব্রহ্মচর্য্য (যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ)।
৯।	গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৬।	জ্ঞান ও কর্ম্ম।
১০।	মধুসূদন ভট্টাচার্য্য	২৮৭।	রত্নমালা ১ম খণ্ড।
১১।	সম্পাদক ইউনাইটেড্ রিডিং রুমস্	২৮৮।	বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তকের তালিকা
১২।	,, বাগবাজার হরিভক্তি লাইব্রেরী	২৮৯।	বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা জুলাই ১৯০৯।
		২৯০।	ঐ এপ্রিল ১৯০৮।
১৩।	Registrar Calcutta University	২৯১।	University of Calcutta for 1908 part VI
		২৯২।	ঐ 1909 „ I
১৪।	,, কালীপদ ভট্টাচার্য্য	২৯৩।	ব্রহ্মশতকম্।
১৫।	,, রায় বাহাদুর রাধাবল্লভ চৌধুরী	২৯৪।	শ্রীরাগানুগাদীপিকা।
১৬।	,, ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	২৯৬।	ভাগলপুর মহাশয় বংশ।
১৭।	,, মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী	২৯৭।	সনাতনসাধনতত্ত্ব বা তন্ত্ররহস্য।
১৮।	,, অক্ষয়কুমার বসু	২৯৮।	শ্রীচৈতন্যকথামৃত (স্বরচিত)
		২৯৯।	শিশুবোধ রামায়ণ।

উপহার-দাতা	উপহৃত পুস্তকাদি
১৯। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩০০। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী ৩০১। বাজীরাও। ৩০২। The life of Dr. Mahendra Lal Sarkar.
	পুথি।
২০। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী	১। কতকগুলি পুথি
২১। শ্রীযুক্ত দাশরথি সিংহ	২। গীতগোবিন্দ সারার্থদর্শিনী টীকা।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় ৺ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া বলেন, সুপ্রসিদ্ধ "যোগেশ" কাব্য এবং অন্যান্য সুন্দর কবিতার রচয়িতা ঈশান বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। তিনি কবিবর ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। তাঁহার অনেক কবিতা অনেকেই আদরের সঙ্গে পাঠ করেন। সাহিত্য-পরিষদে ইহার একখানি তৈলচিত্র থাকা বাঞ্ছনীয়। আজ আমরা এই ছবিখানি পাইয়া পরম আনন্দিত হইলাম।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় এই সম্পর্কে জানাইলেন,—আমরা ছবিখানির নিমিত্ত কতিপয় অনুরাগী বন্ধুর কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁহারাই এই ছবিখানি প্রস্তুত করাইয়া পরিষদে উপহার দিয়াছেন। কবির শেষ জীবনে আমি তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম। আপিসের কর্ম্মসূত্রেই তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়, পরে পরিষদের কথা লইয়াও আলোচনা হইত। আমার হাইকোর্টে প্রবেশের অল্প দিন পরেই কবির জীবন শেষ হয়। সে বড় শোচনীয় ঘটনা। কবি বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করেন। যে দিন তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ পাইলাম সে দিন তাঁহারই একটি কবিতার পংক্তি মনে পড়িয়াছিল,—"স্মৃতি কিম্বা হৃৎপিণ্ড কর উৎপাটন"—জানিনা কবির এই স্বরচিত কবিতা পংক্তির মধ্যে তাঁহার নিজের অন্তিম সংকল্প লুক্কায়িত ছিল কি না!

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় ব্যোমকেশ বাবু তাঁহার রচিত "কবি ঈশানচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনা" নামক প্রবন্ধের সারাংশ পাঠ করেন। কবির অপ্রকাশিত রচনাগুলি যাহাতে প্রচারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার অনুরোধ সভায় অনেকেই উপস্থিত করিলে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জানাইলেন যে কবির পুত্রগণের সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির করা যাইতে পারিবে, তাহা ভবিষ্যতে পরিষৎকে জানান হইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের উপহার প্রদত্ত ৮৫টি তাম্রমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন; কবিরাজ মহাশয়ের এই মুদ্রাগুলির মধ্যে নেপালের বর্ত্তমান গুর্খা রাজবংশের সকল রাজার মুদ্রিত পয়সাই আছে

এবং ভারতের অন্যান্য কয়েকটি দেশীয় রাজত্বের পয়সাও আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আমলের কতকগুলি বিভিন্ন আকারের পয়সাও আছে, সেগুলিও ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইয়া প্রাচীন-মুদ্রাসংগ্রহ মধ্যে স্থান লাভ করিতে অধিকারী হইয়াছে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় "গাজী সাহেবের গান" সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথার অবতারণা করিয়াছিলেন। ডায়মণ্ডহারবার ও বারুইপুর অঞ্চলে এই গাজী সাহেবের গান নিম্নশ্রেণীর হিন্দুমুসলমান মধ্যে বিশেষ প্রচলিত। বারুইপুরের রায়চৌধুরী বংশ রাজপুরে যখন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তৎকালে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ রাজা মদনরায় পীর গাজী সাহেবের কৃপায় নবাবের কোপদৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ এই গানে যথেষ্ট আছে। তখন বাঙ্গালায় সায়েস্তা খাঁর আমল। সে সময় ২৪ পরগণার দক্ষিণ দিকে হিন্দু ও মুসলমান প্রজা সাধারণের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক ছিল, তাহাও এই গান হইতে বেশ বুঝা যায়। প্রবন্ধটি দীর্ঘ হওয়ায় নগেন্দ্রবাবু মুখে তাহার সারাংশ জ্ঞাপন করেন। প্রবন্ধটি পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। নগেন্দ্রবাবু গাজী সাহেবের গানের একটি সম্পূর্ণ পালা সংগ্রহ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই পালা গানও ছাপা হইতে পারে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ মহাশয়ের "বঙ্গীয় গ্রাম্যভাষা" সম্বন্ধে দু-একটি কথা "কথা" নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

অমূল্যবাবুর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ অন্য এক অধিবেশনে পঠিত হইবে স্থির হইল। অতঃপর সভাপতি মহাশয় নগেন্দ্রবাবুর বক্তৃতার সারবত্তা ও গবেষণা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।